১০ম ভাগ। { বৈশাখ, ১৩১৩ সাল। } ১ম সংখ্যা।

আমাদের দশম বৎসর।

আমরা আমাদের গত বৎসরের কর্ম্মফল, ঈশ্বর প্রীতি কামনায়, শ্রীঐশ্বরী মায়া উদ্দেশে, পুরুষসিংহ ঋষি কুথুমীর চরণকমল ধ্যান করিয়া, তাঁহারই করকমলে সমর্পণ করিলাম, গুরুদেবের মুখকমলনিঃসৃত প্রণবধ্বনিরূপ প্রীতিসুধাস্রোত আমাদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হউক ; ঈশ্বর প্রীতি লাভে যেন আমরা কৃতার্থ হই। ওঁ

১। 'আমরা'।

কর্ম্মফল "সমর্পণ করিলাম", এই ক্রিয়ার কর্ত্তা 'আমরা'। পন্থার লেখক প্রকাশক, সম্পাদক ও পাঠক, আমরা গত বৎসর পন্থার জন্য যে যাহা করিয়াছি, সেই সমস্ত ক্রিয়ার যে সমষ্টি ফল, উহাই আমাদের কর্ম্মফল সমর্পণ ক্রিয়ার উহাই কর্ম্মকারক। এই সমষ্টি কর্ম্মফল ভগবতী উদ্দে সম্প্রদান করিতে হইলে, শ্রীগুরু-করকমলকে করণ কারক করিতে হইবে এবং আমরা সকলে একযোগ হইয়া এই ক্রিয়ার এক কর্ত্তা কারক হইতে

হইবে। 'আমি' এই একবচন শব্দটির পরিবর্ত্তে 'আমরা' বহুবচন শব্দটি ধরিয়া, একযোগ হইয়া বলি "এস, 'মা! কর্ম্মফল সম্প্রদান করিতে আমরা সকলে মিলিয়াছি; মা! আমাদের অন্তরে আবির্ভূতা হইয়া আমাদের কর্ম্মফল গ্রহণ কর। মা। যেখানে অনেকগুলি 'আমি'র সদ্ভাবে সম্মিলন, ভগবতি, সদ্ভাবে সম্মিলিত সেই সংঘই তোমার সিংহাসন; তাই মহাযান পন্থাবলম্বিগণ "নমো সংঘায়" বলিয়া নমস্কার করিয়া থাকেন। মা! আমরা সদ্ভাবে সাধু উদ্দেশে মিলিত হইয়াছি; আমাদের এই সংঘে অধিষ্ঠিতা হইয়া আমাদের সংঘাধিপতি পুরুষসিংহকে, আমাদের কর্ম্মফল গ্রহণে প্রেরণ কর'।

'আমি করি' একবচন প্রয়োগ ভগবতী ভাল বাসেন না। অবিদ্যা বলে অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা জীব, আপনাকে ইন্দ্রিয়কৃত কার্য্যের কর্ত্তা জ্ঞান করে; কিন্তু পরাবিদ্যারূপিণী ভগবতী জীবকে এই অহঙ্কারের মোহ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন। মহাদ্যুতিরূপা পরাবিদ্যা হৃদয়ে প্রকাশ হইলে, জীব 'আমি করি' আর বলে না। পরাবিদ্যার আলোক দর্শনের প্রারম্ভেই, জীব সকল কর্ম্মেই "আমরা করিতেছি" ইহা বুঝিতে শিখে; মানব তখন প্রীতিসম্মিলিত কোন সংঘের অঙ্গমাত্র হইয়া, সকল কর্ম্মেই 'আমরা' করিতেছি বলিতে শিখে; তাহার পর আলোক যত ফুটিতে থাকে ততই সকল কর্ম্মের কর্তৃত্ব সেই সংঘে অধিষ্ঠিতা ঐশ্বরী শক্তিতেই দেখিতে পায়।

কপিলদেব শিখাইয়াছেন—অহঙ্কারের অন্তরে মহত্তত্ত্ব। এই মহত্তত্ত্বই একা বুদ্ধিরূপিণী ভগবতীশক্তি। মহাদ্যুতিরূপা এই শক্তিই সেই জগৎ-প্রসবিতার বরণীয় ভর্গঃ; তিনিই মহর্ষিমণ্ডলীর প্রধানা উপাস্যা। অহঙ্কার

তত্ত্বের অন্তরস্থা এই জ্যোতিরূপা দেবীই উমারূপে দেবতাগণকে ব্রহ্মজ্ঞান দিয়াছিলেন; ইনিই পরাবিদ্যা। অবিদ্যা পৃথক্ পৃথক্ অহঙ্কারগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ রাখিয়াছে, কিন্তু যিনি বিদ্যালাভ করিয়াছেন তিনি সকল অহঙ্কারগুলির ভিতর দিয়া একটি তড়িন্ময় সূত্র দেখিতে পান এবং বুঝিতে পারেন যে, সকল অহঙ্কারই একসূত্রে গাঁথা। এই জ্ঞান হইলেই অহঙ্কার তত্ত্বকে জানা হয়, এই জ্ঞান না হইলেই জীব অবিদ্যা বশীভূত ও অহঙ্কার বিমূঢ়। আমি একটি অহঙ্কার বিমূঢ় জীব, আমরা সকলেই যতক্ষণ পৃথক্ পৃথক্

ভাবে কার্য্য করি ততক্ষণ সকলেই অহঙ্কার বিমূঢ় জীব। 'আমি', ভাবটার ভিতরটা একটা ছিদ্র করিয়া ফেলিতে পারিলেই সেই ছিদ্রের মধ্যে প্রণবাত্মক জ্যোতির প্রকাশ হয়। মনে হয় অহঙ্কার তত্ত্বগুলি সব একটি একটি পৃথক্ পৃথক্ নরমুণ্ড, কিন্তু সবগুলি রশ্মিসূত্রে গাঁথা। হৃদয়ের মধ্যে মৃণাল তন্তুবৎ সূক্ষ্ম যে জ্যোতির্ম্ময় সূত্রটির স্পন্দনে অবিরাম প্রণবধ্বনি হইতেছে, সেই সূত্রটি আমার মুণ্ডভেদ করিয়া, অনেক মুণ্ড একত্রে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন। 'আমরা' এই কথায় মনে হয় আমরা সেই মুণ্ডমালা; যে সূত্রে এই মুণ্ডমালা গাঁথা, মহদ্যোনি সেই রশ্মির উদ্ভব ও লয় স্থান। এই মহদ্যোনির অপর নাম প্রকৃতি। এই প্রকৃতির যিনি ঈশ্বর, যিনি এই প্রকৃতির স্বামী, নিত্য-যুক্ত সেই পরম পুরুষই প্রণব বাচ্য ঈশ্বর। এই ঈশ্বর প্রীতিকামনাই আমাদের উদ্দেশ্য। ইনি 'আমাদের' এই সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ঈশ্বরের সহিত মমতা সূত্রে বদ্ধ হইতে পারিলেই, ছোট ছোট মমতা দূরে পলাইয়া যাইবে, এবং আমরা অহঙ্কারের মোহ হইতে উদ্ধার হইতে পারিব। ভ্রাতৃগণ ত্রিপণ রূপ * তুবপুণ দিয়া অহঙ্কারের গোলক গুলা ছেঁদা করি এস। তার পর সকল গুলির ভিতর দিয়া ভ্রাতৃভাবের সূত্র চালাইয়া মাকে নমস্কার করি এস। বাবা দেখে বড় প্রীত হইবেন, আমাদেরও আনন্দের সীমা থাকিবে না। মাতৃচরণে নমস্কার।

২। ঐশ্বরী মায়া।

মমতা সম্বন্ধ-স্থাপক শক্তির নাম মায়া। তুমি আমার, এই সম্বন্ধ যে শক্তি হইতে স্থাপিত হয় উহার নাম মায়া। আমার বাড়ী, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার ধন, আমার দেহ, ইত্যাকার স্বস্বামিভাবের নাম মমতা। যে শক্তি এই মমতার মূল উহার নাম মায়া। জগতে যত জীব আছে সকল জীবেই ঈশ্বরের মমতা সমভাবে বিদ্যমান: ঈশ্বর জানেন যে, সকল জীবই তাঁহার দ্রব্য। যিনি এই অসংখ্য জীবকে, এক ঈশ্বরের সঙ্গে মমতা সূত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন সেই মহামায়াই ঐশ্বরিক মায়া। আমরা ঈশ্বরের স্ব এবং তিনি আমাদের স্বামী। এই স্বস্বামিভাব যদি আমরা উপলব্ধি করিতে

* কায়, মন ও বাক্য এই তিন কেবল ঈশ্বরের কার্য্যে নিযুক্ত করিব, এই তিন প্রতিজ্ঞাতেই ত্রিপণ, যাহাদ্বারা অহঙ্কার গোলক ভেদ করা যায়।

পারি, তাহা হইলেই আমরা মহামায়াকে জানিতে পারিব। এই যে অহঙ্কার তত্ত্বের বর্ণে, 'আমি করি' এই ভ্রমে সদাই ভুলিতেছি। সেই অহঙ্কার দ্রব্যে যে স্বত্ব আছে উহার স্বামী ঈশ্বর, 'আমি উহার স্বামী নহি এই জ্ঞান হইলেই' কোন দ্রব্যেই আমার মমতা থাকিবে না, তখন আমার মায়া, তোমার মায়া, ইত্যাকার মায়াভেদ আর থাকিবে না; ছোট ছোট মায়া মহামায়ায় লয় পাইয়া যাইবে। অসংখ্য প্রকার ভেদের মধ্যে যে একতা Unity in the infinite diversity, উহাই মহামায়ার রূপ। ইনিই পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোজক অসংখ্য জীবের প্রকারভেদের যে এক কারণ তাঁহার নাম প্রকৃতি; (প্র + কৃ + ক্তি = প্রকৃতি; প্রকার ভেদ যাঁহা হইতে হয়) যে সাক্ষীমাত্র পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপী তিনি এক, ইনি প্রকৃতি অধিষ্ঠিত হইয়া সর্ব্বভূতের সহিত মমতা সূত্রে আপনাকে বাধিয়া রাখিয়াছেন; তিনি আপনাকে যে এইরূপ বাঁধিয়া রাখিয়াছেন ইহা তাঁহার স্বেচ্ছা; ইহা তাঁহার দয়া। এই মহাদয়াই মহামায়া। ঈশ্বরের এই দয়াশক্তিই শ্রীঐশ্বরী মায়া। আমরা আমাদের কর্ম্মফল আজি সেই দয়াময়ীকে সম্প্রদান করিলাম। মা দয়াময়ি! দয়া করে আমাদের কর্ম্মফল গ্রহণ কর।

৩। ঈশ্বর প্রীতি কামনায়।

"সে আমার আমি তাঁর, অন্য কারও হব না" ইহাই প্রীতির ভাব। ঈশ্বরের সঙ্গে ঐরূপ ভাবই ঈশ্বর প্রীতি।

৪। চরণকমল, করকমল ও মুখকমল।

জ্যোতির আধার ক্ষেত্রকেই কমল বলা হয়। ওজস্বী পুরুষ মাত্রেরই চরণ, কর ও মুখ ওজঃপুঞ্জে বিশিষ্ট শোভিত হইয়া থাকে। মাথার মধ্যে গকড়াস্থি (Spheroid bone) নামে একখানি অস্থি আছে উহারই মধ্যস্থলে একটি প্রত্যঙ্গ আছে ইংরাজিতে উহার নাম পিটুইটারী বডি। পিটুইটারী বডি কথাটির অনুবাদ "সুধাস্রাবক প্রত্যঙ্গ।" এই স্থলে তেজঃ সঞ্চিত হইলে, সেই সঙ্গে সঙ্গে কর চরণ ও মুখে ওজসালোক প্রকাশ পাইতে থাকে। যাঁহাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি জন্মিয়াছে তাঁহার এই আলোক পদ্মের পাপড়ীর ন্যায় বিকীর্ণ দেখিতে পান। এক্রমোগালি (acromogalli) নামে একটি রোগ আছে, উহা পিটুইটারী বডির রোগ, ঐ রোগে পিটুইটারী

বড়ির আকার বড় হইয়া উঠে এবং সেই সঙ্গে দুই কর দুই পদ ও মুখ এই পাঁচটি অঙ্গে মাংস বাড়িয়া ঐ অঙ্গ কয়টিও বিকৃত হইয়া পড়ে। পিটুইটারী বড়ির সঙ্গে পদদ্বয় করদ্বয়, এবং মুখের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা হইতেও প্রমাণ হয়। গুরুর চরণকমল, করকমল ও মুখকমল ভাবনায় দ্বিদল পদ্মে (Pituitary body) চিত্তস্থির করণের সহজ উপায়। সেই জন্য উক্তরূপ ভাবনা প্রশস্ত।

৫। প্রণবধ্বনিরূপ প্রীতিসুধাস্রোত।

সখি! কে শুনাইল শ্যাম নাম?
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ।

নামের সঙ্গে যে প্রীতিসুধাস্রোত বহে উহা বৈষ্ণব কবির এই গানটিতে পরিস্ফুটরূপে বোঝান হইয়াছে। ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন পালার যাত্রা একবার শুনিয়াছিলাম; ভগীরথ শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে অগ্রগামী হইতেছেন এবং পশ্চাতে স্রোতোময়ী গঙ্গা অনুগামিনী হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া একদল লোকে গান গাহিতেছে—

শাঁখ বাজালে পানি আসে ভাই—একি চমৎকার!

প্রণবধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে প্রীতিসুধাস্রোত সম্বন্ধেও ঐ কথা—

শাঁখ বাজালে পানি আসে ভাই—একি চমৎকার!

চমৎকার—অতি চমৎকার। "আশ্চর্য্যবৎ শৃণোতি কশ্চিৎ অন্যঃ"

ওঁ

গুরুচরণে নমস্কার।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

আনন্দ-লহরী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১২

ত্বদীয়ং সৌন্দর্য্যং তুহিন-গিরিকন্যে তুলয়িতুং
কবীন্দ্রাঃ কল্পন্তে কথমপি বিরিঞ্চিপ্রভৃতয়ঃ।
যদালোক্যৌৎসুক্যাদমরললনা যান্তি মনসা
তপোভি র্দুষ্প্রাপ্যমপি গিরিশসাযুজ্যপদবীম্ ॥

হে দুহিতঃ তুহিন-গিরির !
তব রূপ বর্ণিবারে   বিরিঞ্চ্যাদি কবি হারে,
তবে মা ! শকতি কোথা সামান্য কবির ?
লোকাতীত ও মূরতি   বর্ণিবে বিমূঢ়-মতি !
নীরবে নেহারি সুধু মাধুরী মদির।
অমর-ললনা মরি !   ধেয়ানে বারেক স্মরি'
বিহ্বল মানসে তব প্রতিমা রুচির
অনায়াসে তা'রা সবে   যে সাযুজ্য-মুক্তি লভে
নাহি মিলে মহাতপে সে ধন যোগীর।

১৩

নরং বর্ষীয়াংসং নয়ন-বিরসং নর্ম্মসু জড়ং
তবাপাঙ্গালোকে পতিত মনুধাবন্তি শতশঃ।
গলদ্বেণীবন্ধাঃ কুচকলস-বিস্রস্ত-সিচয়া
হঠাৎত্রুট্যৎকাঞ্চো বিগলিতদুকূলা যুবতয়ঃ ॥

অয়ি মাতঃ রাজরাজেশ্বরি !
অপাঙ্গের জ্যোতিঃকণা   লভে যদি কোন জনা
সে মহাপুরুষবরে শতেক সুন্দরী
লক্ষ্য নাহি করে আর   অন্ধ প্রবীণতা তা'র
রসাভাস-বিহীনতা যায় রে পাশরি।

আঁখিতে আঁকিতে তায়　　বিহ্বলা যুবতী ধায়,
মেখলা পতিতপ্রায়, শিথিল কবরী,
কুচকুম্ভ ঘন দুলে,　　বক্ষবাস পড়ে খুলে,'
আকুল ললনাকুল দুকূল সম্বরি'।

১৪

ক্ষিতৌ ষট্‌পঞ্চাশৎ দ্বিসমধিক পঞ্চশতদকে
হুতাশে দ্বাষষ্টিশ্চতুরধিক পঞ্চাশদনিলে।
দিবি দ্বিষট্‌ত্রিংশন্মনষি চ চতুঃষষ্টিরিতি যে
ময়ূখা স্তেষামপ্যুপরি তব পাদাম্বুজযুগং॥

মূলাধার চক্রে মেদিনীব,
স্বাধিষ্ঠানে বরুণের,　　মণিপুরে অনলের,
অনাহত চক্রে পুন বায়ু-মণ্ডলীর,
ব্যোমের বিশুদ্ধ চক্রে,　　মানসের আজ্ঞাচক্রে,
ষষ্ট্যুত্তর শতত্রয় ময়ূখে মদির
সতত প্লাবিত হয়　　চক্ররূপ ঋতু ছয়
মধুগ্রীষ্মহিমবর্ষাশরতশিশির;
সে সর্ব্ব কিরণোপরি　　রাজে কিবা মরি! মরি!
তব পদাম্বুজ, জিনি' সহস্রমিহির।

১৫

শরজ্জ্যোৎস্নাশুভ্রাং শশিযুতজটাজূটমুকুটাং
বর-ত্রাসত্রান-স্ফটিকঘুণিকা পুস্তককরাং।
সকৃন্নত্বা ন ত্বাং কথমিব সতাং সন্নিদধতে
মধুক্ষীরদ্রাক্ষা মধুরি-মধুরীণাভণিতয়ঃ॥

ক্রিয়াময়ি হে বাণীরূপিণি!
শারদ-জ্যোছনা-শুচি　　জ্যোতির্ম্ময় তনুরুচি
শশিযুত জটাজূট শুভ্রকিরীটিনি!
এক কর ধরে বর;　　অভয় দ্বিতীয় কর;
তৃতীয়ে স্ফটিকমালা স্বচ্ছ সুশোভিনী;
চতুর্থে পুস্তক রাজে;　　ও মূরতি মনো মাঝে
ধেয়ায় যে কণ্ঠে তা'র উ.রি' বিনোদিনি!

নানাবস-সুগভীরা মধু সুধা দ্রাক্ষাক্ষীরা
ফুটাও কবিতা-কলমানস-রঞ্জিনি !

১৬

কবীন্দ্রাণাং চেতঃকমলবন-বালাতপরুচিং
ভজন্তে যে সন্তঃ কতিচিদরুণা মেব ভবতীং।
বিরিঞ্চি প্রেয়স্যাস্তরুণতর শৃঙ্গারলহরী—
গভীরাভি র্বাগ্‌ভি র্বিদধতি সভারঞ্জনমমী ॥

ইচ্ছাময়ি ! তিমির-আবৃত
কবি-হৃদি পদ্মবনে পশি' ওমা ! শুভক্ষণে
বালরবি-রশ্মিরূপে কর আলোকিত।
সে কিরণ সমুজ্জ্বল বিকাশে হৃদয়-দল
স্বর্গীয় সৌরভে সব কবি' সুরভিত ;
অমনি কবিতা মরি ! সভাজনমুগ্ধকরী
গভীর-শৃঙ্গার-রস-তরঙ্গ-মণ্ডিত
কবি-কণ্ঠ হ'তে ফুটি' তোমারি চরণে লুটি'
তোমারি আরতি করে স্বতঃ উচ্ছ্বসিত।

১৭

সাবিত্রীভির্বাচাং শশিমণিশিলাভঙ্গরুচিভি-
র্বশিন্যাদ্যাভি স্ত্বাং সহ জননি সঞ্চিন্তয়তি যঃ।
স কর্ত্তা কাব্যানাং ভবতি মহতাং ভঙ্গিসুভগৈ-
র্বচোভি র্বাগ্দেবীবদনকমলামোদমধুরৈঃ ॥

জ্ঞানময়ি অয়ি ত্রিলোচনে !
বাক্য মাতা অনুপমা চন্দ্রকান্তমণি সমা
বশিনী মেদিনী আদি অষ্টশক্তি সনে
যে তোমারে চিন্তে চিতে বক্রবাণীময় গীতে
বিরচে সে মহাকাব্য আয়াসবিহনে ;
সে কাব্যের নানা ছন্দ পরিপূর্ণ মকরন্দ,
মহাসুখে পান করে যত সুধীজনে ;
বাণীর বদন-পদ্ম স্বর্গীয় সৌরভ সদ্ম
সে সুরভি মিলে তা'র প্রতি পদ সনে।

১৮

তনুচ্ছায়াভি স্তে তরুণতরণিশ্রীসর নিভি-
র্দ্দিবং সর্ব্বামুর্ব্বীমরুণ মণিমগ্নাং স্মরতি যঃ।
ভবন্ত্যস্য ত্রস্যদ্বনহরিণশালীন নয়নাঃ
সহোর্ব্বশ্যা বশ্যাঃ কতি কতিন গীর্ব্বাণগণিকাঃ॥

জ্ঞানরূপা পরম কারণ!
তরুণ তপন শোভা যে মূরতি মনোলোভা
অরুণ মণির সম বরষি কিরণ
স্বরগ ভুবন সব করে মাতঃ! অভিভব
ধ্যানে সে মূরতি তব করে যে স্মরণ,
আসিতে তাহার পাশে দেবাঙ্গনা ভয় বাসে,
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা কম্পিত চরণ,
পলক বিহীন আঁখি চমকায় থাকি' থাকি'
হরিণ-নয়ন সম ত্রাসে নিমগন।

১৯

মুখং বিন্দুং কৃত্বা কুচযুগমধস্তস্য তদধো
হকারার্দ্ধং ধ্যায়েদ্ধরমহিষি তে মন্মথকলাং।
স সদ্যঃ সঙ্ক্ষোভং নয়তি বনিতা ইত্যতি লঘু
ত্রিলোকী মপ্যাশু ভ্রময়তি রবীন্দুস্তন যুগাং॥

হর হৃদে রম নিরন্তর;
উরধে অমৃত সিন্ধু রজোগুণময় বিন্দু,
তোমার বদন ইন্দু পরম সুন্দর;
নিম্নে হৃদি দেশে রয় সত্বতমগুণময়
যুগল বিন্দুর রূপে যুগ্ম পয়োধর;
রাজে মরি! নিম্নে তা'র অরধ হকারাকার
ত্রিগুণিকা কামকলা সূক্ষ্ম শুভকর;
এ প্রতিমা হৃদে যা'র হয় সে নায়িকা-সার
রবিশশিপয়োধরা ত্রিলোকী-ঈশ্বর।* (ক্রমশঃ)

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

---

* আনন্দলহরীর অন্য গুহ্য অর্থ আছে। তন্ত্রশাস্ত্রে জ্ঞান না থাকিলে সেই অর্থ উপলব্ধি হয় না। পং সং।

চৈতন্য কথা।

৩। বুদ্ধদেব।

সম্বোধি লাভ করিয়া, বুদ্ধদেব এক সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত নিরঞ্জরা (ফল্গু) তটে, বোধিবৃক্ষমূলে মুক্তির আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। সপ্তাহের পর তিনি প্রথম প্রহর রাত্রিতে কার্য্যকারণশৃঙ্খলার উপর অনুলোম ও প্রতিলোম ক্রমে মনঃসংযোগ করিলেন। সম্বোধির আলোকে তাহার নিম্নলিখিত জ্ঞান প্রত্যক্ষ হইল।

"অবিদ্যা হইতে সংস্কারের উদ্ভব হয়। সংস্কার হইতে জ্ঞানের উদ্ভব হয়। জ্ঞান হইতে নাম রূপের, এবং নাম রূপ হইতে ছয় ইন্দ্রিয়ের ছয় বিষয় উদ্ভূত হয়। ছয় ইন্দ্রিয় বিষয় হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে অনুভব, অনুভব হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে রাগ, রাগ হইতে সত্তা, সত্তা হইতে জন্ম, জন্ম হইতে জরা ও মৃত্যু, শোক রোদন, ক্লেশ, খেদ ও হতাশা। আমাদের সমগ্র দুঃখই এইরূপে উদ্ভূত হয়। অবিদ্যার বিনাশ দ্বারা সংস্কার নষ্ট হয়, সংস্কারের নাশ দ্বারা নামরূপের নাশ হয়, নামরূপের নাশদ্বারা ছয় ইন্দ্রিয় বিষয়ের নাশ হয়। এইরূপ পর পর নাশ দ্বারা জন্ম ও আনুষঙ্গিক দুঃখের নাশ হয়।"

ক্লেশ না জানা, ক্লেশের কারণ না জানা, ক্লেশের নিবৃত্তি না জানা এবং ক্লেশনিবৃত্তির মার্গ না জানা, ইহাকেই বৌদ্ধমতে অবিদ্যা বলে। সাধারণতঃ বৌদ্ধগ্রন্থে তিন প্রকার সংস্কারের কথা দেখা যায়—কায়সংস্কার, বাক্যসংস্কার ও চিত্তসংস্কার। নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা কায়সংস্কার হয়। বিতর্ক ও বিচার দ্বারা বাক্যসংস্কার হয়। সংজ্ঞা, বেদনা ও বিতর্ক বিচার দ্বারা চিত্তসংস্কার হয়। বিভঙ্গে ছয় প্রকার সংস্কারের কথা আছে পুণ্যাভিসংস্কার, অপুণ্যাভি সংস্কার, অনন্ধাভিসংস্কার, কায়সংস্কার, বাক্যসংস্কার ও চিত্তসংস্কার। পরবর্ত্তী কোন কোন গ্রন্থে ৫৫ সংস্কারের উল্লেখ আছে।

এই কার্য্যকারণশৃঙ্খলা এবং কারণ নাশ দ্বারা কার্য্য নাশ বৌদ্ধধর্ম্মের মূলভিত্তি। বুদ্ধদেবের সম্বোধি (Intuitional cosmic consciousness) এই ধর্ম্মের একমাত্র প্রমাণ।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই ভগবান্ পতঞ্জলি অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চ ক্লেশের নিরূপণ করিয়াছিলেন। উপনিষদে বিদ্যা, অবিদ্যা, জ্ঞান ও অজ্ঞান লইয়া কত পবিত্র বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল। ভগবান্ ব্যাসদেব সেই উপনিষদ জ্ঞানকে কত পূর্ব্বেই না সূত্রবদ্ধ করিয়াছিলেন।

কিন্তু বুদ্ধদেব স্বাধীন ভাবে মানুষিক শক্তির বিকাশদ্বারা নিজ সম্বোধি-বলে এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিগণ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব দেবগণ আপন আপন সম্বোধি দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, সেই জ্ঞানপরম্পরা ও জ্ঞানসমষ্টি এক সাধারণ সম্পত্তি হইয়া বেদমার্গে আর্য্য শিশুর নিকট উপনীত হইয়াছিল। অবতারগণ করুণাবশে অবতীর্ণ হইয়া সেই জ্ঞান আরও পরিস্ফুট করিয়াছিলেন। বুদ্ধিবৃত্তির সংকীর্ণ ও বিচিত্র আধারে সেই জ্ঞান নানারূপে দর্শনে পরিণত হইয়াছিল। দর্শনের অহং সংকীর্ণ কালিমায় জ্ঞানরবি রাহুগ্রস্ত হইল। কি জানি রাজগৃহের পর্ব্বত গুহায়, বুদ্ধদেব অলার ও উদ্রকের নিকট কি শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন? তাঁহার গুরুগণ বেদমূলক ধর্ম্মের শিক্ষা দিলেও, বোধ হয় দেবগণ গৌতম বুদ্ধের কর্ণ বধির করিয়াছিলেন। মনুষ্যত্বের উচ্চতম শিখরে আরূঢ়, সর্ব্ব-ত্যাগী, মারজয়ী গৌতম কেবল আপনার মানুষিক শক্তিবলে কিরূপে জ্ঞান ও মুক্তিলাভ করিতে পারে, এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে দেবতাদের ইচ্ছা। তাঁহাদের ইচ্ছা পূর্ণ হইল বটে। কিন্তু এই অলৌকিক অভিনয়ের মিশ্রফল উৎপন্ন হইল। মনুষ্য আপনার শক্তি জানিল। কিন্তু অপর ক্ষেত্রে সেই শক্তি আত্মঘাতী হইল। এক প্রকাণ্ড ধর্ম্মবিপ্লব হইল। সেই বিপ্লবের ঢেউ চৈতন্যদেবের আবির্ভাব কাল পর্য্যন্ত কখনও প্রবল, কখনও দুর্ব্বল। অবশেষে মহাপ্রভু সেই ঢেউ প্রশমিত করিলেন।

অতি যত্নে গৌতমদেব কার্য্যকারণমূলক জ্ঞানলাভ করিলেন। গভীর চিন্তাবলে সেই প্রত্যক্ষ লব্ধ জ্ঞান আয়ত্ত করিলেন। কিন্তু এই জ্ঞান লইয়া তিনি জীবের কি করিবেন। জীবের দুঃখ দেখিয়াই তাঁহার সন্ন্যাস। জীব দুঃখ নিবারণের জন্য তাঁহার এ দীর্ঘব্যাপী উদ্যম।

অজপাল বৃক্ষতলে সমাসীন হইয়া বুদ্ধদেব ভাবিতে লাগিলেন— 'এই

সত্যের অভ্যন্তরে আমি প্রবেশ করিয়াছি বটে। কিন্তু এই সত্য অত্যন্ত গম্ভীর। সহজে এ সত্য অনুভব করা যায় না। তর্কের দ্বারা এই মহৎ সত্য লাভ করা যায় না। এই দুর্গম সত্য কেবল পণ্ডিতেই বুঝিতে পারিবেন। লোকসমূহ বাসনা পূর্ণ। কামনার পিপাসায় লালায়িত। অর্থ ও কাম লইয়াই তাহাদের সকল ব্যবহার। কিরূপে তাহারা এই দুরূহ কারণবাদ ও কার্য্যকারণ ক্রম বুঝিতে পারিবে। রিপুর একবারে দমন করিতে হইবে। হৃদয়ে শান্তি আনিতে হইবে। সকল উপাধিরই নাশ করিতে হইবে। সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে না। এমন কি সমগ্র নাশ করিয়া একবারে নির্ব্বাণ লাভ করিতে হইবে। আপামর সাধারণে এ কথা কেমনে বুঝিবে। এ ধর্ম্ম প্রচার করিয়া কোন লাভ নাই।"—(বিনয় পিটকের অন্তর্গত মহাবাক্যের প্রথম খণ্ড।)

দুঃখের মূল অবিদ্যা নাশ করিতে হইলে, সকল বাসনারই নাশ করিতে হয়। সে নাশে নামরূপ থাকিবে না, ইন্দ্রিয় বিষয় থাকিবে না, তৃষ্ণা, রাগ থাকিবে না, স্বর্গ থাকিবে না, ভোগ থাকিবে না, কাম থাকিবে না; এমন কি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত কিছুই থাকিবে না। বাসনামাত্রের নাশ হইলে দুঃখই বা কোথা, জন্মই বা কোথা। কিন্তু ইহা ত কথার কথা। বাসনার ঐকান্তিক নিবৃত্তি হইলে মানুষ আর মানুষ থাকিল কোথায়। দেবতা ত তখন তাহার কাছে তুচ্ছ পদার্থ। এ ধর্ম্মের আদর্শ, এ ধর্ম্মের আশ্রয় একমাত্র গৌতম বুদ্ধ ত্রিলোকী আলোকিত করিয়া, প্রলয়কাল পর্য্যন্ত অমিত আভায় প্রজ্বলিত থাকিবেন। কিন্তু ময়ূরের পুচ্ছ লইয়া কাকরূপী জীবমণ্ডলীর কি হইবে? বুদ্ধদেব নিজে এই কথা বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু স্বয়ম্পতি ব্রহ্মা আসিয়া বলিলেন—"বুদ্ধদেব, ধর্ম্মের প্রচার কর। এমন লোক আছে, যাহার মানসিক দৃষ্টি ধূলিধূসরিত নহে। তাহাদের মুক্তি কিরূপে হইবে। মগধ দেশে যে ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, তাহা অসাধু ও অপবিত্রতাময়। অমৃতের দ্বার উদ্ঘাটিত কর। মগধবাসীদিগকে আপন ধর্ম্ম শুনাও। সত্যের উচ্চতম আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া দুঃখময় ভ্রান্ত মানবগণের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। তুমি মুক্ত হইয়াছ। তাহারা এখনও মুক্ত হয় নাই। বীরবর, গাত্রোত্থান কর। তুমি আজ মহাজয়ী ধর্ম্মোপদেষ্টা পথিকদিগের অগ্রণী হইয়া পৃথিবী মধ্যে বিচরণ

কর। ধর্ম্মের প্রচার কর। অবশ্য তোমার উপদেশের অধিকারী জীব তুমি দেখিতে পাইবে।"

করুণহৃদয় বুদ্ধদেবের করুণা উথলিয়া উঠিল। ব্রহ্মার উক্তি তাঁহার মর্ম্মস্পর্শ করিল। নূতন লব্ধ অন্তর্দৃষ্টিদ্বারা তিনি জীবমণ্ডলীকে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। দেখিলেন অধিকারী জীব অনেক আছে।

আর কি তিনি স্থির থাকিতে পারেন। কারুণিক বুদ্ধ করুণার স্রোতে—করুণার অকূল পাথারে ভাসিয়া প'ড়িলেন। আর তখন দিক্ বিদিক্ জ্ঞান থাকিল না। আর তখন অধিকারীর নিয়ম থাকিল না। কেবল কিছুদিন পর্য্যন্ত নারী জাতিই এই ধর্ম্মের বহির্ভূত ছিল। নন্দের প্রার্থনায়, প্রজাপতি দেবীর রোদনে, বুদ্ধের বোধ প্রতিজ্ঞাও ভগ্ন হইল। অধিকারী ও অনধিকারী সকলেই এই ধর্ম্ম লাভ করিল।

গৌতম, তুমি প্রথমে কেবল তোমার গুরু অলার ও উদ্রককে অধিকারী বলিয়া স্মরণ করিয়াছিলে। যখন জানিতে পারিলে তাহারা মৃত, তখন তোমার পূর্ব্ব শিষ্য ও পূর্ব্ব সহচর পাঁচজন ভিক্ষুকে মাত্র অধিকারী বলিয়া স্মরণ করিয়াছিলে। পরে অধিকারের কথা তুমি একবারে ভুলিয়া গেলে কিরূপে? দেবতারাই সকল অনর্থ ঘটান। তোমার কোন দোষ নাই।

বুদ্ধদেব হেতুবাদ সকলকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন।

যে ধর্ম্মা হেতু প্রভবা হেতুংস্তেষাং তথাগতঃ।
হ্যবদীত্তেষাঞ্চ নিরোধ মেবংবাদী মহাশ্রমণঃ॥

সকল হেতুর নিরোধ বাসনার সম্পূর্ণ ত্যাগ। দেহ হইতেই বাসনার উৎপত্তি। দেহ নশ্বর, ঘৃণিত রস ও ধাতুপূর্ণ এবং কতকগুলি অপবিত্র পদার্থের সংহতি (বিজয়সূত্র। Sacred Books of the East. Vol X. Page 32, Sutta Nipata).

দেবতা ও মনুষ্য, পৃথিবী আদি সকল লোক, হেতুর বশীভূত হইয়া সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এইক্ষণে যাহা আছে অপর ক্ষণে তাহা নাই। যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, কতকগুলি কার্য্যের সংহতি মাত্র বা "স্কন্ধ"।

স্কন্ধ পাঁচ প্রকার—রূপ (Material properties or attributes), বেদনা (Sensations), সংজ্ঞা (Abstract Ideas), সংস্কার (Tendencies

or potentialities) এবং বিজ্ঞান (Thought, Reason) সকল মনুষ্যই স্কন্ধের সমষ্টিমাত্র। নিদান অনুযায়ী স্কন্ধের উৎপত্তি হয়। নিদান নাশের স্কন্ধের নাশ হয়।

নিদান, কারণ বা কর্ম্ম অনুযায়ী কখনও একরূপ দেহ, একরূপ জন্ম হয়, কখনও অন্যরূপ দেহ, অন্যরূপ জন্ম হয়। কারণ অনুসারেই কার্য্য, কার্য্য অনুসারেই জন্মান্তর পরিগ্রহ।

ক্ষণে ক্ষণে কারণ অনুসারে কার্য্যের পরিবর্ত্তন হইতেছে, এবং সকল সত্তাই ক্ষণস্থায়ী, এই মত স্বগত বুদ্ধের মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ অতি সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা "ক্ষণিক বিজ্ঞান বাদে" পরিণত করিয়াছিলেন।

মাধ্যমিক মতপ্রবর্ত্তক নাগার্জ্জুনকে গ্রীক রাজা মিনান্ডর (মিলিন্দ) যখন জিজ্ঞাসা করেন "মহাত্মার নাম কি ?" নাগার্জ্জুন (নাগসেন) উত্তর করিলেন, "পিতা, মাতা, ব্রাহ্মণগণ এবং অন্য সকলে আমাকে নাগসেন নামে অভিহিত করেন, কিন্তু বস্তুতঃ নাগসেন বলিয়া কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তি নাই।"

রাজা উত্তর করিলেন, "তবে নাগসেন আমার সম্মুখে নাই। নাগসেন কেবল শব্দমাত্র। ইহার কোন অর্থ নাই। নাগার্জ্জুন প্রশ্ন করিলেন, 'রাজন্, আপনি পদব্রজে আসিয়াছেন, কি রথে আসিয়াছেন ?" রাজা উত্তর করিলেন, "আমি রথে আসিয়াছি।" নাগার্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন রথ কাহাকে বলে ? এই বলিয়া রথের প্রত্যেক অঙ্গকে নির্দ্দেশ করিলেন। রাজা বলিলেন এই অঙ্গগুলি রথ নয়। নাগার্জ্জুন বলিলেন, তবে রথ নাই। মিলিন্দ প্রশ্নাঃ)।

স্কন্ধের সংহতিমাত্র জীবের সত্তা, একথা বুদ্ধদেব বলেন নাই। তিনি আত্মার কথা উল্লেখ করেন নাই। তিনি শেষ তত্ত্বের শিক্ষা দেন নাই। জগতের আদি কারণ লইয়া তাঁহার কোন তাৎপর্য্য ছিল না। মনুষ্য কি, জগৎ কি, এ কথার মীমাংসা করিবার জন্য তিনি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন নাই। তাঁহার একমাত্র মীমাংসার বিষয় জীবের দুঃখ কিরূপে ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক ভাবে নিবৃত্ত হয়। কপিল মুনিও কেবলমাত্র এই মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাই তাঁহারও ঈশ্বর কি জানিবার প্রয়োজন হয় নাই। বর্ত্তনশীল, নিয়ত পরিণামী প্রকৃতির মূলে কপিল মুনিও বলিয়াছিলেন,

বুদ্ধদেবও গিয়াছিলেন। কপিল মুনি প্রকৃতির মূলে কুঠারাঘাত না করিয়া, পুরুষকে লইয়া পলাইয়া আসিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব প্রকৃতির মূলে বাসনা নাশরূপ কুঠারদ্বারা আঘাত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী প্রকৃতির মূলে যখন তিনি কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মাণ্ডের অপর পারের খবর তিনি জানিতেন কি না সন্দেহ। সম্বোধি লাভ করিয়া তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সকল কথা জানিতেন কিম্বা জানিতে পারিতেন বটে, কিন্তু পর নির্ব্বাণ লাভ না করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের অপর পারের কথা তিনি কিরূপে জানিবেন। ঈশ্বর ব্যতীত ঈশ্বরের কথা কে জানিতে পারে? অংশ অবতার ব্যাসদেব "ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" প্রসঙ্গে, ঈশ্বরের তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন এবং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় ঈশ্বরবাদ পূর্ণরূপে ব্যাখ্যান করিয়াছেন।

বুদ্ধদেবের এ বিষয়ে কোন দোষ নাই। প্রকৃত পক্ষে মূলতত্ত্ব (Metaphysics তাঁহার শিক্ষার বিষয় ছিল না। অবান্তরতত্ত্ব (Psychology and Physics) লইয়া তিনি কর্ত্তব্য ধর্ম্মের (Practical Religion) শিক্ষা দিয়াছিলেন। "When Malunka asked the Buddha whether the existence of the world is eternal or not eternal, he made no reply; but the reason of this was, that it was considered by the teacher as an enquiry that tended to no profit."

বুদ্ধদেবের স্কন্ধগুলি পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সে গুলি বেদান্তের পঞ্চকোষের অন্তর্গত। "আত্মা" স্কন্ধের অন্তর্গত নয়। তাঁহার শিক্ষা অনুসারে, আত্মার কথা বলিতে তাঁহার প্রয়োজন হয় নাই।

আত্মা ও ঈশ্বর জ্ঞানের অভাব, কেবল প্রকৃতির কারণানুযায়ী পরিণাম জ্ঞানে প্রকৃতিজয়ের দুরূহতা, শাস্ত্রজ্ঞানের ভিত্তিত্যাগ এইগুলি বৌদ্ধ ধর্ম্মের দুর্ব্বলতা। বুদ্ধদেবের ব্যক্তিগত প্রবলতাও এ দুর্ব্বলতা নষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই। বুদ্ধদেব চারি মহাসত্য নির্ণয় করিয়াছিলেন—(আর্য্যসত্য)।

১। সংসারের সকল পদার্থ ও সকল ভাবই "ক্লেশ।" ২। এই ক্লেশের মূল বিষয়তৃষ্ণা। ৩। এই তৃষ্ণা বা বাসনার নাশ দ্বারাই ক্লেশের নিবৃত্তি হয়। ৪। এই তৃষ্ণানাশের একমাত্র উপায় সংমার্গ অবলম্বন। এই মার্গ বুদ্ধদেব কথিত "অষ্টাঙ্গ মার্গ।

মার্গানামষ্টাঙ্গিকঃ শ্রেষ্ঠঃ সত্যানাং চতুরোপদাঃ।
বিরাগঃ শ্রেষ্ঠো ধর্ম্মানাং দ্বিপদানাঞ্চক্ষুষ্মান্‌॥

মার্গ সকলের মধ্যে অষ্টাঙ্গ মার্গশ্রেষ্ঠ। সত্যের মধ্যে আর্য্যসত্যবাচক চারিটি বাক্য শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্মের মধ্যে বৈরাগ্য শ্রেষ্ঠ। মনুষ্য সকলের মধ্যে চক্ষুষ্মান্‌ শ্রেষ্ঠ।

এষ বো মার্গো নাস্যঃ দশনস্য বিশুদ্ধয়ে।
এতং হি পতিপজ্জথং সাবস্সৈষঃ প্রযোহনঃ॥

এই অষ্টাঙ্গ মার্গই তোমাদের মার্গ। জ্ঞানের বিশুদ্ধির নিমিত্ত অন্য পথ নাই। তোমরা ইহাকেই অবলম্বন কর। ইহা সারের প্রয়োজনকারী।

—(ধম্মপদ, মার্গবাক্য, (চারুচন্দ্র বসু,) ১৫২ পৃষ্ঠা)

অষ্টাঙ্গ মার্গের নিম্নলিখিত আটটি অঙ্গ :—

১। সৎ মতি (Right Views)

২। সৎ উদ্দেশ্য (Right aims)

৩। সৎ বাক্য (Right words)

৪। সৎ আচরণ (Right behavior)

৫। সৎ জীবনবার্ত্তা (Right word of livelihood)

৬। সৎ উদ্যম (Right exertion)

৭। সৎ মনোনিবেশ (Right mindfulness)

৮। সৎ ধ্যান ও শান্তি (Right meditation and tranquility)

এই অষ্টাঙ্গ মার্গ অবলম্বন করিলে ভিক্ষু ক্রমে ক্রমে চারি অবস্থায় উপনীত হন। প্রথম অবস্থা—দীক্ষা বা স্রোতাপত্তি। সৎসঙ্গ, ধর্ম্মশ্রবণ, সৎচিন্তা এবং ধর্ম্ম আচরণ দ্বারা প্রথম অবস্থা লাভ হয়। এই অবস্থায় তিনটি ভ্রম দূর হয়।

১। নিজের সত্তা সম্বন্ধে ভ্রম। অর্থাৎ এই অবস্থায় ভিক্ষু আপনাকে স্কন্ধের সমষ্টি বলিয়া জানিতে পারে। এবং ইহাও জানিতে পারে যে, স্কন্ধ ক্ষণে ক্ষণে পরিণামশীল।

২। বুদ্ধদেব এবং তাঁহার মত সম্বন্ধে সন্দেহ।

৩। যজ্ঞ হোম করিলেই মুক্তিলাভ হইবে, এই ভ্রান্ত বিশ্বাস।

স্রোতে, প্রবেশরূপ এই প্রথম অবস্থার ফল স্বয়ং বুদ্ধদেব বর্ণনা করিয়াছেন--

পৃথিব্যা একরাজ্যেন স্বর্গস্য গমনেন বা।
সর্ব্বলোকাধিপত্যেন স্রোতাপত্তি ফলং বরম্॥

পৃথিবীর ঐকরাজ্য, স্বর্গগমন বা সর্ব্বলোকাধিপত্য অপেক্ষা "স্রোতাপত্তি"র ফল শ্রেষ্ঠ।—(চারুচন্দ্র বসুর ধর্ম্মপদ, ১০০ পৃষ্ঠা)

এই অবস্থায় উপনীত হইলে ভিক্ষু হয় ত সাত জন্মের পর নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিতে পারেন।

দ্বিতীয় অবস্থা।

সকৃদাগামী—এই অবস্থায় ভিক্ষুর সন্দেহ ও ভ্রম থাকে না। তিনি সংযতচিত্তে কাম, দ্বেষ ও বিকল্পের পরাভব করেন। এই অবস্থাপন্ন যতি আর একবার (সকৃৎ), মনুষ্যকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। বেদান্ত শাস্ত্রে ইহাকে "এক ভব" বাদ বলে।

তৃতীয় অবস্থা।

অনাগামী—এই অবস্থায় কামের আত্যন্তিক নাশ হয় এবং দ্বেষ ভাবও সমূলে বিনষ্ট হয়। হৃদয়ে তখন আর কাম ও দ্বেষের উদয় হয় না। আর পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। কিন্তু নির্ব্বাণ লাভের পূর্ব্বে ব্রহ্মলোকে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়।

চতুর্থ অবস্থা।

অর্হৎ—এই অবস্থায় পার্থিব কি অপার্থিব জন্মের বাসনা থাকে না; অভিমান, অহংজ্ঞান ও অবিদ্যা, ইহার কিছুই থাকে না। কেবলমাত্র পরের জন্য জগতের জন্য অর্হৎ জীবন ধারণ করেন।

"As a mother, even at the risk of her own life, protects her son, her only son: So let him cultivate good will without measure toword the whole world, above, below, around, unstinted, unmixed with any feeling of differing or opposing interests. Let a man remain steadfastly in this state of mind all the while he is awake, whether he be

standing, walking, sitting, or lying down. This state of heart is the best in the world. Metta sutta. From children's text J. R. A. S., 1869, describing the state of the Arhats.

অর্হৎ সকল সংযোজন ছেদন করিয়া নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করেন। বেদান্ত শাস্ত্র মতে অর্হৎ জীবন্মুক্ত।

অর্হতের কর্ম্ম বীজ নষ্ট হয়। কেবল প্রারব্ধ কর্ম্মানুযায়ী দেহ ধারণ করিয়া থাকিতে হয়। অর্হতের নির্ব্বাণ সোপাধিকের নির্ব্বাণ। ইহার পর পরনির্ব্বাণ, যাহাকে নিরুপাধি শেষ নির্ব্বাণ বলে।

সচরাচর "পরনির্ব্বাণ" শব্দের অর্থে "নির্ব্বাণ" শব্দ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সেটি ভুল।

"Thus of the Dhamma-pada, Professer Max Muller, who was the first to point out the fact, says. "If we look in the Dhamma-pada at every passage where Nirvana is mentioned, there is not one which would require that its meaning should be annihilation; while most, if not all, would be come perfectly unintelligible if we assigned to the word Nirvana that signification. * * * *

The samething may be said of such other parts of the Pitakas as are accessible to us in published texts.........It follows, I think, that to the mind of the composer of the Buddhavansa, Nirvana meant not the extinction, the negation of being, but the extinction the absence, of the three fires of possion (last, hatred and Qudelsion). From those passages it would seem that the word was used in its original sense only, as late as the time of Buddhagosha; after that time we occasionally (but very seldom, and only when the context makes the modification dear) find Nirvana used where we should expect "anupadisesa nibbana" or "parinibbana"—Rhys Davids

পর নির্ব্বাণ শব্দে ও জীবের ঐকান্তিক নাস অভিপ্রেত নহে। পরনির্ব্বাণ লাভ করিলে জীবের ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে আর জন্ম হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বুদ্ধদেব জীবের স্বরূপ নির্ণয় করেন নাই। (ক্রমশঃ)

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ এম, এ।

—.ব, ছবি ও গান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৫)

মহেশ্বরের ডমরুধ্বনিতে ভূতবর্গ নৃত্য করে। কি অপূর্ব্ব চৈতন্যাধার! তাহারা ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া যায়। ভূতগণ কালের পরিচায়ক; কিন্তু তাহারা পরস্ত্রী হরণ করে না।

স্থূল ক্ষুধা হইতে একটা সূক্ষ্ম ক্ষুধা আছে। সেটার নাম কাম। স্থূল ক্ষুধা পাইলে আমরা ভূত ধরিয়া খাই। কামাগ্নি জ্বলিয়া উঠিলে আমরা ভাব ধরিয়া খাই। খাদ্যাভাবের মাত্রা তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াও সাধক কামলোকে দগ্ধ হইয়া থাকেন। কামলোক হইতে কামনা।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ একত্র করিয়া মাত্রার সাহায্যে একটি সুন্দরীর মূর্ত্তি উদ্ভূতা হয়। মন সেটাকে অহঙ্কারাধিষ্ঠিত হইয়া ভোগ করিতে চাহে। এটাও একটা খাদ্য। ইহার ক্ষুধাটা ভয়ানক। ক্রিয়াশক্তি সুন্দরী কল্পনা করে, জ্ঞানশক্তি তাহা ধরে, ইচ্ছা শক্তি তাহাতে লয় হইতে চাহে। ক্রিয়াশক্তি ব্রহ্মার কল্পনায় বিশ্বরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল। চিরসুষমাপূর্ণ সংসারে ষোড়শী মোহিনী মূর্ত্তি। বিষ্ণু তাঁহাকে সন্তানের ন্যায় জ্ঞানাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। হর আত্মহারা হইয়া তাহাতে চৈতন্য আরোপিত করিয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁর মায়া চিরকালই কুহকিনী। চিত্তবৃত্তিতে উপভোগার্থ তিনি মানবীর মায়া রূপ ধরিয়াছিলেন। আমি বাস্তবিক তাঁহাতে লয় হইতে চাহি, কিন্তু ভেদজ্ঞানে তাঁহারে মায়াভাবকে ভোগ করি। ভেদমায়া সেই মায়ারূপকে স্ত্রী বলিয়া দেখায়। যোগমায়া মাতা এবং কন্যারূপে দেখায়।

লয় স্থান টানিতেছে। প্রেমের গান গাহিলাম। বলিলাম তুমি আমার। কৈ, সে ত আমার নয়! সতী হইয়া তুমি শিবের সহিত বিহার কর, তাহারই রূপ ভেদাত্মক জগতে কাম বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। মা! এই কামকে কি করিয়া জয় করিব।

তাঁহারই পদে তাঁহার মায়াকে সঁপিয়া দাও। সুন্দরী খাদ্য। কামিনীর

ভাব খাদ্য। খাদ্য ভাবিও না। ক্ষুধার কারণ ভাব। জঠরাগ্নি যেমন তাঁহার স্পর্শে কলের মতন তাঁহারই সেবায় অর্পিত হইয়াছিল, কামাগ্নিও তাঁহার স্পর্শে পবিত্র হইবে। ভয় নাই। গুরু তোমার স্ত্রীকে কাড়িয়া লইবেন না। সাধনার জন্যই কামিনী। কামিনীর জন্য সাধনা না। ইহাই পরিমিত বিহার। ইহাই যুক্ত বিহার। গুরুর পদে প্রাণ সঁপিলে তুমি মায়াশিব, স্ত্রী মায়া শক্তি। ষোড়শী স্ত্রীকে সম্মুখে রাখ। কাম দমন করিলে মহা উগ্রমূর্ত্তি হয়। সেই সময় সম্মুখে রাখিলে তোমার পরীক্ষা। খাদ্যের সময়ও সেই পরীক্ষা হইয়াছিল। এমন মদ্য এবং মৎস্য নয়। রক্ত মাংসের পরীক্ষা।

তুমি গৃহস্থ? হয় ত তোমার সম্মুখে সহস্র কামিনী। একটা গানে সকলেই তোমার মাতা এবং কন্যা। একটা গানে তোমার প্রণয়িনী কাব্যময়ী, তোমার সন্তানের মাতা, তোমার ছোট সংসারের যোগমায়া। দুঃখিনী সতীর তুমিই কেন্দ্রস্থল। তুমি যেমন তাহার লয়স্থল, সেও তোমার সহধর্ম্মিণী। তবে কেন তোমার কামতৃষ্ণা মিটে না। শাকান্ন ছাড়িয়া কেন তুমি অন্য রস খুঁজিয়া বেড়াও? তুমি আমিত্বের কলুষিত বদ্ধ রূপকে অন্যের চিত্তে আরোপ করিতে চাহ, তাহার ফল তোমাতেই ছুটিয়া আসে। জান না কি তোমার "আমিত্ব" জগতের সতীতেজ নির্ব্বাপিত করিতে চাহিতেছে। তাহা কি কখনও হয়? একদিন নয়, দুই দিন নয়, দেখিবে সতীত্ব যেমন তেমনই আছে, কিন্তু দুইটি জীবাত্মা ভেদমায়ার গুণে নিকৃষ্টা প্রকৃতির গুণে, নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। জান না কি ভোগ করিলেই ভোগস্থান নরক হইয়া দাঁড়ায়। তোমার মনেই তুমি ভোগ করিয়াছিলে, তোমার মনই আবার নরক।

এই ক্ষুধা দুটি বড়ই মায়া। ক্ষুধার বশে আমারা কাঞ্চন খুঁজিয়া বেড়াই। কাঞ্চন নহিলে কামিনা আসে না। কামিনী হইতে পুত্র কলত্র বাড়িয়া যায়। দারাসুতের জঞ্জালে ক্রোধ বাড়ে। নিজের আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া লোভ হয়, পরশ্রীকাতরতা হয়। লোভে পড়িয়া চুরি করি, চুরি করিয়া ভাবি কাহার জন্য করিলাম? যোগমায়া সকলেই জড়ান, ভেদমায়া ভাবে আবদ্ধ করিয়া জীবকে বিভাগ করিয়া থাকেন। যোগমায়া আবার ভাবগুলি একত্র করিয়া কথা রচনা করেন। তখন ঠ্যালায় পড়িয়া আমরা

বৈরাগ্য শিখি। সেই কথাগুলি ধরিয়া তুমি গাহিয়া থাক,—"দারা সুত কেহ কারও নয় রে বাপ"।

আগে যদি গাহিতে তবে সুন্দর হইত। দারা সুতও আসিত, কিন্তু তাহারা তোমারই হইত। দারা সুত মন্দ নয়। যিনি বিকাশ চাহিয়াছিলেন তিনিই খণ্ড চৈতন্যগুলি একত্র করিতে দারা সুতের রূপ দেখাইয়াছেন। একটি রাগের ছয়টা রাগিণী, এবং তাহার পুত্র সন্তানাদি না হইলে বিশ্ব থাকিত কোথায়। কিন্তু রাগিণীগুলি খাঁটি সুর হওয়া চাহি। রাগ মিশ্র করিও না, সুর হারাইও না। ওস্তাদী করিতে গেলে লাঠালাঠি। আমার মত অনেক ওস্তাদ আছে এবং খুন খারাপি হইলে বড় ওস্তাদ আছে।

(৬)

কত দিক্ দিয়া কত লোক লক্ষ্য করিয়াছে। ভূত দেখিলে বাক্‌রোধ হয়। ভূত দেখিয়া বিজ্ঞানের কথা জুটিতেছে না। "প্রোটাইল" পর্য্যন্ত শেষ। তাহার পর কীটাণু, কোষাণু, জীবাণু, তাড়িত, উত্তাপ, জল, গ্যাস, ড্রেন প্রভৃতি। এক কথায় "প্রকৃতি"। মানুষ প্রকৃতিরই সন্তান। প্রকৃতি হইতে তাহার চৈতন্য। বিজ্ঞান অব্যক্তের উপাসক।

বিজ্ঞান তাঁহারই একভাব। ধর্ম্মে জড়ত্ব আসা অপেক্ষা জড়ত্বে ধর্ম্ম থাকা শ্রেয়ঃ। প্রবল স্বার্থপর "আমিত্বের ধর্ম্ম জগতে ছাইয়া যাওয়াতে, কর্ম্মফলে বিজ্ঞান কসিয়া এক দফা জুতা মারিয়াছে। বিজ্ঞান শিখাইতেছে "তোমার" চৈতন্য জড় হইতে, অর্থাৎ মাত্রাস্পর্শ হইতে। বেদান্ত তাহাকে মায়াভাব কহিয়া থাকেন। উহা একটা প্রতিবিম্বমাত্র। আমরা যে চৈতন্য বাক্‌-যুদ্ধে প্রচার করিয়া থাকি, তাহা হইতে শুদ্ধচৈতন্য বহুদূর। কত মাত্রা পার হইলে যে সে চৈতন্য, তাহা বুঝা যায় না।

যাহারা একটু ভক্ত ভূত দেখিলে নাম করে। জ্ঞানী ভক্তের মধ্যে নাম-গুলার আদর আছে। তল, অতল, রসাতল, ভূর্লোক, ভুবর্লোক। থিয়-সফির ভাষায় প্লেন্ এলিমেণ্টেল, প্রিনসিপ্ল, প্রভৃতি। পরব্রহ্ম, মূলপ্রকৃতি, ঈশ্বর (লগছ্) লয় ছেণ্টার। পুরাকালে দেব, নর, অসুর সকলের নিকটেই মায়ের আদর ছিল। তাহার পর পন্দনামায় পড়িলাম—"রহমান্ রাম আল্লা করতার, পরওর দিগার হ্যায় পালনহার; নবী রসুল প্যাগম্বর জান্, চার

ইয়ারকৈা পহলে মান্।" ওস্তাদ বলিলেন উক্ত চার ইয়ার "রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন।" ওস্তাদ জাতিতে কায়স্থ। তাহার পর শুনিলাম,—দশ অবতার, মৎস্ত, কূর্ম্ম, কাঁকড়া প্রভৃতি!! কাঁকড়া রামচন্দ্রের পিতা দশরথ!!!

কাজেই মানুষ বড় হইয়াছে এবং নাম ছোট হইয়া গিয়াছে। মায়াধিষ্ঠিত ঈশ্বর মানুষেই লয় পাইয়াছেন। যে জাতি ঈশ্বরে ঈশ্বরত্ব দেখে না, তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। নাস্তিকেরও বল আছে, বিজ্ঞানেরও বল আছে, কিন্তু ঈশ্বরের নাম লইয়া ছোট করায় অধঃপতন ভিন্ন আর কিছুই নাই। তিনি বলিয়াছেন—সকলেই তাঁহার প্রিয়। তাঁহাকে খুঁজিয়া না পাইলেও, তাঁহাকে দেখিতে না পাইলেও, অন্ধ সন্তানের ন্যায় নাস্তিক তাঁহার নিকট আদরের। কিন্তু চক্ষুষ্মান হতভাগা আমি, তাঁহার নামের অপলাপ করিয়া কি করিয়া প্রিয় হইতে চাহি?

পাছে সে নামের অপলাপ হয়, পাছে সে নামের মহিমায় কালিমা পড়ে, তাই সাধনার পথে মন্ত্রগুলির অর্থ চিরকাল গুরুমুখী রহিয়া গিয়াছে।

তনুর ত্রাণার্থ তন্ত্র। মনের ত্রাণার্থ মন্ত্র। তনু এই জীবদেহ। ইহা বিশ্বদেহের কিংবা মায়াদেহের একটা অংশ। এই দেহের মধ্যে "আমি"। আমি আত্মা, আমি মন, আমি প্রাণ; সাধারণ মানুষ আত্মা বুঝে না। আত্মা-বুদ্ধি-মনস্ও বুঝে না। সূত্রাত্মাও বুঝে না। তবে "মন" বলিলে বুঝে যেখানে তাহাদের ভাব হয়, দশা এবং দুর্দ্দশা হয়, সুখ ও দুঃখ হয়। প্রাণ বলিলে বুঝে যেটা খাইলে থাকে; খাইতে না পারিলে শীর্ণ হয় এবং রোগ হইলে মরিয়া যায়। আত্মা বলিলে সে জোর "আমি" টুকু বুঝে। ভক্তি বলিলে সে হৃদয়ের একটা উচ্ছ্বাস বুঝে, যাহাতে তনু পুলকিত হয়। জ্ঞান বলিলে বৈষয়িক বুদ্ধি কিংবা জোর শাস্ত্রের দুই একটা কথা বুঝিবার শক্তি, ইহাই অনুমিত হয়।

এই যে জীব, যাহার আরসুল্লার ন্যায় দুইটা বড় বড় চক্ষু, এবং এখানে ওখানে উড়িয়া শব্দ, গন্ধাদি প্রচার করে, যাহার অহরহ খাদ্য, কামিনী এবং কাঞ্চনাদিতেই চৈতন্য, সেও কাচপোকার মত গুরু পাইলে দেহের কাঠাম বদলাইয়া ফেলে। যাহাকে প্রাণ, মন, সপিয়া দেওয়া যায়, সেই গুরু। ঈশ্বর সেই গুরুগণের গুরু এবং তাঁহার বাচক প্রণব। মহামায়ার লয়শক্তি

সর্ব্বদা তাঁহার দিকে ধাইতেছে। যখন যেখানে মনের লয়, কিংবা চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়, নিশ্চয় জানিও সেই স্থানে গুরু আছেন। আমরা গুরুর সহিত শিষ্যের সম্পর্ক বুঝি না। তিনি কি করিয়া শিষ্যের চিত্তে আবিষ্ট হন তাহা বুঝি না। পর শরীরে আবেশ হওয়াটাকে, এখন সাধারণতঃ "সজেসন্" বা "মেসমেরিসম্" বলিয়া বুঝি। কিন্তু "মেসমেরিজম" ক্ষণিক লয়। সংস্কারের বোঝাটা ঘাড়েই থাকে। পারমার্থিক লয় গুরুর দ্বারা হয়। গুরু যিনিই হউন না কেন তিনি প্রাণ সঁপিতে শিখান। আমরা দেখি গুরুর দাড়িটা কত বড়, জটাটা আছে কি না, খান কি, পয়সা লন কি না। অন্য গুরুর সহিত তাঁহার তুলনা করি। ব্রহ্মানন্দ বড় কি ভাস্করানন্দ বড়? ব্রহ্মা বড় কি বিষ্ণু বড়? থিয়সফির গুরুগণ কে? অমুকের গুরুর গলায় ঘা হইয়াছিল। অমুকের গুরু শাস্ত্র জানে না। ইত্যাদি। বদ্ধ আমির ভাবই এই।

মন্ত্র সম্বন্ধেও তাই। ওঁকারটা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া। হ্রীং, ক্লীং, গুলা সেকালের ছিটে ফোঁটার মন্ত্র। বাসুদেব, অনিরুদ্ধ, গোপাল প্রভৃতি বৈষ্ণবী বিকার। বুদ্ধের প্রেমভাব ছিল না, চৈতন্যের যোগবল ছিল না !!!

প্রকৃতি পুরুষে লয় পাইলে পরব্রহ্ম !!! বেদান্তের মায়া সাংখ্যের প্রকৃতি !!!

বুঝিতে সবই পারিলাম, মা, কিন্তু প্রাণের মায়া বড় চিজ্। প্রাণায়াম করিতে গেলে প্রথম ভয় পাছে নাকটা, চক্ষুটা যায়! একেবারে গিয়া ধ্যান আরম্ভ করি। প্রাণটাকে পুষিয়া, মনটাকে ধরি। কাহারও মতে একেবারে আত্মাটাকে ধর। জ্ঞানেই মুক্তি।

শরীরের পোষ্টাই গেলে, চাকচিক্য গেলে, সে পথ সাধনারই নয়। যে খুঁটিই ধর, মা তোমাকে পরীক্ষা করিবেন। আমিত্বের ঝুলি কাঁধে করিয়া প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা কিছুই হয় না। প্রাণায়ামে ক্ষুধা বাড়ে, হয়ত বেশী খাওয়া যায়। ধর একবার। পেটটা ডাগর হইলেই ছাড। বীজ ধ্যান করিয়া অনিমা, লঘিমা প্রভৃতি পাওয়া যায়। হয় ত মারণ, উচাটন, বশীকরণ হয়। ধর বীজ।

কিছুদিন পরে সবই বিরক্তিকর হইয়া পড়ে। কত বড় বন্ধন, শিথিল হইলে সাধক হয় তাহার কি জানিয়াছি? সংসারের ভোগ ছাড়িয়া ভগবানের

অনিশ্চিত দ্বারে ভিখারীর ন্যায় কয়জন লোক কাঁদিয়া বেড়াইয়াছে? ধর্ম্মবীর-গণের মধ্যে সকলেই পথের ভিখারী। পুরাকালে এক রাজযোগী ছিলেন, তিনি ভগবান্ রামচন্দ্রের শ্বশুর জনক ঋষি। ধন্য তবে রাজযোগ। সৌভাগ্যের বিষয় জনকরাজ কোন পুথি রাখিয়া যান নাই !!

গায়কগণ প্রায়ই দরিদ্র। যোগিগণ চক্ষু মুদিয়া গহ্বরে বসিয়া থাকিতেন। ছিন্ন কন্থা লইয়া কে শ্মশানবাসী হইতে চায় ভাই? সংসার পথে থাকিয়া, গৃহস্থ থাকিয়া যতটুকু এ জন্মে হয় তাহাই কর। কিন্তু যাহাই কর নিজের জন্য করিও না, করিতে হয় বলিয়া করিও।

তন্ত্র, মন্ত্র, যোগাদি আত্মবলির পথ। ইহার গূঢ় অর্থগুলি প্রত্যেক উপাসনা প্রণালীতেই আছে। নিরাকার উপাসনাই হউক, সাকার উপাসনাই হউক, তান্ত্রিকই হউক, সকলেরই এক উদ্দেশ্য। সকলেরই লয় স্থান এক। সকলেই সেইখানে যাইতে চাহে। বিশ্বের নিয়মই তাই। কেউ জ্ঞানযজ্ঞ করিয়া, কেউ ভক্তিযোগ করিয়া, কেউ কর্ম্মযোগ করিয়া, কেউ বা অবক্ত্য পথ ধরিয়া, কেউ বা অক্ষর বীজাদি ধরিয়া,কেউ বা জ্ঞান বিজ্ঞান যোগ করিয়া, সকলেই প্রাণ এবং মনকে স্বরূপাবস্থায় আনিতে চায়।

সকলেরই উদ্দেশ্য অসীম শান্তি, অসীম আনন্দ এবং অসীম জ্ঞান। এ আনন্দ কোন বিষয় চাহে না, এ জ্ঞানের অহঙ্কারত্ব নাই। শান্তি চাহি নাই তাই শান্তি, আনন্দ চাহি নাই তাই আনন্দ, জ্ঞান চাহি নাই তাই জ্ঞান। উদ্দেশ্যহীনতার মধ্যে সঙ্কল্প।

আকাঙ্ক্ষার মধ্যে নিরাকাঙ্ক্ষা। জ্বালা যন্ত্রণা পাইয়া মরিতে চাহি। না মরিব না, জ্বালা যন্ত্রণা দাও। তাহাতেই সাধকের কত আনন্দ! সুখ ভোগ করিবার জন্য জন্মিতে চাহি। না সুখ ভোগ করিব না, জন্ম দিও না মা! যেন, দুঃখই পাই। কোমল শয্যায়, ঐশ্বর্য্যের মধ্যে, পূর্ণ যৌবনে যে দিন মরিতে চাহিব, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় বিতাড়িত হইয়াও যে দিন বাঁচিতে সাধ হইবে, সেই দিন হইতে সাধনা আরম্ভ।

তাই ত হয়। তবে চক্ষু দিয়া চাহিয়া দেখি না কেন? জগতে ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে, শুদ্ধ চৈতন্য ফুটিয়া উঠিতেছে, তবুও অন্ধ কেন?

তাঁহার নামের গান প্রতিধ্বনিত হইয়াও আবার বিলীন হয়। তাঁহার

জ্যোতি অন্ধকারেই ফুটিয়া আবার ডুবে। সেই সময় যুক্ত হও। সেই সন্ধ্যার সময়।

(৭)

তাঁহার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিও দেখিয়াছি, করুণাময়ী মূর্ত্তিও দেখিয়াছি। মহাযোগিগণ তাঁহার মায়াদেহস্থ বীণাযন্ত্রটি লইয়া সেকালে সাধনা করিতেন। অতি যত্নে বীণা সম্মার্জ্জিত করিতেন। দেবর্ষি নারদ সেই বীণায় ওঁকার ধ্বনি উত্থিত করিয়া হরিনামে ভুবন ভাসাইতেন।

ওস্তাদীর জন্য বীণা নহে। হরিনাম করিতেই বীণা। আমার প্রাণ বীণাধ্বনি। শুদ্ধচৈতন্য প্রাণ এবং জ্ঞান একই। কিন্তু মায়াভাবে আমরা প্রাণকে মাত্রাস্পন্দনাদিরূপে দেখিয়া থাকি। জ্ঞানকে চিত্তবৃত্তিরূপে দেখি। আমরা ভাবি,—আমরা বাজাইতেছি তাই বুঝি সুর, আমরা গাহিতেছি তাই বুঝি গান। কিন্তু তাহা নয়। সুর আছে বলিয়াই আমরা বাজাই। গান আছে বলিয়াই আমরা গাহি। প্রকৃতি আছে, তাই পুরুষ প্রাণাদিরূপে বিকাশিত হন। মায়াগণ্ডিতে পরিচ্ছিন্ন হইয়া অসংখ্যরূপে প্রতিভাত হন।

প্রথমে তমোগুণের আধারে প্রাণ মাত্রারূপে বিকাশিত হয়। রজোগুণে ইন্দ্রিয়াদি মাত্রায় মাত্রায় সম্বন্ধ স্থাপন করে। সত্ত্বগুণে সেই সম্বন্ধগুলি একত্র হইয়া লয়স্থানকে বিকাশিত করে। তাহার নাম মন। লয়স্থান আত্মা।

সূক্ষ্ম জগতে লয়স্থানগুলির কখন বিনাশ হয় না। যখন মাত্রাস্পন্দন বন্ধ হয় তখন প্রাণের বাহ্যরূপ থাকে না। যখন বিশ্বের মাত্রা স্তব্ধ হইয়া যায় তখন প্রলয়। যখন আমার দেহের মাত্রাগুলি বন্ধ হয় তখন মৃত্যু। কিন্তু মাত্রাস্পন্দনাদি অনাদি। তাহারা বীজাঙ্কুরে লুপ্ত হয়। আবার মহাকালীর মায়ায় পুনর্ব্বার জাগিয়া উঠে। মাত্রাস্পন্দনাদির পুনঃ পুনঃ বিকাশের প্রবৃত্তির নাম সংস্কার। জীব একটা কল। বহু সংস্কারকে কতকগুলি কেন্দ্রে একত্রিত করিয়া রাখে এবং নিজে ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া সেগুলিকে চিত্তদর্পণে প্রতিবিম্বিত করে। এইরূপে বহু বীজ-সংস্কারের একটা সাধারণ স্থানের নাম মন। ইহা কতকগুলি যুক্ত মাত্রার ফল। চৈতন্যরূপী জীবাত্মা সন্তান স্থানীয় হইয়া মায়াবশে একবার ভাঙ্গে ও একবার গড়ে। যখন খুসি ইহা হইতে পুরাতন মাত্রাগুলি ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া আলাদা করা

যায়। তাহার নাম কল্পনা। জীব এ গুলিকে না ভাঙ্গিয়া থাকিতে পারে না। যখন মাত্রাস্পন্দনাদির লোপ হয়, তখন সে মনে প্রবৃত্তি লইয়া থাকে মাত্র। কিন্তু সে কেন্দ্র ভ্রষ্ট হয় না। তাই শাস্ত্র বলেন, মরিবার সময় আমরা মন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়াদির সংস্কার লইয়া থাকিমাত্র।

যদি এ কল্পে প্রলয় হয়, তথাপি পৃথিবীর বীজ থাকিবে। আবার যথাস্থানে সে উদিত হইবে।

গর্ত্তে হাত পা থাকে না, কিন্তু একই চৈতন্য গর্ত্ত হইতে অহঙ্কার মন প্রভৃতি ধরিয়া বাহির হয় এবং মন হইতে ইন্দ্রিয় প্রভৃতি ধরিয়া বাহির হয়। এক একটা দণ্ড কিংবা স্নায়ুপথ এইরূপে বাহির হয়। সেগুলি বন্ বন্ করিয়া ঘুরে এবং এক একটা আকর্ষণের. ক্ষেত্র কিংবা বৃত্তি স্থাপন করে। এটা যেন বিজ্ঞানের চৌম্বকের মত। শাস্ত্র ইহাকে সমুদ্রমন্থন বর্ণনায় বুঝাইয়াছেন। মহামায়ার বিরাট গর্ত্ত এইরূপে দেবযান এবং পিতৃযান বাহিয়া আসিয়াছে। জনকজননীতে সেই মাতৃগর্ত্ত দেখিতে পাই, তাই তাঁহারা গুরু স্থানীয়। গর্ভস্থ ভ্রূণও সেইরূপ পিতামাতার যুক্ত পাঞ্চভৌতিক দেহকে নিজের প্রবৃত্তি অনুসারে গঠন করিয়া লয়। তাহার যত মাত্রা সংস্কারাদি আছে, গর্ত্তে সেই অনুযায়ী মাত্রাদি পাঞ্চভৌতিক উপাদানাদিতে পায়। সে তাহাই অবলম্বন করে। তাহার বোধ হয় "আমি প্রাণ পাইলাম।" সে মায়াগর্ত্তে এইরূপে প্রাণ পায়।

মহামায়ার ক্রিয়াশক্তিগুণে এইরূপে জনকজননীর দেহস্থ শুক্রশোণিত সন্তানের বৃহৎ দেহের আধার হয়। সন্তানের প্রবৃত্তি অনুসারে এক ডিম্ব ফুটিয়া বহু হইতে-আরম্ভ করে এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন এবং অহঙ্কারাদির আধার কিংবা দেহ হয়।

গর্ত্তে প্রথমে জীবাত্মাকে লইয়া মনের উদয় হয়। যেন আকাশে একটি চাঁদ। আমার. "আমিত্ব" গুণে এই মনকে আমার মন বলি, কিন্তু বাস্তবিক সেটা মায়াদেহ। তাহা যন্ত্রে দেখা যায় না। মনের মধ্যে পাঁচটি জীব থাকে। জীবদেহ তখন অদৃশ্য পঞ্চজীবাত্মক পরমাণু (Permanent atom) জীব বীজাধিষ্ঠিত খণ্ড চৈতন্য। মনটাকে চাঁদ বলিলে, সে চৈতন্য-সূর্য্যের জ্যোতি অবলম্বন করে তাহাই বুঝায়। সূর্য্য তাহার কেন্দ্রে কিংবা লয় স্থানে আছে।

আত্মারূপী মন সেই জ্যোতির সাহায্যে পঞ্চবীজকে দেখে। মা যেমন সন্তানকে রক্ষা করে, মন তেমনি সংস্কারকে রক্ষা করে। নচেৎ বিশ্ব থাকিত না। অথচ মন এই বীজগুলিকে লইয়া যে অদৃশ্য সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে তাহা আমি বুঝি না। মায়ার আবরণে সূর্য্য অদৃশ্য।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে জীব গর্ত্তে তাহার ক্ষেত্র পায়। পাঞ্চভৌতিক দেহের মধ্যে সব মাত্রাগুলিই আছে। প্রথমে পিতৃমাতৃজাত অহঙ্কারের এবং মনের মাত্রা অবলম্বন করে। তাহার পর রজোগুণকে অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রিয় দিয়া বাহির হয়। বীজ সংস্কারগুলি স্থূলদেহে এই ইন্দ্রিয়গুলির সংস্পর্শে প্রচারিত হয় এবং তমোগুণ অবলম্বন করিয়া পাঞ্চভৌতিক মাত্রার সহিত কাঁপিতে থাকে। সংস্কারগুলি একবার লয়স্থানে যাইতে চায়, একবার বিকাশস্থানে আসে। ইহা হইতে যুগ্ম নিশ্বাসের সৃষ্টি।

"আমার" মন মনোময় কোষে থাকে। সে মায়া সন্তানগুলির লীলা-খেলায় মত্ত হইয়া জীবাত্মারূপে বদ্ধ হয়। মনের ইন্দ্রিয়গুলি প্রাণময় কোষ ভেদ করিয়া অন্নময় পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আমরা সেগুলিকে স্নায়ু কিংবা বায়ু-পথ বলিয়া দেখি। ইহাদের কাজ যত রকমের মাত্রা স্পন্দনাদি সংগ্রহ করিয়া মনকে পরিপুষ্ট করা। ইহাদিগের ক্ষেত্র কামদেহ কিংবা বাসনাদেহ বলিয়া খ্যাত। আমার মনের ভোগবাসনার অভাব হইলে যে উগ্রমূর্ত্তি হয়, কিংবা ভয় পাইলে যে মোহাদি হয় তাহা ছয়টা রিপুতেই প্রতীয়মান হইবে। যেরূপ বাসনা দ্বারা উত্তেজিত হয়, প্রাণ সেইরূপ গতি এবং মাত্রা অবলম্বন করে। মন পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহির হইতে নানা রূপ লইয়া ভাবে এবং তাহার একীকরণ করিয়া ক্রিয়াশক্তির আশ্রয়ে কল্পনা করে। জীব তাহাতে বদ্ধ হইয়া ভাবে "মন", "প্রাণ", ও "আমি" আমারই।

সাধক এই মায়াগর্ত্তকে মাতৃগর্ত্ত করিয়া বীণাটির মত দেখেন। বাস্তবিক মনও আমার নয়, ইন্দ্রিয়ও আমার নয়, দেহও আমার নয়, বাসনাও আমার নয়, স্পন্দনাদিও আমার নয়, মাত্রাদি ও আমার নয়। সাধকের প্রথমে বুঝা উচিত আমার সহিত এই গর্ত্তের সম্বন্ধ কি।

বিশ্বদণ্ডে এই প্রাণের পথ, তন্ত্রে সুষুম্না পথ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আমরা ছট্ করিয়া এই সুষুম্নাকে আমার বলিয়া সাব্যস্ত করি। সুষুম্নার উপর

আমার কি জোর আছে? বিশ্বপ্রাণ কাঁপিতেছে। সেই মহাবীণায় যে তার অনাদি কাল হইতে কম্পিত তাহার নাম সুষুম্না। সেটা লয় পথ। তাঁহার স্পন্দনের দুই মূর্ত্তি—চন্দ্র ও সূর্য্য। তন্ত্র তাহার গতিকে ইড়া ও পিঙ্গলা রূপে দেখিয়াছে। যোনি হইতে যোনি বাহিয়া, বংশ হইতে বংশ বাহিয়া, যুগে যুগে, কল্পে কল্পে এই সুষুম্না। কত সৌরজগৎ, কত পৃথিবী, কত দেশ, কত ধর্ম্ম ইহাতেই বিকাশ হইয়াছে এবং ইহাতেই লয় পাইয়াছে। বিজ্ঞান ইহার মধ্যে জৈবিক বিকাশ দেখিতেছে, ব্রহ্মবিদ্যা ইহার মধ্যে চৈতন্তকে দেখিতেছে। বীণাকে সাবধানে ধর। মার দেহ বলিয়া কোলে কর। সন্তানের কোমল স্পর্শে বীণায় আঘাত কর। গুরুর কৃপা নহিলে এ বীণা বাজাইতে পারিবে না।

আমি এ বীণায় বাঁধা, কিন্তু বাজাইতে পারি না। কে যেন বাজায় তাহার প্রতিধ্বনিমাত্র আমার চিত্তবৃত্তিতে উদয় হয়। ইচ্ছা হয় মন দিয়া শুনি, কিন্তু ভেদাত্মিকা মায়ায় শুনিতে পাই না।

আমার নিকট এখন বীণা নীরব। সংসারের কলরব তাহার তামসিক প্রতিধ্বনি। কেন?—কারণ মাত্রাভেদ। বীণার জুড়ীর তার এক নয়। কতবার চেষ্টা করিয়াছি মিলাইতে পারি নাই। "আমি" ও "সে" এই যুগ্ম নিশ্বাস একত্র হয় নাই। তাহা দুটি চক্ষু, দুটি কর্ণ, দুটী নাসিকারন্ধ্র, দুটি হাত, দুটি পা ও দুইটি মস্তিষ্ক পিণ্ড লইয়া ব্যস্ত। মস্তিষ্কটা অলাবুর মত। দিবারাত্রি তাহাতে বেসুরা ঢং ঢং শব্দ। তাহারই মধ্যে আমার দর্শন, বিজ্ঞান এবং শাস্ত্র। সুর মিলাইতে গেলে ঢং ঢঙানি থামিয়া যায়, প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে, মাত্রা স্তম্ভিত হয়, সহস্রার পর্য্যন্ত কম্পিত হয়। প্রাণের ভয় হয়।

মহাচৈতন্যময়ী সুষুম্নার শেষভাগে নিদ্রিতা। ভেদমায়ারূপে ব্রহ্মা তাঁহাকে সেই স্থানে তপস্যা করিতেছেন। বীজ হইতে বীজ বাহিয়া সেই চৈতন্য ব্রহ্মাণ্ড বিকাশ করিতেছে। আজ সেই চৈতন্য দেখিয়া আমার চেতনা হইবে। সাধ হয় ত একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ। ইহা আমার তোমার কাজ নয়।

জীবদেহের মেরুদণ্ডকে আমরা সুষুম্না বলিয়া বুঝিয়াছি। এই কি শেষ সুষুম্না, না সুষুম্নার প্রতিচ্ছবি মাত্র? কত দেহ বাহিয়া এই সুষুম্না গিয়াছে

তাঁহার ইয়ত্তা নাই। আমি যতটুকু, মার চৈতন্যটুকু ততদূর প্রতিবিম্বিত, বাকীটুকু সুষুপ্ত। নিম্নযোনিতে তাঁহার সেই সুষুপ্তি আমারও সুষুপ্তি ছিল। পশুযোনিতে স্বপ্ন দেখিয়াছি। আজ সাধকের বেশে জাগ্রত। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া তন্ত্র প্রত্যেক যোনির এক একটি মূলাধার নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

বিশ্বের মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত আমার মায়াদেহে যুক্ত। আমি অংশমাত্র। চৈতন্য ইহাতে বদ্ধ নহেন। আত্মা মুক্ত। চিদাভাবে আমার আত্মাকে আমি ছোট করিয়া ফেলি, অতএব আমি বদ্ধ। লয়স্থানে গেলে আমি বদ্ধ থাকিব না। অতএব যোগী মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া ছয়টি মায়াচক্র ভেদ করিয়া আত্মার সহিত অভেদত্ব সংস্থাপন করেন।

যাঁহাদের সুরজ্ঞান হইয়াছে তাঁহারা দ্বিদলের দুইটি কাণ টিপিয়া একেবারে আজ্ঞাচক্রে বসেন ও গান আরম্ভ করেন। আমাদিগের আজ্ঞাচক্রে গুরু বসেন। গুরু যথার্থ ওস্তাদ। তাঁহার উপদেশ মন্ত্র।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদির সহিত আমরা বদ্ধ। ইহাদিগকে আশ্রয় করিয়া সূক্ষ্মভূতগুলির সহিত কিংবা মাত্রার সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ। যখন কোন কামিনীর দূরস্থ সুমধুর ভাবে প্রাণ চঞ্চল হয়, জানিও শব্দভূত ঘাড়ে চলিয়াছে। তাই ভূতশুদ্ধির দরকার। প্রত্যেক চক্রে মনকে লয় করার নাম চিত্তবৃত্তির নিরোধ। যে গর্ত্ত দিয়া বাহির হইয়াছি, সেই মাতৃগর্ত্তে আবার প্রবেশ। গুরূপোদিষ্ট মাত্রা অবলম্বন করিয়া প্রাণায়াম আরম্ভ করিলে ভূতশুদ্ধি হয়। ভূতরাজ্যে গেলেই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধের নানা বিকার দেখিয়া থাকি। সে সব চক্রস্থিত বীজের কোষ অবলম্বন করিয়া থাকে। পদ্মের পাপড়ির ন্যায়। পাপড়িগুলির বর্ণ আছে। তাহার অক্ষরগুলি স্বর ও ব্যঞ্জনাত্মক। তন্ত্রে তাহা দেখিতে পাইবে। অনেকে মনে করেন এই সব চক্রে মন দেওয়া—তাহার সুরগুলিতে লীন হওয়া বুঝি একটা বিপজ্জনক ব্যাপার। বুঝি নাকটা কাণটা যাইবে, গলা দিয়া রক্ত উঠিবে। তখন মনে হয় অমুকের গিয়াছিল। কিন্তু সে "অমুক" সন্তান হইয়া মাতৃচরণে আত্মবলি করিতে গিয়াছিল, কিংবা মার স্কন্ধে উঠিতে গিয়াছিল তাহা বিবেচ্য। আমি সিদ্ধি লাভার্থ যাইতে চাহি না। জন্মাবধি যাহাদিগের সহিত মায়া খেলায় আবদ্ধ হইয়াছিলাম তাহাদিগের

সহিত বিদায় লইতে আসিয়াছি। তাহারাও ম'ার সন্তান। তাহারা আমার গানে কতই আনন্দিত। তাহাদিগকে ছাড়িয়া শ্মশানে যাইব। তাহারাও আমার সাক্ষী। যে গুরুপদে মন দিয়াছে ভূত তাহার বাহন। আমি মাকে লইয়া ভূতনাথের নিকট যাইতেছি, আমার নাকদিয়া রক্ত উঠিবার কোন উদ্দেশ্য নাই। যদি উঠে সেটা কলুষিত রক্ত। সে রক্ত লইয়া কথনও সাধনা করিতে যাইও না। বুঝিতে হইবে সেটা সংযম, আসন ও প্রাণায়াম আনিতে শুদ্ধ হইয়াছে।

মূলধার হইতে অনাহত পর্য্যন্ত ভূর্লোক, অনাহত হইতে আজ্ঞা ভুবর্লোক এবং আজ্ঞা হইতে সহস্রার স্বর্লোক। ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ প্রভৃতির এক একটি পক্রিয়া। শাস্ত্রে বলিয়াছেন পিঙ্গলা এবং ইড়া দেবযান ও পিতৃযানের পথ। সাধক উভয় পথ অতিক্রম করিয়া সকলকে প্রণাম করিতে করিতে যান। তিনি মাত্রা অতিক্রম করিতে থাকেন। কাল অতিক্রম করিতে থাকেন, শুক্লপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ, মাস, ঋতু, ধূম, অর্চ্চি, উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ণ, বর্ষ, সকলি অতিক্রম করেন। তিনটি লোকের সহিত বিদায় লইয়া সাধক প্রণবের অধিকারী হন।

তখন তিনি শিবশক্তির লীলার লয়স্থানে দেখেন। প্রণব দিয়া তিনি সুরে লয় হন। প্রণব দিয়া তাঁহাকে নমস্কার করেন। তখন তিনি ব্রাহ্মণ। (ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, এম, এ।

আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়ম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

৩। কর্ত্তব্যজ্ঞান।

আমরা দেখিয়াছি যে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আমাদিগের ভিতর স্থূলের অতীত এক মহত্তর প্রজ্ঞা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। যদ্যপি এই প্রজ্ঞা স্থূল জগতে প্রকাশমান্ করিতে হয় তবে সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় দমন ও মনঃসংযম আবশ্যক, তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। এবং আমাদের সনাতন প্রথাতে এই উপায়গুলি কেন মহত্তর প্রজ্ঞার বিকাশহেতু বলা হইয়াছে তাহাও ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

এক্ষণে আমরা আর একটি বিষয় আলোচনা করিব। কি ভাবে মানব

তাঁহার ক্রিয়া পরিচালনা করিলে, জীবন কি ভাবে গঠন করিলে মহত্তর প্রজ্ঞার যথার্থ বিকাশ হয় তাহা দেখা যাউক। সে জন্য কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্ম করা যে, চিত্তশুদ্ধির জন্য আবশ্যক তাহা বুঝিতে পারিব। আমাদের অন্তর্নিহিত বিশুদ্ধ চৈতন্য এখন অস্ফুটরূপে বিরাজমান আছেন, তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট করিতে হইলে আমাদিগকে কি প্রকারে উপযোগী করিতে হইবে—তাহারই আলোচনা করা যাইবে। আমরা ক্রমোন্নতির কোন্ স্তরে অবস্থিত এবং আমাদিগের ক্ষমতা কতদূর, তাহা জানিলে আমরা ক্রমশঃ নিজেদের ভিতর বিশুদ্ধ চৈতন্যের বিকাশ করিবার জন্য চেষ্টা করিব। এবং বিহিত উপায়গুলিও অবলম্বন করিব। এজন্য কর্ত্তব্য জ্ঞানটি আলোচনা অত্যাবশ্যক কেন, তাহা বলিবার পূর্ব্বে এ বিষয়টি সম্যক্ বুঝিবার জন্য দুই একটি কথার অর্থ কি ভাবে সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা বলা আবশ্যক।

প্রথমতঃ মহত্তর প্রজ্ঞা শব্দটি আমরা সংকীর্ণরূপে ব্যবহার করি নাই। স্থূলের অতীত যে কোন প্রকার বিকাশের মাত্রাই আমরা মহত্তর প্রজ্ঞা বলিয়া ব্যবহার করিয়াছি। সুতরাং ইহাতে স্থূলের অতীত চর্ম্মচক্ষুর অগোচর যে সূক্ষ্ম জগৎসমূহ আছে—অর্থাৎ সূক্ষ্ম, কারণ ও তদপেক্ষা আরও উচ্চ জগৎসমূহ এবং ব্রহ্মাণ্ডে এতদতীত আরও যাহা আছে—ইহাতে মানবের যে বিকাশ তাহাই আমরা মহত্তর প্রজ্ঞা বলিয়া ব্যবহার করিয়াছি।

আধ্যাত্মিক এ কথাটির অর্থ কি? মহত্তর প্রজ্ঞা যেরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে উহার সমুদয় বিকাশকে আধ্যাত্মিক বলা যাইতে পারে না। চৈতন্য ও তাহার উপাধিতে আমরা প্রভেদ চিন্তা করিবার সময় আমাদের মনে করা উচিত যে, যাহা কিছু উপাধিগত তাহা আধ্যাত্মিক নহে। উপাধিগত চৈতন্যের বিকাশ প্রাকৃতিক, উহা আধ্যাত্মিক নহে। উপাধিগত চৈতন্যের বিকাশ যে কোন কোষেই হউক না কেন স্থূলজগতে চৈতন্যের বিকাশ যেরূপ আধ্যাত্মিক নহে ইহাতে তদ্রূপ। যে স্থলে প্রাকৃতিক চৈতন্যের বিকাশ দেখিবে তাহাকে অবিদ্যা বা মায়া (Phenomenal) বলিয়া জানিবে এবং যাহা কিছু মায়িক তাহাকে আধ্যাত্মিক বলা যায় না। এ বিষয়টি আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে আমাদের এ বিষয়টি আলোচনায় ভ্রম হইবার সম্ভাবনা আছে। আধ্যাত্ম্য কি অনাধ্যাত্ম্য

তাহা নির্দ্ধারিত না হইলে কি প্রকারে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা যায়,তাহার বিচার অসম্ভব। উপাধিগত চৈতন্য, উচ্চ বা নীচ উপাধিতে যাহাতেই আবদ্ধ হউক না কেন, তাহাতে বড় যায় আসে না। প্রস্তর, উদ্ভিদ, পশু, মনুষ্য বা দেবতা যে উপাধিগত হউক না কেন, যে পর্য্যন্ত ইহা প্রাকৃতিক বা মায়িক, ততক্ষণ ইহাকে আধ্যাত্মিক বলা যাইতে পারে না। হয় ত কোন ব্যক্তি অণিমা প্রভৃতি অষ্ট সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, বা সূক্ষ্ম জগতের বস্তু বা সত্তা অবলোকন করিবার সূক্ষ্মদৃষ্টি লাভ করিয়াছে, বা গন্ধর্ব্বগণের সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণের ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু এ সমুদয় প্রাকৃতিক বা মায়িক, এ সমুদায় অনিত্য ও ক্ষণভঙ্গুর। যাহা নিত্য ও অবিনাশী তাহা প্রাকৃতিক বা ঔপাধিক নহে।

তবে আধ্যাত্মিক কাহাকে বলিব? যে চৈতন্য সমুদয় বস্তুতে একত্ব অনুভব করে এবং যাহা সমুদয় বস্তুতে এক আত্মা দেখে এবং সমস্ত বস্তু একই আত্মায় দেখে তাহাই আধ্যাত্ম। আধ্যাত্মিক জীবন বলিলে যে চৈতন্য অসংখ্য পরিদৃশ্যমান্ বস্তুর মধ্যে মায়ার আবরণ উন্মোচন করিয়া প্রত্যেক পরিবর্ত্তনশীল উপাধিতে একই নিত্যবস্তু দেখে তাহাই বুঝায়। সেই আত্মজ্ঞান বা আত্মপ্রীতি বা আত্মাকে উপলব্ধি করাই আধ্যাত্মিক জীবন। সর্ব্ববস্তুতে পরিদৃশ্যমান্ আত্মদর্শনের নাম প্রকৃত জ্ঞান। এতদ্ব্যতীত সমুদয় অবিদ্যা, ইহা ছাড়া সমুদয় ঔপাধিক। এই দুইটি বিষয়ের প্রভেদ যদি আমরা ভাল করিয়া বুঝি তবে অনিত্য বস্তু পরিত্যাগ করিয়া আমরা নিত্যবস্তুতে আসক্ত হইব। উপাধিগত চৈতন্যে যত উচ্চই হউক না কেন আমরা তাহাতে আকৃষ্ট হইব না। এই আধ্যাত্ম জ্ঞান যাহাতে আমরা লাভ করিতে পারি তাহারই উপায় জানিবার জন্য আমরা ব্যস্ত হইব এবং যে সমুদয় নিয়মে পালনে হইয়া উহা বিকশিত হয় তাহার অন্বেষণ করিব। সর্ব্বব্যাপী সমগ্র চৈতন্য ও এক বিশিষ্ট চৈতন্য যে এক তাহা বুঝিতে পারিব। তখন কোন বস্তুই বাহ্যিক উপাধি বা রূপের জন্য আমাদের প্রিয় হইবে না পরন্তু সমুদয় উপাধির প্রাণভূত আত্মার জন্য প্রিয় হইবে। যখন মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট অধ্যাত্মবিদ্যা জানিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহাকে এই জ্ঞানেরই কথা বলা হইয়াছিল। যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছিলেন,—"স্বামী স্ত্রীলোকের নিকট স্বামীর রূপহেতু প্রিয় নহে, কিন্তু যিনি রূপকে আশ্রয় করিয়া আছেন সেই আত্মার জন্যই প্রিয়; স্ত্রী ও স্ত্রীরূপ

হেতু প্রিয় নহে, আত্মার জন্যই প্রিয় ;” এইরূপে স্থূল জগতের সমুদয় বস্তু একে একে আত্মার হেতুই প্রিয়, তাহা বলিয়া তৎপরে স্বর্গের দেবতাদের সম্বন্ধেও ঐ প্রকার বলিলেন, “দেবগণ দেবরূপের হেতু প্রিয় নহে, কিন্তু আত্মার নিমিত্তই প্রিয়।”

ইহাই আধ্যাত্মজ্ঞান। সর্ব্ব জীব আত্মাতে আছে ; সর্ব্বত্রই একই আত্মা বিরাজমান। সর্ব্বজীব একই আত্মায় দেখার নাম অধ্যাত্মজ্ঞান। এই জ্ঞানই অধ্যাত্মজ্ঞান বা আত্মবিদ্যা। আমরা মোহান্ধকারে নিপতিত ভ্রান্ত মায়াবদ্ধ জীব এই জ্ঞান কিরূপে লাভ করিব ?

এই অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য, ও সর্ব্বত্র একই আত্মাকে উপলব্ধি করার জন্য প্রথমতঃ প্রধান উপায় কর্ত্তব্য জ্ঞানের সাহায্যে ক্রিয়া অনুষ্ঠান করা। আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করিবার জন্য কর্ত্তব্যানুষ্ঠান যে কেন প্রথমে আবশ্যক, তাহা দেখা যাউক।

আমরা যদিও স্থূলচক্ষে দেখিতে পাই না তথাপি সূক্ষ্মদর্শীগণ বলেন যে, এই জগতে অনেক সূক্ষ্ম জীব আছে যাহাদের সহিত আমাদের সম্বন্ধ আছে। তাহারা অলক্ষ্যভাবে স্থূল জগতের জীবের সহিত কর্ম্মসূত্রে গ্রথিত আছে। তাঁহারা বলেন যে, আমাদিগের চারিদিকে সূক্ষ্ম জগতের অনেক অদ্ভুত শক্তি-সম্পন্ন জীব সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছে ইহাদিগের প্রকৃতিকে বশ করিবার ক্ষমতা এবং স্বেচ্ছাবশে জড় ; সূক্ষ্ম জগতের উপাদান গঠন করিবার আছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি মানবের সৎচিন্তা এবং উচ্চ বিষয়ে জানিবার চেষ্টা প্ররোচনা করতঃ মানবের ক্রমোন্নতির পথে সাহায্য করে ; অপরগুলি সাহায্য করে কিন্তু অন্য ভাবে। এ গুলি মানবকে উন্নতির বাধা দেয় এবং তাহাকে প্রতিপদে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করে। প্রতিপদে পদস্খলনহেতু তাহারা মানুষকে দৃঢ়ভাবে পদবিক্ষেপ করিতে শিক্ষা প্রদান করে, এবং অন্যায়ের পথে লইয়া গিয়া অবশেষে তাহাকে সম্পূর্ণ ন্যায়বান করে। এই দুইটি, ন্যায় ও অন্যায়—ভাল ও মন্দ দ্বন্দ্বভাব, ভগবানের শক্তির বিকাশ। একটি অন্যটির বিকাশজন্য আবশ্যক। যেমন অন্ধকার না থাকিলে আলোক অনুমান করা যায় না, বাধা বিঘ্ন না থাকিলে উন্নতির পরিমাণ করা যায় না ; সেই প্রকার ক্রমোন্নতির পথে বিরুদ্ধ শক্তি না থাকিলে ক্রমোন্নতি সাধন হয়

না। উন্নতির পথে যে শক্তি বাধা দেয় তদ্দ্বারা উন্নতির স্থায়ীত্ব ও মানুষের উচ্চ জীবনের লাভ করা সম্ভবপর হয়। এই দুইটি বিরুদ্ধভাবাপন্ন শক্তির ক্রিয়া প্রায়ই সাধারণ লোকে মিশাইয়া ফেলে, সুতরাং গোলমাল উপস্থিত হয়। সূক্ষ্মজগতের যে শক্তি এবং যে জীবসমূহ আমাদিগকে উন্নতির পথে লইয়া যায়, সত্যপথ প্রদর্শন করে এবং উচ্চতরভাবে প্রণোদিত করে আমাদিগকে পাপপঙ্ক হইতে উত্তোলন করে এবং জীবন পবিত্র করে, ইঁহারা যথার্থ আমাদিগের ভক্তির পাত্র। ইঁহাদিগের প্রদর্শিত পথে আমরা স্বচ্ছন্দে নিরাপদে চলিতে পারি। ইঁহারা আমাদের আরাধ্য। অপর শক্তিটির বিরুদ্ধে যতক্ষণ আমরা চলিতে পারি, ততক্ষণ সে আমাদের বন্ধুর কার্য্য করে। সে শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিলে আমাদের বাহুতে বল বৃদ্ধি হয় ও ক্রমোন্নতি হয়। ইহাদিগের সহিত যে পরিমাণে আমরা যুঝিতে পারি সেই পরিমাণে আমাদের উন্নতি হয়। এ শক্তিকে অবলম্বন না করিয়া, ইহার বশীভূত না হইয়া ইহার বিরুদ্ধে চলিতে হইবে। এ শক্তিকে ধ্যান বা পূজা করিতে হইবে না। এ দুইটি বিরুদ্ধশক্তির মধ্যে মানুষ কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবে? কি প্রকারে একটি শক্তি হইতে অপরটিকে বুঝিতে পারা যাইবে?

এই স্থলেই কর্ত্তব্যজ্ঞানের আবশ্যক। আমাদের হৃদয়কন্দরে যে কর্ত্তব্যজ্ঞান নিহিত আছে, যে আত্মজ্ঞানের আলোক আমাদের উন্নতির পথ দেখায়, তাহার সাহায্যে কর্ত্তব্য পালনই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এই জ্ঞানের দ্বারাই এবং সত্যপথ হইতে আমরা কোনক্রমে বিচ্যুত না হইয়া, এই দুই পন্থার মধ্যে বাঞ্ছিত মার্গ অবলম্বন করিতে পারি। এ জ্ঞানটি দ্বারা আমরা ভাল মন্দ বিচার করিতে পারি, ইহাঁকে ইংরাজি ভাষায় Conscience বলে।

অনেকে বলে Conscience এই ইংরাজি কথাটির তাৎপর্য্য এক কথায় প্রকাশ করিবার সংস্কৃত ভাষায় কোন কথা নাই; এবং এ কথাটি সত্য। সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতদের মতে এ কথাটির কোন প্রতিশব্দ বা প্রত্যর্থ নাই। কিন্তু আমরা কেবল শব্দ লইয়া তর্ক বিতর্ক করিতেছি না, বস্তুটির জ্ঞান হওয়াই আবশ্যক; নাম লইয়া গণ্ডগোল না করিয়া বরং যাহা সত্য তাহারই অনুসন্ধান করা উচিত। কিন্তু এ কথার ভাবটির অভিব্যক্তি প্রাচ্য জগতের অপেক্ষা কোন্ দেশের ধর্ম্মগ্রন্থে বা সাহিত্যে বেশী আছে? কোন্ দেশে

কর্ত্তব্যজ্ঞান এবং ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রাচীন ভারতের অধিবাসীর জীবন অপেক্ষা অধিক আছে? এবং পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থাপেক্ষা কোন্ গ্রন্থে ঐ বিষয়ের বিস্তৃত উপদেশ আছে?

এ কথাটি প্রতিপন্ন করার জন্য একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্। মহাভারতের উপাখ্যান দেখা যাউক। যুধিষ্ঠির ধর্ম্মপুত্র ছিলেন, তিনি ধর্ম্মাবতার। তিনি একবার শ্রীকৃষ্ণের নিকট পরীক্ষায় পরাজিত হইয়াছিলেন, এবং সত্যপথ হইতে বিচলিত হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের অন্তিম দশায় দেখ। মহাপ্রস্থানের সময় দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া যুধিষ্ঠিরকে স্বীয় রথারোহণ করিয়া স্বর্গে যাইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির কি করিলেন? তিনি মহাপ্রস্থা-নের সময় যে কুকুরটি তাঁহার সহিত হস্তিনাপুর হইতে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—এই কুকুরটির জন্য আমার হৃদয় দয়ার্দ্র হইয়াছে; আমার সহিত উহাকেও স্বর্গে আসিতে অনুমতি করুন।" দেবরাজ ইন্দ্র প্রত্যুত্তর দিলেন "স্বর্গে কুকুরের স্থান নাই।" যুধিষ্ঠিরকে তথাপি অসম্মত দেখিয়া দেবরাজ শচীপতি বিদ্রূপচ্ছলে কহিলেন "তোমার ভ্রাতাদের একে একে মরিয়া গেলে অনায়াসে তুমি তাহাদিগকে মহামরুভূমিতে পরিত্যাগ করিয়া আসিলে; তুমি তোমার প্রিয়তমা পত্নী দ্রৌপদীকেও মৃতাবস্থায় ফেলিয়া আসিয়াছ। তাহার মৃতদেহ তোমার স্বর্গারোহণের পথে বাধা দেয় নাই। তোমার প্রিয় ভ্রাতৃগণ ও প্রিয়তমা কৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ; তবে কেন একটা সামান্য কুকুরের উপর মায়া করিতেছ? কেনই বা উহাকে স্বর্গে তোমার সহিত লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছ?" তদুত্তরে ধর্ম্মপুত্র কহিলেন "মৃত ব্যক্তিদিগের আমরা কোন সাহায্য করিতে পারি না; আমার ভ্রাতাদের বা আমার স্ত্রীর জীবনের জন্য আমি কিছুই করিতে পারি নাই, কিন্তু এ কুকুরটি এখনও জীবিত আছে, এখনও মরে নাই, এবং আমার শরণাগত। শরণাগত নিরাশ্রয় জীবকে পরিত্যাগ করা আর ব্রহ্মহত্যা ও ব্রহ্মস্বাপহরণজনিত পাপ একই। আমি একাকী স্বর্গারোহণ করিব না।" যখন যুধিষ্ঠির দেবরাজ ইন্দ্রের তর্কে কিছুতেই কর্ত্তব্যচ্যুত ও ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলেন না, তখন কুকুররূপী ধর্ম্ম অন্তর্ধান হইলেন এবং নিজ রূপ ধারণ করতঃ তাঁহাকে স্বশরীরে স্বর্গে

যাইতে অনুমতি করিলেন। যুধিষ্ঠিরের Conscience কত স্থির ও অবিচলিত !! দেবরাজ ইন্দ্রের আজ্ঞা অপেক্ষা উহা প্রবল। অমরত্বের কোন প্রকার প্রলোভনই তাঁহাকে কর্ত্তব্যপথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই; দেবরাজের মিষ্টভাষেও তাঁহার Conscience নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের পথ হইতে কোন মতেই বিচ্যুত করিতে পারে নাই।

আর এক যুগের আর একটি উপাখ্যান দেখ। বলিরাজা যখন যজ্ঞ করিতেছিলেন, তখন একটি কদাকার বামন তাঁহার নিকট বর প্রার্থনা করিল। ত্রিপাদমাত্র ভূমি যজ্ঞের দান স্বরূপ যাচ্ঞা করিল। ঐ সামান্য বামনের ক্ষুদ্রপাদপরিমিত ত্রিপাদ ভূমি—এ অতি তুচ্ছ দান! এ আর অধিক কথা কি? বর তৎক্ষণাৎ দেওয়া হইয়া হইল। অমনি বামনরূপী ভগবান্ এক পাদ মর্ত্তে, এক পাদ আকাশে আর এক পাদ কোথায় দিবেন? আকাশ ও মর্ত্ত হইল সুতরাং আর একপাদ দিবার জন্য ভক্ত তাহার বক্ষ পাতিয়া দিল। ভগবচ্চরণ ধারণ করিবার জন্য ভক্তের বক্ষ ব্যতীত আর কি আছে? তৃতীয় পাদটি ধারণ করিবার জন্য বলি বক্ষ পাতিয়া দিলে, সকলে বলিয়া উঠিল "ইহা প্রতারণা, ইহা ছলনা, ইহা অন্যায়, "শ্রীহরি তোমার বিনাশের নিমিত্ত এইরূপ করিতেছেন; তুমি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ কর, তোমার বর ফিরাইয়া লও; নিজের বিনাশহেতু সত্য পালন করিও না।" এই যুক্তি বলির কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল সত্য, কিন্তু তিনি সত্য পালন, কর্ত্তব্যানুষ্ঠান ও তাঁহার Conscienceএর উক্তি জীবন, বা রাজ্য অপেক্ষা বেশী মূল্যবান মনে করিলেন; সুতরাং কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া অচল রহিলেন। তৎপরে তাঁহার গুরুদেব আসিলেন। গুরুর অপেক্ষা অধিক মান্যার্হ কেহ নাই। তিনি ত তাঁহাকে সত্যভঙ্গ করিতে আদেশ দিলেন। যখন গুরুর আজ্ঞাও অবহেলা করিলেন, তখন তিনি অবাধ্যতা হেতু তাঁহাকে শাপ দিলেন। অবশেষে বিষ্ণু নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন যে, "এই বলি সকলের কথা না শুনিয়া, গুরুর কোপে শাপান্বিত হইয়াও সত্যভঙ্গ করিল না, এবং ভবিষ্যত কল্পে তিনি দেবরাজ ইন্দ্র হইবেন।" এই বর দিয়া অন্তর্ধান হইলেন। কারণ যেখানে সত্যের পালন পূজা ও সত্যের মর্য্যাদা আছে, সেই স্থানেই নির্ভয়ে ক্ষমতার আরোপ করা যাইতে পারে।

এইরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত যে শাস্ত্র অভাব নাই সেখানে Conscience নামক কথাটির প্রতিশব্দ নাই বলিয়া কি ক্ষতি? এ ভাবটি সমভাবে সর্ব্বত্র প্রজ্বলিত আছে। কর্ম্ম কর্ত্তব্যজ্ঞানের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; সর্ব্বত্রই কর্ত্তব্যনিষ্ঠা বিদ্যমান আছে। সনাতন হিন্দুজীবনে এ ভাবমূলক কথাটী কি? ইহার নাম ধর্ম্ম। ইহাই কর্ত্তব্যপরায়ণতা, ন্যায়নিষ্ঠতা ও সত্য-পরায়ণতা প্রভৃতি সমুদয় ভাবের সমষ্টি।

এক্ষণে এ কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের নিয়ম কি দেখা যাউক। ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক স্তরে ইহার পরিবর্ত্তন হয় বটে, কিন্তু তাহার (Principle) সারমর্ম্ম একই। ক্রমোন্নতি যেমন ক্রমশঃ সাধিত হয়, সেইরূপ কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের নিয়মও উচ্চ হয়। একজন অসভ্য বর্ব্বরের যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বা ধর্ম্ম, তাহা একজন সুশিক্ষিত উন্নত ব্যক্তির জন্য বিহিত নহে। রাজার ধর্ম্ম ও শিক্ষকের ধর্ম্ম এক নহে। যোদ্ধার ধর্ম্ম ও বণিকের ধর্ম্ম বিভিন্ন। অতএব কর্ত্তব্যা-নুষ্ঠানের বা স্বধর্ম্মের নিয়ম বুঝিতে হইলে, আমরা ক্রমোন্নতির কোন স্তরে অবস্থিত তাহা দেখা আবশ্যক; অর্থাৎ স্বধর্ম্ম নির্ণয় করিতে হইলে আমাদের নিজের অবস্থা দেখা উচিত। যে অবস্থার মধ্যে আমরা এক্ষণে অবস্থিত, তাহা দ্বারা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মও বুঝিতে পারিব; কেন না পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফলেই বর্ত্তমান অবস্থা হইয়াছে। আমাদের কতদূর ক্ষমতা ও সামর্থ্য তাহাও দেখা উচিত। অন্যের ধর্ম্ম দেখিয়া আমার ক্ষমতার বহির্ভূত অবস্থা ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য বলিয়া নিরূপণ করিতে পারি না। আমাদের দোষ ও গুণ সমুদয় জানা চাই। এ বিষয় গুলি বিশেষ যত্নসহকারে পর্য্যালোচনা করিলে তবে আমাদের 'স্বধর্ম্ম' কি তাহা বুঝিতে পারিয়া আমরা আমাদের অভীষ্ট পথে চলিতে পারিব।

মোটামুটি ইহা বলা যাইতে পারে যে, একই অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণের যাহারা ক্রমোন্নতির একই স্তরে অবস্থিত, তাহাদের ধর্ম্মও একই প্রকার। তবে কতকগুলি সাধারণ ধর্ম্ম আছে, যাহা সকলের পক্ষে অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। সকলের পক্ষে কোন না কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে। শাস্ত্রে পৃথক পৃথক লোকের পক্ষে পৃথক পৃথক ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিহিত আছে। গৃহীর ধর্ম্ম ও সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম পৃথক। এইরূপ নানা প্রকার লোকের জন্য নানা প্রকার

কর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য বা ধর্ম্ম বলিয়া বিহিত আছে। মনুতে যে দশবিধ কর্ম্মের কথা আছে যে কেহ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করে তাহার পক্ষে এ গুলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এ গুলিতে সর্ব্ব সাধারণ, মানুষ—মানুষের প্রতি যাহা কর্ত্তব্য তাহারই কথা আছে। এ গুলি অনেক দিনের অভিজ্ঞতার ফলে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং তাহাদিগের কর্ত্তব্যতা বা অনুষ্ঠান সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না।

কিন্তু এ ধর্ম্ম সম্বন্ধে এরূপ প্রশ্ন সময় সময় উঠে যে, তাহার মীমাংসা তত সহজ নহে। যাঁহারা আধ্যাত্মিক জীবনের পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে প্রায়ই ধর্ম্ম কি ও কর্ত্তব্য কি তাহা নির্ণয় করা বাস্তবিক বড় কঠিন হইয়া উঠে।

এরূপ বিষম ও পরীক্ষাস্থলে নিজকে নিরাপদে উত্তীর্ণ করিতে হইলে অর্জ্জুন যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কহিয়াছিলেন—

"আমি ধর্ম্মবিমূঢ় চিত্ত···আমি আপনার শিষ্য,আপনারই শরণাপন্ন হইলাম, এক্ষণে আপনি শিক্ষা প্রদান করুন"—সেইরূপ নিজের হৃদয়কন্দরে গিয়া স্থিরভাবে নিজের ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব ভাব ও বাসনা সমুদয় পৃথক করিতে হইবে এবং ক্ষণিকের জন্যও ঐ প্রশ্নটী উদারভাবে এবং সুস্পষ্ট আলোকে ও আত্মজ্ঞানের সাহায্যে আলোচনা করিতে হইবে; এবং গুরুদেবের চরণপদ্মে মনসংলগ্ন করিয়া তাহার শরণাপন্ন হইতে হইবে। এই প্রকার উপাসনা, আত্মবিশ্লেষণ এবং ধ্যানের দ্বারা যাহা কর্ত্তব্য পথ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় তাহাই অবলম্বন করিতে হইবে। হয় ত আমাদের ভ্রম হইতে পারে; কিন্তু সত্যপথ নির্দ্ধারণ করিবার প্রয়াস সত্ত্বেও যদ্যাপি ভ্রম হয়, তবে ঐ ভ্রমই আমাদের শিক্ষাপ্রদ। হয়ত উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার জন্য ঐ শিক্ষাটী আমাদের আবশ্যক। আমরা হয়ত ভ্রমবশতঃ বাসনার পথ অবলম্বন করিয়াছি এবং ধর্ম্ম বলিয়া যাহা বাছিয়া লইয়াছি, তাহা হয়ত অহঙ্কার প্রণোদিত। যদ্যপি তাহাও হয়, তথাপি সত্যপথ নিরূপণ করিবার এবং তাহা অবলম্বন করিবার জন্য আমরা চেষ্টা করিয়াছি তাহাতে অমঙ্গল হইতে পারে না। সত্যপথে চলিতে গিয়া ভ্রমে পতিত হইলেও এটা আমাদের স্থির নিশ্চয় হওয়া চাই, যে অন্তর্যামী পরমাত্মা আমাদের ভ্রম সংশোধন করিয়া দিবেন।

(ক্রমশঃ) শ্রীশিশির কুমার ঘোষাল এম এ।

বিজ্ঞান, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

জড় আছে কি না এই বিষয়ে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য যে মত প্রচার করেন, তাহা বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া গৃহীত হইতেছে। প্রতীচ্য খণ্ডে যখন Berkeley মায়াবাদ প্রচার করেন, তখন তাঁহাকে কতই তাড়না সহ্য করিতে হইয়াছিল। গত February মাসের Athenium পত্রিকায় M. Poincare নামক বৈজ্ঞানিক বলেন যে, প্রকৃতির প্রধান গুণ জড়ত্ব বা Enertia। কিন্তু যদি কোন উপায়ে ইহা প্রমাণিত করিতে পারা যায় যে, এই Enertia বা জড়ত্ব প্রকৃতির স্বাভাবিক গুণ নহে, যদি বাস্তবিক পক্ষে mass বলিয়া কোন পদার্থ না থাকে, তাহা হইলে জড় আর জড় রহিল না। Radium হইতে নির্গত ক্ষুদ্রতম অণু সকল দেখিলে বুঝা যায়, যে উহাতে দুই প্রকার Enertia বা জড়ত্ব শক্তির ক্রিয়া হইতেছে। একটীকে ইংরাজিতে Mechanical Enertia বলে। গতিশীল পদার্থমাত্রের গতিরোধ করিতে গেলে এই প্রকার জড়ত্ব অনুভূত হয়। তাহার উপর অণুটী স্বীয় তাড়িত প্রবাহ সংরক্ষণের জন্য আর এক প্রকার Enertia প্রকাশ করে। তাহাকে Electro magnetic Enertia বলে।

* * *

এক্ষণে Abraham এবং Kaufmann নামক দার্শনিকদিগের গবেষণা হইতে প্রমাণিত হয় যে, বাস্তবিক পক্ষে Mechanical Enertia নাই। সুতরাং massও নাই এবং যাহাকে আমরা mass বা বস্তু বলি, তাহা কেবল Electro magnetic শক্তির প্রকাশ মাত্র। এই শক্তির পরিবর্ত্তে "চিৎ" বা "মায়া শক্তি" শব্দ প্রয়োগ করিলে বিজ্ঞান অদ্বৈত দর্শনে পরিণত হয়।

* * *

গত চৈত্র মাসের পন্থায়—Sun-Spot সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে পূজনীয়া Blavatesky যাহা বলেন তাহা দেখা যাউক। During Manvantaric Period, there is a regular circulation.. the Sun contracting as rhythmically as the human heart. .Only instead of performing the round in a second or so, the Solar blood takes ten of its years to circulate and a whole year to pass through its auricle and ventricle before it washes the lungs. অর্থাৎ সৃষ্টি বা মন্বন্তর কালে সূর্য্যদেব সৌর জগতের হৃদয়রূপে অবস্থিত হইয়া সমস্ত মণ্ডল ব্যাপিয়া তাহার জীবনস্রোত সঞ্চালন করেন। মানবদেহে রক্তের সঞ্চরণ হইতে যেমন এক সেকেণ্ড লাগে, সেইরূপ সৌরমণ্ডলে সৌরপ্রাণসঞ্চালন হইতে দশ বৎসর লাগে। তদুপরি এক বৎসর অলিন্দ হৃদয়ের মধ্যস্থ যন্ত্রাদির মধ্যে সঞ্চালন করিতে লাগে।

এই কথা বলিবার অনেক বৎসর পরে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের Sun spot সম্বন্ধে

অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করেন। গত সৌরগ্রহণ সময়ে তাঁহারা ২১১টী নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন। সূর্য্যের Corona বা জ্যোতিচ্ছটা সহিত Sun spotএর সম্বন্ধ এই সময়ে নির্ণীত হয়। তাঁহারা দেখিলেন যে যখন Sunspot এর সংখ্যা সর্ব্বাধিক হয় তখনই তখনই Coronaএর ছটা সর্ব্বদিকে সমভাবে প্রধাবিত হয়। Tribune পত্রিকার ২৪শে জানুয়ারী সংখ্যায় Hon. R. Strutt বলেন "It is found in fact that the whole activity of the sun including the amout of heat it radiates to earth'undergoes a rgular pulsation in eleven years." অর্থাৎ "সূর্য্যের সমস্ত শক্তি এমন কি পৃথিবীতে বিকীর্ণ উত্তাপশক্তিও একাদশ বর্ষ ব্যাপিয়া সঞ্চারিত হইতে লাগে। সূর্য্যের শক্তি সঞ্চার যে মানবের রক্ত সঞ্চারণের ন্যায় এবং Corona যে জীবনী শক্তির বহিঃপ্রকাশ, এ কথা সমস্তই আধুনিক বিজ্ঞান স্বীকার করিলেন।

* * *

তবে হিন্দু যখন ঈশ্বরের বিশ্বরূপিত্ব বা বিভুভাব সূর্য্যমণ্ডলে কেন্দ্রস্থ করিয়া তথায় "নারায়ণ কেয়ূরকুণ্ডলবান্ ভগবানের" ধ্যান করে, তখন আর তাহাকে ভ্রান্ত বলা সঙ্গত হয় না। তবে প্রকৃত হিন্দু সূর্য্যদেবের স্থূলভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার আধ্যাত্মিক ভাবে মন সন্নিবিষ্ট করিয়া, স্থূল আলোকচ্ছটার পরিবর্ত্তে তাহা হইতে নিসৃত "বরেণ্যং ভর্গঃ"কে মাতৃস্বরূপে —পালয়িতৃ স্বরূপে গ্রহণ করেন।

* * *

প্রকাশ্যভাবে সূর্য্যমণ্ডল ব্যপিয়া প্রাণ সঞ্চারণে আমাদের ১১ বৎসর লাগে, এবং লয় স্থানে অব্যক্ত ভাবে অবস্থিতি আর এক বৎসর কাল ধরিতে হইবে। আমাদের ১২ বৎসর সৌরপ্রাণের একটী ক্ষণ; তাহা হইলে আমাদের বৎসর সৌরজগতের কত এবং সূর্য্যের একদিন আমাদের কত? কাল বা সময়ের পরিমাণ বাস্তবিক পক্ষে নাই। কালই আত্মার অব্যক্ত ভাবের আভাসমাত্র। তবে ব্যবহারিক ভাবে পরিমাণ করিতে গেলে, আমরা কার্য্য বা work দিয়া পরিমাণ করি। ইহাকে unit of time বলে। কার্য্যও আবার matter নামধেয় অব্যক্তপদার্থের ঘনত্ব বা densityর উপর নির্ভর করে। এই জন্যই শাস্ত্রে মানব ও দৈব বৎসরের প্রভেদ আছে। স্থূল সৌরমণ্ডলের ত এই কথা। ভগবানের মনোময় অভিব্যক্তি কত সময়ে স্থূলরূপে প্রকটিত হয়। তাঁহার মানসিক ভাবের এক ক্ষণ আমাদের কত সময়? আমাদের জীবনব্যাপী সুখ দুঃখের পরিণাম; তাঁহার চক্ষে কিরূপ? তবে ভাই, স্থূল জীবনের কার্য্যকলাপ ও সুখ দুঃখ লইয়া অত কাঁদি কেন? প্রত্যেক স্থূল ব্যাপারে ভগবানকে এত ডাকাডাকি করি কেন?

---

১০ ভাগ। { জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩ সাল। } ২য় সংখ্যা।

সুপ্রভাত।

উঠিয়া প্রভাতে বসিয়া শয্যাতে
দুর্গা বলি যে বা ডাকে।
ঘুচে যায় তার বিপদের ভার
সুখেতে সদা সে থাকে॥
তাই ভোরে উঠি জুড়ি হাত দুটী
সঁপি মন বাঙা পায়।
ডাকি প্রাতঃকালে দুর্গা দুর্গা ব'লে
সুখে যেন কাল যায়॥

প্রভাতে যে ভজে রবি শশী কুজে
বুধ গুরু শুক্র শনি।
সুপ্রভাত হেতু ভজে রাহু কেতু
জুড়িয়া যুগল পাণি॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু হরে ডাকে যে কাতরে
সুখ-প্রভাতের তরে।
হয় অনিবার সুপ্রভাত তার
পড়েনা গ্রহের ফেরে॥
তাই নবগ্রহে ত্রিদেবে আগ্রহে
কাতরে ডাকি সকালে।
নিশা অবসানে সুপ্রভাত দানে
প্রসন্ন হও সকলে॥

জয় কালী তারা মহাবিদ্যা পরা
ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভবের ঘরণী ভৈরবী ভবানী
ছিন্নমস্তা মহেশ্বরী॥
প্রাচীনা মূরতি ধূমাবতী সতী
বিদ্যারূপে সুবরদা।
বগলা মাতঙ্গী কমলা বরাঙ্গী
সিদ্ধবিদ্যা সুখপ্রদা॥
নাশিতে অবিদ্যা দশ মহাবিদ্যা
প্রভাতে উঠিয়া স্মরি।
দাশের কৃপায় পরাভূত হয়
সংসারের সব অরি॥

অহল্যা সুন্দরী তারা মন্দোদরী
কুন্তী দ্রৌপদী সতী।
এই পঞ্চ নারী প্রাতঃকালে স্মরি
ধর্ম্মে যেন থাকে মতি॥
পুণ্য শ্লোক নলে স্মরি প্রাতঃকালে
বৈদেহী জনার্দ্দনে।
পাণ্ডুর কুমারে স্মরি যুধিষ্ঠিরে
পুণ্যশ্লোক, মানি মনে॥

দময়ন্তী নলে কর্কটক ছলে
ঋতুপর্ণ অক্ষগুণে।
যে মতে উদ্ধারি পায় রাজ্য ফিরি
কলি নাশি সে কীর্ত্তনে॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনে স্মরি মনে মনে
ধন-নাশ নাহি হয়।
হারাধন মেলে ও নাম স্মরিলে
করতলে পুনরায়॥

অখণ্ড মণ্ডল ব্যাপ্ত জল স্থল
অনল অনিলাকাশ।
দিব্য-জ্যোতিঃ যার বিশ্ব চরাচর
করিতেছে সুপ্রকাশ॥
সেই ব্রহ্ম-পদ অতুল সম্পদ
যাঁর কৃপাগুণে মেলে।
সে গুরু-চরণ করিয়া বন্দন
প্রণমি পদ কমলে॥

বসা'য়ে যতনে হৃদি-সিংহাসনে
অভীষ্ট-আরাধ্য ধন।
পূজি ভক্তি ভরে মানসোপচারে
শ্রীচরণে সঁপি মন॥
তুমি প্রভু পিতা সকলের ধাতা
তুমি মা জগৎ-যোনি।
জগৎ-বিধাত্রী তুমি জগদ্ধাত্রী
শিবা শুভ-বিধায়িনী॥
তুমি হে গোলকে চতুর্দ্দশ লোকে
সতত সর্ব্বত্র বাস।
অনন্ত শয়নে বৃষভ-আসনে
নাভিপদ্মে সুপ্রকাশ॥

সতত সগুণ নাহি কোন গুণ
ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু।
নাহি দেহরূপ তবু অপরূপ
পরমেষ্টি মহাগুরু॥
পড়ি ভব ঘোরে এ বিশ্ব-সংসারে
যখন যা কিছু করি।
সকলই তোমারে তুষিবার তরে
যথা তথা ফিরি ঘুরি॥
ধর্ম্ম-পথ জেনে প্রবৃত্তির গুণে
সে পথ ধরিতে নারি।
জানিয়া অসার না করি বিচার
পাপ-পথে সদা ফিরি॥
তুমি হৃষিকেশ দাও উপদেশ
হৃদয়-কমলে থাকি।
পথের সম্বল দাও পুণ্য-বল
দাও হে জ্ঞানের আঁখি॥

হই হে শ্রীহরি দিব্য-দেহ-ধারী
শোক-ভাগী নাহি হই।
পূর্ণ ব্রহ্মে মিলে সে পদ-কমলে
লীন হ'য়ে সদা রই॥

দশ-দিক্‌পালে নমি প্রাতঃকালে
গণেশাদি দেবগণে।
প্রণমি ধরায় বিষ্ণুপ্রিয়া পায়
স্থান মাগি শ্রীচরণে॥
হইয়া সন্তোষ পাদ-স্পর্শ-দোষ
ক্ষমি নিজ কৃপা-বলে।
ধ'র মা আমার এ দেহের ভার
ধর মা সন্তানে কোলে॥

ইষ্ট দেবতারে   তুষিবার তরে
নিত্য-নিয়োজিত পথে।
সাজি কর্ম্ম-সাজে   সংসারের কাযে
যাত্রা করি সুপ্রভাতে॥

শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাংখ্য।

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥
কেন—২—৫।

সর্ব্বভূতে সেই মহান্ পুরুষের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলে মনুষ্য অমরত্ব লাভ করে, অন্যথা তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। যাবতীয় হিন্দু-দর্শনের এই অমরত্ব লাভই উদ্দেশ্য। "অমৃতত্ব" "অপবর্গ" "মুক্তি" "পুরুষার্থ" প্রভৃতি, একই পদার্থের নামান্তর মাত্র। অপরাপর দর্শন হইতে হিন্দু দর্শন মাত্রেরই এই বিশেষত্ব। অন্য দেশীয় দর্শনে এইরূপে প্রথম হইতে উদ্দেশ্য নির্ণয় না থাকায়, নানারূপ মতদ্বৈধ ও বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু হিন্দুদর্শন মাত্রেই প্রথম হইতে অপবর্গ লাভে উদ্দেশ্য স্থির করায়, অস্মদ্দেশীয় দর্শনশাস্ত্রের ধর্ম্মের সহিত অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ ও পারমার্থিক ও নৈতিক মঙ্গলের সোপান-রূপত্ব দৃষ্ট হয়। অবশ্য এই "অপবর্গ" বা "মুক্তি"র অর্থ বিভিন্ন দর্শনে বিভিন্ন ভাষায় পরিব্যক্ত হইয়াছে; কিন্তু সকলেই বিভিন্ন পন্থায়, বিভিন্ন উপায়ে এই একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইবার প্রয়াস পান। উপায় সম্বন্ধেও সমস্ত দর্শনের ঐক্য দেখা যায়; সকলেই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা "অপবর্গ" লাভ হয় কহিয়া থাকেন, কিন্তু লক্ষ্য-নির্ণয়-পার্থক্যে, সাধন স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞানেরও নানার্থ দৃষ্ট হয়। প্রস্তাবিত সাংখ্যদর্শনে উক্ত "অপবর্গ" ও তৎসাধন, তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে মহর্ষি কপিল

কি উপদেশ দিয়াছেন যথা সময়ে তৎসম্বন্ধে আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে। এক্ষণে সাংখ্যদর্শন কি এবং তাহার কোথায় বিশেষত্ব, তৎসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বিচার করা প্রয়োজন।

সাংখ্য শব্দ "সংখ্যা" শব্দ হইতে "থিতক" প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। সংখ্যা শব্দের সামান্যার্থ "গণন"। কিন্তু "সংখ্যা" শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ সমাখ্যান বা যথাযথ বিবরণও হইতে পারে। বস্তুতঃ, সাধারণতঃ "সংখ্যা" শব্দ যে গণনার্থের সূচনা করে, তাহাও ঐ ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইতে অনুপ্রাণিত। কোনও বস্তুর সম্যক্ বিবরণ স্থির করিতে হইলে অন্যান্য পদার্থ হইতে তাহার বিশেষত্ব নিরূপণ করার প্রয়োজন হয়। মানবের জ্ঞান অন্বয় ও ব্যতিরেক মূলে সংস্থাপিত; বস্তুসাধারণ হইতে বস্তু বিশেষের পার্থক্য স্থিরীকরণ ভিন্ন, তদ্বস্তুর জ্ঞান লাভ করা যায় না; এবং এইরূপে বস্তু হইতে বস্তুন্তরের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে হইলেই "গণন" করার প্রয়োজন হয়। অতএব এই সংখ্যা শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য ও সাধারণ অর্থের পর্য্যালোচনা করিলে আমরা "সংখ্যা" শব্দের তিনটী অর্থ দেখিতে পাই:—(১) সম্যক্ জ্ঞান (২) বিশেষণ (৩) গণন। এ কারণ সাংখ্যদর্শন অর্থাৎ যে দর্শনে "সংখ্যা"র বিষয় বিবরিত আছে তাহারও তিন অর্থ দেখিতে পাই:—প্রথমতঃ, ইহাকে সাংখ্যদর্শন বলা হইয়াছে; যেহেতু ইহাতে সৃষ্টি ও প্রলয়ের মৌলিক তত্ত্বের উপদেশ মূলে সম্যক্ জ্ঞানের পন্থা দর্শিত আছে। দ্বিতীয়তঃ, অস্মদ্দর্শনে ব্যক্ত (সৃষ্ট পদার্থ নিচয়) অব্যক্ত (মূলা প্রকৃতি) ও জ্ঞ (পুরুষ)—এই তিন পদার্থের বিশেষণমূলে মুক্তির পন্থা প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়াও ইহার নাম সাংখ্য। তৃতীয়তঃ, এই দর্শনে মূলতত্ত্বের সংখ্যা নির্ণয় করা হইয়াছে বলিয়াও ইহার নাম "সাংখ্য" হইতে পারে।

সাংখ্যদর্শনমেতাবৎ পরিসংখ্যান দর্শনং।
সংখ্যাং প্রকুর্ব্বতে চৈব প্রকৃতিং প্রচক্ষতে॥

এই স্থলে সাংখ্যদর্শনের বিচার বিশেষত্বের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। ইউরোপীয় ও অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলী কেহ বা সাংখ্যদর্শনকে "নিরীশ্বর" দর্শন, কেহ বা "জড়বাদপ্রবর্ত্তক" দর্শন ইত্যাদি নানা বিশেষণে

বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি যতটুক বুঝিয়াছি তাহাতে আমার বোধ হয় যে, তাঁহারা সাংখ্যদর্শনের বিষয় ও বিচার বিশেষত্বের যথাযথ বিচার করেন নাই বলিয়াই এবম্প্রকার ভ্রম প্রমাদে পতিত হইয়াছেন। সাংখ্য প্রকৃতি ও প্রাকৃত জগৎকে মন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কেবল তাহারই নাম-রূপের পর্য্যালোচনা করেন নাই, অথবা আত্মাকে প্রাকৃত জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করারও প্রয়াস পান নাই। পক্ষান্তরে পুরুষ ও প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া তাহাদিগের পরস্পরান্বিত গুণধর্ম্মাবলী মানিয়া লইয়া কিরূপে পুরুষ প্রকৃতি সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং কিরূপে তাহার স্বরূপ জানিতে পারিয়া তদ্বিপরীতধর্ম্মাপন্ন স্বস্বরূপত্বের প্রকৃত জ্ঞানলাভ করে এবং বন্ধন দায় হইতে মুক্ত হয় তাহাই সাংখ্যদর্শনের প্রস্তাবিত বিষয়। এক কথায় বলিতে গেলে সাংখ্য জ্ঞানতত্ত্বের পর্য্যালোচনা করেন নাই। (The problem of the Sankhya is essentially epistemological rather than metaphysical)। যাবতীয় প্রাচীন দর্শন অধিকাংশ স্থলেই বস্তুতত্ত্বের অন্বেষণে ব্যস্ত। প্রাচীন গ্রীসের সমুদয় দর্শনই এই কার্য্যে ব্যাপৃত। নব্য দর্শনে Descartes প্রথম ইউরোপের চিন্তাস্রোতঃ মানসিক ব্যাপার আলোচনার দিকে প্রধাবিত করিয়াছিলেন, এবং তৎপরবর্ত্তী দার্শনিকগণও মনস্তত্ত্বের আলোচনায় তাঁহাদিগের ধীশক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। জার্ম্মান পণ্ডিত প্রবর ইম্যানুয়েল কাণ্ট Kant সর্ব্ব প্রথম দার্শনিকতত্ত্বের মূলসূত্র জ্ঞানক্রিয়ার আলোচনায় মনঃ-সংযোগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই যত্ন ও চেষ্টায় ইউরোপের চিন্তাজগতে নূতন প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই কাণ্টীয় দর্শনের সহিত সাংখ্যদর্শনের মূলসূত্রের একাধিক ঐক্য দেখা যায়। কাণ্টও সাংখ্যকারের ন্যায় বিভিন্ন ভাবে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় সম্বন্ধে বিচার করেন নাই। বস্তুতঃ জ্ঞানক্রিয়ার যথাযথ বিবরণ ব্যতিরেকে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় সম্বন্ধে কোনও দার্শনিক তত্ত্ব উদ্ঘাটন করা যায় না। কাণ্টের অননুকরণীয় ভাষায়, মানসিক ক্রিয়া-বিষয় জ্ঞান ব্যতীত শূন্যান্তঃস্থলও নষ্টপ্রসর এবং বিষয়পরম্পরা মানসিক ক্রিয়া ব্যতীত অন্ধ ও অজ্ঞান। Notions without perception are

empty, perceptions without notions are blind। সাংখ্যদর্শন ও বলিলেন "পঙ্গ্বন্ধবৎ উভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ।" পুরুষ প্রকৃতির অভাবে পঙ্গু, প্রকৃতি পুরুষের অভাবে অন্ধ, উভয়ের সংযোগে জ্ঞান ক্রিয়ার (সর্গের) প্রসর। এই জ্ঞানতত্ত্বের উপর সাংখ্যদর্শনের ভিত্তি বলিয়াই সাংখ্য পুরুষ ও প্রকৃতি, Ego and Non-ego, এই দুই পদার্থকে এরূপ বিভিন্নধর্ম্মাপন্ন পরস্পরবিরোধী দুইটি স্বতন্ত্র পদার্থ করিয়া স্থাপন করিয়াছেন। এ দুইএর মধ্যে জ্ঞানক্রিয়ার অন্তরালে সমন্বয় কোথায় এবং কি উপায়ে হইতে পারে তৎসম্বন্ধে সাংখ্য কোন কথাই বলেন নাই। জ্ঞানক্রিয়ার জন্য জ্ঞাতা (পুরুষ) ও জ্ঞেয় (প্রকৃতি) দুইটী পদার্থের প্রয়োজন এবং তজ্জন্যই সাংখ্য ঐ দুই পদার্থের শ্রুতি কথিত যাবতীয় বিবরণ স্বীকার করিয়া জ্ঞান সর্গের ব্যাখ্যানে অগ্রসর হইয়াছেন। প্রতি পুরুষের জ্ঞান, ক্রিয়া, প্রবৃত্তি, গুণ ও রাগের বিভিন্নতা দেখা যায় বলিয়া নানা পুরুষের অবতারণা করিয়াছেন। বিষয়-জ্ঞানের চক্ষে দেখিতে গেলে,এক জন মানবের জ্ঞান অপর এক জন হইতে পৃথক্। এক জনের জ্ঞান যে দিকে প্রধাবিত হইতেছে অপর এক জনের প্রকৃতি হয়ত ঠিক তাহার বিপরীতে প্রধাবিত হইতেছে দেখা যায়। কাহারও প্রকৃতি সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন, কাহারও বা তামসিক ভাবাপন্ন দেখিতে পাই। অতএব সাংখ্যদর্শন বলিলেন পুরুষ অসংখ্য। কাণ্ট যেরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থমাত্রের অজ্ঞাত কারণকে Ding-an-sich—Thing-in-itself—মানসিক গুণরাগে অরঞ্জিত পদার্থ-স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং যতদূর স্থির করা যায় উক্ত পদার্থ-স্বরূপকে শক্তির আধার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, সাংখ্যকারও সেইরূপ তাঁহার মূল প্রকৃতিকে অবিকৃত ও অব্যক্ত কারণ বলিয়াছেন। সাংখ্যের পুরুষ ও অহংকার কাণ্টের Transcendental and Empirical Ego একই পদার্থ। কাণ্ট ঈশ্বরের অস্তিত্বের তিন প্রকার প্রমাণ (Cosmological, Ontological and Teleological) পর্য্যালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, উক্ত প্রমাণত্রয়ের কোনটীই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংস্থাপিত করিতে পারে না। সাংখ্যকারও বলিয়াছেন "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" "তদপেক্ষায়াং প্রমাণাভাবাৎ"। বস্তুতঃ, বিষয় জ্ঞানের পন্থা ভগবৎসত্তা

উপলব্ধির প্রমাণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও পৃথক্—সাংখ্যকার তাহা জানিয়া বলিয়াছেন যে, সিদ্ধ প্রমাণত্রয় (দৃষ্ট, অনুমান ও আপ্তবচন) ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে অসমর্থ। কাণ্ট তাঁহার সর্ব্বোতোমুখ দর্শনের নৈতিক ও পারমার্থিক অংশে অন্য উপায়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। তবে যে দর্শনশাস্ত্র কেবলমাত্র বিষয়-জ্ঞান-ক্রিয়ার আলোচনায় ব্যাপৃত, তাহার মধ্যে ঈশ্বরের কোনও স্থান থাকিতে পারে না। সাংখ্যদর্শনকে একপ্রকার জড়বাদ বিবেচনা করাও একবারে ভ্রম। সাংখ্য অবশ্য মহৎ অহঙ্কারাদি "অজড়" পদার্থকে প্রকৃতির কার্য্য বলিয়াছেন এবং তজ্জন্য হঠাৎ এরূপ মনে হইতে পারে যে, তদ্দ্বারা সাংখ্য জড়বাদের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু সাংখ্যদর্শনের মৌলিক চিন্তাসমূহ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, প্রকৃতি পুরুষ হইতে যখন বিচ্ছিন্ন থাকেন তখন তাহাতে কোনও ক্রিয়ার প্রসর নাই ; তখন তাহা সত্ত্ব রজঃ তমঃ ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা এবং পুরুষের সান্নিধ্যহেতু প্রকৃতিতে মহদাদি বিকৃতি নিচয় পরিদৃষ্ট হয়। ইহাতেও বুঝা যায় যে, সাংখ্যদর্শনকার বিষয় ও মনের সংঘর্ষণে কি প্রকারে জ্ঞান কার্য্য সুসাধিত হয়, তাহাই দেখাইয়াছেন। তিনি জড়বাদীর ন্যায় আত্মাকে জড় প্রকৃতির রূপান্তরমাত্র স্থির করেন নাই।

সাংখ্যদর্শন "অব্যক্ত" হইতে "ব্যক্তে"র উৎপত্তি ক্রমবিকাশমূলে বিবৃত করিয়াছেন। বস্তুতঃ সাংখ্যদর্শনকেও এক প্রকার ক্রমবিকাশদর্শন বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান যুগে স্পেনসেরীয় ক্রমবিকাশ দর্শন অস্মদ্দেশে সমধিক পরিজ্ঞাত। অতএব স্পেনসারের ক্রম বিকাশ ও সাংখ্য ক্রম বিকাশের ভেদাভেদ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। উভয়ত্রই অব্যক্ত হইতে ব্যক্তের উৎপত্তি ও পরিণতি ধারাবাহিক রূপে আলোচিত হইয়াছে অর্থাৎ উভয় দর্শনই ক্রমবিকাশপ্রণালীতে বস্তুতত্ত্বের উদ্ঘাটন করিয়াছে। কিন্তু বিকাশী পদার্থ ও বিকাশ প্রণালীতে দুই দর্শনে সম্পূর্ণ পার্থক্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা দৃষ্ট হয়। স্পেনসার জড় (matter) এবং জড়শক্তির (Force) ক্রমিক বিকশনে বাষ্প হইতে দ্রব, দ্রব হইতে কঠিন, কঠিন হইতে কঠিনতর বস্তুনিচয় ; তাহা হইতে বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদি ; তাহা হইতে প্রটোজোয়া প্রভৃতি সামান্য কীট পতঙ্গ হইতে ক্রমান্বয়ে উচ্চ

হইতে উচ্চতর আ-মানব পশুনিচয় কিরূপে উপজিত হইতে পারে তাহাই দেখাইয়াছেন। এবং এই বিকশন ক্রিয়ার মূলে যে সংযোগ (integration) এবং বিয়োগাত্মক (disintegration) প্রণালী অন্তর্নিহিত রহিয়াছে তাহাই (Spencer) বিবৃত করিয়াছেন। এই ক্রমবিকাশে আত্মার (পুরুষের) কোনও স্থান নাই ; স্পেনসার জড়শক্তির ও জড়ের সংযোগ বিশ্লেষণে মানসিক ও আত্মিক সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ উৎপন্ন করিতে গিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার দর্শনের একদেশদর্শিতা প্রতিপদে প্রতীয়মান হয়। সাংখ্যকার কিন্তু প্রথম হইতেই আত্মা এবং জড়, পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুই পদার্থকে একই ক্রিয়ার অংশভূত অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বলিয়া আমূল স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সংক্ষেপে বলিতে হইলে স্পেনসারের ক্রমবিকাশ জড় প্রকৃতির ক্রম বিকাশ, সাংখ্য দর্শনের ক্রমবিকাশ পুরুষের বিষয় জ্ঞান-ক্রিয়ার ক্রমবিকাশ। তজ্জন্য স্পেনসেরীয় দর্শনে ক্রমবিকাশের স্তরগুলি সুপরিস্ফুট ও বিশ্লিষ্ট, সাংখ্যদর্শনের বিকাশগুলি মনোদ্বারা বিভিন্ন ভাবে বোধ্য কিন্তু পরস্পরাশ্লিষ্ট।

সাংখ্যদর্শনের সহিত ইউরোপীয় পণ্ডিতপ্রবর Liebnitz দার্শনিকের সমধিক ঐক্য দেখা যায়। সাংখ্যদর্শন প্রকৃত পক্ষে প্রত্যেক "পুরুষ" কি প্রকারে বিষয়জ্ঞান ক্রমান্বয়ে লাভ করিয়া বিষয় বিষয়ীর পার্থক্য উপলব্ধি করিয়া মুক্ত হন তাহাই দেখাইয়াছেন। লায়েবনিজের Monads গুলিও ঠিক সাংখ্যের পুরুষের ন্যায় ; প্রত্যেকেই তাহার জ্ঞানানুসারে সৃষ্টি প্রকরণের আদর্শ স্বরূপ। (Every finite monad has the clearest perception of those parts of the universe to which it is most nearly related ; from its standpoint it is a mirror of the universe). এই সমস্ত monads আকাশে ক্ষুদ্র বিন্দুর ন্যায় স্থিত (they are pure points in space)। কিন্তু প্রত্যেকের জ্ঞান সম্বন্ধে মানসিক শক্তি অদম্য ও অসীম। জ্ঞান, সকল monadর সমান নয়। বস্তুতঃ জ্ঞান—বিশেষত্বেই monad গুলির সত্তার বিশেষত্ব। প্রতি monadএর জ্ঞান যত সুপরিস্ফুট হয়, ততই সে মুক্তির দিকে অগ্রসর হয়। ঈশ্বরও একটী monad, তিনি প্রাথমিক monad ; সসীম monadএর জ্ঞান সর্ব্বতোভাবে সুপরিস্ফুট হইলেই

ঈশ্বর-monad বা প্রাথমিক monad হইয়া যাইতে পারে। অবশ্য সাংখ্য-কার ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই, কিন্তু সাংখ্যের "পুরুষ" ও লায়েবনিজের monad এর ঐক্যের বিষয় চিন্তা করা যাইতে পারে।

এক্ষণে সাংখ্যের বিষয়ের অবতারণা করা যাউক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি অপবর্গ ও তৎপ্রাপ্তির উপায় প্রদর্শনই প্রত্যেক হিন্দুদর্শনের কার্য্য; সাংখ্য-কারও তাহাই করিয়াছেন। সাংখ্যকার দেখিলেন,মানব প্রকৃতিতে দুঃখ মাত্রের নিরসন ও সুখ প্রাপ্তির একটা ইচ্ছা স্বতঃই উদ্রিক্ত হয়। মনুষ্যের অপর নানা বিষয়ে পার্থক্য থাকিতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকেই নিজ নিজ জ্ঞান ও শক্তির অনুসারে দুঃখমোচন ও সুখের অন্বেষণে ব্যাপৃত। মানব কিন্তু একবার একটু সুখ পাইলেই সন্তুষ্ট হয় না, একটী সুখ পাইলে অপর একটী সুখের দিকে ধাবিত হয়; অল্প সুখ পাইলে তদপেক্ষা অধিক সুখের প্রয়াসী হয়। তজ্জন্যই সাংখ্যকার বলিলেন "দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা তদভি-ঘাতকে হেতৌ" দুঃখত্রয়ের দ্বারা ক্লিষ্ট হইয়া মানব তন্নিবারক হেতু জানিতে ইচ্ছুক হয়, কিন্তু দুঃখ নিবারণের জন্য নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াও কিছুতেই ইপ্সিত সুখ লাভ করিতে পারে না। কারণ সাধারণ উপায় গুলিতে কোনটীরই অত্যন্ততা ও একাগ্রতা নাই। সুখের অন্বেষণে কেহ বা নানাবিধ ভোগ্য বস্তুর মহৎ সমাবেশ করিয়া তাহা হইতে সুখের অন্বেষণ করিতেছেন, কেহ বা যজ্ঞ ব্রত নিয়মাদি দ্বারা স্বর্গাদি প্রকৃষ্ট লোক পাইতে ও তথায় সুখভোগ করিতে ব্যস্ত। কিন্তু ইহার মধ্যে কোন উপায়েই অবিচ্ছিন্ন অল্পাধিকতা-শূন্য সুখ পাওয়া যাইতে পারে না; অথচ তাহা না পাইলেও আত্মার তৃপ্তি হয় না। তজ্জন্যই সাংখ্যকার বলিলেন যে, এতদ্ব্যতিরিক্ত এক শ্রেয়ঃ উপায় আছে। সেটী পুরুষ, প্রকৃতি ও বিকৃতি এই পদার্থত্রয়ের বিজ্ঞান "তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞ বিজ্ঞানাৎ।" সাংখ্যকার তিন রূপ দুঃখের কথা বলিয়াছেন, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। মূলতঃ দুঃখ দুই প্রকার হইতে পারে—(১) যে সমস্ত দুঃখের কারণ বহির্জগতে অন্বেষণ করিতে হয় (২) যাহার কারণ আমার নিজের শরীর বা মনের মধ্যে দেখিতে পাই। প্রথম প্রকারের দুঃখ আবার দুই প্রকার হইতে পারে (ক) যে সমস্ত দুঃখ দুষ্ট পদার্থ বা জীব

হইতে প্রাপ্ত (খ) যে সমস্ত দুঃখ অদৃষ্ট পদার্থ হইতে প্রাপ্ত। স্বীয় মনের বা শরীরের অবস্থা দ্বারা যে দুঃখ পাওয়া যায় তাহাকে আধ্যাত্মিক দুঃখ বলা যায়। দৃষ্ট বহির্জাগতিক পদার্থ হইতে যে দুঃখ পাওয়া যায় তাহাকে আধিভৌতিক, ও অদৃষ্টবহিঃস্থ পদার্থ হইতে যে দুঃখ পাওয়া যায় তাহাকে আধিদৈবিক দুঃখ বলা যায়। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, সাংখ্য কেবল মাত্র দুঃখ নিবৃত্তির উপায় বলিয়া দিলেন, কিন্তু সুখ প্রাপ্তির ত কোনও উপায় বলিয়া দিলেন না। অবশ্য দুঃখের বিনাশ একটী অভাব পদার্থ, কিন্তু সুখ প্রাপ্তি একটী ভাব পদার্থ (One is a negative, while the other is a positive state)। তাহা হইলে সাংখ্যদর্শনের উদ্দেশ্য কিরূপে সর্ব্বানুমোদিত হইতে পারে? যতদিন পর্য্যন্ত মানব প্রাকৃতিক নাম রূপে পরিব্যাপ্ত থাকিয়া অনাত্মা দেহাদিতে অহংমমাদি জ্ঞান করিতে থাকেন ততদিন তাঁহার দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি নাই; কারণ জন্ম মরণাদি নানারূপ দুঃখ দেহাদি ভূতগ্রামের সহিত অবিচ্ছেদ্য। এই অনাদি অনন্ত দুঃখভার ছেদনই সাংখ্যের মতে পরমপুরুষার্থ। বস্তুতঃ আমাদিগের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ; দুঃখের একান্ত অভাব হইলে কি প্রকারের সুখ থাকিতে পারে, কি একবারেই থাকিতে পারে কি না, তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে আমার বোধ হয় ভূতগ্রামের সহিত একবারে বিচ্ছিন্ন হইলে আত্মসত্তা উপলব্ধি করিতে করিতে আত্মা অসীম অপার আনন্দ উপভোগ করিবেন, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সাংখ্য আত্যন্তিকী দুঃখ নিবৃত্তির উপায় বলিয়া দেওয়াতে উক্ত সুখের উপায়ও বলিয়া দিয়াছেন, কিন্তু ঐ সুখের কোন বিশেষণ ব্যাখ্যান হইতে পারে না। আত্মা ঘটিত যাবতীয় বিষয়ের "নেতি নেতি ন্যায়েন" "তাহা ইহা নয়, উহা নয়" ইত্যাদি প্রকারেই ব্যক্ত করা হয় এবং তজ্জন্যই আত্মার স্বসত্ত্বোপলব্ধিজনিত যে সুখ তাহাকে যাবতীয় দুঃখ ভাবের অভাব পদার্থ ভিন্ন অপর কোনও বিশেষণ দেওয়া যাইতে পারে না। এই অপবর্গ বা মুক্তি ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞ বিজ্ঞান মূলে কি প্রকারে লাভ করা যাইতে পারে তাহার উত্তরে সাংখ্য বলিয়াছেন :—

রূপৈঃ সপ্তভিরেব তু বধ্নাত্যাত্মানমাত্মনা প্রকৃতিঃ।
সৈব চ পুরুষার্থং প্রতিবিমোচয়ত্যেকরূপেণ॥

প্রকৃতি সপ্তরূপে নিজে নিজেকে বদ্ধ করিয়া একরূপে পুরুষের উপকারার্থ নিজেকে মুক্ত করে। এই সপ্তরূপ বন্ধনের উপায়:—ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, রাগ, ঐশ্বর্য্য (power) অনৈশ্বর্য্য (weakness)। মুক্তির একমাত্র উপায় হইতেছে জ্ঞান; সে জ্ঞান কি প্রকার তাহা অবশ্য পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। উক্ত জ্ঞানের কি ফল হয় এবং তাহার স্বরূপ কি তাহা এই প্রকারে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে:—

এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাস্মি ন মে নাহমিত্যপরিশেষং।
অবিপর্য্যয়াৎ বিশুদ্ধং কেবল মুৎপদ্যতে জ্ঞানং॥

এইরূপে তত্ত্বাভ্যাসদ্বারা "আমি নাই" "আমার নাই" "আমিত্ব নাই" ইত্যাকার শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধ একমাত্র জ্ঞান উৎপন্ন হয়। প্রথমতঃ এই জ্ঞান তত্ত্বাভ্যাস দ্বারা লাভ করা যায়; দ্বিতীয়তঃ সেই জ্ঞান পূর্ণ, ভ্রমপ্রমাদশূন্য (নিশ্চয়াত্মক) ও একমাত্র জ্ঞান নাম পাইবার উপযুক্ত; তৃতীয়তঃ এই জ্ঞান লাভ করিলে বিশিষ্ট দেশ-কাল-পাত্র ভেদযুক্ত অহং জ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়। তখন পুরুষ স্বসত্ত্বায় অবস্থিত হইয়া প্রেক্ষকভাবে প্রকৃতিকে দেখে—সে অবস্থায় পুনরায় আর সৃষ্টি হইতে পারে না; কারণ তদ্বিষয়ে প্রয়োজন ও প্রবৃত্তির অভাব। তখন পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ হইলেও সৃষ্টি কার্য্য অসম্ভব; যেহেতু পুরুষ বিবেচনা করেন যে, প্রকৃতির স্বরূপ ত দেখিয়া লইয়াছি আর দেখার প্রয়োজন নাই। প্রকৃতি মনে করেন যে আমাকেত দেখাইয়া দিয়াছি আর দেখাইবার প্রয়োজন নাই। এইরূপ সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিলে ধর্ম্মাধর্ম্মাদি যাবতীয় কর্ত্তব্য নষ্ট হইয়া যায়; তখন আর কোনও নূতন কার্য্যের অবসর থাকে না। কেন না, তৎসমস্তের মূলে যে অহংকার ছিল তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তবে সঞ্চিত কর্ম্ম সংস্কাররূপে থাকায় জ্ঞানলাভ মাত্রেই স্থূল শরীর নষ্ট হয় না। যথা সময়ে ঐ সংস্কারের কার্য্য শেষ হইলেই পুরুষ প্রকৃতি হইতে বিমুক্ত হইয়া ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক কৈবল্য অর্থাৎ স্ব-স্বরূপত্ব লাভ করে:—

প্রাপ্তে শরীর ভেদে চরিতার্থত্বাৎ, প্রধানবিনিবৃত্তৌ
ঐকান্তিকং আত্যন্তিকং উভয়ং কৈবল্যং আপ্নোতি।

তখন পুরুষ নিত্য শুদ্ধ হইয়া সেই অবস্থা প্রাপ্ত হন যাহাকে উপনিষদ্

বলিয়াছেন :—বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্ব্বৈঃ প্রাণা ভূতানি সম্প্রতিষ্ঠন্তি যত্র।
তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সৌম্য স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমেবাবিবেশেতি ॥

(ক্রমশঃ)

আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়ম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের হৃদয়ের লক্ষ্য পরমপুরুষের প্রতি রাখে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা সত্য জানিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি, ততক্ষণ আমরা ভুল করি বলিয়া হতাশ্বাস হইবার কারণ নাই। সত্যপথ নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া আমাদের অজ্ঞতাবশতঃ যদি অন্যায় করিয়া থাকি, তাহা হইলে তাহার পরিণামে যে কষ্ট হইবে তাহাতে আমাদের মনের মালিন্য দূর হইবে; সুতরাং সে কষ্টকে আমরা সাদরে গ্রহণ করিব। তখন আমরা শ্মশানের অধিপতি দেবাদিদেব মহাদেবকে এই বলিয়া স্তুতি করিব—"হে জ্যোতির্ম্ময়! তোমার অগ্নির দ্বারা আমাদিগের দৃষ্টিপথের বাধাবিঘ্ন দগ্ধ কর। হে দয়ানিধে! আমাদিগের মনের সমুদয় ময়লা পোড়াইয়া খাঁটি সোণা কর। যে পর্য্যন্ত সমুদয় ময়লা না দগ্ধ হইয়া যায় সে পর্য্যন্ত তোমার অগ্নিতে দগ্ধ কর।"

কিন্তু যদি আমরা কাপুরুষের ন্যায় সত্য স্থির করিবার ভয়ে পিছাইয়া যাই এবং আমাদিগের ভিতরের Conscienceএর (অন্তরাত্মার) উক্তিতে বধির হই এবং সত্যপথ বলিয়া অপরের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট আয়াসসাধ্য একটি পন্থা অবলম্বন করি, এবং যাহা আমরা অন্যায় বলিয়া অনুভব করি, এবং আমাদের Conscienceএর বিরুদ্ধে অন্যের ধর্ম্ম অবলম্বন করি, তাহা হইলে কি আমরা ঠিক্ করিলাম? কখনই নহে; আমরা আমাদের অন্তরস্থিত ঐশী শক্তিকে বা বাণীকে নিরোধ করিয়া রাখিলাম; তাহাকে কথা কহিতে দিলাম না। আমরা উচ্চ ছাড়িয়া নীচ অবলম্বন করিলাম; আমরা কঠিন ছাড়িয়া সহজ অবলম্বন করিলাম। আমরা আমাদের বাসনাকে পরিশোধিত না করিয়া উহার নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম। যদ্যপি অন্যের দ্বারা নির্দ্ধারিত পন্থা বস্তুতঃ ভাল ও হয়, তথাপি আমার নিকট যাহা

ভাল বলিয়া স্পষ্ট বোধ হয়, তাহা অবলম্বন না করিয়া অন্যের মতে চলিলে আমাদের উন্নতির পথে বিঘ্ন হয়। বাসনাকুহকে পড়িয়া ভ্রমে নিপতিত হইলে যে অনিষ্ট হয়, ইহা তদপেক্ষা সহস্রগুণে ক্ষতিজনক। যাহা আমাদের নিকট প্রকৃষ্ট সত্য বলিয়া মনে হয় তদনুসারে কার্য্য করাই আধ্যাত্মিক জীবন-লাভেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে নিরাপদ্ পন্থা। যে পন্থা আমাদিগের নিকট অন্যায় বলিয়া বোধ হয় যদি তাহাকে অন্যের উপদেশ ও আজ্ঞা অনুসারে ন্যায় বলিয়া গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমাদিগের ভিতর যে ন্যায় ও অন্যায় বিচার করিবার শক্তি আছে,—তাহা—এক্ষণে ক্ষুদ্র ও বলহীন হইলেও—হারাইয়া ফেলিব। তাহার সাহায্য না লইয়া কার্য্য করিলে তাহাও নিভিয়া যাইবে এবং আমাদিগকে অন্ধকারে চলিতে হইবে। যদি এই পথ কর্ত্তব্য-জ্ঞান ও ন্যায়পরায়ণতা দ্বারা পরীক্ষা করিয়া না লই, তবে আমরা আলোক ও অন্ধকার কি প্রকারে চিনিব? সৎপথ বা শুক্লমার্গ, এবং অসৎ বা কৃষ্ণমার্গ এ দুইয়ের প্রভেদ কি প্রকারে জানিব? দৈবী ও আসুরীভাব কি প্রকারে বুঝিব? ন্যায় ও সত্যের অবতারস্বরূপ দেবগণকে অসুর হইতে কি প্রকারে পৃথক্ করিব? যে স্থলে কর্ত্তব্যানুষ্ঠান নাই, যে স্থলে দয়া পবিত্রতা ও আত্মত্যাগ দেখা যায় না, সেখানে হয় ত ক্ষমতা থাকিতে পারে, কিন্তু সেখানে প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা নাই। প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা সমগ্র জগৎকে জ্ঞানালোকে আলোকিত করে এবং জনসমাজে একটি মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপিত করে।

আধ্যাত্মিক জীবনের পথ সহজ ও সুগম এরূপ আশা করা বৃথা; কারণ পুনঃ পুনঃ চেষ্টা ব্যতিরেকে এবং নিয়ত বিফলমনোরথ না হইয়া আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করা যায় না। অদম্য ও দুঃসাহসিক অধ্যবসায় ব্যতীত কর্ত্তব্যের পন্থা লাভ করা অসম্ভব। সত্যের ও ন্যায়ের পথে চলিতে বাসনা করিলেই আমরা নিশ্চয়ই উহা জানিতে পারিব, যে কোন প্রকার কষ্টদায়ক পন্থা দিয়া যাই না কেন, তাহাতে বড় আসে যায় না। প্রত্যেক দিন নিত্য দৈনিক জীবনে ন্যায়ের পথে চলিতে অভ্যাস করা চাই; তাহা হইলে যেমন আমরা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকিব, ততই আমরা আরও পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারিব।

অনেকে আধ্যাত্মিক জীবনে সহায়তার জন্য গুরুর অনুসন্ধান করেন

এবং সদ্‌গুরু নির্ব্বাচন করিতে পারেন না। সুতরাং দুই একটী কথা এ বিষয়ে বলা আবশ্যক। কি কি লক্ষণের দ্বারা সদ্‌গুরু জানা যায়, এবং যে আধ্যাত্মিক জীবন আমাদের অনুকরণীয়, সাধন যোগ্য ও জগতে দৃষ্টান্ত স্বরূপ এবং আলোকপ্রদ তাহা কিরূপ? সে আধ্যাত্মিক জীবনে কে কত উন্নতি সাধন করিয়াছে তাহা পরীক্ষা করার উপায় কি তাহা দেখা যাউক।

আধ্যাত্মিকজীবনে যে কেহ উন্নতি সাধন করিয়াছেন এবং সাধন মার্গে অগ্রসর হইয়াছেন এবং গুরু পদার্হ এবং অন্যের সহায়তা বা শিক্ষা প্রদান করিতে সক্ষম, তাহার প্রমাণ এই যে সাধক যে গুণগুলি নিজের জীবনে সাধনা করিতে চেষ্টা করিতেছে সে গুলি তাঁহাতে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। শিষ্য যে গুলি অসম্পূর্ণ ভাবে সাধন করেন, গুরু সে গুলি সম্পূর্ণ ও বিশিষ্ট রূপে সাধন করেন। শিষ্য যে গুলি সাধন করিতে প্রয়াস করিতেছে, গুরু তাহারই আদর্শরূপে অবতীর্ণ। এক্ষণে আধ্যাত্মিক জীবন কোন্ গুণ গুলির দ্বারা নির্ণয় করা যায় দেখা যাউক।

আমরা চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাই যে সমগ্র মানব, কি স্ত্রী কি পুরুষ, সকলেই জ্ঞানালোক পাইবার জন্য ব্যগ্র ও বিশেষ চেষ্টিত। কিন্তু সকলেই প্রকৃত পথ না পাইয়া বিপন্ন, হতবুদ্ধি ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া যান।

আমারা যাহাদের সংস্পর্শে আসি, তাহাদের সকলের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য আছে। তাহা না হইলে তাহারা আমাদের জীবন স্রোতে আসিয়া কেন মিশিবে? এ পৃথিবী আকস্মিকতা বা যদৃচ্ছা দ্বারা নিয়মিত হয় না; আমাদিগের জীবনে কোন কার্য্যই উদ্দেশ্য বিহীন ও অসংলগ্ন নহে। কর্ত্তব্যের অর্থ এই যে সকলের প্রতি আমাদের যে ঋণ আছে তাহা পরিশোধ করা। আমাদের পরিচিত ব্যক্তিগণের প্রতি নিশ্চয় কোন না কোন কর্ত্তব্য আছে। প্রত্যেকের প্রতি এ কর্ত্তব্য কি? এ ঋণ সাধারণতঃ ত্রিবিধ। গুরুজনকে মান্য করাই কর্ত্তব্য। সমস্থানীয় ব্যক্তিগণকে ভালবাসা ও স্নেহ করা উচিত এবং সাহায্য করা উচিত, কনিষ্ঠ ও অসহায়দিগকে দয়া বাৎসল্য ও উপকারই কর্ত্তব্য। এ গুলি সাধারণ বিশ্বজনীন ধর্ম্ম, এ গুলি পালন করিতে কাহারও পরাঙ্মুখ হওয়া উচিত নহে। এ গুলি সাধন না করিতে পারিলে আধ্যাত্মিক জীবন কখনই লাভ করা যায় না।

এমন কি ধর্ম্মশাস্ত্রে বিহিত কর্ম্মগুলিও যদ্যপি আমরা যথাযথ অনুষ্ঠান করি, এবং আমাদের সর্ব্ব প্রকার ঋণ (যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি তদ্দ্বারা যাহাদের সংস্পর্শে আসিয়াছি,—আত্মীয় স্বজনের প্রতি, সমাজের প্রতি, সমগ্র জাতির প্রতি) পরিশোধ করি তথাপি আমাদের ইহা অপেক্ষা আর একটি গুরুতর ধর্ম্ম আছে। সেটী আমাদের পথ প্রদর্শক আলোকের ন্যায় বলিলেও চলে। যদি কেহ ঘটনাচক্রে আমাদিগের সংস্পর্শে আসিয়া পড়ে তবে যখন সে আমাদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ করিবে, তখন যেন আমাদিগের নিকট থাকাতে কিছু না কিছু উন্নত হইয়াছে এটা দেখা যায়। যেমন আসিয়াছিল পরিত্যাগ কালীন যেন অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে, এটা দেখা উচিত। যদি কোন অজ্ঞ ও জ্ঞানহীন ব্যক্তি আমাদের মধ্যে আসিয়া পড়ে তবে যেন আমাদিগের নিকট থাকিয়া অপেক্ষাকৃত জ্ঞান লাভ করে ও অনেক বিষয় যদ্বিষয়ে সে পূর্ব্বে অজ্ঞ ছিল—তাহারই অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে। যদি কোন শোকসন্তপ্ত হতভাগ্য ব্যক্তি আমাদিগের মধ্যে আসিয়া পড়ে তবে তাহার দুঃখের ও শোকের ভাগী হইয়া যেন আমরা তাহার দুঃখভার কতটা লাঘব করিতে পারি। যদ্যপি কোন অসহায় দুর্ব্বল ব্যক্তি আমাদের মধ্যে আসে তবে আমাদের অহঙ্কার ও দর্পে তাহাকে পদানত না করিয়া তাহাকে আমাদিগের বলে বলীয়ান করিতে কুণ্ঠিত না হই। সর্ব্বত্রই আমাদের নম্রস্বভাব ও ধীর সহিষ্ণু এবং সকলের সহায় হওয়া আবশ্যক। আমরা আমাদের দৈনিক জীবনে যেন কাহারও সহিত কটু ব্যবহার না করি; অন্যকে আমাদিগের ব্যবহারে উদ্বেলিত না করি। এই পৃথিবীতে লোকের দুঃখের অবধি নাই; অতএব দুঃখের বোঝা আর বাড়াইয়া লাভ কি? ধার্ম্মিক লোককে সকলের সুখ সচ্ছন্দতা ও শান্তির আকর হওয়া আবশ্যক। তাঁহাকে এই অন্ধকারের মধ্যে একটী উজ্জ্বল আলোকের ন্যায় হওয়া চাই, পথহারা পথিক যেন তাঁহার দীপ্ত ও জ্যোতির্ম্ময় আলোকের নীচে আসিলে নির্ভয়ে গন্তব্য পথে চলিতে পারে। আমাদিগের আধ্যাত্মিকতা কি পরিমাণে হইয়াছে তাহার বিচার করিতে হইলে জগতের উপর কি প্রভাব হইয়াছে, কি উপকার করিয়াছি তাহা দেখা উচিত, নচেৎ স্বার্থপরতা বৃদ্ধি করার নাম আধ্যাত্মিকতা নহে। সুতরাং

জগৎকে আমাদের বাস হেতু অপেক্ষাকৃত পবিত্র, উন্নত ও সুখময় করিয়া যাইতে পারি, তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত।

পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য না করিলে, পরস্পর পরস্পরকে ভাল না বাসিলে, পতিতকে উদ্ধার না করিলে আমরা সংসারে কি জন্ত আসিয়াছি? ধার্ম্মিক লোক কি অপরের উন্নতির পথে বাধা দিবেন—না উন্নতির সহায়তা করিবেন? তিনি জগতের উদ্ধারকর্ত্তা না হইয়া কি অপরের উন্নতিপথে কণ্টক হইবেন এবং লোকে তাঁহার নিকট হইতে নিরুৎসাহিত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইবে? তোমার দ্বারা লোকের মনে কি ভাবের উদ্রেক হয় তাহা দেখিও; তোমার বাক্যাবলী তাহাদের জীবনে কিরূপ কার্য্য করে দেখিও। সর্ব্বদা প্রিয়, মধুর ও নম্র বাক্য কহিবে; সে রসনা আধ্যাত্মিক জীবনের উপাধি হইবার জন্ত চেষ্টা করিতেছে, তদ্দ্বারা যেন তুচ্ছ গল্প, রূঢ় বাক্য ও অপরের প্রতি সন্দেহজনক উক্তি না বাহির হয়। সাধনমার্গ আমাদের নিজের দোষেই কঠিন বলিয়া বোধ হয়; এবং বাহিরে দোষ তত নহে যত আমাদের ভিতরের। কেবল মাত্র নিজের চেষ্টাতে আমাদিগের দৈনিক জীবন ও আচার ব্যবহার পরিমার্জ্জিত করিলে আধ্যাত্মিক জীবনলাভ সম্ভবপর হয়। তোমার ভ্রাতৃগণকে সাহায্য কর; তাহাদিগের প্রতি কঠোর ব্যবহার করিও না। যখন তাহারা পথচ্যুত ও পতিত হইতেছে তখন তাহাদিগকে উত্তোলন কর। ইহা ভাবিও না যে, তোমার পতন নাই। আজ তুমি দাঁড়াইয়া আছ, হয়ত কাল তোমার পদস্খলন হইতে পারে এবং তখন তুমি অন্যের সাহায্য ভিন্ন উঠিতে পারিবে না।

সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে ভগবানকে অসীম দয়ার সাগর বলে। সুতরাং তাঁহার প্রিয় হইতে হইলে ধার্ম্মিক ব্যক্তিরও দয়ার্দ্রচিত্ত হওয়া আবশ্যক। যে দয়াময়ের দয়াতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ডুবিয়া আছে, আমরা আমাদের ক্ষুদ্র যোগ্যতানুসারে তাঁহার যত ক্ষুদ্র অংশ হই না কেন, এক বিন্দু দয়ার কণা কি ভ্রাতৃগণকে দিতে পারি না? তোমার আপনার ভ্রাতাকে সাহায্য করিলে, বা আপনার অভাবকে ভ্রাতার অভাবের পশ্চাৎ পূরণ করিলে, কখনই দোষের কার্য্য বা অন্যায় হইতে পারে না।

এই ভাবের নামই এবং কেবলমাত্র ইহাই, প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা, এবং

আমরা পূর্ব্বে যে বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছিলাম তাহাতেই পুনরায় উপনীত হইলাম। সকলের ভিতর একই আত্মা বিরাজমান ইহা উপলব্ধি করার নাম প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা। ধার্ম্মিক কেবলমাত্র পরহিতব্রত লইলেই যথেষ্ট হইবে না। বিশ্বে যে সকল জীব বা প্রাণী আছে তাহাদিগের সহিত একতা অনুভব করিতে হইবে। এ পৃথিবীতে এক ছাড়া অন্য বা অপর কিছু নাই। আমরা সকলেই এক। "একমেবাদ্বিতীয়ম্।" যাহা কিছু বিভিন্নতা দেখিতেছি ইহা একেরই রূপান্তরমাত্র। একই আত্মা সকলকে অনুপ্রাণিত করিতেছে এবং সকলের ভিতর বিরাজমান।

পরমদয়াল প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ গীতায় পাপী ও পুণ্যবানের সম্বন্ধে কি মত প্রকাশ করিয়াছেন একবার শ্রবণ কর—

"যদ্যপি অতিশয় ঘোর পাপী আমাকে অনন্যমনে ভজনা করে তাহাকে ধর্ম্মাত্মা মনে করিতে হইবে, কারণ সে যথার্থ বুঝিয়াছে। সে অচিরে ধর্ম্মাত্মা হইবে এবং চিরশান্তি প্রাপ্ত হইবে। হে কৌন্তেয়! নিশ্চয় জানিও আমার ভক্তের বিনাশ নাই।"

অতএব দৃঢ় নিশ্চয় হইয়া একটা ঠিক কর এবং একবার ঠিক করিলে আর ভীত হইও না। হয় ত তোমার ভ্রম হইবে, বার বার পতন হইবে; কিন্তু অচিরে তুমি ধর্ম্মাত্মা হইয়া পরমশান্তি লাভ করিবে।

অতএব ভগবচ্চরণে আমরা আত্মসমর্পণ করি; তাঁহাতে আমাদের একতা অনুভব করা চাই; সেজন্য পরস্পরের সহিত আমাদের একতা বোঝা চাই। যদ্যপি আমরা দুর্ব্বল ও ভ্রান্ত, তথাপি যখন আমরা স্থির নিশ্চয় করিয়াছি তখন সত্যস্বরূপ ভগবানের সত্যবাক্যেই আমাদের আশ্বাস স্থল এবং আমরা নিশ্চয়ই অচিরে ধর্ম্মাত্মা হইয়া পরমশান্তি প্রাপ্ত হইব। (ক্রমশঃ)

শ্রীশিশির কুমার ঘোষাল, এম. এ।

ইস্‌লামীয় তত্ত্ববিদ্যা।

ইস্‌লাম ধর্ম্মোক্ত তত্ত্ববিদ্যা ও অন্যান্য প্রকার তত্ত্ববিদ্যার মধ্যে প্রভেদ দেখান আমাদের এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। বস্তুতঃ এরূপ কোন প্রকারের চেষ্টার একমাত্র পরিণাম বিফল প্রয়াস। কারণ তত্ত্ববিদ্যা সকল ধর্ম্মের একমাত্র সঞ্জীবনী শক্তি। ইহা কোন অনুষ্ঠান পদ্ধতি অথবা কোন বিশিষ্ট ধর্ম্ম মত বা প্রক্রিয়া বিশেষ বা কোন বিশ্বাস নহে যাহা দ্বারা ইহাকে অন্য ধর্ম্ম হইতে প্রভেদ করা যাইতে পারে। অধুনা অনেকে তত্ত্ববিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যাকে একটি সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ ধর্ম্মবিশেষে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। যেমন আমরা অনেকে ব্রহ্মবিদ্যাকে হিন্দুধর্ম্মের রূপান্তর বলিয়া মনে করি, তদ্রূপ ইউরোপেও ইহাকে খ্রীষ্টধর্ম্মের সার বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার অনেকে চেষ্টা করিতেছেন। বর্ত্তমান মানবের ভেদযুক্ত বুদ্ধিতে এ প্রকার ভ্রম হওয়া কিছু বিচিত্র নহে; সেই জন্য প্রত্যেক থিওসফিষ্ট বা তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তির এই অসীমা সর্ব্বধর্ম্মের সারভূত ব্রহ্মবিদ্যা বা অধ্যাত্ম বিদ্যাকে ও এই বিদ্যার আশ্রয়ভূত অনন্ত জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষকদিগকে সংকীর্ণ ও সসীম করিবার চেষ্টা হইতে সাধ্যমতে রক্ষা করা উচিত।

ধর্ম্মের সহিত তত্ত্ববিদ্যার সম্বন্ধ আলোচনায় দেখা যায় যে, বিজ্ঞান গ্রহ নক্ষত্রাদির সহিত গ্রহ নক্ষত্রাদির মধ্যস্থ "ইথার" নামক বায়বীয় পদার্থের যে সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন, তত্ত্ববিদ্যার সহিত ধর্ম্মেরও প্রায় সেই সম্বন্ধ বলা যাইতে পারে। ইহাই সেই পুরাতন সনাতন মার্গ। এই মার্গ অবলম্বনে ও এতৎ সম্বলিত বিশ্বব্যাপী প্রজ্ঞার সাহায্যে সকল ধর্ম্মের সাধুব্যক্তিগণ সেই অনন্ত সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বদ্রষ্টা পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন। এই ক্ষুরধারবৎ সংকীর্ণ সুকঠিন মার্গ অবলম্বন করিবার জন্য স্বীয় ধর্ম্মোক্ত দেবতাদি অবলম্বন করিয়া অল্পে অল্পে ক্রমোন্নতির সহিত আত্মজ্ঞান প্রসারিত করিয়া অবশেষে মূলতত্ত্বে উপনীত হয়েন। সাধন অবস্থার প্রথমে সাধকের এই মহামার্গের বিশিষ্ট জ্ঞান না থাকিলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না; কারণ তাঁহারা স্বীয় ধর্ম্মের অভ্যন্তরস্থ ওতপ্রোতভাবেস্থিত এই মহাবিদ্যার আশ্রয়েই পরিণামে পরম ফল প্রাপ্ত হয়েন। মানবশিশুর চলিতে শিখিবার সময় যেমন মাধ্যাকর্ষণ

শক্তির অস্তিত্ব বুঝিবার আবশ্যক হয় না, অথচ তাহার প্রত্যেক চেষ্টাই তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার অনমুভূত মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা নিয়মিত হয়, তদ্রূপ শিশুমানবও স্বধর্ম্মে আস্থা স্থাপনপূর্ব্বক জীবন গঠন করিতে প্রয়াস করিলে তাহার অনমুভূত অথচ সর্ব্বক্ষণে বর্ত্তমান এই ব্রহ্মবিদ্যা তাহার চেষ্টাকে নিয়মিত ফলপ্রদ করে। এক সময়ে লোকের তাড়িত সম্বন্ধীয় জ্ঞান অতি অল্পই ছিল। তখন লোকের জ্ঞান ছিল, যে টেলিগ্রাফের তারই তাড়িৎ সঞ্চালনের আধারভূত অত্যাবশ্যক একমাত্র পদার্থ। তাড়িত সঞ্চালনের নিমিত্ত ইথার নামক সূক্ষ্ম পদার্থের যে বিশেষ আবশ্যক তাহা অনেকেরই জানা ছিল না। ইথার সম্বন্ধে মানবের কোন জ্ঞান না থাকিলেও বাস্তবিক পক্ষে ইথারই তাড়িত সঞ্চালনের আধার ছিল; এবং তারের অভ্যন্তরস্থ প্রচ্ছন্নভাবে স্থিত এই ইথারই তখনও তাড়িত সঞ্চালনের পক্ষে একমাত্র পদার্থ ছিল। ইথার সম্বন্ধে অজ্ঞান দূর হইবার পূর্ব্বে ইথার যে ছিল না এবং ইথারের সাহায্য ব্যতীত তাড়িত সঞ্চালনের জন্য অন্য কোন প্রকার অদ্ভুত পদার্থ ছিল এ কথা কেহ বলিতে পারে না। যেমন ইথার আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বেই এই ইথারই তাড়িত সঞ্চালনের একমাত্র আধার ছিল। তদ্রূপ বিশিষ্ট ধর্ম্মের সাধক সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়কারিণী এই পরাবিদ্যার অস্তিত্ব স্বীকার না করিলেও বাস্তবিক পক্ষে এই বিদ্যার সাহায্যে তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়। এই বিংশ শতাব্দীর উন্নতিশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে, যে সূক্ষ্ম উপায় দ্বারা বহির্জ্জগতের পদার্থ সমূহের সংস্পর্শ বা আঘাত দ্বারা জাত শারীরিক স্পন্দন, মস্তিষ্ক পরমাণুতে সংক্রামিত হইয়া বহির্জগতের পদার্থের জ্ঞান উৎপাদন করে, ইহা কয়জন লোকের জানা আছে? অথচ তাহা বলিয়া কি আমাদের বহির্জ্জগতের জ্ঞান হয় না? স্নায়ুমণ্ডল নির্ম্মাণকারী অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণু সকলের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে স্থিত এবং পরস্পরের সংহননকারী স্থূল স্পন্দনকে সূক্ষ্মরূপে পরিণত করিবার আধারভূত ইথার নামক সূক্ষ্ম পদার্থের বিষয় কয়জন লোকের জানা আছে? অথচ প্রত্যেক মুহূর্ত্তে লক্ষ লক্ষ স্থূল স্পন্দন, মস্তিষ্ক পরমাণুতে সূক্ষ্মরূপে পরিণত হইতেছে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধেও এইরূপ। জগতের বিশিষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীগণ, থিওসফি বা ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা প্রমাণিত আধ্যাত্মিক ভাব, শক্তি ও নিয়মাবলীর সাহায্যে

যথার্থ সত্যে উপনীত হন। এই মার্গ দ্বারা যখন গন্তব্য স্থানে উপনীত হওয়া যায়, তখন ইহার অস্তিত্বের জ্ঞান না থাকিলেও বিশেষ কোন ক্ষতির বিষয় নাই। যিনি সত্য লাভের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন তিনিই সত্য লাভ করিয়া থাকেন। যিনি অলসভাবে অপেক্ষা করেন, তিনি কদাচ সত্য প্রাপ্ত হন না। সেই জন্যই আমরা দেখিতে পাই প্রত্যেক ধর্ম্মের ভক্তগণ, প্রেমের ও শান্তির আকর ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইবার জন্য তাঁহার প্রতিনিধিরূপে জগতে প্রেম ও শান্তি বিস্তার করিবার জন্য বিশেষরূপে লালায়িত ও ব্যগ্র। এই প্রকারের সাধকেরা থিওসফি শব্দ তাঁহাদের সীমাবদ্ধ ধর্ম্মের ভিতরে নাই বলিয়া এবং ইহার শিক্ষা বিপরীত বলিয়া ইহাকে গ্রহণ করিতে চাহেন না। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীগণ সম্বন্ধে আমরা এইরূপ জানি, এবং স্থূলদর্শী মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বীগণ সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ। ইসলাম ধর্ম্ম প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মবিদ্যার ভাবে ও শিক্ষায় পরিপূর্ণ। কিন্তু ইস্‌লাম ধর্ম্মের অধ্যাত্ম শিক্ষায় অশিক্ষিত স্থূলদর্শী মুসলমানদিগের নিকট হইতে তাহার কোন আভাস পাওয়া যায় না। একটু ভিতরে প্রবেশ না করিয়া কেবলমাত্র উপর উপর দেখিলে ধর্ম্মের গূঢ় প্রচ্ছন্ন সত্য সকল আবিষ্কার করা যায় না।

তত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণ প্রথমে দেখিয়া মনে করেন যে, ইস্‌লাম ধর্ম্মে তাঁহাদের শিক্ষা করিবার কিছুই নাই। কিন্তু একটু অনুসন্ধান করিলেই তাঁহাদের এই ভ্রম দূর হইয়া যায়। পাশ্চাত্য প্রদেশে ইস্‌লাম ধর্ম্ম এত অল্প লোকে জানে এবং যে টুকু জানে সে টুকু এত ভ্রমাত্মক বা ভ্রমপরিপূর্ণ যে, ইস্‌লাম ধর্ম্মের যথার্থ সৌন্দর্য্যে তাঁহারা অনভিজ্ঞ বলিয়া তাঁহাদের দোষ দেওয়া যায় না। কারণ গত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া এখানে খ্রীষ্টান মিশনরিগণ সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের নিগূঢ় তথ্য সকল বুঝিতে না পারিয়া ভ্রমপ্রমাদময় চক্ষে পুরাণ ও বেদাদি পাঠ করিয়া জগতের চক্ষে সনাতন হিন্দু ধর্ম্মকে হেয় করিতেছেন। মুসলমান ধর্ম্মের পক্ষেও তদ্রূপ। বস্তুতঃ টমাস কার্লাইলের অগ্রে কোন ব্যক্তি মহম্মদ ও তাঁহার ধর্ম্মের সাপক্ষে একটি কথা বলিতে সাহস করেন নাই। তাঁহার এই পুস্তকের জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। এখনও পর্য্যন্ত ইউরোপে মহম্মদ ও তাঁহার ধর্ম্ম বিষয়ের জ্ঞান অতি সংকীর্ণ। এখনও পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে সনাতন ধর্ম্ম বা সত্যের একাংশ বা একটি ভাব প্রকাশকারী খ্রীষ্টান

ধর্ম্মে এরূপ অদ্ভুতভাবে প্রচার করা হয় যে, সত্যের অপর একভাব প্রকাশকারী অন্য ধর্ম্মাবলম্বীগণকে প্রেমের চক্ষে না দেখিয়া হিদান বা পৌত্তলিক বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। বাস্তবিক পক্ষে মিশনরি বা তৎপৃষ্ঠপোষক ওরিয়াণ্টালিষ্টগণ বুঝেন না যে, মানব বাস্তবিক পক্ষে একই ভগবানের অংশ; এবং মিশর দেশে ও নামে সাইরিস্ মানব যাঁহাকে পাইতে চেষ্টা করে, হিন্দুস্থানে ভগবান্‌রূপে যিনি ভক্ত হৃদয়কে মাতাইয়া দেন, মুসলমান ধর্ম্মে আল্লারূপে যিনি মানবকে আকর্ষণ করেন, তিনিই খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রতিপাদ্য গড্ বা ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কেহ নহেন। মানবের মূল একতা নিবন্ধন মানবের আধ্যাত্মিক চেষ্টাও মূলতঃ একইরূপে প্রকাশ পায়। আমরা ইহাও জানি যে, এই হিদানদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য খ্রীষ্টপ্রচারক দিগকে বহু ব্যয়ে দেশ বিদেশে পাঠান হইয়া থাকে; এবং ইউরোপের নরনারীগণ আপনাদের দেশে দুঃখপ্রপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে এক কপর্দ্দক ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন, কিন্তু আফ্রিকার বর্ব্বর জাতিগণকে মদ ও খেলানার লোভ দেখাইয়া খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য প্রত্যেক বৎসর লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়া থাকে।

ইস্‌লাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে সাধারণ লোকের ধারণা এই যে, ইহা অতি নীচ জাতীয় ধর্ম্ম, এবং অদৃষ্টবাদ, বহুবিবাহ ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় সংমিশ্রণ মাত্র। এই ধর্ম্মে মৃত্যুর পরে স্ত্রীলোকের মুক্তি অস্বীকার করে। এবং এই ধর্ম্মে এই ধর্ম্মাবলম্বীগণকে বিধর্ম্মীদিগকে সমূলে উচ্ছেদপূর্ব্বক প্রতিহিংসা লইতে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহাতে সকল রকমের দাসত্ব অনুমোদন করে; এবং ইহার ভক্তগণকে স্বর্গে পার্থিব সুখভোগের প্রলোভন দেওয়া হইয়া থাকে। বাস্তবিক উপরোক্ত ভাবগুলি সত্য নহে। এক ধর্ম্মের স্থূলদর্শী পৃষ্ঠপোষকগণ অপর ধর্ম্মের মিথ্যাত্ব প্রমাণ করিবার জন্য এইরূপ করিয়া থাকেন। কিন্তু সকল ন্যায়বান্, পক্ষপাতশূন্য ব্যক্তিগণ যাঁহারা মুসলমান রাজত্বে বসবাস করিয়াছেন এবং দিন দিন ইহার কলেবর বৃদ্ধি দেখিতেছেন, তাঁহারা জানেন যে, অন্যান্য বড় বড় ধর্ম্মের বহিরঙ্গ ভাবের ন্যায় ইহার বহিরঙ্গ ভাবও একরূপ। মুসলমানেরা খ্রীষ্টান অপেক্ষা অধিক ভক্তিমান্। ইহারা স্ত্রীলোকদিগের প্রতি কুব্যবহার করে না এবং স্ত্রীলোকদের মুক্তি

স্বীকার করে। মুসলমান সমাজ পৃথিবীর যাবতীয় সমাজ অপেক্ষা মিতাচারী বা পানভোজনে সংযমী। বলপূর্ব্বক ইস্‌লাম ধর্ম্মের বিস্তার একেবারে নিষিদ্ধ এবং ইহাতে দাসত্ব অনুমোদিত নহে। দাসব্যবসায়ীরা ইহা জানিয়া মুসলমান ধর্ম্ম তাহাদের রক্ষিত আফ্রিকাদেশ সকলে প্রচারিত হইলে তাহাদেরই উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া, যাহাতে তথায় মুসলমান ধর্ম্ম না প্রচার হইতে পারে তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকে। সে সময়ে দেশ লাম্পট্য ও কুরীতিতে পরিপূর্ণ। তখন মহম্মদ তাহা হইতে দেশ রক্ষা করিবার জন্য সময়ে সময়ে বহুবিবাহ অনুমোদন করিলেও ইহার এক্ষণে আর সেরূপ আদর নাই। বাস্তবিক এই বহুবিবাহ সভ্য পাশ্চাত্য দেশ-সমূহের আইনানুমোদিত লাম্পট্য, গোপনে বহুবিবাহ ও এক স্ত্রীর বহুপুরুষ গমন অপেক্ষা শতাংশে শ্রেয়ঃ। সভ্যতার চরম সীমায় উপনীত ইউরোপে আজও ধর্ম্মশাস্ত্রের শব্দমাত্রের উপরে প্রতিষ্ঠিত যীশুর সশরীরে পুনরুত্থান ও একজনের শাস্তিতে অন্য লোকের পাপের নাশ প্রভৃতি মতগুলি লোককে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে কোরাণের শব্দমাত্র বা কদর্থের উপর প্রতিষ্ঠিত স্বর্গে পার্থিব সুখভোগের শিক্ষার উপর আর সেরূপ বিশ্বাস নাই।

বাস্তবিক বর্ত্তমান প্রচলিত ইস্‌লাম ধর্ম্ম ও পূর্ব্বের ইস্‌লাম ধর্ম্ম—এ উভয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ। এই ইস্‌লাম ধর্ম্ম এক কালে চীন হইতে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এককালে ইহার স্পেনদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয় সকল জগতের বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্রস্থান ছিল। তখন এই ধর্ম্মসম্প্রদায় সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত শিল্পী, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক নরনারীতে পরিপূর্ণ ছিল। মুসলমানদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চ্চা অনেক বেশী থাকায় তাঁহারা অনেক নূতন সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই সকল আবিষ্কারের দ্বারা জগতের ও আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ইহাদের অভ্যুদয়ের চরমসীমা হইতে আধ্যাত্মিক অবনতির সূত্রপাত হয়। তখন কেবল স্থূল পার্থিব সুখভোগের জন্য অত্যাচারী ও লোভী হওয়ায় রোমের ন্যায় এই প্রভূতবলশালী ইস্‌লামেরও পতন হইল। কিন্তু প্রকৃত ইস্‌লাম ধর্ম্ম যেমন তেমনই আছে। বর্ত্তমান মুসলমান ধর্ম্মাচার্য্যের

মধ্যে মহম্মদের সেই পবিত্র ভাব না থাকিলেও, ইস্লাম ধর্ম্মের কোন ক্ষতি হয় নাই; এবং বর্ত্তমান মুসলমান প্রধান দেশ সকলে এই ধর্ম্মের পুনর্জ্জীবনের চিহ্ন সকল প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাতে বোধ হয় যে মুসলমান ধর্ম্ম পুনর্ব্বার একটী প্রবল ধর্ম্মের মধ্যে গণ্য হইবে।. ইহা সত্য হইলে তত্ত্ববিদ্যার ছাত্র থিওসফিষ্টেরা জানেন যে, অন্যান্য ধর্ম্মের পুনরুদ্দীপনের জন্য ঋষিদের সে অবিচলিত দৃষ্টি রহিয়াছে ইহার উপরও তাঁহাদের সেই দৃষ্টি রহিয়াছে। এই দৃষ্টির ফল এক্ষণে মুসলমান ধর্ম্মে দেখা যাইতেছে। সেই জন্য সেই অভ্রান্ত ঋষিগণের দৃষ্টির নিদর্শনস্বরূপ ইস্লাম ধর্ম্মের উন্নতির সহিত আমরা তত্ত্ববিদ্যার জ্ঞানের প্রকাশ দেখিতে পাইতেছি। মিথ্যা ভাব সকল হইতে প্রত্যাবৃত্ত প্রত্যেক মুসলমান সাধকের হৃদয়ের আবেগে সেই ঋষিপ্রসূত অজ্ঞাননাশকারী পরাবিদ্যারূপ জ্ঞানের বিমল পাবনীশক্তি দেখিতে পাই। তাহা হইলে শ্রমশীল তত্ত্ববিদ্যার ছাত্রদিগের পক্ষে ইস্লাম ধর্ম্মে আলোচনা করিবার প্রচুর বিষয় আছে দেখিতে পাওয়া যায়। ইস্লাম শব্দার্থ যখন ভগবানে আত্মসমর্পণ, তখন এই ধর্ম্মে ব্রহ্মবিদ্যা বা আত্মবিদ্যার অভাব থাকিতে পারে না। ইস্লাম ধর্ম্ম এক সময়ে কত উন্নত পদবীতে আরূঢ় তাহা আমরা দেখিয়াছি এবং ইহার পতনও আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। একদিকে ভক্ত মুসলমান হৃদয়ে ইস্লামের জীবনীশক্তির সঞ্চরণে; অপর দিকে বাহ্য সৌন্দর্য্যে আসক্ত নামমাত্র আখ্যাধারী মুসলমানদিগের মধ্যে ইস্লাম ধর্ম্মের বহিরঙ্গের অত্যাসক্তি বশতঃ, উক্ত ধর্ম্মের অন্তরঙ্গরূপ সেই জীবনীশক্তির পুনরাগমনে উক্ত ধর্ম্মের পুনোরুত্থানের আশা হইয়াছে।

তবে ইস্লাম ধর্ম্মের প্রতিনিধিগণের মধ্যে অনেকে যে ইহাকে কেবলমাত্র বহিরঙ্গবিশিষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন তাহা কি সত্য? ইহার কি কোন অন্তরঙ্গ কিছু নাই? যেরূপ যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে নির্ব্বাচিত কতকগুলি শিষ্যকে, সাধারণ লোকের নিকট প্রকাশের অযোগ্য সুতরাং গুহ্য, উক্ত খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কতকগুলি শিক্ষা দিয়াছিলেন, মহম্মদ কি সে প্রকার কোন শিক্ষা দেন নাই? আমরা ইস্লাম ধর্ম্ম একটু গভীর ভাবে আলোচনা করিলেই দেখিতে পাইব যে, উক্ত শিক্ষা ইস্লাম ধর্ম্মে আছে এবং তাহাকেই বস্তুতঃ ইস্লামীয় তত্ত্ববিদ্যা বলা যাইতে পারে। ইস্লাম

ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব বুঝিতে হইলে এই বহুধাব্যাপ্ত ইস্‌লাম ধর্ম্ম যে তিন ভাগে বিভক্ত তাহা বুঝিতে হইবেক। ইসলাম, ইমান্‌ ও ইষাণ—এই তিন ভাগে ইহাকে নিয়মিতরূপে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এই ধর্ম্ম সম্বন্ধে মতামত যে ধর্ম্মে ব্যাখ্যাত হয় তাহার নাম ইস্‌লাম। ইহাই এই ধর্ম্মের বহিরঙ্গপ্রকাশক, এবং ইহার উপরই সমস্ত আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া স্থাপিত রহিয়াছে। ন্যায় বা তর্কাংশের নাম ইমান্‌, এবং দর্শনাংশের নাম ইষাণ।

বস্তুতঃ মুসলমান ধর্ম্মের যে অংশ সাধারণ লোকের হৃদয়গ্রাহী তাহার নাম ইস্‌লাম। মুসলমান ধর্ম্মকে বাহির হইতে দেখিবামাত্র যাহাতে ইহা লোকের হৃদয়গ্রাহী হইয়া ইহার উপরে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হয়, তাহার জন্য উক্ত ধর্ম্মের এই অংশটুকু বাহ্যাড়ম্বর ও প্রক্রিয়া পদ্ধতির বিবরণে পরিপূর্ণ। মুসলমান ধর্ম্ম এইরূপে তিন ভাগে বিভক্ত বলিয়াই ইহা তত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের আলোচ্য বিষয় হইয়াছে। ইস্‌লাম ধর্ম্ম এ প্রকার সুচারুরূপে স্তরে স্তরে বিভক্ত ও গঠিত যে, ইহার ভক্তগণ তাঁহাদের ক্রমোন্নতির সহিত ইহার সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর স্তরে প্রবেশ করিতে কোন প্রকার অভাব অনুভব করেন না। প্রথমতঃ কেবলমাত্র ধর্ম্মে বিশ্বাস ও যে উপায়ে এই বিশ্বাস বহির্জগতে ব্যবহৃত হইতে পারে তাহার নিয়মাবলী এবং এ অংশে বাহ্যাড়ম্বরের উপর লক্ষ্য রাখিয়া যে সকল উপায়দ্বারা উক্ত বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হয় তাহারই শিক্ষা। কিন্তু ইসলাম ধর্ম্মের মূলমন্ত্র ঈশ্বরের একত্ব। এই মূলতথ্য সর্ব্বদাই সাধকের সম্মুখে ধরা হইতেছে এবং তৎ সাহায্যে ও তদুপরি প্রার্থনা এবং অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে এবং আত্মার উন্নতি সাধনদ্বারা অন্তরঙ্গ ধর্ম্মের জ্যোতি হৃদয়ে প্রকাশিত হইবার যোগ্য হইলে দ্বিতীয় স্তরে যাইতে পারা যায়। এইরূপে এই ধর্ম্মাবলম্বীগণকে প্রথম শিক্ষার অভিজ্ঞতা লাভ করাইয়া দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষোপযোগী করা হয়। উপরোক্ত প্রকারে ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বীগণের ধর্ম্মে দৃঢ়বিশ্বাস এবং বাসনার নির্ম্মলতা সাধিত হইলে, তাঁহাদিগকে ন্যায় ও যুক্তির উপর যে এই ধর্ম্ম স্থাপিত তাহা নিজে বুঝিতে এবং অন্য লোককে বুঝাইবার যোগ্য করাইবার জন্য এবং তৃতীয় স্তরের অধিকারী করাইবার জন্য ইহার দ্বিতীয় স্তর—তর্কাংশ

বশিক্ষা দেওয়া হয়। অবশেষে বহিরঙ্গ শিক্ষার অতীত ধ্যান ধারণার দ্বারা প্রাপ্ত সনাতন সত্যকে লাভ করিবার উপযোগী তৃতীয় স্তরে বিশুদ্ধ দর্শনাংশ উপদিষ্ট হয়।

মুসলমান ধর্ম্মে এইরূপে আমরা একটী শিক্ষার সোপান দেখিতে পাই। ইহা সোপানের সর্ব্বোচ্চ ধাপের উপরস্থিত ব্যক্তির পক্ষে যেমন আবশ্যক, সোপানের সর্ব্বনিম্ন ধাপস্থিত ধীরে ধীরে নিশ্চিত পাদক্ষেপে আরোহণকারী ব্যক্তির পক্ষেও সেইরূপ। ইহাকে কি থিওসফি বা ব্রহ্মবিদ্যা বলে না? মহাত্মগণ কি এইরূপ শিক্ষা দিবার জন্যই উপদেশ দেন নাই? বাস্তবিক তাঁহারা ঐরূপ শিক্ষা দিয়াছেন। এবং এই ইস্লাম ধর্ম্মের ত্রিবিধ ভাবেই আমরা ইহার আবিষ্কারকর্ত্তার প্রজ্ঞা দেখিয়া অবিরামধারে জ্ঞান ও মঙ্গলের আধার সেই পরমকারণের চিহ্ন বা লক্ষণ দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে নমস্কার করি।

ইস্লাম ধর্ম্মের বহিরঙ্গ বিভাগে যখন আমরা এত তত্ত্ববিদ্যানুযায়ী শিক্ষা দেখিতে পাই তখন ইহার অন্তরঙ্গের শিক্ষায় আমরা সর্ব্বধর্ম্মের জীবনীভূত ব্রহ্মবিদ্যার নিদর্শন যে আরও প্রচুর পরিমাণে পাইব তাহার আর বিচিত্র কি? কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় অনেক মুসলমান এই অন্তরঙ্গ ভাবের অস্তিত্বও অস্বীকার করেন। কেহ কেহ অন্তরঙ্গ শিক্ষা একেবারে দেওয়া হয় নাই এই কথা বলেন। অন্যে ইহাকে অন্তরঙ্গ শিক্ষা বলিয়া অস্বীকার করেন এবং স্থূল পদার্থের অতীত কিছুই দেখিতে চাহেন না। প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকদিগকে কেবলমাত্র মুসলমান ধর্ম্মের শিশু বলা যায়। মনের সংকীর্ণতা দূর না হওয়ায় তাঁহারা আপনাপন ধারণার অতীত সত্য গ্রহণে অক্ষম। স্থূলদর্শী খ্রীষ্টধর্ম্ম যাজকের সহিত খ্রীষ্ট ধর্ম্মের যে প্রকার সম্বন্ধ, শেষোক্ত শ্রেণীর মুসলমানদিগের সহিত মুসলমান ধর্ম্মেরও সেই প্রকার সম্বন্ধ। লোককে ধর্ম্ম শিখাইবার ব্যবসা অবলম্বন করিয়া ইঁহারা আপনাদের উদরান্নের সংস্থান করেন। যেমন হিন্দুধর্ম্মে জাতিগত ব্রাহ্মণ ও তত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মণ এই উভয়ের মধ্যে সাধারণের চক্ষে ব্রাহ্মণ জাতিগত হইয়া পড়িয়াছে; ইসলাম ধর্ম্মের শিক্ষকেরাও কতকটা উক্ত শ্রেণীর শিক্ষক। হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্মের মধ্যে এই শ্রেণীর লোক প্রকৃত অধ্যাত্মজ্ঞানহীন হওয়ায় ধর্ম্মের জীবনীশক্তির অনুভবে

অক্ষম হইয়া কেবলমাত্র অনুষ্ঠান পদ্ধতি লইয়া ব্যাপৃত থাকেন। ইঁহারা ধর্ম্মের ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহার নিগূঢ় সত্য বাহির করা বহু আয়াস সাধ্য বলিয়া মনে করেন। বস্তুতঃ তত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের সেই অন্তর্দৃষ্টি ইঁহাদের না থাকায় ইঁহারা সুচারুরূপে সত্য আবিষ্কারে এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে উপদিষ্ট শব্দরাশির প্রকৃত অর্থ নিরূপণে অক্ষম। যে জ্ঞানচক্ষু লাভ করিলে সকল বস্তুর অন্তরতম স্তরে প্রবেশ করা যায় এবং যাহার সাহায্যে এই আপাত প্রতীয়মান বিভিন্নতা ও ভেদ জ্ঞানের মধ্যে একত্ববাচক পরম তত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, সে জ্ঞানচক্ষুর অভাব হইলে মানব স্বভাবতঃই বহিরঙ্গ হইয়া পড়েন। ইঁহারা ইঁহাদের কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অন্তদৃষ্টি শূন্য হইলেও আপনাদিগের অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। অন্ধ যেমন অপর এক দৃষ্টিহীনের পথ প্রদর্শক হইতে পারে না, ইঁহারাও সেইরূপ। ইসলাম ধর্ম্মের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থাই ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। সুখের বিষয় ইসলাম ধর্ম্মের সকল আচার্য্যই অধ্যাত্মজ্ঞান হীন নাহেন। মহম্মদ ১৩০৯ বৎসর পূর্ব্বে যে যথার্থ সত্যের প্রচার করিয়া গিয়াছেন ইঁহারা আজও সেই সত্য প্রচারে ব্যাপৃত এবং ইসলাম ধর্ম্মের পুনরুদ্দীপন ইঁহাদেরই হস্তে নিহিত।

হিন্দু দর্শন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বেদান্তসারের বঙ্গানুবাদে লিখিয়াছেন :—

"ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত কারণ হয়েন, যেমন ঘটের নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার হয়; এবং উপাদান কারণ হয়েন, যেমন সত্য রজ্জুতে যখন ভ্রম দ্বারা সর্প হয় তখন সেই মিথ্যা সর্পের উপাদান কারণ সেই রজ্জু হইয়া থাকে, অর্থাৎ রজ্জুকে সর্পাকারে দেখা যায়, আর যেমন মৃত্তিকা ঘটের উপাদান কারণ হয়, অর্থাৎ ঘটাকারে মৃত্তিকার প্রত্যক্ষ হয়।

"ব্রহ্ম আত্মসঙ্কল্পের দ্বারা আপনি আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত নামরূপের আশ্রয় হইতেছেন, যেমন মরীচিকা অর্থাৎ মধ্যাহ্ন কালে সূর্য্যের রশ্মিতে যে জল

দেখা যায় সেই জলের আশ্রয় সূর্য্যের রশ্মি হয়, বস্তুতঃ সে মিথ্যা জল সত্যরূপ তেজকে আশ্রয় করিয়া সত্যের ন্যায় দেখায়, সেইরূপ মিথ্যা নামরূপময় জগৎ ব্রহ্মের আশ্রয়ে সত্যরূপে প্রকাশ পায়। নাম আর রূপ যাহা দেখ, সে সকল কল্পনামাত্র, বস্তুতঃ ব্রহ্ম সত্য হয়েন, অতএব নশ্বর নামরূপের কোন মতে স্বতন্ত্র ব্রহ্মত্ব স্বীকার করা যাইতে পারা যায় না।

"বিবেক—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ইত্যাকার বিচার।" "যদ্যপিও ভগবান্ আচার্য্যের (শ্রীশঙ্করাচার্য্যের) কৃত ভাষ্যকে মোহের লিখিত করিয়া কহা সকলেরি দুষ্কৃতের কারণ হয় তথাপি বিশেষ করিয়া চৈতন্য দেব সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদিগের অত্যন্ত অপরাধজনক হইবেক, যেহেতু পূজ্যপাদ ভগবান্ ভাষ্যকারের (শ্রীশঙ্করাচার্য্যের) শিষ্যানুশিষ্য প্রণালীতে কেশব ভারতী ছিলেন, সেই ভারতীর শিষ্য চৈতন্যদেব হয়েন, আর শ্রীধরস্বামীও পূজ্যপাদ (শ্রীশঙ্করের) সম্প্রদায়ের শিষ্য শ্রেণীতে ছিলেন, তাঁহার কৃত গীতা প্রভৃতির টীকা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে কি অন্য সম্প্রদায়ে সর্ব্বদা মান্য এবং চৈতন্যদেবও ঐ টীকাকে মান্য করিয়াছেন, আর সেই শ্রীধরস্বামী স্বয়ং গীতার টীকাতে লিখেন যে ভাষ্যকারমতং সম্যক্ তদ্ব্যাখ্যাতৃগিরিস্তথা ইত্যাদি।"

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের তর্ক আত্মতৃপ্তিকর কি না, আত্মার সন্তুষ্টি দৃঢ়-বিশ্বাসজনক কি না তাহা সাধকগণ নিজ নিজ মনকে জিজ্ঞাসা করিবেন। এতৎসম্বন্ধে শ্রীজীব গোস্বামীর মত এইরূপ:—মায়া স্বতন্ত্রা বা স্বাধীনভর্তৃকা নহেন। শ্রীভগবান্ ব্যতীত মায়ার স্বতন্ত্র:অস্তিত্ব অসম্ভব। মায়া অন্ধ ও অচেতন, ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান, সৎ-চিৎ-আনন্দময়, সত্ত্বরজঃ-তম ত্রিগুণ ভগবানের অধীন ও কার্য্যসাধনের উপায়। এইরূপ অবস্থায় মায়া তাঁহাকে বশীভূত করিবে। তিনি মায়া কর্ত্তৃক উপহিত হইয়া জীবাত্মা হইবেন, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় ও অযৌক্তিক। পরব্রহ্ম এমন কি অপরাধ করিলেন যে হঠাৎ মায়াকর্ত্তৃক পরিভূত হইয়া অগণ্য জীবজন্তুরূপে অশেষ ক্লেশভোগের পাত্র হইবেন? আবার কোন্ পুণ্য-ফলেই বা জীবাত্মা রূপ পরিহার করিয়া পরমাত্মারূপ স্বরূপত্ব লাভ করিবেন? হঠাৎ এইরূপ অজ্ঞানতা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। শ্রীভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী পরমপুরুষ; জীব সত্ত্বরজস্তমগুণময় নিত্যবস্তু, কিন্তু ভগবান্ ও জীব স্বরূপতঃ

ও সামর্থ্যগতভাবে পৃথক্। পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্ব শব্দের অর্থ কি, আত্মা পরিচ্ছন্ন অর্থাৎ মায়ার আবরণে আত্মা আচ্ছাদিত হয়েন, আত্মার স্বরূপ প্রকাশ পায় না। অখণ্ড পরমাত্মা মায়ারূপ পরিচ্ছেদের দ্বারা আবৃত হইয়া খণ্ড জীবাত্মা হয়েন। কিন্তু আত্মার আবার খণ্ড, বিভাগ, হ্রাস, বৃদ্ধি কি? তাহা হইতেই পারে না। অপিচ, প্রতিবিম্ব শব্দের অর্থ এই যে—যেমন একই সূর্য্য ভিন্ন ভিন্ন জলাধারে প্রতিফলিত হইয়া বহুল সূর্য্যরূপে প্রতিভাত হয়, সেইরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম আধার ও উপাধিভেদে মায়াতে প্রতিবিম্বিত হইয়া দেব, মানব, পশু, পক্ষী, উদ্ভিদরূপে ক্লেশভোগ করেন। ইহা অযৌক্তিক। কারণ আত্মার আবার প্রতিবিম্ব কি? যদি উপাধিগত ভেদ প্রকৃত হয় তাহা হইলে "সোঽহং" জ্ঞান দ্বারা উপাধির নাশ হইয়া ব্রহ্মত্ব লাভ হইতে পারে না। কারণ শৃঙ্খলাবদ্ধ কয়েদীর যদি এমত জ্ঞান হয় যে, সে রাজা হইয়াছে, তথাপি তাহার শৃঙ্খল মোচন হয় না।

এই অচিন্ত্যাভেদাভেদবাদ বেদান্তদর্শনেই আছে। বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের বিংশতি সূত্র এই:—"প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেলিঙ্গং আশ্মরথ্যঃ।" আশ্মরথ্য বলেন—প্রথমে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল যে, আত্মা বিজ্ঞাত হইলেই সকল বিজ্ঞাত হয়; এখন যদি আত্মা দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, নিদিধ্যাসিতব্য, এই বাক্যের আত্মা শব্দ পরমাত্মা না হইয়া জীবাত্মা হয়েন, তাহা হইলে সেই প্রতিজ্ঞার হীনতা হয়। প্রথম প্রতিজ্ঞা এই ছিল:—"আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি"—আত্মা বিজ্ঞাত হইলে সকল বিজ্ঞাত হয়।

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তদীয় সহধর্ম্মিণী মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছেন:—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ, মৈত্রেয়ি! আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেন ইদং সর্ব্বং বিদিতং।" বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

যে আত্মা দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য, নিদিধ্যাসিতব্য কথিত হইলেন তাহা পরমাত্মা, জীবাত্মা নহেন। পরমাত্মাকে, জীবাত্মা দর্শন, শ্রবণ, মনন এবং ধ্যান করিবেন। যেমন মৃত্তিকাকে জানিলে সমস্ত মৃত্তিকা নির্ম্মিত পদার্থ জানা যায়, সেইরূপ পরমাত্মাকে জানিলে সমস্তই জানা যায়।

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার বক্তব্য বিষয় আরও স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন।

"যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি, তদিতর ইতরং

পশ্যতি, তদিতর ইতরং শৃণোতি, তদিতর ইতরং অভিবদতি, তদিতর ইতরং মনুতে, তদিতর ইতরং বিজানাতি। যত্র বা অস্যসর্ব্বং আত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ, কেন কং পশ্যেৎ, কেন কং শৃণুয়াৎ, কেন কং অভিবদেৎ, কেন কং মন্বীত, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ। যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ, বিজ্ঞাতারং কেন বিজানীয়াদিতি।"

(বৃহদারণ্যক উপনিষৎ)।

যে স্থানে দ্বৈতভাব থাকে সেই স্থানেই একজন অন্য জনের ঘ্রাণ পায়, একজন অন্য জনের দর্শন করে, বাক্যে প্রকাশ করে, মনন করে, জানে। অর্থাৎ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্য, শ্রোতা ও শ্রোতব্য পৃথক। কিন্তু যেখানে দ্বৈতভাব না থাকে, সমস্তই এক পরমাত্মা, তথায় কে কাহার ঘ্রাণ লয়, কে কাহাকে শ্রবণ করে, বাক্য প্রকাশ করে, মনন করে, জানে? যদ্দ্বারা বিশ্বের সমুদয় পদার্থ জানা যায়, তাহাকে আর কিসের দ্বারা জানা যাইবে? জ্ঞাতার আর জ্ঞাতা কে?

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের বিষ্ণুস্তোত্রে আছে :—

"সত্যপি ভেদাপগমে নাথ! তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥" ৩।

হে প্রভো! বিশ্বরূপ তুমি, অতএব যদিও তোমাতে ও আমাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই, তথাপি আমিই তোমার, তুমি আমার নহ। যদিও সমুদ্র ও তরঙ্গ একই পদার্থ তথাপি তরঙ্গই সমুদ্রের, সমুদ্র কখনও তরঙ্গের নহে।

"উদ্ধৃতনগ, নগভিদনুজ দনুজকুলমিত্র, মিত্রশশিদৃষ্টে।
দৃষ্টে ভবতি প্রভবতি ন ভবতি কিং ভবতিরস্করঃ॥" (৪).

হে উপেন্দ্র! তুমি গোবর্দ্ধনধারী, দানবকুল নিসূদন, সূর্য্য শশিনেত্র, সর্ব্বোপরি প্রভুত্বসম্পন্ন, তুমি দৃষ্টিগোচর হইলে ভববন্ধন মোচনের আর কি বাকি থাকে? কিবা তন্ত্রে কিবা মন্ত্রে, কি উপায়ে, কি প্রণালীতে তাঁহাকে দৃষ্টিগোচর করা যায় ইহাই সর্ব্বযুগে সকল সাধকমণ্ডলীর চিত্তাকাশ আন্দোলিত করিয়াছে। সুগভীর জ্ঞানভাণ্ডার আর্য্যশাস্ত্রের চরম উৎকর্ষ বেদান্তশাস্ত্র। "আমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় বা যাইব? জীবজগৎ ও জড়জগৎ কি, এবং তাহাদের মূলতত্ত্ব ও মূলকারণই

বা কি, "পরব্রহ্ম কি?" ইত্যাকার প্রশ্ন আবহমান কাল হইতে চিন্তাশীল মানবের হৃদয়কে আন্দোলিত করিতেছে। এই জ্ঞানলিপ্সার প্রবল উচ্ছ্বাস যখন চরমসীমায় উপনীত হয় তখন মানব ঋষিরূপে, কবিরূপে ভাবের আবেগে মহান্ সত্যসকল উচ্চৈঃস্বরে গান করিয়া থাকেন। তখন মহর্ষিগণ কবিত্বশক্তির উত্তেজনায় হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ ভাবরাশিকে আকার প্রদান করিয়া মানবের অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করেন এবং জনি-মৃতিভীত মানবকে অভয় প্রদান করিয়া এইরূপ গাথা গান করিতে থাকেন,—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাহতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

ওহে! আর ভয় নাই! আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি, তিনি কোটিসূর্য্যসমপ্রভ, তিনি অজ্ঞান তমিস্রার ও প্রকৃতির অতীত, তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, ইহা ব্যতিরিক্ত মুক্তির অন্য উপায় নাই।

এই সকল গাথাই বেদ। বেদের অন্তভাগ বা শিরোভাগের নাম বেদান্ত বা উপনিষৎ। বেদ অপৌরুষেয় বাক্য। ইহাদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়, এই জন্য ইহার নাম বেদ বা ব্রহ্মজ্ঞানভাণ্ডার। এই ব্রহ্মজ্ঞান, ভগবান্, ব্রহ্মার হৃদয়ে উদয় করিয়া দিয়াছেন, গুরু শিষ্যের ন্যায় অধ্যাপনা করেন নাই। শ্রীভাগবতের প্রথম শ্লোকে আছে—

"তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ।"

ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর, দেব মানব সকলেই প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত; ভগবান্ প্রকৃতির অতীত। (চণ্ডী ও ভাগবত দ্রষ্টব্য)। প্রাকৃত বা সৃষ্ট যে সমস্ত নাম, রূপ, গুণ ও রূপকাদি আছে তদ্দ্বারা অপ্রাকৃত, প্রকৃতির অতীত ভগবানের অপ্রাকৃত বা সৃষ্টির পূর্ব্ব.সময়ের হস্ত, পদ, কর্ণ, চক্ষু, রূপ প্রভৃতি বর্ণনা করিবার সাধ্য নাই, অথচ সৃষ্টজীব ইহার অতিরিক্ত কিছুই জানে না। অতএব অপ্রাকৃত ভগবান্ সম্বন্ধে যিনি যে বর্ণনা করুন না কেন, তাহা অসম্পূর্ণ হইবেই হইবে। আর যদি কণাদ ঋষির মতে পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি বশতঃ কেহ গীতা ও গীতোক্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা মানিয়া

তাহাতেই শ্রদ্ধা বা দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়া মানিতে পারেন তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের—"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ"—জন্ম ও লীলাদি আস্বাদন করিয়া ভক্ত সংসার মুক্ত হইতে পারেন। শ্রীরাধিকা সখীদিগের নিকট কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া অকৃতকার্য্য হইলেন; কারণ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রপঞ্চ—রূপ প্রপঞ্চের সাহায্যে বর্ণনা করা যায় না। এই অপ্রপঞ্চ রূপ গুণ কাব্যে, চিত্রে, মন্দিরে প্রকাশ করিতে যাইয়া ভারতের কবিত্বের, চিত্রবিদ্যার, স্থপতিবিদ্যার লোকাতীত উৎকর্ষ হইয়াছে। রাধিকা নিজেও চিত্র আঁকিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু না; একটী গীতে আছে—"চিত্র আঁকিলাম নয়ন কজ্জলে।

আমি দিই নাই চরণ চল্‌বে বলে।
যদি কেহ বলে চিত্র কি চলে?
সময়ে চলে—নলের দগ্ধ মীন যেমন জলে চলে॥"

শ্রীরাধিকার দেহ হইতে যেমন মনকে বিতাড়িত করিয়া দিয়া শ্রীকৃষ্ণের অপ্রপঞ্চরূপ রাধার হৃদয়ঘর মাঝে মৌরসী বন্দোবস্ত লইয়া চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, বাক্য প্রভৃতির উপর একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, সেইরূপ যখন ভক্ত হৃদয় মন্দির হইতে প্রাকৃত মনকে তাড়াইয়া দিয়া তথায় শ্রীকৃষ্ণকে বসাইয়া বলিতে পারিবেন "হৃদয় নিকুঞ্জ বনে, চিরবিহর নাথ নিশিদিন" তখনই দর্শন বিজ্ঞান পাঠ সার্থক হইবে। তদন্যথায় অনর্থক শৃগাল কুকুরের ন্যায় কুটতর্ক করিয়া ভেউ ভেউ করা সার হইবে।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য শারীরক ভাষ্যের প্রথমে "কোঽয়মধ্যাসঃ", অর্থাৎ অধ্যাস (যে বস্তু যাহা নহে তাহাতে সেই বস্তুর আরোপ করা) কি? এই যুক্তি বা কল্পনার অবতারণা করিয়া মায়াবাদ স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভেদ, জগৎ মিথ্যা। যেমন কুম্ভকার ঘট নির্ম্মাণের নিমিত্ত কারণ, এবং ঘটের উপাদান কারণ মৃত্তিকা, সেইরূপ এই বিশ্বসৃষ্টিকার্য্যে ব্রহ্মই নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। এক ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অপর কোন কারণ স্বীকার করিলে ব্রহ্ম সৃষ্টিব্যাপারে অপরের অধীন, সান্ত ও সসীম হইয়া পড়েন। যেমন ঘট মৃত্তিকার বিকারমাত্র, মৃত্তিকাই ঘটাকারে পরিণত, যেমন স্বর্ণালঙ্কার সুবর্ণের বিকারমাত্র, সুবর্ণই অলঙ্কারে পরিণত, সেইরূপে

এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই জগদাকারে পরিণত। ঘট ও অলঙ্কার কার্য্য প্রকৃত বস্তু নহে, মিথ্যা; মৃত্তিকা ও স্বর্ণই প্রকৃত বস্তু; কারণ—মৃত্তিকা সত্য, কার্য্য ঘট অসত্য। সেইরূপ কার্য্য জগৎ অসত্য; কারণ ব্রহ্ম সত্য। এই প্রকার সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয় এই ত্রিসর্গ মিথ্যা—মায়াকল্পিত। আবার জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভেদ, জীবাত্মা খণ্ড আত্মা, মায়া-সম্মোহিত এবং পরমাত্মা এক অখণ্ড, অদ্বিতীয় আত্মা, মায়মুক্ত। পরমাত্মা নামরূপ উপাধিতে আবদ্ধ হইলে জীবাত্মা হন, নামরূপ উপাধির নাশ হইলে পরমাত্মাই থাকেন। অপিচ, পরমাত্মা-বিম্ব, মায়াদর্পণে পতিত হইয়া জীবাত্মা রূপ প্রতিবিম্ব হন, মায়া দর্পণ ভগ্ন হইলে, মায়া অপসারিত হইলে প্রতিবিম্বের নাশ হয়; বিম্বমাত্র—এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মমাত্র থাকেন। জীব ও ব্রহ্ম অভেদ; উপাধি ও প্রতিবিম্বদ্বারা ভেদ প্রতীয়মান হয়, বাস্তবিক তাহা অধ্যাস বা অবিদ্যা। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, শুক্তিতে রজত ভ্রম হয়, সেইরূপ এক ব্রহ্মে নানাত্ব জ্ঞান অবিদ্যা বা মিথ্যার কার্য্য। যেমন একই সূর্য্য বহুপাত্রস্থিত জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া সূর্য্যবৎ প্রতিভাত হয়, সেইরূপ একই পরমাত্মা নরবানরপশুপক্ষীরূপ উপাধিগত হইয়া নানারূপে প্রতীয়মান হয়েন। ঘটাকাশ অর্থাৎ ক্ষুদ্র ঘটে আবদ্ধ আকাশ ঘট ভগ্ন হইলে যেমন মহাকাশে বিলীন হয়, সেইরূপ জীবাত্মা উপাধি ও মায়ার নাশে পরমাত্মায় লীন হয়।

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে:—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং"—হে সৌম্য! আদিতে একমাত্র অদ্বিতীয় সৎ ছিলেন।

"সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েত ইতি স তপোঽতপ্যত, স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ। তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"।—সেই চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন যে—আমি বর্দ্ধিত হইব, বহু হইয়া জন্মিব—এই ইচ্ছা করিয়া তিনি আত্মতপপরায়ণ হইয়া সৃষ্টি বিষয় পর্য্যালোচনা করত সগুণ হইয়া এই নিখিল ভুবন যাহা কিছু সমস্তই সৃজন করিলেন। তাহা সৃষ্টি করিয়া তাহাতে স্বয়ং অনুপ্রবিষ্ট হইলেন।

শ্রীভগবানের ইচ্ছা শক্তি, জ্ঞান শক্তি ও ক্রিয়া শক্তি অথবা পর্য্যায়ক্রমে হ্লাদিনীশক্তি (আনন্দ), সম্বিৎ (চিচ্ছক্তি), ও সন্ধিনী শক্তি (সৎ), অথবা অন্তরঙ্গা শক্তি, তটস্থাশক্তি ও বহিরঙ্গা শক্তি, অসীম ও অখণ্ড। শ্রীভগবানের

অনন্ত শক্তি, তন্মধ্যে এই তিন শক্তি প্রধানা। শ্রীভগবানের শক্তির পরিমাণ হয় না, এবং সমস্ত শক্তিকেও মাত্র তিন শক্তিতে সীমাবদ্ধ করা যায় না। তাঁহার অনন্ত শক্তি, তন্মধ্যে তিনটী মাত্র প্রধানা। তিনি অনন্তরূপে বিকশিত হইলেও তাঁহারা নিজের ব্যক্তিত্বের (Individuality) ধ্বংস হয় না।

শ্রীভগবানের চিচ্ছক্তি ও জীবশক্তি অভেদ, আবার ভগবানের চিচ্ছক্তি ও মায়াযুক্ত জীবশক্তি ভেদ। "কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ।" (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।) ইহাই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ। শ্রীচৈতন্যদেব উদাহরণ দ্বারা উহা স্পষ্টিকৃত করিয়াছেন :—"সূর্য্যাংশ কিরণ যৈছে অগ্নি জ্বালাচয়।" সূর্য্য এবং কিরণ তেজাংশে অভিন্ন। অগ্নি এবং অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তেজাংশ অভিন্ন। কিন্তু কিরণজাল সূর্য্য হইতে বিচ্যুত হইয়া অন্ধকারে পতিত হওয়ায় এবং অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অগ্নি হইতে পৃথক হইয়া অন্ধকারে পতিত হওয়ায়, সূর্য্যে ও অগ্নিতে পুনরায় পৌছিতে অসমর্থ। এই জন্য তাহারা সূর্য্য ও অগ্নি হইতে ভিন্ন। এইরূপ জীবশক্তি চিদংশে ভগবান্ হইতে অভিন্ন, কিন্তু মায়া শক্তি প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ বহির্ম্মুখে বিধায় শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন।

"কৃষ্ণ সূর্য্যসম মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার॥" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)।

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীসনাতন গোস্বামীকে শ্রীভগবানের সহিত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের পার্থক্য বুঝাইতে যাইয়া বলিয়াছিলেন :—যেমন দুগ্ধ হইতে তক্র প্রভৃতি হইতে পারে, কিন্তু দধি ও তক্রাদি পুনরায় দুগ্ধ হইতে পারে না। সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এবং অসংখ্য দেব, মানব, পশু, উদ্ভিদ প্রভৃতি জীবাত্মা হইতে পারেন, কিন্তু ইঁহারা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হইতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্য পার্থক্য থাকিয়া যায়। যদি অনন্ত শক্তিমান্ ভগবান্‌কে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর (সত্ব, রজঃ, তমঃ গুণ প্রধান), এই তিন অংশে বিভক্ত করিয়া কল্পনাতে ভগবানের ব্যক্তিত্ব বা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ করা যায়, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যদেবের উক্ত উদাহরণ প্রযুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু যদি শ্রীভগবানকে অনন্ত শক্তিমান স্বীকার করিয়া লইয়া বলা যায় যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর, প্রভৃতি তাঁহা হইতেই প্রসূত বা পরিণত হইয়াছেন ও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর

ভগবানের বিকার বা বিবর্ত্ত নহেন, তাহা হইলে মায়াবাদীর বিবর্ত্তবাদ দাঁড়া-ইতে পারে না। পরিণামবাদই স্থাপিত হইবে।

বেদ ও উপনিষদের বহু স্থানে নানাপ্রকার উক্তি পাওয়া যায়, তৎসমস্ত উভয় মত অনুসারেই সামঞ্জস্য করা যায়, সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য করা যায় না। এই জন্য বেদ ও বেদান্তের প্রকৃত ও মুখ্য অর্থ করিতে হইলে পুরাণের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। পুরাণ ব্রহ্মকে সবিশেষ বা স্বতন্ত্র ভগবানই বলিয়াছেন; স্থানে স্থানে যে নির্ব্বিশেষ বা অভেদ একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা পরিণামবাদের বিরোধী নহে।

"বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝানে না যায়।
পুরাণ বাক্যে সেই অর্থ করয়ে নিশ্চয়॥" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)।

"যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং,সা সাভিধত্তে সবিশেষ মেব।
বিচার যোগে যতি হন্ত তাসং, প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষ মেব॥"

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক)।

যে যে শ্রুতি নির্ব্বিশেষ বলিতেছেন, সেই সেই শ্রুতি মুখ্যবৃত্তিদ্বারা সবিশেষ বলিতেছেন। বিচার করিলে শ্রুতিগণের সবিশেষ কথন প্রায়ই বলবৎ দৃষ্ট হয়।

অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীদিগের সন্ন্যাস মন্ত্র—"তত্ত্বমসি" "সেই তুমি"। শ্রীচৈতন্যদেবের একজন ভক্ত মুরারি গুপ্ত ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসের সাহায্যে উক্ত মন্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন:—তত্ত্বমসি = তৎ—ত্বং—অসি = তস্য ত্বং অসি = সেই ভগবানের তুমি নিজজন বা ভগবদ্ভক্ত। বাস্তবিকও জীব ভগবানের ভক্ত, ভগবানের নিত্যদাস; ইহাই ভগবানের সহিত জীবের নিত্য সম্বন্ধ।

মহাপ্রলয় আবস্থায় ভগবানের কোলে জীবসঙ্ঘ শয়ান ছিল; তাহাদের পূর্ব্বকল্পের কর্ম্মফলেই ব্রহ্মের সৃষ্টি সঙ্কল্প হইল—"তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয় ইতি।" এক হইতে বহু প্রসূত হইয়া এই বহু অচ্ছেদ্য ভালবাসায় অথবা প্রেম-ভক্তির আকর্ষণ প্রভাবে একের অভিমুখে আকৃষ্ট। ইহাই ভগবানের সহিত জীবের নিত্য সম্বন্ধ; জীব ও ভগবান কদাপি এক নহেন। "সর্ব্বদৈব বিলক্ষণো"।

মহর্ষি অঙ্গিরা শৌনক ঋষিকে বলিয়াছিলেন:—

*"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ, যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি। যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি, তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বঃ।" (মুণ্ডকোপনিষৎ।)

ঊর্ণনাভি নিজ দেহাভ্যন্তর হইতে তন্তু সৃজন করিয়া তাহা গ্রহণ করতঃ জাল প্রস্তুত করিয়া তাহা উপসংহার করিতে পারে। পৃথিবীর অভ্যন্তর হইতে ব্রীহি, যব, গোধুম প্রভৃতি ঔষধি সকল বহির্গত হয়। জীবিত পুরুষের দেহাভ্যন্তর হইতে কেশ লোমাদি উৎপন্ন হয়। সেইরূপ অক্ষর পরমাত্মা হইতে এই বিশ্ব উদ্ভূত হইয়াছে। পরমাত্মা অক্ষর ও অব্যয়, তাঁহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই। ঊর্ণনাভি শরীরাভ্যন্তর হইতে অধিক তন্তু নির্গত করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িতে পারে। তাহার ক্ষুদ্র শক্তি নিঃশেষিত হইতে পারে, কিন্তু ভগবানে এইরূপ শক্তি হীনতার আরোপ প্রযোজ্য নহে।

শ্রীচৈতন্যদেব বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে বলেন :—

"ভগবান্ বহু হৈতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃত শক্তিকে তবে কৈল বিলোকন॥
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাঁহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার॥
স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।
নিঃশক্তি করিয়া তারে করহ নিশ্চয়॥" (শ্রীচৈতন্য চরিত)।

বাস্তবিক জগৎ মিথ্যা নহে, জগৎ নশ্বর মাত্র।

"মণি যৈছে অবিকৃতে প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপে হয় ঈশ্বর তবু অবিকার।" (শ্রীচৈতন্যদেবের উক্তি)

ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

"অচিন্ত্য শক্তি ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত।
পরিণাম-বাদ ব্যাসসূত্রের সম্মত॥

তবে শঙ্করাচার্য্য মায়াবাদ স্থাপন করিলেন কিরূপে? "বিবর্ত্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া।" (শ্রীচৈতন্যদেবের উক্তি)।

বাস্তবিক একেশ্বরবাদ ও মায়াবাদ এক কথা নহে। অদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদী, উভয়ে এক ঈশ্বরই স্বীকার করেন। দ্বৈতবাদী দুই জন ঈশ্বরকে স্বীকার করেন না, এই মাত্র বলেন যে জীব ও ঈশ্বর সর্ব্বদাই বিলক্ষণ, জীব ভগবানের নিত্যদাস।

থিওসফী সম্প্রদায় হইতে মুদ্রিত তৃতীয় ভাগ "সনাতন ধর্ম্ম" গ্রন্থে আছে :—

"It is this nature, identical with Brahman as the sparks from a fire are identical with the fire, which evolves, unfolds itself as the Jivatma in all living beings. As a seed grows to be a tree like its parent, so the Jivatmic seed grows into self-conscious Deity Samsara exists that the Jivatma may have to realise himself. The Jivatma differs from Brahman only as the seed from the tree that bears it.

"জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ" (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ)

"Wise and unwise, both unborn, powerful and powerless."

Therefore, although unwise and powerless, the Jivatma can become wise and powerful ; to this end he must evolve, and his evolution is on the wheel of births and deaths." (An Advanced Text Book of Hindu Religion and Ethics, p. 90)। ইহাই বৈষ্ণবদর্শনের প্রতিধ্বনি।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে শ্রীচৈতন্যদেবই অগ্নি ও অগ্নির জ্বালাচয়ের সহিত ব্রহ্ম ও জীবের তুলনা করিয়াছেন। ব্রহ্ম ও জীব উভয়েই এক, কিন্তু উভয়ের শক্তির পার্থক্য আছে। উল্লিখিত উদ্ধৃতাংশে মূলবৃক্ষ ও মূলবৃক্ষের ফলের জীবের সহিত ব্রহ্ম ও জীবের তুলনা করা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতে অবতারী ভগবানের সহিত অবতারের এইরূপ তুলনা করা হইয়াছে :— "অবতারী ভগবান্ স্বয়ং অবতরণ করিতে পারেন, যেমন শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। অবতারী হইতে অবতারবৃন্দ অবতরণ করেন। অবতারীর দেহে সমস্ত অবতারের স্থিতি। যেমন মূল প্রদীপ হইতে বহু প্রদীপ জ্বালিত হইতে পারে তদ্রূপ।" জীবাত্মাকে বীজ বলিলে, জীবাত্মা-বীজ নূতন এক বৃক্ষরূপে পরিণত হইতে পারে বটে, কিন্তু মূলবৃক্ষ নষ্ট হয় না, মূলবৃক্ষের হ্রাস বৃদ্ধিও হয় না। শ্রীভগবানের অনন্ত শক্তি, জীবের শক্তি সীমাবদ্ধ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজানকীনাথ পাল শাস্ত্রী।

বিজ্ঞান, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

ধ্যান।ধারণার আবশ্যক কি এবং উক্ত অবস্থাতে প্রকাশিত ঘটনাবলী বাস্তবিক কিনা এতদ্বিষয়ে অনেকে সন্দিহান আছেন। যখন জড়বাদ একমাত্র সত্য বলিয়া গৃহীত হইত, তখন Buchner প্রভৃতি জড়বাদী বৈজ্ঞানিকগণ মানব চৈতন্যকে স্থূল অনুসম্ভূত পদার্থ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। এই জড়বাদের পরাক্রম আমাদিগের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও বর্তমান। জাগ্রত চৈতন্য ভিন্ন চৈতন্য নাই, এই মত অনেকেই সমর্থন করেন। সেই জন্য চৈতন্য পদার্থ অনুসন্ধানের দ্বারা পরিচ্ছন্ন কিনা দেখিতে হইবে।

স্বপ্নাবস্থায় এবং ধ্যানাবস্থায় স্থূল মস্তিষ্ক দূষিত রক্তে পরিপূর্ণ হয়। ঐ দূষিত রক্ত মস্তকে সঞ্চারিত হইলে, স্নায়বীয় যন্ত্র সকল বিকল হইয়া পড়ে; সুতরাং জড়বাদের মতে ওরূপ অবস্থায় চৈতন্য বা প্রজ্ঞা প্রকাশ অসম্ভব। যে যন্ত্রের সাহায্যে চৈতন্য উৎপন্ন, তাহা বিকল হইলে জ্ঞান বা শৃঙ্খলাযুক্ত চৈতন্যের প্রকাশ অসম্ভব। চক্ষুরিন্দ্রিয় বিকল হইলে দৃষ্টি অসম্ভব; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, স্থূল বিষয় ও ইন্দ্রিয় অপসারিত হইলে মানব সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, জাগ্রত চৈতন্যের অতীত মহত্তর প্রজ্ঞা আছে, এবং স্থূল শরীরের উহার প্রকাশ জন্যই হয় না।

এই মহত্তর প্রজ্ঞাই নবীন দার্শনিকের Subliminal self। Society for Psychical Research বহু যত্নে এই তথ্য প্রমাণিত করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দু যোগীর চক্ষে আরও উচ্চতর অবস্থা আছে। Subliminal self আমাদের স্বপ্ন চৈতন্য মাত্র এবং তদুপরি সুষুপ্তি ও তুরীয় দুই অবস্থা আছে।

আমাদের উপরস্থিত এই মহত্তর প্রজ্ঞার প্রকাশের কৌশলই যোগ প্রক্রিয়া নামে খ্যাত। কিন্তু অনেকে ভুলিয়া যান যে, এই প্রজ্ঞা সর্ব্বদাই বর্তমান, এবং যখন কৌশল বিশেষের সাহায্যে ইহাকে নামাইতে পারা যায়, তখনই মানব চৈতন্য বৃহত্তর রূপে দেখা যায়। বাহ্য চৈতন্যের দ্বারা বা বাহ্য প্রক্রিয়ার সাহায্যে, বা এক কথায় "কর্ম্মের" দ্বারা এই মহত্তর প্রজ্ঞাকে উৎপন্ন করা হয় না। অথচ বিভিন্ন মার্গাবলম্বী সাধকেরা আপনাপন প্রক্রিয়াকে মহত্তর চৈতন্যের হেতু বলিয়া মনে করেন। যেমন Radium আবিষ্কারের পূর্ব্বেও Radium ছিল এবং পরেও থাকিবে। এবং আবিষ্কার অর্থে যেমন উহার প্রকাশের কৌশল মাত্র ভিন্ন আর কিছু নহে, তদ্রূপ বিশিষ্ট মার্গ আবিষ্কারের পূর্ব্বেও মহত্তর প্রজ্ঞা একই ভাবে অবস্থিত।

তবে কেন আমরা আপনাপন কর্ম্মদ্বারা প্রাপ্ত, পরিচ্ছন্ন, বিভিন্ন মার্গ বা কৌশলের মোহে পড়িয়া চৈতন্যের মৌলিক একতা ভুলিয়া যাই। তবে কেন সেই মহান্ সত্যের উদ্দেশে চলিতে চলিতে, ক্ষুদ্র দেহাত্মভাবের মোহে ও ভেদবুদ্ধিতে; বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী সম্প্রদায়ের গঠন করি। স্থূল বৈজ্ঞানিকদিগের ভিতর যে একতা দৃষ্ট হয়, তৎপরিবর্ত্তে ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে এইরূপ উদারতা কেন দেখিতে পাই না? ভগবানকে বা সত্য উপলব্ধির পথকে পরিচ্ছিন্ন না করিয়া থাকিতে পারি না কেন? যে হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে শাক্ত, শৈব প্রভৃতি সাধনা-বিভাগ ও বেদান্ত, সাংখ্য প্রভৃতি দর্শন বিভাগ থাকা সত্ত্বেও মৌলিক একতা নষ্ট করিতে

পারে নাই, সেই হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকগণ কিরূপে আপনাপন পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন, তাহা দেখিলে দুঃখ হয়। অহঙ্কার বা ভেদবুদ্ধি নাশ করা কর্ত্তব্য, ইহা স্বীকার করিয়াও সাধনামার্গে ভেদভাব পোষণ করিতে বদ্ধপরিকর হই। জীবের কর্ম্মাংশ গ্রহণ করিলে জীবেশ্বরে ভেদই দেখা সম্ভব, কিন্তু তাহার অন্তরতম চৈতন্যাংশ গ্রহণ করিলে অভেদ ভাবই দৃষ্ট হয়। শুধু তটস্থা শক্তিতে কি চৈতন্য উৎপন্ন হয়?

সমালোচনা।

শাণ্ডিল্য সূত্রম্।—সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হৃষিকেশ শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক মৈথিল শ্রীভবদেব ভট্টবিরচিত "অভিনব" ভাষ্য ও তাহার বঙ্গানুবাদ সহিত প্রকাশিত। ভক্তিতত্ত্ব নির্ণয় বিষয়ে শাণ্ডিল্য সূত্রই ভারতে, শুধু ভারতে কেন জগতে, সর্ব্বপ্রথম ও শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই অপূর্ব্ব সংস্করণের বিশেষত্ব এই যে এতৎসন্নিবেশিত ভবদেবের অভিনব ভাষ্য ইতিপূর্ব্বে মুদ্রিত বা কোন ভাষায় অনুদিত হয় নাই। বোয়ালিয়ার সবজজ শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ ঘোষাল মহাশয়ের ঐকান্তিক যত্নে ও অনুরোধে শাস্ত্রী মহাশয় বহু পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে ইহার সকলন ও অনুবাদ করিয়াছেন, এবং তাঁহারই নির্ব্বন্ধাতিশয়ে ও সবিশেষ আনুকূল্যে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে এই অমূল্য ও অভিনব গ্রন্থ ভক্তজগতে যে একটা পরম আদরের ও আগ্রহের বস্তু বলিয়া গৃহীত হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভক্তিপিপাসু ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি মাত্রেই ইহা পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিবেন। ইহার আয়তন ডিমাই আট পেজী ৩০০ শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মুদ্রাঙ্কন অতি সুন্দর ও সুচারু, মূল্য অতি সুলভ—দেড় টাকা মাত্র। কলিকাতা সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারিতে এবং ৯৬ নম্বর পটুয়াটোলা লেনস্থ গ্রন্থকারের ভবনে প্রাপ্তব্য।

পাগলের প্রলাপ।—শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত মূল্য ।৵০।

যে পাগলের "পাগলামী" "পন্থায়" পাঠকগণের বড় আদরের ধন, যাহা পাঠ করিয়া অনেকের হৃদয়ে সেই "মহাপাগলের" ভাবের ছায়া প্রকাশিত হয় এবং অমানিশায় সৌদামিনী প্রভার ন্যায় মোহের অন্ধকার দূর করিয়া আমাদিগকে পথপানে লইয়া যায়— সেই "পাগলামী" অদ্য পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। সংসারে সকলেই পাগল,—কেহই প্রকৃতরূপে আত্মস্থ নহেন। তাহার উপর মিথ্যাভূত ভেদাত্মক "আমির" অত্যাচার। এ ক্ষেত্রে আমাদের পাগলামির মাত্রা একটু চড়াইয়া "পাগলের" প্রলাপের সুরে জীবনের সুর বাঁধিলে বোধ হয় মঙ্গল। পুস্তকখানি সাধারণের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। "পন্থা" কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।
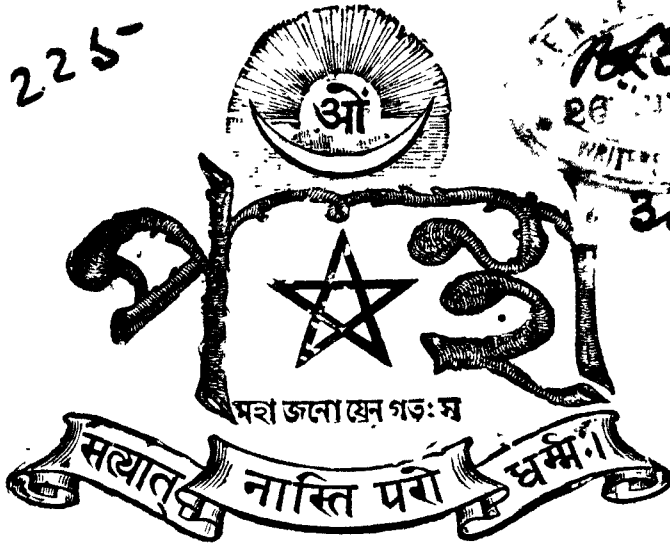
১০ম ভাগ] ১৩১৩ সাল, আষাঢ়। [৩য় সংখ্যা।

প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি ও পুরুষ।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পঞ্চ বিষয় চিত্ত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা গ্রহণ করেন; ইহাই ক্রিয়াশক্তির কার্য্য। এই বিষয় আহরণ ক্রিয়ার যখন নিবৃত্তি হয়, তখন সেই অবস্থার নাম প্রত্যাহার। প্রতি + আহার = প্রত্যাহার; বিষয় আহরণ ক্রিয়া হইতে ইন্দ্রিয়গণের ফিরিয়া আনার নাম প্রত্যাহার। আমাদের শরীরের যে কোষে ক্রিয়াশক্তির কার্য্য হইয়া থাকে, উহার নাম প্রাণময় কোষ। এই প্রাণময় কোষের অন্তরে মনোময় কোষ, এবং মনোময় কোষের অন্তরে বিজ্ঞানময় কোষ। যেমন একটি ডিম্বের ভিতর সাদা লালাময় একটি কোষ এবং তাহার ভিতর পীতবর্ণ পদার্থের আর একটি কোষ। ইচ্ছাশক্তি মনোময় কোষের শক্তি এবং জ্ঞানশক্তি বিজ্ঞানময় কোষের শক্তি। বিজ্ঞান ময় কোষের অন্তরে আনন্দময় কোষ; ভোগদাশক্তি এই আনন্দময় কোষের শক্তি। জীব এই আনন্দময় কোষে অধিষ্ঠিত হইয়া সুখ দুঃখ ভোগ করেন। সুখ দুঃখের সংস্কার এই আনন্দময় কোষে প্রতিফলিত হইয়া আনন্দময় কোষেই সংস্কাররূপে অঙ্কিত হইয়া থাকে, এবং এই সমস্ত

সংস্কার আনন্দময় কোষকে নানা বর্ণে চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছে। এই সংস্কার হইতেই সুখ দুঃখ সম্বন্ধে জীবের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। জ্ঞানশক্তি যখন কোন বিষয়-সংস্পর্শ-জনিত সুখ দুঃখের সংস্কারের মধ্যে সুখের মাত্রাই অধিক বলিয়া বুঝেন, তখন এই জ্ঞান মনোময়-কোষে সঞ্চারিত হইয়া সেই বিষয় ভোগের ইচ্ছাতে পরিণত হয়, এবং মনের এই ইচ্ছাশক্তি প্রাণময় কোষে সঞ্চারিত হইয়া ক্রিয়াশক্তিতে পরিণত হয় এবং ইন্দ্রিয়গণ বিষয় গ্রহণ ব্যাপারে ব্যাপৃত হয়। ইহাই শক্তির ত্রিবৃৎ ব্যুত্থানক্রম। জ্ঞানশক্তি যখন কোন বিষয় সংস্পর্শ জনিত সুখ দুঃখের সংস্কার মধ্যে দুঃখের মাত্রাই অধিক বলিয়া বুঝেন, তখন এই জ্ঞান মনোময় কোষে সঞ্চারিত হয়, এবং সেই বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে বিরত রাখিবার ইচ্ছা মনোময় কোষে উদিত হয়; এই রূপে যখন বিজ্ঞানাত্মা (বিজ্ঞানময়কোষাধিষ্ঠিত জীব) যাবতীয় বাহ্যবিষয়ের সংস্পর্শ জনিত সুখ ও দুঃখের মধ্যে দুঃখের আধিক্য বুঝিয়া সকল বিষয় হইতেই বিরত হন, তখন ক্রমে ক্রমে মনও বিষয়ভোগেচ্ছা ছাড়িয়া দেয়। এই সময় ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গে মনের একটি সংগ্রাম উপস্থিত হয়। ইন্দ্রিয়গণ জন্মিয়া অবধি বিষয় রস গ্রহণ করিতেছে; তাহারা বরাবর যে পথে চলিয়াছে সেই পথেই চলিতে চায়; প্রাণময় কোষের প্রাণ সহজে অন্য পথে চলিতে চায় না, এবং মনকে বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে; তখন ইচ্ছাশক্তি দৃঢ় করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে বশ করিতে হয়। ইন্দ্রিয়গণের এই বশীকরণের নাম প্রত্যাহার। ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গে সংগ্রামে ইন্দ্রিয়গণ যখন সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়া পড়ে, তখন মনের ইচ্ছাশক্তির আর কোন ক্রিয়া থাকে না। মন তখন ক্রমে ক্রমে এক স্থলে স্থির হইয়া বসেন। মন যখন এক স্থলে স্থির হইয়া বসেন তখনকার সেই অবস্থার নাম ধারণা।

দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা।—পাতঞ্জল সূত্র।

আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিলাম তাহা হইতে ইহা বুঝা গেল যে, প্রাণময় কোষের ক্রিয়াশক্তির যে শান্ত অবস্থা উহার নাম প্রত্যাহার, এবং মনোময় কোষের ইচ্ছাশক্তির যে শান্ত অবস্থা উহার নাম ধারণা। এই ধারণার পরের অবস্থাই ধ্যানের অবস্থা, এবং ধ্যানের পর যে অবস্থা উহার নাম সমাধি। পতঞ্জলি ধ্যানের যে সূত্র দিয়াছেন, তাহা এই— তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানং।

ধারণার সংজ্ঞা বলিয়া তাহার পর ধ্যানের সংজ্ঞা বলিয়াছেন সেই জন্য "তত্র" শব্দের অর্থ ধারণার অবস্থাতে। ধারণার অবস্থাতে চিত্ত আরূঢ় হইলে চিত্তে উদিত প্রত্যয় সকলের যখন একতানতা উপস্থিত হয় তাহার নাম ধ্যান।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রত্যাহার ক্রিয়াশক্তির শান্ত অবস্থা এবং ধারণা ইচ্ছাশক্তির শান্ত অবস্থা। ইচ্ছাশক্তি শান্ত হইলে পর চিত্তে কেবল জ্ঞানশক্তির ক্রিয়া হইতে থাকে, অর্থাৎ ভাবের তরঙ্গসব বিজ্ঞানময় কোষে খেলিতে থাকে; এই সব তরঙ্গ যখন শান্ত হইয়া একটি মাত্র ভাবে জ্ঞান শক্তির পরিণতি হয় তখন সেই অবস্থার নাম ধ্যান। জ্ঞানশক্তির শান্ত অবস্থার নামই ধ্যানাবস্থা। জ্ঞানশক্তি শান্ত হইবার পর, শক্তি যখন আনন্দময় কোষে লয় হয় তখন চিত্ত এক অসীম আনন্দ অবস্থা প্রাপ্ত হন। তখন চিত্তে সসীম কোন ভাব থাকে না। চিত্তের স্বরূপ তখন অসীম আকাশের ন্যায় হয়। চিত্তের এই অসীম আকাশ রূপই চিত্তের স্বাভাবিক রূপ। চিত্তের এই অসীম আকাশরূপের নাম চিদাকাশ। ইহাই চিত্তের স্বাভাবিক রূপ, এই জন্য এই চিদাকাশের নাম স্বভাব বা প্রকৃতি। চিত্তের এই অবস্থার নাম সমাধি-অবস্থা। পতঞ্জলি সমাধির যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা এই:—

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং, স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ।

"তৎ" অর্থাৎ ধ্যান পরিপক্ক হইলে চিত্তের অর্থমাত্র অবস্থার প্রকাশ হইয়া যখন চিত্ত স্বরূপশূন্যবৎ হইয়া যায় তখন সেই অবস্থার নাম সমাধি অবস্থা। পাতঞ্জল দর্শনের বিভূতি পাদের ৩৮ সূত্রে ইন্দ্রিয়গণের স্বরূপ ও অর্থবত্ত্ব-রূপ এই দুইটি বাক্য যেরূপ অর্থে উল্লেখ আছে, সমাধির সংজ্ঞাতেও স্বরূপ ও অর্থমাত্র শব্দ সেই রূপ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে বোধ হয়। ইন্দ্রিয়গণ যে রূপে সম্ভোগ প্রদান করে, উহাই ইন্দ্রিয়গণের অর্থবত্ত্বরূপ। পাতঞ্জল দর্শনে যে চিত্তশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে উহার অর্থ অন্তঃকরণ অর্থাৎ অন্তরের ইন্দ্রিয়, যাহা দ্বারা দ্রষ্টা পুরুষ প্রত্যয় সমূহ দর্শন করেন। চিত্তের যে আনন্দ-ময় রূপ উহাই চিত্তের অর্থমাত্র রূপ। সমাধিকালে এই অর্থমাত্ররূপের প্রকাশ হয় এবং চিত্তের অন্য কোন সসীম রূপ থাকে না। ধ্যানকালে চিত্ত ধ্যেয়বস্তুর সসীম কোন আকারে পরিণত হইয়া থাকে, সমাধিকালে ঐ

সসীম আকার আর থাকে না। এই সসীম রূপ-বিসর্জ্জনের অবস্থাই সমাধিরূপ আনন্দ অবস্থা। এই সমাধি অবস্থাতে চিত্তের যে রূপ, উহাই বিজ্ঞানময় কোষের অন্তরস্থ আনন্দময় কোষ। এই সমাধি যখন জীবের লক্ষ্য হয়, তখন প্রাণময় কোষের ক্রিয়াশক্তি মনোময় কোষের ইচ্ছাশক্তিতে লয় হইয়া যায়; মনোময় কোষের ইচ্ছাশক্তি, বিজ্ঞানময় কোষের জ্ঞান-শক্তিতে লয় হয় এবং বিজ্ঞানময় কোষের জ্ঞানশক্তি নাদস্বরূপ শান্ত আনন্দে পরিণত হইয়া অণুরূপ জীবের পরম ভোগের কারণ স্বরূপা হইয়া থাকেন। ইহাই শক্তির ত্রিবৃৎ নিরোধক্রম। প্রত্যাহারে প্রথম আবৃত্তি, ধারণাতে দ্বিতীয় আবৃত্তি, ধ্যানে তৃতীয় আবৃত্তি; এই ত্রিআবর্ত্তের পরিণাম সমাধি। প্রত্যাহারে প্রাণময় কোষ শান্ত—ধারণাতে মনোময় কোষ শান্ত—ধ্যানে বিজ্ঞানময় কোষ শান্ত এবং সমাধিতে আনন্দময় কোষের ভোগদা শক্তি শান্তভাব ধারণ করেন। আনন্দময় কোষের শক্তির লয় হওয়ার নামই সমাধি।

শক্তি কথাটি হিন্দুশাস্ত্রে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি,—ঐ অর্থ বুঝিলে শক্তির শিবসম্মিলনের নামই যে সমাধি উহা বুঝা যাইবে

চলচ্চিত্তে বসেচ্ছক্তিঃ শান্তচিত্তে বসেচ্ছিবঃ।

চিত্ত যখন চলিতে থাকে তখন শক্তি উহাতে বসেন। চিত্ত যখন শান্ত হয় তখন শিব উহাতে বসেন। পাশ্চাত্য গণিত ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে শক্তির যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে উহা এই, Force is that which produces motion in matter হিন্দুশাস্ত্রে শক্তি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে উহার সংজ্ঞা এইরূপ—Shakti is that which produces motion in mind.

চলচ্চিত্তে বসেচ্ছক্তিঃ; এই শক্তি, যিনি চিত্তকে চালান, যিনি চিত্তক্ষেত্রে স্পন্দন উৎপাদন করেন ও যাবতীয় চিত্তরঙ্গের কারণভূতা, হিন্দুদর্শন সমূহে তাঁহারই আলোচনা করা হইয়াছে। এই শক্তি যখন শান্ত হন, চিত্তে যখন কোনরূপ তরঙ্গ থাকে না, চিত্ত যখন প্রশান্ত সাগরের ন্যায় অবস্থায় থাকেন শিব উহাতে বসেন; তখন পুরুষের স্বরূপ ঐ চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। সমুদ্রে যখন তরঙ্গ হইতে থাকে তখন সূর্য্যের স্বরূপ-বিম্ব উহাতে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না, কিন্তু যখন সমুদ্রে কোন তরঙ্গ থাকে না, তখনই সমুদ্র সূর্য্যের

প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ হয়, চিত্ত ও পুরুষ সম্বন্ধেও সেইরূপ। চিত্ত শান্ত হইলেই জ্যোতিঃবিন্দুরূপ পুরুষের রূপ চিত্তক্ষেত্রে উপলব্ধি হয়।

যোগশ্চিত্ত বৃত্তিনিরোধঃ, তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানং—

পাতঞ্জল দর্শনের প্রথম সূত্র দুইটির ইহাই অর্থ যে, চিত্তের শান্তিতেই পুরুষের স্বরূপোলব্ধি।

জ্যোতির্বিন্দুরূপ পুরুষের স্বরূপ সম্বন্ধে ভগবান গীতাতে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই—

কবিং পুরাণমনুশাসিতারং, অণোরণীয়াং সংমনুস্মরেদ্যঃ।

সর্ব্বস্য ধাতারং অচিন্ত্যরূপং, আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

চিত্ত যে শান্ত অবস্থায় উপনীত হইলে এই আদিত্যবর্ণ বিন্দুরূপ পুরুষের প্রকাশক হন উহাই চিত্তের সমাধি অবস্থা। চিত্তশক্তির শান্ত অবস্থার নাম নাদ অবস্থা। এই অবস্থার ঠিক ইংরাজী নাম Silence. That silence in which nothing but Purusha is reflected in the mind is called yoga—ইহাই পাতঞ্জলদর্শন অনুযায়ী যোগের সংজ্ঞা।

চিত্তের শক্তি যখন বিষয়াভিমুখে ধাবিতা হন তখন উহার নাম ব্যুত্থান শক্তি, এবং যখন অন্তরের অন্তরস্থ বিন্দুরূপের দিকে ধাবিতা হন তখন উহার নাম নিরোধশক্তি। প্রত্যাহারে নিরোধশক্তির প্রথম আবৃত্তি হইয়া ক্রিয়া-শক্তি শান্ত হইয়া যায়, ধারণাতে দ্বিতীয় আবৃত্তি হইয়া মনোময় কোষের ইচ্ছাশক্তি শান্ত হইয়া যায়, ধ্যানে তৃতীয় আবৃত্তি হইয়া জ্ঞান শক্তি শান্ত হইয়া যায় এবং সমাধিতে শক্তির নাদরূপ প্রাপ্তি ও পুরুষ সম্মিলন। ইহাই শক্তির সার্দ্ধত্রিবৃৎ প্রণবরূপ। পুরুষ কেবলমাত্র সমাধিগম্য এইজন্য প্রণবই তাঁহার বাচক। নাদরূপ শক্তির সহিত প্রণববাচ্য পুরুষের সম্মিলন ভাবনাই যোগভাবনা। চিত্তের নিরোধ শক্তিরই অন্য নাম কুণ্ডলিনী শক্তি। অকারে কুণ্ডলিনীর প্রথম আবৃত্তি ও ক্রিয়াশক্তির লয়, উকারে কুণ্ডলিনীর দ্বিতীয় আবৃত্তি ও ইচ্ছাশক্তির লয়, মকারে কুণ্ডলিনীর তৃতীয় আবৃত্তি ও জ্ঞানশক্তির লয়, নাদ, সমাধির রূপ, এবং বিন্দু, পুরুষের রূপ। প্রণবের এইরূপ ভাবনাই যোগ। চিত্তবৃত্তি নিরোধ নীরস অবস্থা নহে, পুরুষ সম্মিলন জন্য উহা পূর্ণানন্দ অবস্থা। তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানং; তখন চিত্তের স্বামী সহবাস

পূর্ণানন্দ অবস্থা। এস ভাই এই বিবাহে শাঁখ বাজাই। এই শাঁখ বাজাইলেই গৌরীব বর এয়োর মাঝে দিগম্বর রূপ ধরিবেন। তখন আমরা এয়ো হয়ে গাহিব—

'আই আই আই সখি, এই কি গৌরীর বর লো,
বিয়ের বেলা এয়োব মাঝে হয় দিগম্বব লো।' ভারতচন্দ্র।

মহাযোগী মহেশ্বরের সম্ভোগকায়া আমাদেব মঙ্গল করুন॥ হরগৌরী চবণে নমস্কাব॥

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

সনাতন ধর্ম্ম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পব।)

চতুর্থ অধ্যায়।

কর্ম্মফলবাদ।

যাহা করা যায় তাহাই কর্ম্ম। প্রত্যেক কর্ম্মই ত্রিকালব্যাপী, অর্থাৎ প্রত্যেক কর্ম্মের কারণভূত অংশ অতীত, ক্রিয়মান অংশ বর্ত্তমান, এবং ফলভূত অংশ ভবিষ্যৎ। সেই জন্য কর্ম্ম বলিলে ঘটনার পারম্পর্য্য বা কর্ম্ম ও ফলের পারম্পর্য্য বা কর্ম্মচক্র বুঝায়। কর্ম্ম বলিলে, আমাদের মনে স্বতঃই জাগরুক হওয়া উচিত যে, কর্ম্মফল কর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে; কিন্তু উহা কর্ম্মেরই অংশ, কর্ম্ম হইতে উহা পৃথক করা যায় না। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, কর্ম্মের যে অংশ ভবিষ্যতের অন্তর্নিহিত তাহাই ফলপদ বাচ্য। কিন্তু ভবিষ্যৎ হইলেও উহা অর্থাৎ ফল ক্রিয়মান কর্ম্মেরই অংশমাত্র। সুতরাং দুঃখকে তাহার কারণভূত অসৎকার্য্যের অংশ বলিয়াই বুঝিতে হইবেক; এই মাত্র প্রভেদ যে, ফলাংশ কিছু পরে ঘটে। যুদ্ধ সময়ে কোন সেনা আহত হইলে তৎকালে যুদ্ধোৎসাহ বশতঃ তাহার বেদনা অনুভব না হইলেও, পরে যুদ্ধাবসানে বিলক্ষণ বেদনা অনুভব হয়। সেইরূপ মনুষ্য পাপকর্ম্ম করিবার সময় তজ্জন্য দুঃখানুভব না করিলেও পরে তাহাকে ঐ পাপের জন্য দুঃখ ভোগ করিতে হয়। আঘাত হইতে বেদনা স্বতন্ত্র নহে, অগ্নি

হইতে উত্তাপ স্বতন্ত্র নহে, পাপ হইতে দুঃখ পৃথক নহে, যদিও উহা পরে ফলরূপে অনুভূত হইয়া থাকে।

অতএব দেখা গেল যে, সকল ঘটনা, সর্ব্ব বিষয়ই পরস্পর-সম্বদ্ধ। সেই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। এমন কিছুই ঘটিতে পারে না, অতীতে যাহার কোনও কারণভূত অংশ নাই এবং ভবিষ্যতে যাহার কোনও ফল স্বরূপ অংশ থাকিবে না। দেবী ভাগবত বলিতেছেন, "অকারণং কথং কার্য্যং সংসারেঽত্র ভবিষ্যতি।"—ইহ সংসারে কোন কার্য্য অকারণে কিরূপে সংঘটিত হইবেক?" জীবাত্মা এই নিয়মতন্ত্র রাজ্যে আগমনপূর্ব্বক নৈসর্গিক বিধির সীমামধ্যেই সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিবে। যে পর্য্যন্ত জীব ঐ সমুদয় প্রাকৃতিক নিয়মের স্বরূপ সর্ব্বতোভাবে অবগত না হইয়া কার্য্য করে, ততদিন সে সম্পূর্ণ পরতন্ত্র দাস থাকে এবং প্রাকৃতিক শক্তির প্রবাহে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া বেড়ায়; ততদিন তাহাকে কর্ম্মচক্র দ্বারা পরবশে চালিত হইতে হয়। কিন্তু যখন জীব সেই সমুদায় প্রাকৃতিক তত্ত্ব জানিতে পারে তখন তাহার কর্ম্মচক্রকে চালিত করিবার সামর্থ্য জন্মে।

যেরূপ কোনও নৌকার হাল, দাঁড় ও পাল না থাকিলে তরঙ্গ ও বায়ুবশে অসহায়বৎ ইতস্ততঃ চালিত হয়, নাবিকের ঐ নৌকাকে নিজ অভীষ্ট পথে চালিত করিবার সামর্থ্য থাকে না; কিন্তু পাল, দাঁড় ও হাল পাইলে যেমন নিপুণ নাবিক নৌকাকে নিজ অভিলষিত দিকে অনায়াসে চালিত করিতে পারে, তখন বায়ু বা স্রোতের গতি প্রতিকূল থাকিলেও নৌবিস্তাররহস্যবিৎ নাবিক পালের সাহায্যে সেই বায়ু ও স্রোতের গতির সুকৌশল ব্যবহার দ্বারা অনায়াসেই তাহাদিগকে অনুকূল করিয়া লইতে পারে, সেইরূপ মানব প্রকৃতির শক্তিনিচয়ের রহস্যবিৎ হইলে, সেই সকল শক্তি কোনও সময়ে প্রতিকূল থাকিলেও উপায়বিশেষ দ্বারা সেই প্রতিকূলশক্তি হইতেই নিজের অভিমত ফল লাভ করিবার সমর্থ হইতে পারে। শক্তি অত্যন্ত প্রতিকূল হইলেও তাহার শক্তিকে বাধাদির শক্তিশূন্য করিতে সমর্থ হয়। অতএব জ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয়। অজ্ঞগণই ঘটনাচক্রের দাস জানিবে।

প্রাকৃতিক বিধিনিচয় কোনও কালেই অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনে করিও না। তাহারা কিরূপ হইলে কি হইতে পারে ইহাই নির্দ্দেশ করে মাত্র। "জল নিয়মিত

(normal) তাপে ১০০ ডি, সি পর্য্যন্ত উত্তপ্ত হইলে উথলিয়া উঠে।" ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। সুতরাং জল না উথলিয়া উঠে অথচ উত্তপ্ত হয় এরূপ প্রয়োজন হইলে ১০০ ডি, সি অপেক্ষা কম উত্তপ্ত করিলেই চলিতে পারে। যে এ তত্ত্বটী জানে সে অনায়াসে এ কার্য্য করিতে পারে। কিন্তু পর্ব্বত শিখরে বায়ুভার বা চাপ অল্প হওয়াতে ঐ পরিমাণ তাপের অপেক্ষা অল্প তাপেই জল উথলিয়া উঠিবে, অথচ ঐ তাপ রন্ধনের পক্ষে যথেষ্ট হইবে না। সুতরাং কোনও উপায়ে চাপ বৰ্দ্ধিত করিলেই কার্য্যের সুবিধা হইবে। জলপাত্রে চাপ দিয়া রাখিলে জল হইতে উৎপন্ন বাষ্প বাহির হইয়া যাইতে পারিবে না, তাহা হইলে চাপ বৰ্দ্ধিত হইবে। প্রাকৃতিক সকল বিধি সম্বন্ধেই এই নিয়ম। বিধি সকল এই মাত্র বলিতেছে কিসে কি হয়। তদনুসারে ফলাভিলাষী নিজ প্রয়োজনানুরূপ ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারিলেই ফল লাভ করিবেন। সেই জন্যই কথিত হইয়াছে "Knowledge is power" "জ্ঞানই শক্তি"।

ইতঃপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে জীবাত্মা, ইচ্ছা জ্ঞান ও ক্রিয়া এই ত্রিশক্তি-সম্পন্ন। এই তিনটী উপাধির আবরণে আসিয়া ভাবনা, বাসনা, ও ক্রিয়া হইয়াছে ; ইহাদ্বারাই মানব কর্ম্মী। এই শক্তিত্রয় নির্দ্দিষ্ট বিধির অনুগত।

বাসনা মানবের চিন্তাকে উত্তেজিত ও পরিচালিত করে, চিন্তা এই রূপে উত্তেজিত ও পরিচালিত হইয়া কর্ম্মের উৎপাদন করে এবং দৃশ্যজগতে প্রকাশিত হয়।

"কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি। স যথাকামো ভবতি তৎ ক্রতুর্ভবতি।
যৎ ক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে। যৎ কর্ম্ম কুরুতে তৎ অভিসম্পদ্যতে।"
বৃহদারণ্যক ৪।৪।৫।

"পুরুষ কামময়। তাহার যেমন কামনা, চিন্তাও তদনুরূপ ; যেমন তাহার চিন্তা তেমনি কর্ম্ম সে করে ; যেমন কর্ম্ম সে করে তদনুরূপ ফলই প্রাপ্ত হয়। এই শ্লোকের ব্যাখ্যাতে ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন বাসনা বা কামনাই এই সংসারের মূল। অতএব কর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইতে হইলে পৃথক পৃথক তিনটী তত্ত্ব অভ্যাস করিতে হইবেক। তবেই আমরা ঘটনা বৈচিত্রের কারণ সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব এবং তদনুসারে আমাদের ভবিষ্যৎ ভাগ্য নিয়মিত করিয়া অভীষ্ট ফল লাভ করিতে সমর্থ হইব।

বাসনাবশে জীব যেখানে অভীষ্ট লাভ হইতে পারে সেই স্থানে গমন করিয়া থাকে এবং তদনুসারে ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্যের স্থির করিয়া লয়।

"তদেব সক্তঃ সহ কর্ম্মণৈতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষক্তমস্য।" বৃহদারণ্যক ৬।

বাসনাপাশে জীব অভীষ্ট বিষয়ে আবদ্ধ হয়। সেই বন্ধন অচ্ছেদ্য। যে মানবের যেরূপ কামনা, সে সেই কাম্যবস্তুর সন্নিকটে বাধ্য হইয়া গমন করিয়া থাকে। কাম্যবস্তুই অভীষ্ট ফল। যে মানব যে ফলের বাঞ্ছা করিয়াছে, তাহা যেখানেই থাকুক না কেন অবশ্যই সে তাহা প্রাপ্ত হইবেক। মানব "কামকারেণ ফলেসক্তো নিবধ্যতে।" সে ফল ভালই হউক মন্দই হউক, সৎ হউক বা অসৎই হউক, আনন্দজনক হউক আর কষ্টকর হউক, বিধি সর্ব্বত্র একবিধ। যতদিন মানব ফলাকাঙ্ক্ষী, সে ততদিন তাহাতে বাসনাসূত্রে আবদ্ধ, ততদিন সৎ বা অসৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে। যখন মানব এই বিষয় জানিতে পারে, তখন সে আপনার বাসনার প্রতি লক্ষ্য রাখে, এবং যাহার ফল শুভজনক সেইরূপ কর্ম্ম করিতে যত্নবান হয়। তাহা হইলে জন্মান্তরে তাহা আয়ত্ত করিতে পারে। ইহাই বাসনাময়ী প্রকৃতির প্রথম বিধি।

দ্বিতীয় বিধি—মনের সহিত সম্বন্ধ। মনই সমস্ত কার্য্যের কারণ। মানব যেমন চিন্তা করে ক্রমে তদনুরূপ হইয়া পড়ে। ছান্দোগ্য উপনিষদে লিখিত আছে ;—

"অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথা ক্রতুরস্মিঁল্লোকে পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্যভবতি।"

ব্রহ্মা ধ্যান করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মানবের মন তাঁহারই প্রতিবিম্ব, সেই জন্য মন সৃষ্টিকার্য্যে নিপুণ। ব্রহ্মা ক্রিয়ার উৎপাদক, কিন্তু তাঁহার সমস্ত ক্রিয়াই ধ্যান ; সেই ধ্যান হইতেই জগৎ সৃষ্টি। চিন্তা বহির্জ্জগতে প্রকট হইয়াই ক্রিয়ারূপ ধারণ করে। কার্য্যমাত্রই অতীত চিন্তার ভৌতিক প্রকাশ। ব্রহ্মা যেমন তাঁহার ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন, মনও তাহার চিন্তা সেই রূপই সৃষ্টি করিয়া থাকে। মানবের চরিত্রও চিন্তাজাত ; এবং তাহাই মানবের কর্ম্মের উপাদানত্রয়ের অন্যতম। মানব অনবরত ভাবনার ফলেই সে যাহা তাহাই হইয়াছে। সে বর্ত্তমান সময়ে অনবরত যেরূপ ভাবনা

করিয়েছে, ভবিষ্যতে অবশ্যই তদনুরূপ হইবে। যদি মানব সচ্চিন্তায় কালযাপন করে তাহা হইলে অবশ্যই সৎ হইবে; অনবরত অসৎচিন্তায় ব্যাপৃত থাকিলে অসৎ হওয়াও অবশ্যম্ভাবী। ইহা জানিয়া মানবের যত্ন-পূর্ব্বক আত্মগঠনে সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। সৎ, পবিত্র ও উন্নত বিষয়ে মন ব্যাপৃত রাখিলে অবশ্যই আত্মোন্নতি সাধিত হইবেক। জঘন্য বিষয়ে ব্যাপৃত রাখিলে অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী।

তৃতীয় বিধি—কর্ম্মাশ্রিত কর্ম্মানুরূপ অবস্থা সংঘটিত হইয়া থাকে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে লিখিত আছে ;—

"যথা যথা কর্ম্মগুণং ফলার্থী করোত্যয়ং কর্ম্মফলে নিবিষ্টঃ।
তথা তথায়ং গুণসংপ্রযুক্তঃ শুভাশুভং কর্ম্মফলং ভুনক্তি॥"

ফলের আশায় যে যেমন করে
সদসৎ কাজ যেবা।
সে কাজের গুণে করে সেই মত
শুভাশুভ ফল সেবা॥

"ন জীবাজ্জায়তে কিঞ্চিৎ নাকৃত্বা সুখ মেধতে।
সুকৃতৌ বিন্দতে সৌখ্যং প্রাপ্য দেহক্ষয়ং নরঃ॥"
"জীব বিনা না জনমে কিছু, কর্ম্ম বিনা নহে সুখোদয়।
সুকৃতির ফলে ফলে সুখ, যদি তাহে দেহ হয় ক্ষয়॥"

মানব যদি নিজের চারিদিকে ইহজীবনে সুখের হাট বসাইতে পারে, পরত্র অবশ্যই অশেষ সুখলাভে সমর্থ হইবেক সন্দেহ নাই। জগতের সর্ব্বত্রই যদি দুঃখ বিস্তার করাই তাহার জীবনের কার্য্য হয়, তবে পরত্র তাহার ভাগ্যে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। এই অখণ্ডনীয় বিধি অবগত হইয়া মানব সেইরূপ কর্ম্ম করিতে যত্নবান হইবে যাহা দ্বারা পরত্র সুখী হইতে পারে। ইহাই তৃতীয় কর্ম্মবিধি।

এই বিধিত্রয় কর্ম্মফলের প্রবর্ত্তক। জীবাত্মা ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি দ্বারা অন্বিত। ঐ শক্তিত্রয়ের পার্থিব বিকাশ,—বাসনা, ভাবনা ও ক্রিয়া। আমরা বুঝিবার সুবিধার জন্য মানবভাগ্যকে সুযোগ, স্বভাব ও ঘটনারূপ ত্রিবিধ ভাগে বিভক্ত করিয়া বিচার করিলাম।

আমরা দেখিলাম আমরা নিরন্তর কর্ম্ম করিতেছি এবং পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের

ফলভোগ করিতেছি। আমরা অতীত কালে যেরূপ কার্য্য করিয়া আপনাকে গঠিত করিয়াছি তদনুরূপ কার্য্য আমরা বর্ত্তমান সময়ে বাধ্য হইয়া সম্পন্ন করিতেছি। তখন আমরা যেরূপ বাসনা করিয়াছিলাম, এখন সেইরূপ বিষয়ভোগ করিবার সুযোগ পাইতেছি। তখন যেরূপ শক্তিলাভের চেষ্টা করিয়াছিলাম, এখন সেইরূপ শক্তির চর্চ্চায় জীবন যাপন করিতেছি। কিন্তু যে জীবাত্মা, তখন বাসনা, ভাবনা বা কার্য্য করিয়াছিল, আজিও সে সেইরূপ শক্তিমান; এখনও সে সেই ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির যথাযথ স্ফুরণ করিয়া পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল হ্রাস বা নাশ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য উন্নততর অবস্থার সংঘটন করিতে সমর্থ। এইজন্য ভীষ্মদেব ভাগ্য অপেক্ষা পুরুষকারের প্রশংসা করিয়াছিলেন।

কর্ম্মফলের অবশ্যম্ভাবিতার জন্য যদি মানব চেষ্টাকে পরিত্যাগ করে, তবে সে মত নিতান্ত হেয়। কর্ম্ম পথদর্শক, ক্রিয়াশক্তির অবসাদক নহে।

কর্ম্মফল সম্বন্ধে একটি বড় জটিল প্রশ্ন সচরাচর উত্থিত হয়; অনেকেই প্রশ্ন করেন "যদি মানব কর্ম্মফলজাত ভাগ্যবশে মঙ্গল বা অমঙ্গল ভোগ করিতে বাধ্য হয়, যদি ভাগ্যবশেই তাহার সমস্ত কর্ম্ম সিদ্ধ বা অসিদ্ধ হয়, তবে আর চেষ্টার প্রয়োজন কি'? এইরূপ সিদ্ধান্ত যে ভ্রমপূর্ণ, তাহা সহজেই স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যাইবেক। পূর্ব্বোক্ত বিষয়টী যদি ধীরভাবে চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে স্পষ্টই উপলব্ধ হইবে যে, সাধারণে কর্ম্মচক্র সম্বন্ধে ভ্রমপূর্ণ সিদ্ধান্ত স্থির রাখিয়াছে। চেষ্টাটীও কর্ম্মের অঙ্গ, শুভাশুভ ফলও তাই; কর্ম্মচক্র কোন দিনই সম্পূর্ণরূপে ফলোন্মুখ অবস্থায় বর্ত্তমান নহে, কিন্তু চিরদিনই আবর্ত্তিত হইতেছে; ইহা কেবল ভবিষ্যতের জন্য অতীত কার্য্যদ্বারা স্থিরীকৃত নহে, কিন্তু বর্ত্তমান কর্ম্মদ্বারা নিরন্তর গঠিত ও পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যখন কোনও মানব সৎ হইবার জন্য ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তৎকালে তাঁহাতে যে শক্তি কার্য্য করিতে থাকিবে তাহার মঙ্গলময় ফলে অচিরেই সাধুমার্গে অবলম্বনে সমর্থ হইবেন, এবং সঙ্গে পূর্ব্বতন অসাধুমার্গ ক্রমে ক্রমে পরিত্যক্ত হইবেক সন্দেহ নাই। মানব এমত অসহায় জীব নহে যে, কর্ম্ম বিতাড়িত হইয়া সৎ বা অসৎ হইবেক। কিন্তু তিনি নিরন্তর যেরূপ বাসনা করিবেন, সেইরূপ হইতে পারিবেন। মানব কখনও নিশ্চেষ্ট নাই ও নিশ্চেষ্ট থাকিতেও পারিবে না।

মানব জীবিতাবস্থায় সৎ বা অসৎ এক বিষয়ে চেষ্টা করিতে বাধ্য। সেই চেষ্টা সদ্বাসনা নিয়ন্ত্রিত হইলেই, সে নিজ অদৃষ্ট ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবে; এবং অনিয়ন্ত্রিত চেষ্টাই আলস্যাদি রূপে অদৃষ্ট-আবর্ত্তে হাবুডুবু খাওয়াইবে। মানবের সদ্বাসনা করিবার অধিকার আছে, সদ্বিষয়ে চিন্তা করিবার শক্তি আছে এবং সৎকার্য্য করিবার জন্য যত্ন করিবার ক্ষমতা আছে। দেবতাগণ সেইরূপেই দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। অন্যেও সেইরূপ চেষ্টা করিয়া মহত্ত্ব লাভে সমর্থ হইতে পারেন।

কর্ম্মণেন্দ্রো ভবেজ্জীবো ব্রহ্মপুত্রঃ স্বকর্ম্মণা।
স্বকর্ম্মণা হরের্দাসং, জন্মাদি রহিতো ভবেৎ॥
স্বকর্ম্মণা সর্ব্বসিদ্ধিমমরত্বং লভেদ্ধ্রুবং।
লভেৎ স্বকর্ম্মণা বিষ্ণোঃ সালোক্যাদি চতুষ্টয়ং॥
সুরত্বঞ্চ মনুত্বঞ্চ রাজেন্দ্রত্বং লভেন্নরঃ।
কর্ম্মণাচ শিবত্বঞ্চ গণেশত্বং তথৈবচ॥" দেবী. ভাঃ ৯।২৭।১৮।২০।
কর্ম্মবশে ইন্দ্র পদ লাভ করে, স্বকর্ম্মের ফলে জীব ব্রহ্মপুত্র হয়।
কর্ম্মবশে জীব হরিদাস্য লাভ করি, জন্মাদি রহিত হতে পারে সুনিশ্চয়॥
স্বকর্ম্মের ফলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়, অমরত্ব লভিবারে পারে কর্ম্মফলে।
বিষ্ণুর সালোক্য আদি মুক্তি চতুর্ব্বিধ, কর্ম্মফলে লাভ হয় জানেতো সকলে॥
সুরত্ব নরত্ব লাভ কর্ম্মফলে হয়, লভয়ে রাজেন্দ্রপদ কর্ম্মফলে নর।
কর্ম্মফলে শিবপদ লভে সুনিশ্চয়, কর্ম্মফলে হতে পারে জীব গণেশ্বর॥"

ইহা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে যে কর্ম্ম হইতে কর্ম্মফল উৎপন্ন হইতেছে। সেই কর্ম্ম অপর হইতে উৎপন্ন হয়, নাই, ভোক্তাই তাহার উৎপাদন ও পোষণ কর্ত্তা, তাহার নিজ কর্ম্মই সেই ফলের জনক। সুতরাং ঐকান্তিকতার সহিত চেষ্টা করিলে তাহার ফলের ব্যতিক্রম করিবার শক্তিও তাঁহার মধ্যেই আছে। কর্ম্মফল তত্ত্ব সম্বন্ধে সাধারণ মানবের সময়ে সময়ে আর একটী ভ্রম দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কাহাকে কষ্ট ভোগ করিতে দেখিলে বলে "এই ব্যক্তি স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে; তাহার সাহায্য করিলে কর্ম্মফলের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে হইবেক।" "যাঁহারা এরূপ বলেন তাঁহারা সেকালে ভুলিয়া যান যে সকলেই অপরের কর্ম্মসহায়,

এবং সকলেই নিজকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করেন। যদি আমরা কোনও বিপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য করিয়া তাহার বিপদের হ্রাস সম্পাদন করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার তৎকালিক কর্ম্মফলের হ্রাস হইবেক। তখন আমরা তাহার কর্ম্মফল হ্রাসরূপ কর্ম্মের কর্ত্তা হইয়া তাহার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল চক্রের আবর্ত্তনে সহায়তা করিলাম। যদি আমরা আমাদের সাধ্যায়ত্ত কর্ম্মদ্বারা সেই বিপন্নের বিপদনাশে সহায়তা না করি, তাহা হইলেও আমাদের দ্বারা কর্ম্ম হইল; কিন্তু সে কর্ম্ম অকর্ম্ম; সে অকর্ম্মেরও ফল আছে। তাহা আমরা অবশ্যই ভোগ করিব। হয়ত সেই ক্ষেত্রে আর কেহ, সেই বিপন্নকে সাহায্য করিয়া সৎকর্ম্ম ফলের অধিকারী হয়। আমরা আমাদের জ্ঞানের সাহায্যে আমাদের কর্ম্ম বা কর্ত্তব্য নিরূপণ করিব। আমরা জানি বিপন্নকে সাহায্য করা সৎকার্য্য, কারণ সাধুগণ ভূয়োভূয়ঃ এই উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। যে কারণে যে অতীত কার্য্যের ফলে বর্ত্তমানে কষ্টরূপ কর্ম্মফল ঘটিতেছে, সেই কারণ ভূত কর্ম্মের সম্পূর্ণ সুপরিস্কৃত জ্ঞান দ্বারা সেই বিপন্ন সাহায্যের উপযুক্ত কিনা তাহা স্থির করিয়া লইতে হইবেক।

কর্ম্ম ত্রিবিধ;—প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও বর্ত্তমান বা আগামী। যে কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী কোন রূপেই অতিক্রম করা যায় না তাহাই প্রারব্ধ কর্ম্ম। অতীতে যে সমস্ত কর্ম্ম করা হইয়াছে এবং যাহাদ্বারা কর্ত্তার বর্ত্তমান প্রকৃতি, শক্তি, ধারণা প্রভৃতি জন্মিয়াছে অথচ, এখন সম্পূর্ণ পক্ক হইয়া ফলোন্মুখ হয় নাই, তাহাকেই সঞ্চিত কর্ম্ম বলা যায়। আর যে কর্ম্ম বর্ত্তমানে সম্পন্ন করা হইতেছে তাহাই বর্ত্তমান কর্ম্ম; তাহার ফল পরে হইবেক এই জন্য তাহাকে আগামীও বলা যায়।

"অনেক জন্ম সঞ্জাতং প্রাক্তনং সঞ্চিতং স্মৃতং।
ক্রিয়মানঞ্চ যৎ কর্ম্ম বর্ত্তমানং তদুচ্যতে॥
সঞ্চিতানাং পুনর্ম্মধ্যাৎ সমাহিত্য কিয়ংকিল।
দেহারম্ভে চ সময়ে কালঃ প্রেরয়তীব তৎ॥
প্রারব্ধং কর্ম্ম বিজ্ঞেয়ং" ..... (দেবী ভাগবত ৬।১।৯।১২।১৭)

"পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মসমূহে যে সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদিত হইয়াছে তাহারাই

সঞ্চিত কর্ম্ম। যে কর্ম্ম বর্ত্তমান সময়ে সম্পাদিত হইতেছে, তাহারই নাম বর্ত্তমান কর্ম্ম। এবং সঞ্চিত কর্ম্ম সমূহের মধ্যে যে গুলি কাল শক্তিতে নবদেহারম্ভের পূর্ব্বে ফলোন্মুখ হইয়া মানবকে আশ্রয় করিয়া আসে, তাহারই নাম প্রারব্ধ কর্ম্ম।"

সঞ্চিত কর্ম্ম কেবল মানবের পশ্চাতে সঞ্চিত অবস্থাতেই আছে, মানবের প্রবৃত্তি তাহার ফলভোগের জন্য ব্যাকুল; কিন্তু তখনও তাহা প্রারব্ধে পরিণত হইয়া ফলোন্মুখ হয় নাই। বর্ত্তমান কর্ম্ম ভবিষ্যতের জন্য ও আগামী কালের জন্য কর্ম্মফলের আয়োজনে ব্যস্ত; কেবল প্রারব্ধ সুপক্ক ফল লইয়া কর্ত্তার জন্য বর্ত্তমানের ক্ষেত্রে উপস্থিত আছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে লিখিত আছে, সঞ্চিত কর্ম্মসমূহ হইতে কাল শক্তিদ্বারা প্রারব্ধে পরিণত হয়। বেদান্ত গ্রন্থ সমূহে এই প্রারব্ধকে গুণনির্ম্মুক্ত বাণের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। কর্ম্মফলদাতা দেবতাগণ সঞ্চিত কর্ম্মসমূহের মধ্যে কতকগুলিকে বর্ত্তমান দেহে উপভুক্ত হইবার উপযোগী বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন; এবং তদুপযুক্ত জনক জননী, জাতি, সমাজ, দেশ, কাল ও সহযোগীগণেরও আয়োজন করিয়া থাকেন। কারণ ভোগ ব্যতীত প্রারব্ধের খণ্ডন হইতে পারে না। প্রারব্ধের পরিবর্ত্তন মনুষ্য চেষ্টার অতীত, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। প্রারব্ধের ফল ভোগের দ্বারাই ক্ষয়িত হয়। ইহার একমাত্র প্রতিকার এই যে দুঃখে দুঃখ উপেক্ষা পূর্ব্বক সন্তোষ ও সহিষ্ণুতার সহিত ভোগ করা;—যেন ঋণ পরিশোধিত হইতেছে—দায়িত্বের অবসান হইতেছে।

"প্রারব্ধ কর্ম্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ।"

প্রারব্ধ কর্ম্ম কেবল ভোগ দ্বারাই ক্ষয় হয়। সঞ্চিত কর্ম্ম সুসংযোগ দ্বারা পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে। পাপ প্রবৃত্তি সাধনদ্বারা নষ্ট করা যাইতে পারে, সৎপ্রবৃত্তি সাধনদ্বারা বর্দ্ধিত করা যায়। প্রত্যেক চিন্তা, বাসনা ও ক্রিয়ার দ্বারা আমরা পরজন্মের জন্য কর্ম্ম সঞ্চিত করিয়া থাকি। (ক্রমশঃ)

চৈতন্য কথা।

বুদ্ধদেব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ভগবান বুদ্ধদেব কপিলাবস্তু নগরে ন্যগ্রোধারামে শাক্যদিগের মধ্যে সেকালে অবস্থিতি করিতেছিলেন। গোতমী মহা প্রজাবতী ধীরে ধীরে উপনীত হইয়া, এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন এবং দণ্ডবৎ প্রণামানন্তর সবিনয়ে বলিতে লাগিলেন—"ভগবন্, স্ত্রীলোকে কি গৃহত্যাগ করিয়া তথাগত প্রবর্ত্তিত ভিক্ষুর আশ্রম অবলম্বন করিতে পারিবে না?" গর্জ্জন করিয়া বুদ্ধদেব বলিলেন "যথেষ্ট হইয়াছে! গোতমী, আপনি এরূপ আজ্ঞা করিবেন না।" দ্বিতীয় বার, তৃতীয় বার মহা প্রজাপতি অনুনয় করিলেন। বুদ্ধদেব স্থিরপ্রতিজ্ঞ।

কপিলাবস্তু ত্যাগ করিয়া বুদ্ধদেব বেসালী নগরীতে উপনীত হইলেন। এবং মহাবনে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

গোতমকুলরমণী মহা প্রজাপতি, মাথার চুল কাটিয়া ফেলিলেন। এবং গৌরিক বসন পরিধান করিয়া, কতকগুলি শাক্য রমণী সমভিব্যাহারে বেসালী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যথাকালে তিনি বেসালী নগরীতে মহাবনে উপনীত হইলেন। কণ্টক বিদ্ধ, ধূলি ধূসরিত চরণে রোদন করিতে করিতে তিনি, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। আনন্দ তাঁহাকে এই ভাবে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এরূপে আপনি এখানে কেন?" "আনন্দ! ভগবান্ রমণীকে তাঁহার প্রবর্ত্তিত গৃহত্যাগী ভিক্ষুর ব্রত হইতে বঞ্চিত করিতেছেন, তাই আমি ভিক্ষুকের ন্যায় এখানে দণ্ডায়মান!" আনন্দ আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি সেই মুহূর্ত্তে ভগবান্ বুদ্ধদেবের নিকট গমন করিলেন, এবং কাতর স্বরে বলিলেন "ভগবন্, কৃপা কর। গোতমী মহা প্রজাপতি দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। তাঁহার পথশ্রান্ত, ধূলিময় চরণ। তাঁহার নয়নে বারি ধারা পতিত হইতেছে। আপনি রমণী জাতিকে ভিক্ষু ধর্ম্মের অধিকারী করুন।" গর্জ্জন করিয়া বুদ্ধদেব বলিলেন, "আনন্দ এরূপ কথা বলিও না।" দ্বিতীয় বার, আনন্দ অনুনয় করিলেন। সেই এক উত্তর। তখন আনন্দ

নিজের মনে যুক্তি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্, যদি স্ত্রীলোকে গৃহ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে, যদি তাহারা ভিক্ষুর ব্রত অবলম্বন করিয়া আপনার উপদিষ্ট মত এবং শাসনের অনুসরণ করে, তাহা হইলে কি তাহারা দীক্ষার ফল লাভে অসমর্থ হইবে? তাহারা কি ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় মার্গ এবং অবশেষে অর্হতের সিদ্ধ অবস্থায় উপনীত হইতে পারিবে না?" বুদ্ধদেব বলিলেন, "অবশ্য তাহারা এই যোগমার্গের পথিক হইতে সমর্থ।" "তবে ভগবন্, আপনি গোতমী মহাপ্রজাপতিকে কেন বঞ্চিত করিবেন? তিনি আপনার পিতৃব্য পত্নী। আপনার মাতা পরলোক গমন করিলে, তিনিই আপনাকে স্তন্য-দানে বর্দ্ধিত করিয়াছেন। আজ সেই আপনার পরমোপকারিণী মহা প্রজাপতির কথায়, রমণী জাতিকে অধিকার প্রদান করুন।" বুদ্ধদেব সম্মতি প্রদান করিলেন। মহাপ্রজাপতি দীক্ষিতা হইলেন।

গোতম বুদ্ধের স্বর পরিবর্ত্তিত হইল। অতি গম্ভীর ভাবে তিনি বলিতে লাগিলেন, "আনন্দ, যদি রমণী জাতি দীক্ষার অধিকার না পাইত, তাহা হইলে এই পবিত্র বৌদ্ধধর্ম্ম সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত প্রচলিত থাকিত। এখন কেবল মাত্র পাঁচশত বৎসর এই ধর্ম্ম জগতে আপনার অধিকার বিস্তার করিবে। আনন্দ, যদি কোন গৃহে স্ত্রীলোকের আধিক্য হয়, তাহা হইলে সহজে সে গৃহে দস্যুর উৎপাত হয়।" Sacred Books of the East, Vol XX pages 320-326.

যীশুখ্রীষ্টের জন্ম গ্রহণ করিবার ৪৭৭ বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেব শরীর ত্যাগ করিয়াছিলেন। যীশুখ্রীষ্ট জন্মগ্রহণ করিলেই তিনি ধর্ম্ম প্রচারকের অধিকার প্রত্যাহৃত করিয়া, পরনির্ব্বাণ লাভানন্তর অবতারের উচ্চপদবীতে আরোহণ করিলেন। তাঁহার পবিত্র কিরণ মাত্র এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে তাঁহার নিদর্শন থাকিয়া গেল।

পাঁচশত বৎসর তথাগত প্রচলিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের যথার্থ জীবন। পাঁচশত বৎসরের পর নাগার্জ্জুন এই ধর্ম্মের নেতা। পাঁচশত বৎসর ব্যাপী মহাতেজস্বী ধর্ম্ম মধ্যেই বুদ্ধদেবের মাহাত্ম্য অনুসরণ করিতে হইবে।

এই কাল পরিচ্ছেদ কেন? ধর্ম্মের চরম উদ্দেশ্য কি? এধর্ম্মে আছে কি ও নাই কি? বৌদ্ধ ধর্ম্মে আছে আত্মবল, নাই ঈশ্বর সহকারিতা। আছে

বাসনা ত্যাগ, ব্রহ্মাণ্ড নাশ, আছে নির্ব্বাণ, নাই নির্ব্বাণের অবশেষ। আছে প্রকৃতির উপর কটাক্ষ, নাই পুরুষের কেবলতা। আছে মায়াত্যাগ, নাই স্বরূপাবস্থিতি। আছে পরিণাম জ্ঞান, নাই অপরিণামী।

ফল,—বাসনা ত্যাগ দ্বারা, ধর্ম্ম আচরণ দ্বারা ঐশ্বর্য্য লাভ ও উর্দ্ধলোকে গমন। কিন্তু উর্দ্ধাদপি উর্দ্ধলোক, ক্রমে ব্রহ্মলোক গমন করিয়া, ব্রহ্মলোকের বাসনা ত্যাগ দ্বারা ব্রহ্মলোক হইতে মুক্ত হইলে ভবিষ্যৎ শূন্যময়।

ফল, যোগ মার্গের পুনরুদ্ধার, যোগের বিস্তৃতি লাভ, পরে যোগ দ্বারা নির্ব্বাণ মুক্তি।

কিন্তু নিরীশ্বর, ব্রহ্মজ্ঞান রহিত, প্রকৃতির ক্ষণিক বিজ্ঞান দ্বারা শূন্য-চিন্তক, ব্যক্তির বাসনা নাশ কোথায়? কিসের জন্য বাসনা নাশ? শূন্য দর্শীর প্রয়োজনই বা কি, অপ্রয়োজনই বা কি?

বাসনার মূলে কুঠারাঘাত করিলে, মনুষ্যের চরমলাভ হয় বটে, কিন্তু সে কি শূন্য লাভ? বুদ্ধদেব যদিও শূন্য বলেন নাই, তথাপি তিনি কিছুই বলেন নাই। তাঁহার ধর্ম্মে Metaphysics নাই, Absolute Reality নাই, Thing-in-itself নাই। বাসনা ত্যাগ তবে কিসের জন্য? কেবল মাত্র দুঃখ নাশের জন্য; আনন্দ প্রাপ্তির জন্য নহে। দুঃখময় জীবন এবং ভাল, নাশের চিত্র চিরভয়ঙ্কর। নির্ব্বাণের পর বুদ্ধদেব ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিলেন। তিনি পরম আনন্দ লাভ করিলেন। কিন্তু এ কথা ত শিক্ষা দিয়া আসেন নাই। সুতরাং চিত্তের আবেগে তিনি শঙ্করাচার্য্য হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

হিন্দু দর্শন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

শ্রীচৈতন্যদেব বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে এইরূপ তিরস্কার করিয়াছিলেন:—

মায়াবশি, মায়াবশ, ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীব ঈশ্বর সহ কহ ত অভেদ॥

গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানে। (গীতা ৭।৫ ,।)

হেন জীব অভেদ কর ঈশ্বরের সনে ?" ।

এই অভেদ করে কে ? করে একমাত্র মায়াবাদী। এই জন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"জীবের নিস্তার লাগি সূত্র কৈল ব্যাস।

মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ ॥" শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ ছাড়িয়া এক্ষণে বৈষ্ণবদর্শনের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাউক। বৈষ্ণবগণ চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত, (১) শ্রী সম্প্রদায় (২) ব্রহ্ম বা মাধ্বী সম্প্রদায় (৩) রুদ্র সম্প্রদায় (৪) সনক সম্প্রদায়। শ্রী সম্প্রদায়ের আদ্যাচার্য্য শ্রীরামানুজ স্বামী, মাধ্বী সম্প্রদায়ের শ্রীমধ্বাচার্য্য স্বামী, রুদ্র সম্প্রদায়ের শ্রীবিষ্ণু স্বামী, ও সনক সম্প্রদায়ের শ্রীনিম্বাদিত্য স্বামী। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বৈষ্ণবদর্শনের আবিষ্কৃত। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব মাধ্বী সম্প্রদায় ভুক্ত। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য খণ্ডন করিয়া অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ স্থাপন করেন ; এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদই দর্শন-শাস্ত্রের পরিণতি বলিতে হইবে। শ্রীপাদ রামানুজস্বামী, মধ্বাচার্য্যস্বামী, বল্লভাচার্য্য ও বলদেব বিদ্যাভূষণ বেদান্তসূত্রের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদপোষক ভাষ্য এবং অনুভাষ্য প্রভৃতি লিখিয়াছেন। বেদান্তদর্শনেও আশ্মরথ্য, ঔড়লোমি, কাশকৃৎস্ন প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য বেদান্তদর্শনের ভক্তিমার্গপ্রবর্ত্তক ভাষ্য ও মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া "শত দূষণী" নাম্নী সংহিতা লিখিয়াছেন। শ্রীমধ্বা-চার্য্যের অপর নাম শ্রীপাদ আনন্দতীর্থ আচার্য্য, তৎকৃত দর্শনের নাম সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে 'পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনম্' দেওয়া আছে। শ্রীমধ্বাচার্য্য ও শ্রীরামানুজ উভয়েই মান্দ্রাজ অঞ্চলের লোক ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব বাঙ্গালা ৮৯২ সনে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীরামানুজ স্বামী বেদান্তদর্শনের এক ভাষ্য লিখিয়াছেন, তাঁহার দর্শনের নাম রামানুজ দর্শন। শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ চৈতন্যদেবের পদাশ্রিত ছিলেন ; তিনি গোবিন্দভাষ্য নামক বেদান্তদর্শনের এক ভাষ্য লিখিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক বৈষ্ণব শ্রীজীব গোস্বামী "ষট্‌সন্দর্ভ" প্রণয়ন করিয়া দ্বৈতবাদ স্থাপন ও মায়াবাদ খণ্ডন

করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ দেব বাল্যকালে মুরারিগুপ্তের অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদের বিচার শুনিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার অন্নের থালার উপর প্রস্রাব করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন,—

"হাত আর মাথা নাড়া ছাড় হে মুরারি।
জ্ঞান ও বক্তৃতা ছাড় ভজ হে শ্রীহরি॥
জীবে আর ভগবানে ভিন্ন যে না করে।
প্রস্রাব করি আমি তার থালের উপরে॥"

শ্রীমধ্বাচার্য্যের শিষ্য পদ্মনাভ আচার্য্য, তাঁহার শিষ্য নরহরি, তাঁহার শিষ্য দ্বিজমাধব, তাঁহার শিষ্য অক্ষোভ, তাঁহার শিষ্য জয়তীর্থ, তাঁহার শিষ্য জ্ঞানসিন্ধু, তৎশিষ্য বিদ্যানিধি, তৎশিষ্য রাজেন্দ্র, তৎশিষ্য জয়ধর্ম্ম মুনি ও বিষ্ণুপুরী (ভক্তিরত্নাবলীর লেখক)। জয়ধর্ম্মমুনির শিষ্য পুরুষোত্তম ব্রহ্মণ্য, তৎশিষ্য ব্যাসতীর্থ (বিষ্ণুসংহিতা লেখক), তৎশিষ্য লক্ষ্মীপতি, তাঁহার শিষ্য শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী, যিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের আদি সূত্রধার। তাঁহার শিষ্য শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকট মহাপ্রভু চৈতন্যদেব মন্ত্র গ্রহণ করেন।

বৈষ্ণবগণ মায়াবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলেন। বাস্তবিক মায়াবাদে ও বৌদ্ধমতে পার্থক্য অতি সামান্য। ম্যাডাম ব্লাভাট্‌স্কীর মতে শঙ্করাচার্য্য বুদ্ধদেবের অবতার। (Secret Doctrine, Vol III)। বৌদ্ধগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত:—মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক। মাধ্যমিক মতে কিছুই নাই, সকলই শূন্য। এই সকল মতের বিস্তারিত পরিচয় পরে দেওয়া হইবে। অন্যান্য ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রেরও বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। সুপ্রসিদ্ধ ষড়দর্শনের নাম সকলেই অবগত আছেন। তাহা ব্যতীত মায়াবাদ দর্শনকে শঙ্করদর্শন ও অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ দর্শনকে বৈষ্ণব দর্শন সংজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে। এই দুই মতের ঐক্য ও অনৈক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই দর্শন পাঠের উদ্দেশ্য সফল হয়। এতদ্ব্যতীত বেদবিরোধী চার্ব্বাক দর্শন আছে, জিনোক্ত তত্ত্বানুবর্ত্তী জৈনমত ও অন্যান্য মতপোষক আর্হত দর্শন আছে। নকুলীশ পাশুপত দর্শন (মহাদেব পরমেশ্বর ও জীবগণ পশু। শৈবদর্শন (ভক্তবৎসল

শিবদেবতাই পরমেশ্বর ও জীবগণ পশু), প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন (ভক্তবৎসল মহেশ্বরই জগদীশ্বর), রসেশ্বর দর্শন (পারদ পদার্থের বিষয় ও মহেশ্বরই পরমেশ্বর এবং জীবাত্মাই পরমাত্মা), পাণিনি দর্শন (শব্দানুশাসন ও ব্যাকরণ), রামানুজ দর্শন (অদ্বৈত মত খণ্ডনকারী এক প্রকার বৈষ্ণব দর্শন), পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শন (আনন্দতীর্থ স্বামীকৃত ভাষ্যাবলম্বনে পূর্ণপ্রজ্ঞ কর্তৃক সঙ্কলিত এক প্রকার বৈষ্ণব দর্শন) আছে। এই সকল দর্শনেরও যথাসাধ্য বিস্তৃত বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে। শ্রীরামানুজ ভেদ, অভেদ ও ভেদাভেদ অঙ্গীকার করেন। পূর্ণপ্রজ্ঞ বলেন যে, রামানুজের মত শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদপোষক, সুতরাং অশ্রদ্ধেয়। ইনিই 'তত্ত্বমসি' মন্ত্রকে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

বেদের অন্তভাগের—শিরোভাগের নাম বেদান্ত বা উপনিষৎ। বেদান্তসারে আছে :—"বেদান্তো নাম উপনিষৎ প্রমাণং তদুপকারিণি শারীরক সূত্রাদীনিচ" (শ্রীমৎ সদানন্দ যোগীন্দ্র।)

উপনিষৎই প্রকৃত বেদান্ত। উপনিষদের প্রকৃত মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিবার জন্য মহর্ষি বেদব্যাস বেদান্তসূত্র বা শারীরকসূত্র বা বেদান্তদর্শন বা ব্রহ্মসূত্র বা উত্তর মীমাংসার প্রণয়ন করিয়াছেন। বেদান্ত অপৌরুষেয় বাক্য; কিন্তু বেদান্তদর্শন, কিম্বা বেদান্তদর্শনের, ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পুরুষের বাণী—ভ্রমপ্রমাদ শূন্য পুরুষের বাণী। বেদান্ত অনন্তরত্ন প্রভব, ইহার কাঠিন্য 'সৌভাগ্য বিলোপি' হয় নাই। বেদান্ত, জগতের সমগ্র দর্শন শাস্ত্রের, ধর্ম্মশাস্ত্রের ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের উৎস।

শ্রুতির্মাতা পৃষ্টা দিশতি ভবদারাধন বিধিং
যস্যা মাতুর্বাণী স্মৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী।
পুরাণাদ্যা যে বা সহজনিবহা স্তে তদনুগা
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভবানেব শরণং॥

শ্রুতি নিখিল শাস্ত্রের মাতা, তিনি জিজ্ঞাসিতা হইয়া (মুনিগণ কর্ত্তৃক) আপনার (শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সার বস্তু, জীবের উপাস্য ও শ্রুতির প্রতিপাদ্য) আরাধনা বিধি উপদেশ করেন। বেদমাতা হইতে নির্গলিতা স্মৃতি ভগিনী

স্বরূপা, তিনিও মাতা হইতে প্রাপ্ত উপদেশই শিক্ষা দিয়া থাকেন। পুরাণাদিও বেদ হইতে উদ্ভূত ও বেদার্থ প্রকাশক, তাঁহারা ভ্রাতৃস্বরূপ, সেই উপদেশই দেন। অতএব হে গোবিন্দ! তুমিই একমাত্র শরণ্য, ইহা আমি শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ হইতে অবগত হইলাম।

বেদান্ত দর্শন, বেদান্ত বা উপনিষৎ সমূহের সমন্বয় ব্যাখ্যা। ষড়দর্শনের প্রণেতৃগণ অধিকার অনুসারে উপনিষদের ব্যাখ্যা করিয়া যুক্তি বলে স্বীয় স্বীয় মত সংস্থাপন করিয়াছেন। দর্শনত্যাগ করিয়া শুধু উপনিষদ পাঠ করিলে উপনিষদের মর্ম্ম সম্যক্‌রূপে অবধারণ করা কঠিন হয়। বিশেষতঃ কোন্ গ্রন্থ প্রকৃত উপনিষৎ, কোন্ গ্রন্থ নকল ও কৃত্রিম তাহা দর্শনশাস্ত্র চক্ষু ভিন্ন নির্ণয় করা দুর্ঘট। মুক্তিকোপনিষদে ১১৮০ খানা উপনিষদের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে থিওসফী সম্প্রদায় হইতে ১০৮ খানা মুদ্রিত হইয়াছে। বেদান্ত দর্শনের এক জাতীয় আরও বহুল গ্রন্থ আছে। বেদান্তদর্শনের ভাষ্য, অনুভাষ্য, বার্ত্তিক, টীকা, পঞ্চদশী, বেদান্তসার, বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলী, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, বেদান্ত পরিভাষা, সিদ্ধান্ত লেশ্য, চিৎসুখী, খণ্ডনখণ্ডখাদ্য, আত্মানাত্ম বিবেক, স্বারাজ্যসিদ্ধি ইত্যাদি।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তদর্শনের ভাষ্যস্বরূপ। ইহা মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের উক্তি; মহাপ্রভু বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে বলিয়াছিলেন বেদের নানা স্থানে নানা প্রকার উক্তি আছে, এই জন্য বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝা যায় না। পুরাণবাক্যে তাহার অর্থ নির্ণীত হইয়াছে। 'ব্রহ্ম' অর্থে ব্যাপক বা বৃহদ্বস্তু বুঝায়, ইহাই ঈশ্বরের লক্ষণ। স্বয়ং ভগবান সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ এবং শাস্ত্রের প্রমাণ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। যে শ্রুতিগণ তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ বলিয়াছেন, অর্থাৎ কেবল চিন্মাত্র সত্তা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সেই শ্রুতিগণই তাঁহাকে প্রকৃতির অতীত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যে শ্রুতি তাঁহাকে নির্বিশেষ বা অভেদ অখণ্ড বলিয়াছেন, সেই শ্রুতিই শব্দের স্বাভাবিকী শক্তিরূপ মুখ্য বৃত্তি দ্বারা তাঁহাকে বিশেষ ও স্বতন্ত্র বলিয়াছেন। বিচার করিলে শ্রুতিগণের কথিত সবিশেষ ব্রহ্মই প্রায় বলবৎ দৃষ্ট হয়েন। ঈশ্বরের বিগ্রহ সৎ-চিৎ-আনন্দময় ও নিত্য সত্তা। যে শ্রীবিগ্রহ না মানে, সে পাষণ্ডী, অস্পৃশ্য, অদৃশ্য ও যমদণ্ডী। বেদ মানে না

বলিয়া বৌদ্ধকে নাস্তিক বলে, কিন্তু নামমাত্র বেদ মানিয়া বেদাবলম্বনে যে নাস্তিকতা তাহা বৌদ্ধ নাস্তিকতা অপেক্ষা অধিকতর দূষণীয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বারাণসীর ঘোর মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে আত্মসাৎ করিয়া তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন:—ব্যাস ভগবান্, তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের গভীরার্থ কোন জীব জানে না, এই জন্য তিনি দয়াপরবশ হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতরূপ ভাষ্য দ্বারা আপনার সূত্রের ব্যাখ্যা আপনিই করিয়াছেন। যিনি সূত্র কর্ত্তা, তিনি যদি স্বয়ং ব্যাখ্যা কর্ত্তা হয়েন, তাহা হইলে সূত্রের প্রকৃত অর্থ অনায়াসেই লোকের জ্ঞানগম্য হয়। বেদের যে ঋক্ হইতে বেদান্তসূত্রের যে সূত্র রচিত হইয়াছে, সেই সূত্র হইতে ব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক রচনা করিয়াছেন, অতএব শ্রীভাগবত বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য। ভাগবতের ও উপনিষদের অর্থ একই প্রকার। এই বলিয়া মহাপ্রভু দিগ্দর্শন করিবার জন্য শ্রীভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোক পড়িলেন:—

"আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং যৎ কিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনং॥"

এই শ্লোকের অনুরূপ শ্রুতির ঋক্ যথা:—

"ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিৎ ধনং॥" ঈশোপনিষৎ—১।

বাঙ্গালী পাঠকগণের নিকট এই শ্লোকটীর একটু অপূর্ব্বত্ব আছে। প্রথমতঃ মহাপ্রভু প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে উদ্ধার করিবার জন্য এই শ্লোক উদ্ধৃত করেন। দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্মগণ বলেন যে এই শ্লোকটী দৈব প্রেরিত হইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হস্তগত হয়। তিনি ব্রাহ্মসমাজের রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ দ্বারা ইহার অর্থ করাইয়াছিলেন। সেই অর্থ শ্রবণান্তর স্বর্গ হইতে অমৃত আসিয়া তাঁহাকে অভিষিক্ত করে, ও ঈশ্বরের উপর তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল। তিনি সাংসারিক সুখের পরিবর্ত্তে ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ পাইলেন। সেই দিন তাঁহার পক্ষে অতি শুভ দিন, পবিত্র আনন্দের দিন ছিল।

এই শ্লোকটী দ্বারা বৌদ্ধদর্শনের শূন্যবাদ, শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ ও

*বৈষ্ণব দর্শনের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে, এই জন্য ইহার কয়েক প্রকার অর্থ দেওয়া যাইতেছে।

রাজা রামমোহন রায় শ্রীশঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য অবলম্বন করিয়া ইহার এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন :—"পরমেশ্বরের চিন্তন দ্বারা যাবৎ নামরূপ-বিশিষ্ট মায়িক বস্তু সংসারে আছে সে সকলকে আচ্ছাদন করিবেক; অর্থাৎ ভ্রমাত্মক নামরূপ বিশিষ্ট বস্তু সকল পরমেশ্বরের সত্তাকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইতেছে এমত জ্ঞান করিবেক; যাবৎ বস্তুকে মিথ্যা জানিয়া সংসার হইতে অভ্যাস দ্বারা বিরক্ত হইবেক সেই বিরক্তি দ্বারা আত্মাকে পালন অর্থাৎ উদ্ধার করিবেক। এইরূপ বিরক্ত যে তুমি পরের ধনে অভিলাষ কিম্বা আপনার ধনে অত্যন্ত অভিলাষ করিবে না।"

ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, ব্রহ্ম একমাত্র সৎ পদার্থ; জগৎ অসৎ, মায়িক। ব্রহ্মের সত্ত্বাতে জগতের সত্তা, ব্রহ্মের সত্ত্বা না থাকিলে জগতের সত্ত্বা থাকিত না। জগতের নিজের (Absolute) সত্ত্বা নাই, অন্বয় ও ব্যতিরেক ন্যায় দ্বারা ব্রহ্মের সত্ত্বাতে অবিদ্যা পরিকল্পিত জগতের ব্যবহারিক সত্ত্বা (Conditional) প্রতীয়মান হয়। অবিদ্যা নাশ করিতে পারিলে একমাত্র সত্যই হৃদয়ঙ্গম হইবে, 'সোঽহং' বা 'তত্ত্বমসি' জ্ঞান জন্মিবে, জীবাত্মা উদ্ধার হইবে। ইহা মায়াবাদ। বৌদ্ধদর্শন বলেন আত্মা বা জগতের কোন স্বাধীন (Absolute) সত্ত্বা নাই, যে কোন সত্ত্ব অনুভব করি তাহা সম্বন্ধজাত (Conditional) সত্ত্বা। একের সহিত অপরের যে সম্বন্ধ তাহাতেই সত্ত্বার অনুভূতি হয়। গুণের সহিত গুণীর যে সম্বন্ধ তাহাতেই সত্ত্বার বোধ জন্মে। কোন পুস্তক চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, তাহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বর্ণ, গুরুত্ব প্রভৃতি গুণ আছে। এই সকল গুণ না থাকিলে পুস্তক থাকিত না, এবং পুস্তক না থাকিলে গুণও থাকিত না, গুণ বাদ দিলে শুধু পুস্তক থাকে না, পুস্তক বাদ দিলে শুধু গুণ থাকে না। ইন্দ্রিয়ের সহিত বৃক্ষের যে সম্বন্ধ তদ্দ্বারাই বৃক্ষের জ্ঞান হয়। দর্শনজ্ঞান, শ্রবণজ্ঞান, স্পর্শ জ্ঞান প্রভৃতিও ইন্দ্রিয়ের সহিত বস্তুর সম্বন্ধমাত্র। তবে আত্মা কি? কতকগুলি সম্বন্ধ জ্ঞানসমষ্টি। এই সম্বন্ধজ্ঞান নষ্ট কর, জগৎ নষ্ট হইবে, আত্মা নষ্ট হইবে, সুতরাং উদ্ধার হইবে, নির্ব্বাণমুক্তি লাভ হইবে। তখন তুমি দেখিবে সব

সম্বন্ধজ্ঞান লোপ পাইয়াছে, তুমি মহাশূন্যে নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থায় অবস্থিত, "ন তত্র চন্দ্রো ভাতি" ইত্যাদি। যদি চিন্তা দ্বারা স্বাধীন সত্তা নষ্ট করিতে পার তাহা হইলেই নির্ব্বাণ। মায়াবাদী বলিবেন জগতের অস্তিত্ব ব্রহ্মের অস্তিত্বে ডুবাইয়া দিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কর।

এখন দেখা যাউক যে, বৈষ্ণব দার্শনিকগণ উক্ত শ্লোকের কিরূপ অর্থ করেন। তাঁহাদের তর্কে একটু নূতনত্ব, একটু বিশেষত্ব আছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন আমি পূর্ণ ভগবান, মানুষ তনু লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি।" শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "আমি কখনও মিথ্যা কথা কহি না।" শ্রীকৃষ্ণ ত্রিসত্য; তিনি যদি কোন নাম, রূপ ও বিগ্রহ লইয়া লীলা করিয়া থাকেন তাহা হইলে সেই নাম, রূপ ও বিগ্রহ মিথ্যা নহে। নিত্য, ত্রিকাল সত্য। সত্যস্বরূপ ভগবান্ কেন মিথ্যা নাম, রূপ ও বিগ্রহ গ্রহণ করিবেন? তবে তাঁহার নাম, রূপ ও বিগ্রহ অপ্রাকৃতিক, সৃষ্টির অতীত। তিনি অন্ধকারের পর পারে পরমব্যোমে 'দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর মুরলীধর,' তাহা না হইলে ঐ রূপ লইয়া তিনি ভক্তগণকে ফাঁকি দিতেন না। তবে যে উপনিষৎ বলেন যে, তাঁহার হাত নাই গ্রহণ করিতে পারেন, পদ নাই চলিতে পারেন, কর্ণ নাই শ্রবণ করিতে পারেন, মন নাই মনন করিতে পারেন ইহার অর্থ কি? শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলেন যে, উপলক্ষণা দিয়া হস্ত পদ কর্ণ প্রভৃতির গৌণ অর্থ কর। অর্থাৎ সেই সেই ইন্দ্রিয় না থাকা সত্ত্বেও তত্তৎ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিতে পারেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন "মুখ্য অর্থ ছাড়িয়া দিয়া গৌণ অর্থ কেন লইব? যদি মুখ্য অর্থ অস্পষ্ট হয় কিম্বা অসম্ভব হয় তাহা হইলে লক্ষণা যোজনা করা যাইতে পারে। এখানে হস্ত, পদ, কর্ণ প্রভৃতি বুঝিতে পারা যায়। উপনিষৎই বলেন এই হস্ত পদ কর্ণ সৃষ্টির পূর্ব্বের অর্থাৎ অপ্রাকৃত। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, তাঁহার হস্ত পদ কর্ণ প্রভৃতি আছে, তাহা তাঁহার জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বের তাহা অপ্রাকৃত।" শ্রীমদ্ভাগবত বলেন শ্রীকৃষ্ণের দেহে জীবদিগের ন্যায় ধাতুসম্বন্ধ নাই। Secret Doctrine এ আছে Body of Illusion. শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লিখিত শ্লোকের অনুবাদ এইরূপ:—'এই জগতে যে কিছু স্থান বা ভূতজাত আছে, তৎ সমস্তই আত্মা বা ঈশ্বরের আবাস্য—আবাস-বিষয়ীভূত ভগবৎ সত্তা

ও চৈতন্যদ্বারা ব্যাপ্ত। সেই ঈশ্বর কর্তৃক যাহা ত্যক্ত বা দত্ত হইয়াছে, তাহাই ভোগ কর, বেশী গৃধ্নু বা আকাঙ্ক্ষী হইও না। ঈশ্বরের ধন ভিন্ন ধন কাহার যে তুমি আকাঙ্ক্ষা করিবে ?”

পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এই শ্লোকের শেষাংশের আরও কয়েক প্রকার অর্থ করিয়াছেন, তাহা এইরূপ :-‘ঈশ্বর যে যৎকিঞ্চিৎ ধন প্রদান করিয়াছেন, তদ্দ্বারাই ভোগ সাধন কর। ‘তেন’ হেতুনা—সেই হেতু, ত্যক্তেন ঈশ্বরার্পণেনৈব, নতু স্বার্থং—নিজসুখের জন্য নহে, ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া ভোগ কর।’

কস্যস্বিৎ কস্যচিদপি মা গৃধঃ—অন্য কাহারও ধন আকাঙ্ক্ষা করিও না। মা গৃধঃ—অধিক ধন বা অদত্ত ধন আকাঙ্ক্ষা করিও না।’

‘কস্যস্বিৎ কস্য অন্যস্য ধনমস্তি যতো ধনাকাঙ্ক্ষা ক্রিয়তে—ঈশ্বর ভিন্ন কি অপর কোন ব্যক্তির ধন আছে যে, ঈশ্বর যাহা দেন নাই তাহা অপর ব্যক্তির নিকট পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করিবে।”

“স্বিৎ প্রশ্নে—অরে! কাহার ধন? গৃহস্থিত ধনও পরমেশ্বরের ভিন্ন আর কাহারও নহে।”

“যাবদ্ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাং।

অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি’ ইতি নারদোক্তিঃ।”

“আবাস্য—ত্রিভুবনে যে কিছু স্থান বা জীবের দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি আছে তাহা ভগবানের ক্রীড়াভূমি বা লীলাস্থল।”

“মা গৃধঃ—ভগবানের ও ভগবদ্ভক্তের সেবায় অন্ন ব্যয় করিয়া অবশিষ্ট দ্বারা পাত্র মিত্র কলত্রাদির ও নিজের উদর ভরণ মাত্র করিবে।”

“তেন ত্যক্তেন—বহু ধন থাকা সত্ত্বেও ভগবানের মন্দির নির্ম্মাণ ও তাঁহার পূজা সংস্থাপন করিয়া এবং তাঁহার সেবার নিমিত্ত অর্থ নিয়োজিত করিয়া ভৃত্যের বেতনস্বরূপ যাহা থাকিবে তদ্দ্বারা উদর ভরণ করিবে।”

উল্লিখিত শ্লোকের অর্থ সম্বন্ধে বৈষ্ণব দার্শনিকগণের বিচার পদ্ধতি জানিতে হইলে ঐ শ্লোকানুরূপ অপর দুইটী শ্লোক ভাগবত হইতে উদ্ধৃত করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। শ্রীভাগবতের ১১শ স্কন্ধে বর্ণিত আছে

নব যোগেন্দ্র শিবিরাজের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলে ঐ নয় জনের মধ্যে কবি ও হরি নামক যোগেন্দ্রদ্বয় এই দুইটী শ্লোক বলেন :—

"খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ জ্যোতীংষি সত্বানি দিশোদ্রুমাদীন্।
সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং যৎকিঞ্চভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥" ১১।৩৯।

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবতি আত্মনি এষ ভাগবতোত্তমঃ॥" ১১।২।৪৩।

ভাগবতোত্তম আকাশ, বায়ু, অগ্নি, সলিল, পৃথিবী, জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, ভূতজাত, দিক্ সকল, বৃক্ষাদি, সরিৎ ও সমুদ্রাদি যে কিছু পদার্থ আছে তৎসমুদয়কে শ্রীহরির শরীর জানিয়া অনন্যমনে প্রণাম করিতে থাকেন। ইহাকেই 'ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং' বলা যায়।

যিনি চেতনাচেতন সমস্ত ভূতে আপনার উপাস্য ও অভীষ্ট ভগবানের আবির্ভাব ও বিদ্যমানতা অনুভব করেন এবং আপনার ভগবৎপ্রেম চেতনাচেতন সর্ব্বভূতে দর্শন করেন, অর্থাৎ ব্রজগোপিকাদের ন্যায় যাঁহার চিত্তে সর্ব্বভূত ভগবদ্বিষয়ক প্রেমাবিষ্ট বলিয়া স্ফুরিত হয় এবং তজ্জন্য তক্কে ভগবানের অধিষ্ঠান-বুদ্ধিতে আকাশ, বায়ু, বৃক্ষ প্রভৃতিকে নমস্কার করিতে থাকেন, তিনিই মহাভাগবত।

এই অংশের ব্যাখ্যায় শ্রীজীব গোস্বামী ক্রমসন্দর্ভে লিখিয়াছেন যে, এ স্থানে ব্রহ্মজ্ঞান বা নিরাকার ঈশ্বরের জ্ঞানের কথা কথিত হয় নাই। কারণ এখানে ভাগবতের কথা হইতেছে। ভাগবতে, জীব ও ভগবানকে পৃথক বলিয়া জানেন। জীব ও ব্রহ্মের অভেদজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান, অথবা 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম,' অথবা ছান্দোগ্য উপনিষদের 'একমেবাদ্বিতীয়ং' জ্ঞান এবং তৎফল—হেয় ও ভাগবততত্ত্বের বিরোধী। এখানে নিরাকার ঈশ্বরজ্ঞানের কথাও কথিত হয় নাই। কারণ অব্যবহিত পূর্ব্বে আত্যন্তিকী ভক্তি-লক্ষণে অহৈতুকী ও অব্যবহিতা ভক্তির কথাই কথিত হইয়াছে। এবং পরে প্রধান ভাগবতের লক্ষণে এক কথায় বলা হইয়াছে যে, যাঁহার হৃদয়ে হরি প্রেমরজ্জুদ্বারা বদ্ধপদ হইয়া অবস্থিতি করেন। সুতরাং নিরাকার-জ্ঞান প্রেমপরাকাষ্ঠার ও সর্ব্বোত্তম ভক্তি লক্ষণের বিরোধী।

আমরা পূর্ব্বে বেদান্ত দর্শনের ও মীমাংসাদর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় লিখিয়াছি।

বেদব্যাস, ভগবানের সপ্তদশ অবতার ছিলেন; সাংখ্যাচার্য্য কপিল মুনি ভগবানের পঞ্চম অবতার ছিলেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—'সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ'। কপিল জন্মসিদ্ধ ছিলেন। কপিলের সাংখ্যযোগ নিরীশ্বর যোগ, পতঞ্জলির পাতঞ্জলদর্শন সেশ্বর যোগশাস্ত্র। কপিল ঈশ্বর অঙ্গীকার করেন নাই। কেনই বা করিবেন? তিনি যে স্বয়ং ভগবানের অবতার ছিলেন। তাঁহার মাতার নাম দেবহূতি ও পিতার নাম কর্দ্দম ঋষি। তিনি স্বীয় মাতাকে অতি উপাদেয় ভাগবত ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন :—

"মদ্ধিষ্ণ্য দর্শন স্পর্শ পূজাস্তুত্যভিবন্দনৈঃ।
ভূতেষু মদ্ভাবনয়া সত্ত্বেনাসঙ্গমেন চ ॥
মহতাং বহুমানেন দীনানামনুকম্পয়া।
মৈত্র্যা চৈবাত্মতুল্যেষু যমেন নিয়মেন চ ॥
আধ্যাত্মিকানু শ্রবণান্নাম সংকীর্ত্তনাচ্চ মে।
আর্জ্জবেনার্য্য সঙ্গেন নিরহংক্রিয়য়া তথা ॥" ভাঃ ৩।২৯।১৪।

আমার (ভগবানের অবতার কপিলের) প্রতিমাদি দর্শন, স্পর্শন, পূজন, স্তবকরণ, বন্দন, সকল ভূতে অন্তর্য্যামীরূপে আমার ভাবনা, ধৈর্য্য, বৈরাগ্য, মহৎ ব্যক্তিদিগের (ভগবদ্ভক্তগণের) বহু সম্মান করণ, দীনের প্রতি অনুকম্পা, আত্মতুল্য ব্যক্তিতে মৈত্রী, যম (বাহেন্দ্রিয় নিগ্রহ), নিয়ম (অন্তরিন্দ্রিয় দমন), আত্মা-অনাত্মা-বিবেক-শাস্ত্র শ্রবণ, আমার নাম সঙ্কীর্ত্তন, সরল আচরণ, সাধুসঙ্গ এবং অহঙ্কাররাহিত্য।

কপিল নাস্তিক ছিলেন না এবং সাংখ্যদর্শনও নাস্তিক দর্শন নহে। তিনি প্রকৃতি ও পুরুষগণকে অনাদি বলিয়াছেন, প্রকৃতিকে সৃষ্টি-কর্ত্রী এবং পুরুষ বহু বলিয়াছেন। স্পষ্টতঃ এক পুরুষ বা ব্রহ্মকে অঙ্গীকার করেন নাই, ইহার কারণ পরে দেওয়া যাইবে। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন "ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।" ভাগবত ১১।১৪।১৯।

'আমাকে যোগশাস্ত্র দ্বারা কিম্বা সাংখ্য যোগ দ্বারা পাওয়া যায় না।'

যোগশাস্ত্র সেশ্বর, তদ্দ্বারা ও ভগবানকে পাওয়া যায় না। "কা বা মুক্তির্বিষয়ে বিরক্তিঃ"—মুক্তি কি? বিষয়ে বিরক্তি। প্রকৃতিকে ভোগ

করিয়া পুরুষের বিরক্তি জন্মিলেই পুরুষ মুক্ত (সাংখ্যমতে)। মুক্ত অবস্থায় পুরুষ কি অবস্থায় থাকেন, এক মহাপুরুষের অংশীভূত হয়েন কিনা, সে পর্য্যন্ত কপিলের যাওয়া প্রয়োজন হয় নাই। শ্বেতাশ্বেতরোপনিষদের "অজামেকাং লোহিত শুক্ল কৃষ্ণাং" ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় ইহা প্রকাশিত হইবে। কপিল দেব নিজে সাংখ্যতত্ত্ব লিপিবদ্ধ করেন নাই। তিনি আসুরিকে উপদেশ করেন। আসুরি পঞ্চশিষাকে বলেন, এবং তখন উহা সাংখ্য প্রচলন নামে লিপিবদ্ধ হয়। বর্ত্তমান সময়ে ঈশ্বরকৃষ্ণ কৃত সাংখ্য কারিকাই সাংখ্য দর্শন নামে পরিচিত। বিজ্ঞান ভিক্ষু সাংখ্যপ্রবচনের ভাষা লেখেন। তিনি বলিয়াছেন "কালার্ক ভক্ষিতং সাংখ্যশাস্ত্রং জ্ঞান সুধাকরং" কাল রাহু কর্ত্তৃক জ্ঞান চন্দ্র রূপ সাংখ্য শাস্ত্র ভক্ষিত হইলে তিনি বচনামৃত দ্বারা তাহা পুনর্জ্জীবিত করিবেন।

কপিলদেবের সাখ্যতত্ত্ব অতীব প্রাচীন দর্শন মত। শ্রীভাগবতের প্রথম স্কন্দে আছে :— পঞ্চমঃ কপিলোনাম সিদ্ধেশঃ কালবিপ্লুতং।

প্রোবাচসুরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রাম বিনির্ণয়ং ॥

সাংখ্যদর্শনের ভাষ্যে শ্রীগৌড়পাদ স্বামী লিখিয়াছেন :—

"কপিলায় নমস্তস্মৈ যেনা বিদ্যাম্বুধৌ জগতি মগ্নে।

কারুণ্যাৎ সাংখ্যময়ী নৌরিব বিহিতা প্রতারণায় ॥"

সেই কপিলকে নমস্কার করি, যিনি করুণাপরবশ হইয়া অবিদ্যারূপ সমুদ্রে নিমগ্ন জগৎ পার হইবার নিমিত্ত সাখ্যকারিকারূপ নৌকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

সাংখ্যদর্শনে যেমন ঈশ্বরাঙ্গীকার নাই, সেইরূপ মীমাংসা দর্শনেও ঈশ্বরাঙ্গীকার নাই। মহর্ষি কপিল ও জৈমিনি উভয়েই বেদ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তদুপরি স্বীয় স্বীয় মত স্থাপন করিয়াছেন ও শ্রুতি সমন্বয় করিয়াছেন। উভয়েই পরলোকতত্ত্ব জন্মান্তরবাদ ও দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। মীমাংসা কর্ম্মকাণ্ড লইয়া ও বেদান্তদর্শন ব্রহ্মকাণ্ড লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, মীমাংসা অদৃষ্টের উপর নির্ভর করেন, বেদান্তসূত্র ব্রহ্মের উপর নির্ভর করেন। মীমাংসা দর্শন কর্ম্মবাদী, বেদান্ত দর্শন সৎ-কারণবাদী, সাংখ্যদর্শন সৎকার্য্যবাদী এবং অক্ষপাদ বা গৌতম ঋষির

ন্যায়দর্শন ও কণাদ ঋষির বৈশেষিক দর্শন অসৎকার্য্যবাদী। পাতঞ্জল দর্শন সেশ্বর সাংখ্য। সাংখ্য দর্শন চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতিরিক্ত পুরুষ বা জীবাত্মা স্বীকার করেন, পাতঞ্জল এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অতিরিক্ত ঈশ্বর অঙ্গীকার করেন। বেদান্ত দর্শন সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অতিরিক্ত ব্রহ্ম স্বীকার করেন।

সাংখ্য দর্শনের 'অসদকরণাৎ'—অসৎকরণ হইতে কোন কার্য্যই হয় না, এবং বৈশেষিক দর্শনের 'কারণাভাবাৎ কার্য্যাভাবঃ'—কারণের অভাবে কার্য্যের অভাব হয়, প্রায় একই কথা। ন্যায়দর্শন ও বৈশেষিক দর্শন ঈশ্বর পদ বাচ্য পরমাত্মাকেই জগতের সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের একমাত্র কর্ত্তা বলিয়াছেন। মীমাংসক বলেন যে কর্ম্মই বিশ্বের নিদান।

ঈশ্বর সম্বন্ধে ও দার্শনিকদিগের বিভিন্ন মত আছে। সাংখ্য মতে প্রধান বা প্রকৃতিই বিশ্বের উপাদান কারণ। বেদান্ত মতে ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। পতঞ্জলি, কণাদ ও গোতম বা অক্ষপাদের মতে প্রকৃতি ও পরমাণু সমূহ হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। মীমাংসকগণ বলেন যে কর্ম্মই বিশ্বের নিদান্ "ছন্দাংসি বৈ বিশ্বরূপানি"। বৈনাশিক ও আর্হত গণের মতে পরমাণুই জগতের হেতু, বিজ্ঞানবাদিগণের মতে ক্ষণিক জ্ঞানই বিশ্বোৎপাদনের হেতু, মাধ্যমিকগণের (বৌদ্ধদর্শন) মতে শূন্য এবং মৌহূর্ত্তিক-বৃন্দের মতে কালই বিশ্বোৎপত্তির হেতু।

আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক মত পার্থক্য দৃষ্ট হয়। চার্ব্বাকগণ দেহ ও ইন্দ্রিয়দিগকেই আত্মা বলিয়া মানেন, তদতিরিক্ত আত্মা নামক কোন পদার্থ স্বীকার করেন না। কেহ কেহ প্রাণকে আত্মা বলেন, কেহ কেহ সূক্ষ্ম মনকে আত্মা বলেন। কাহারও মতে ক্ষণস্থায়িনী বুদ্ধি, কাহারও মতে স্থির বুদ্ধিই আত্মা। বেদান্তমতে আত্মা নির্ব্বিশেষ ও নিত্য জ্ঞানানন্দ স্বরূপ। সাংখ্য-পাতঞ্জলের মতে সুখ দুঃখাদি সঙ্গশূন্য চিন্মাত্র আত্মা, এবং নৈয়ায়িকের মতে চিৎ-যুক্ত (চৈতন্যবিশিষ্ট) জ্ঞান এবং গুণাদি যুক্ত জড় দ্রব্যরূপই আত্মা।

আত্মার পরিমাণ সম্বন্ধেও বিভিন্নমত দৃষ্ট হয়। কোন কোন আগমজ্ঞ পণ্ডিত আত্মাকে পরমাণু পরিমিত কহেন। কেহ কেহ আত্মাকে দেহ পরিমিত, এবং নৈয়ায়িকেরা ব্যাপক বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে আত্মা

মানসপ্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত। সাংখ্যমতে আত্মা অনুমান গম্য, কাহারও মতে জ্ঞানগম্য। বৈদান্তিকগণ বলেন পঞ্চকোষের অন্তরস্থ, কূটস্থ, সর্ব্বপ্রকাশক স্বয়ং প্রকাশ জ্যোতিই আত্মা।

সেশ্বর পাতঞ্জল দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় "অথ যোগানুশাসনং"। কণাদ-ঋষির বৈশেষিক দর্শনের বিষয় "অথাতো ধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ"। ন্যায় দর্শন প্রমাণ প্রমেয়াদি নিম্নলিখিত ষোড়শ পদার্থের ব্যাখ্যা করিয়া চিচ্ছক্তির ও অচিতের বিষয় উপদেশ করিয়াছেন।

ন্যায় দর্শন :—এই দর্শন মতে পদার্থ ষোলটী, যথা—(১) প্রমাণ (যদ্দ্বারা যথার্থ জ্ঞান হয়)। (২) প্রমেয় (যথার্থ জ্ঞানের বিষয়)। (৩) সংন্দেহ (প্রতিপাদ্য বিষয়ের অনিশ্চিত জ্ঞান)। (৪) প্রয়োজন (কার্য্যে প্রবৃত্তির উদ্দেশ্য)। (৫) দৃষ্টান্ত (লৌকিক পরীক্ষার উদাহরণ স্থল)। (৬) সিদ্ধান্ত (সংশয়স্থলে শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা মীমাংসিত বিষয়)। (৭) অবয়ব (প্রতিপাদ্য বিষয় স্থিরীকরণের জন্য প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ উপনয় ও নিগমন এই পঞ্চ বাক্য)। (৮) তর্ক (মিথ্যা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি। (৯) নির্ণয় (উভয় পক্ষের তর্ক বিতর্ক হইতে বিষয়াবধারণ)। (১০) বাদ (সত্য নির্দ্ধারণের জন্য যে বাক্য প্রযুক্ত হয়)। (১১) জল্প (তর্কে জয়লাভ করিবার অভি-প্রায়ে যে বাক্য প্রযুক্ত হয়)। (১২)বিতণ্ডা (যে বাক্যে পর মত খণ্ডন করে, কিন্তু স্বমত সংস্থাপন করে না)। (১৩) হেত্বাভাস (দোষযুক্ত হেতু)। (১৪) ছল (প্রযুক্ত বাক্যের প্রকৃত অর্থ না লইয়া অন্যার্থ কল্পনা করিয়া দোষ দেওয়া) (১৫) জাতি (বিচার স্থলে অনুপযুক্ত উত্তর)'। (১৬) নিগ্রহ স্থান (বিচার স্থলে পরাজয়ের প্রধান কারণ)। সাংখ্য মতের প্রমাণ প্রমেয় বিষয় পরে বিবৃত হইবে।

বৈশেষিক দর্শন :—এই দর্শন মতে দ্রব্য (পৃথিবী, অপঃ, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা, এবং মন, এই নয়টী দ্রব্য-পদার্থ ; গুণ (রূপ, রস গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন অর্থাৎ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ও জীবন-যোনিযত্ন গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম্মাধর্ম্ম, ও শব্দ, এই চতুর্দ্দশটী গুণ পদার্থ), কর্ম্ম (গতি), সামান্য (জাতি), বিশেষ (পরস্পর

ব্যাবর্ত্তক পদার্থ) ; সমবায় (নিত্য সম্বন্ধ) ; এবং অভাব (অন্যোন্যাভাব, প্রাক্-অভাব ও ধ্বংস বা অত্যন্ত-অভাব রূপ সংসর্গাভাব) ;—এই সাতটী পদার্থের যথার্থ জ্ঞান হইলে মিথ্যাজ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞান জনিত সংস্কার নষ্ট হয় ; সদসৎ কোন কার্য্যে প্রবৃত্তি থাকে না, কর্ম্মফল নষ্ট হয়, ধর্ম্মাধর্ম্ম রূপ অদৃষ্ট থাকে না, সুতরাং কারণাভাবে পুনর্জ্জন্মরূপ কার্য্যও হয় না এবং দুঃখোৎপত্তির হেতু জন্মমৃত্যুর ভয় না থাকিলে আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি হইয়া পরম মঙ্গলরূপ নিঃশ্রেয়স (মুক্তি) লাভ হয়। যেমন দীপশিখা, তৈল দশা (সলিতা) প্রভৃতি উপকরণের অভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ লিঙ্গশরীরের নাশ হইলে সুখ দুঃখের ও ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টের অত্যন্ত অভাব হেতু আত্মা মুক্তি লাভ করেন।

পাতঞ্জল দর্শনে "ঈশ্বরের" সংজ্ঞা এইরূপ দেওয়া আছে :—"ক্লেশ কর্ম্ম বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ" :—অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্লেশ, কর্ম্ম ফলরূপ বিপাক, কর্ম্মফলের সংস্কাররূপ আশয়, এই সকলের সহিত কালত্রয়ে যাঁহার সম্বন্ধ নাই, তাদৃশ সর্ব্বনিয়ামক স্বতন্ত্র পুরুষই ঈশ্বর। সেই ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ। "তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ববীজম্" সর্ব্বজ্ঞত্বের বীজ (জ্ঞাপক) নিরতিশয় জ্ঞান তাঁহাতেই আছে। "স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ, কালেন অনবচ্ছেদাৎ" তিনি কালদ্বারা অবচ্ছিন্ন হন না ও অনাদি, এই জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্রষ্টা ব্রহ্মাদির উপদেষ্টা গুরু। তাঁহাকে কিরূপে প্রণিধান করিতে হয় তদ্বিবরণ পশ্চাৎ বিবৃত হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজানকীনাথ পাল, শাস্ত্রী, বি, এল্।

আমিও আমার দেহ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রাণময় কোষ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে সকল, উপাদান লইয়া এই ভূর্লোক গঠিত, সে গুলিকে স্থূলত্ব ও সূক্ষ্মত্ব অনুসারে সাত ভাগে ভাগ করা যায়। স্থূল হইতে সূক্ষ্মতর পর্য্যন্ত যথাক্রমে তাহাদেব নাম—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, অনুপাদক

ও আদি। ইহাদিগের মধ্যে প্রথমোক্ত তিন প্রকার পদার্থ অর্থাৎ ক্ষিতি অপ ও তেজঃ (পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ভাষার যাহাদিগকে যথাক্রমে কঠিন, তরল ও বাষ্পীয় পদার্থ Solid, liquid and gaseous matter বলে) তাহা লইয়া আমাদের এই চর্ম্মচক্ষুগোচর স্থূল দেহ বা অন্নময় কোষ গঠিত হইয়াছে। সকলেই জানেন এই তিন প্রকার পদার্থের মধ্যে তেজঃ বা বাষ্প (Gaseous matter) সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম। অতি সূক্ষ্ম অণু সহযোগে এই পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু এই অণুগুলিও পরমাণু নহে; ইহারা আর একটি অধিকতর সূক্ষ্ম পদার্থের বিকার মাত্র। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এই পদার্থকে ইথার (Ether) নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। আমাদের শাস্ত্রকারেরা ইহারই নাম দিয়াছেন মরুৎ। ব্যোম ইথারের অপেক্ষাও সূক্ষ্ম পদার্থ। ইথারের অপেক্ষা যে সূক্ষ্ম পদার্থ থাকিতে পারে ইহা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা কিছু দিন পূর্ব্বে মানিতেন না। এমন কি ইথারকেও তাঁহারা জড়পদার্থ বলিতে সঙ্কুচিত হইতেন। এখন সে সকল সন্দেহ ক্রমশঃ তিরোহিত হইতেছে। বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা এক্ষণে ইথারকে জড় পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, অধিকন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ইথারকে আর একটি অধিকতর সূক্ষ্ম জড় পদার্থের বিকার বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইথারের এই সূক্ষ্মতর অবস্থাই আমাদের ব্যোম। অনুপাদক এবং আদি আরও সূক্ষ্মতর ইথার। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে ইথারের এই দুইটি অবস্থাও আবিষ্কৃত হইবে এইরূপ আশা করা অসঙ্গত নয়।

বৈজ্ঞানিকদিগের মতে ইথার ভূর্লোকের সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। স্থূল জড়ের প্রত্যেক কণা ইথার সমুদ্রে ভাসমান রহিয়াছে। ক্ষিতি অপ ও তেজঃ পদার্থের প্রত্যেক অণু ইথারের আবরণে আবরিত, প্রত্যেক অণুদ্বয়ের মধ্যে ইথারের ব্যবধান বর্ত্তমান। তাপ, আলোক ও বিদ্যুতের স্রোত ইথার অবলম্বন করিয়াই প্রবাহিত হইয়া থাকে। যেখানে তাপ বা আলোক আছে, যেখানে বৈদ্যুতিক ক্রিয়া চলিতেছে, সেই খানেই ইথার আছে বুঝিতে হইবে। আমাদের স্থূলদেহ একটি ক্ষিত্যপ্‌তেজোময় জড় পদার্থ। সুতরাং ইহারও প্রত্যেক অণু বেষ্টন করিয়া ইথার অবস্থিতি করিতেছে। শরীরতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত মাত্রেই জানেন, প্রতিক্ষণে আমাদের এই স্থূলদেহের মধ্যে নানা

পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে এবং প্রত্যেক পরিবর্ত্তনের সহিত বৈদ্যুতিক ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া দেহাভ্যন্তরে ইথারের অস্তিত্ব মুহুর্মুহুঃ জ্ঞাপন করিতেছে। শরীরের এমন স্থল নাই যেথানে ইথার বিদ্যমান নাই, সুতরাং আমাদের স্থূলদেহের অনুরূপ আর একটি সূক্ষ্ম ইথিরীয় দেহ (Ethereal body) ইহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে, ইহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়। এই ইথিরীয় দেহকেই বৈদান্তিকেরা প্রাণময় কোষ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। মরুৎ (Ether I) ব্যোম (Ether II) অনুপাদক (Ether III) ও আদি (Ether IV) নামক চারি প্রকার সূক্ষ্ম পদার্থ ইহার উপাদান।

এই সকল পদার্থ এত সূক্ষ্ম যে স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহাদের অস্তিত্ব অনুভব করা আমাদের সাধ্য নহে। এখনও এমন উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ নির্ম্মিত হয় নাই, যাহা দ্বারা স্থূলতম ইথার প্রত্যক্ষীভূত হইতে পারে। তথাপি এক চমৎকার উপায়ে সম্প্রতি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রাণময় কোষের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন। তাহার একটি বিবরণ পূর্ব্বেকার পন্থায় প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য তাহা সার মর্ম্ম এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। Prof. Elmer Gates নামক বৈজ্ঞানিক বেগুনি রঙ্গের পাচ সপ্তক উপরের আলোকরশ্মি লইয়া একটী অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কারে উপনীত হন। রশ্মি যেরূপ ধাতব পদার্থে প্রতিহত হয়, সেইরূপ জীবনীশক্তি এই রশ্মির প্রতিবন্ধক। মানবের চক্ষুর সারভূত অংশ হইতে Rhodopsin নামক নূতন পদার্থ সংগৃহীত করিয়া তৎ সাহায্যে একটী জমি প্রস্তুত করা হয়; উহার গুণ এই যে, সামান্য আলোকরশ্মি পতিত হইলে তাহার রঙ্গের পরিবর্ত্তন হয়। ঐ জমির নিকট উভয়দিকে বদ্ধ কাচের নলের মধ্যে একটী জীবিত ইন্দুরকে নবাবিষ্কৃত রশ্মির পথে রাখা হয়। যতক্ষণ ইন্দুরটা জীবিত থাকে, ততক্ষণ Rhodopsin ক্ষেত্রে তাহার ছায়া পড়ে, কিন্তু মরিয়া গেলে আর পড়ে না। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে মুহূর্ত্তে ইন্দুর দেহ হইতে জীবনীশক্তি বাহির হইয়া যায়, সেই মুহূর্ত্তে উহা স্বচ্ছ হইয়া পড়ে এবং তৎসঙ্গে ইন্দুরের মত একটী ছায়া পদার্থ বদ্ধ কাচনলের ভিতর দিয়া ঊর্দ্ধমুখে চলিয়া যায়। ইন্দুরের দেহের মধ্যে জীবনীশক্তির দ্বারা

উজ্জীবিত কি পদার্থ আছে যাহার ছায়া পড়ে? উহার আকৃতি ইন্দুরের শরীরের মত কেন? ইন্দুরটী মরিয়া গেলে ছায়া পদার্থ নির্ম্মিত শরীরটীর উর্দ্ধগতি হয় কেন? ইহাতে কি প্রাণময় কোষের প্রমাণ হইবে না!

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত প্রাচ্য বিজ্ঞান কিরূপ ভাবে সমর্থিত হইতেছে, উক্ত বিবরণটিকে তাহার সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। যাহা হউক প্রাণময় কোষ প্রত্যক্ষ করিবার জন্য অত্যধিক সাধনার প্রয়োজন নাই। যাঁহাদের সূক্ষ্মদৃষ্টির কিঞ্চিন্মাত্রও উন্মেষ হইয়াছে, তাঁহারা এই দেহটিকে স্পষ্ট দেখিতে পান। যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে, ইহার বর্ণ ধূসর ও বেগুনি রঙ্গের মিশ্রণে উৎপন্ন, অনেকটা বেগুনি আভাযুক্ত ভস্মের মত। তবে সকলের প্রাণময় কোষ সমান সূক্ষ্ম বা স্থূল নহে। স্থূলতর উপাদানগুলি অধিক পরিমাণে থাকিলে দেহ ঘন ও স্থূল, এবং সূক্ষ্মতর উপাদানগুলির আধিক্য হইলে দেহ সূক্ষ্ম হইয়া থাকে, ইহা বলাই বাহুল্য।

আমাদের মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের অভ্যন্তর হইতে বহু শ্বেত বর্ণের সূত্র সমূহ বহির্গত হইয়া আমাদের স্থূলদেহের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। দেহের যে অংশই ব্যবচ্ছেদ করা যায়, সেই অংশেই এই সকল সূত্র দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি স্থূল ইন্দ্রিয়গণ এই সূত্রগণ সাহায্যেই স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে। এই সূত্রগণের সহিত যোগ না থাকিলে স্থূল দেহের কোন যন্ত্রই চলিতে পারে না। আমাদের সূক্ষ্মতর দেহগুলিও এই সূত্রগণকে অবলম্বন করিয়া ভূর্লোকের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিতেছে। এই সূত্রগুলির নাম স্নায়ু বা বায়ু-প্রবাহিণী নাড়ী (Nerve)। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বাহিরের সংবাদ ভিতরে আনিতেছে; কতকগুলি ভিতরের আদেশ বাহিরে বহন করিতেছে। প্রথমোক্তের নাম সংজ্ঞা নাড়ী (Sensory) ও শেষোক্তের নাম আজ্ঞা (Motor) নাড়ী। অণুবীক্ষণের দ্বারা এই দুই নাড়ীর মধ্যে আকারগত কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় না, অথচ উভয়ের কার্য্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সংজ্ঞা নাড়ী অন্তর্ম্মুখী, আজ্ঞা নাড়ী বহির্ম্মুখী। আমাকে মশা কামড়াইল, সংজ্ঞা নাড়ী সে সংবাদ আমার মস্তিষ্কে বহন করিয়া আনিল—আমার জ্বালা অনুভব হইল,

অমনি অভ্যন্তর হইতে ব্যক্ত কতকগুলি আদেশ আজ্ঞানাড়ীর সাহায্যে প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণ হস্তের মাংসপেশীকে উদ্বৃক্ত করিল, মাংসপেশী সঙ্কুচিত হইল, ফলে হস্ত উঠিল ও আহত স্থলে পড়িল। এইরূপে প্রতিমুহূর্ত্তে স্নায়ুপথ অবলম্বন করিয়া বাহির হইতে শক্তি প্রবাহ ভিতরে প্রবেশ করিতেছে এবং ভিতর হইতে বাহিরে যাইতেছে।

(ক্রমশঃ)

পঞ্চীকরণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বর্ত্তমান কালে নব্য সভ্যদিগের চিত্তে এই এক মহৎ সংস্কার জন্মিয়াছে যে, হিন্দুশাস্ত্রোদিত তাবৎ ধর্ম্মই অলীক। তাঁহারা তদর্থে বলেন যে, পূর্ব্বকালের চতুর ব্রাহ্মণজাতিদিগের চতুরতাতেই তাবৎ শাস্ত্রের রচনা হইয়াছে। এক্ষণে কালের গতিকে মনুষ্যদিগের বিদ্যা বুদ্ধির যে প্রকার দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে পূর্ব্বকালের চাতুর্য্য আর রক্ষা পাইবে না। সংপ্রতি নব্য ব্রহ্মজ্ঞানী মহাশয়েরা বুদ্ধিযুক্তি প্রভাবে যে মত স্থাপনা করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছেন, বোধ হয় ভাবীকালে সে মত গ্রহণে কেহই বিরত হইবেন না। তাহাতে দেশের নিয়ম নাই, কালের নিয়ম নাই, স্ত্রী পুরুষ ও হিন্দু মুসলমান ম্লেচ্ছাদি কোন জাতির বিচার নাই, এবং বর্ণাশ্রমাচার ধর্ম্মানুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নাই, কেবল এক ঈশ্বরের সত্বার প্রতি নির্ভর করতঃ ইচ্ছামত ব্যবহার অর্থাৎ স্থূলবিষয়ভোগে নিযুক্ত থাকিয়া, মাসান্তে, কি পক্ষান্তে কি সপ্তাহান্তে, এক দিবস ব্রহ্মসভায় বা গীর্জ্জায় গমন করিলেই পরমাত্মার উপাসনা হয়। এমত সুলভ উপাসনা সত্বে শঠ ব্রাহ্মণদিগের বাক্যে কে নিত্য প্রাতঃস্নান, হবিষ্যাহার, ব্রত, নিয়মানুষ্ঠান ও যাগ, যজ্ঞ, দেবার্চ্চনায় এবং পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধাদিতে নিয়ত কষ্ট পরিগ্রহ করতঃ অকৃতার্থে আত্মধনের পরিক্ষয় করিবে? হা পরমেশ্বর! তোমার মহিমার অন্ত নাই, কোন্ শরীরে যে কোন্রূপে বিরাজ কর এবং কোন্ ঘটে যে কোন্রূপে বুদ্ধির উদয় কর, তাহার মর্ম্ম বুঝিতে কেহই সমর্থ নহে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই

যে, অনেক আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়েরা আপনাদিগকে বেদান্তধর্ম্মী বলেন, অথচ বেদান্তকে স্পর্শও করেন না। যদ্যপি তাঁহারা বেদান্তকে মান্য করিতেন, তবে কদাপি বেদোদিত সোপানকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারিতেন না; কারণ জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড এতদুভয় কাণ্ডই বেদের মুখ্য প্রয়োজন। কর্ম্মকাণ্ড হেয় বলিয়া পরিগ্রহ করিলে জ্ঞানসোপানে আরোহণ করিতে পারে না। অতএব বিজ্ঞবরেরা বিবেচনা করিবেন যে, ইহাঁরা শুদ্ধ মৌখিক বৈদান্তিক বলিয়া জানান, ফলে বেদান্ত শাস্ত্রের অর্থাৎ উপনিষৎ ধর্ম্মের অধিকারী নহেন।

পরম কারুণিক কৃপানিধান ভগবান এতদনন্ত বিশ্বরাজ্য মধ্যে একাবয়ব বস্তুমাত্রও সৃজন করেন নাই; মুখ, নাসিকা, কর্ণ, বর্ণ, স্বর, গ্রীবা, বক্ষঃ, কক্ষ, কুক্ষি, নিতম্ব, জঙ্ঘোরু, মন প্রভৃতি জীববিশেষে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বুদ্ধিবৃত্তিও সকলকে সমান দেন নাই, এই হেতু পরস্পর মতের অনৈক্য না হইবার বিষয় কি? নচেৎ আধুনিক ভাক্ত, নব্য তত্ত্বজ্ঞানপ্রকাশকেরা কি বৈদিক কর্ম্মীদিগের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতেন? ফলে যথার্থ বেদোদিত ধর্ম্মকর্ম্মে শ্রদ্ধা না থাকাতে, এক সময়ে একরূপ বাক্যে নিতান্ত নির্ভর করিতে পারেন না; সুতরাং শ্রুতিগহ্বরস্থিত বাদান্ধকারে অহরহঃ ভ্রাম্যমান হইয়া শাখাহীন মৃগের ন্যায় নানাস্থানী হইয়াছেন। অব্যবস্থিত চিত্তপ্রযুক্ত বেদোদিত দেবার্চ্চকদিগকে নির্ব্বোধ বলিয়া পরিহাস করিয়া কহেন যে, "তোমরা অতীন্দ্রিয় নির্ব্বিকার নিরঞ্জন অচিন্ত্যাব্যক্ত সত্য সনাতন পরমেশ্বরকে শিব, বিষ্ণু, গণেশ, সূর্য্য, দুর্গা প্রভৃতি প্রপঞ্চস্বরূপ নানা দেবতা বোধে উপাসনা করিয়া অকৃতার্থে সুদুর্লভ পরমায়ুকে ক্ষেপণ করিতেছে কেন?" ইহাতে বক্তব্য এই যে, যাঁহাদিগের বেদশাস্ত্রের আলোচনা আছে, তাঁহারা কি কদাপি দেবার্চ্চকদিগকে এরূপ কটূক্তি করিতে পারেন? কারণ পরব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ প্রতিপন্ন না হওয়াতে, তাঁহার তটস্থ লক্ষণদ্বারা অবয়ববিশিষ্ট দেবতার উপাসনা করিতে বেদে অনুশাসন করিয়াছেন। নচেৎ কোন মতে তৎপ্রাপ্ত্যর্থে উপাসনা হয় না। ইহা নব্যজ্ঞান প্রকাশকেরা আপনারাই প্রকাশ করতঃ অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, অশ্বিনীকুমার, বিশ্বদেব, সরস্বতী প্রভৃ।

অথর্ব্ব বিশিষ্ট দেবতার পৃথক্ পৃথক্ ধ্যান, পূজা ও স্তুতি করিতে বেদে আজ্ঞা দিয়াছেন। ইহাতে তাঁহারা যদ্যপি ঐ সকল পৃথক্ পৃথক্ দেবতাকে এক পরমেশ্বররূপে প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত এরূপ যুক্তি করিতে পারেন যে, "যদিও অগ্নি, সূর্য্য, বায়ু, ইন্দ্র প্রভৃতির উপাসনায় অনুশাসন বেদে আছে, কিন্তু তাঁহাদিগের অন্তর্যামী পুরুষ পরমাত্মা ভিন্ন নহে," তবে ঐ সকল দেবতা ভিন্ন হইলেও পরমেশ্বরে অভিন্ন হইতে পারিলে, শিব, দুর্গা, বিষ্ণু, গণেশাদি কি ভিন্ন রূপে থাকিয়া এক পরমেশ্বর হইতে পারেন না? তাঁহাদিগের উপাসনায় বৈদিক মতের ব্যাঘাত হয়। যদি অগ্নি বায়ু প্রভৃতি দেবতারা পৃথক্ দৃষ্ট হইয়াও এক হইতে পারেন, তবে শিব বিষ্ণু প্রভৃতি ভিন্ন রূপ হইলেও অবশ্য এক হইবেন, তাহাতে সংশয় কি? তবে পাশ্চাত্য শিক্ষাদাতাদিগের অভিপ্রায় লইয়া যদি এরূপ আপত্তি করেন যে, "সগুণ উপাসনাই যদি কর্ত্তব্য হয়, তবে এক রূপের উপাসনা না করিয়া নানা দেবতার প্রতিমূর্ত্তি অর্চ্চনার ফল কি? এবং ইহাও আলোচনা করা উচিত যে, এক ঈশ্বরের উপাসনাই সাধকের কর্ত্তব্য।"

ইহার উত্তর যে, বৈদিক কর্ম্মীরা নানা দেবতার উপাসনা করেন না। ব্রহ্মাদি ষষ্ঠী পর্য্যন্ত সকলই পরমেশ্বরের রূপ; অতএব অভেদ জ্ঞানে দেখিলে এক ঈশ্বর ব্যতীত দ্বিতীয় উপাস্য নাই। যদি বল যে, নানা মূর্ত্তি ও নানা ধ্যান এবং নানাবিধ অনুষ্ঠান কেন হইয়াছে, এত পরমেশ্বর কিরূপেই বা সম্ভব হয়? উত্তর,—নাম অনেক এবং ধ্যানগত মূর্ত্তিও অনেক বটে, এবং ইহাতে সাধারণ লোক অনেক দেবতাই বোধ করে। বস্তুতঃ তাহা নহে; যথার্থ বেদদর্শী উত্তম জ্ঞানীরা জানিয়াছেন যে, এক পরমেশ্বরই নানা রূপে উপাস্য, তথাচ যোগবাশিষ্ঠে:—দিক্ কালাদ্যনবচ্ছিন্ন মদৃষ্টোভয়কোটিকং। চিন্মাত্রমক্ষয়ং শান্তমেকং ব্রহ্মাস্মিনেতরং॥

দিক্ কাল প্রভৃতি অনবচ্ছিন্ন প্রযুক্ত তাবৎ পদার্থই পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্ট হয়; কিন্তু সে সকল পৃথক্ নহে, চিন্ময়, অক্ষয়, শান্ত, এক ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য নহে। যদি বল যে, বিশেষণগত বৈলক্ষণ্য থাকাতেও যদি বিশেষ্যগত বৈলক্ষণ্য গ্রাহ্য না হয়, তবে নানবিধ বিশেষণ ভেদেও কোন পদার্থের পৃথকত্ব নিশ্চয় হইতে পারে না? উত্তর এই যে, বিশেষণগত বৈলক্ষণ্য দ্বারা যদ্যপি

শব্দবোধে ভেদগ্রহ হয়, তথাপি এক বস্তুনিষ্ঠ নানা বিশেষণের তাৎপর্য্য একই বিশেষ্য হয়, অর্থাৎ নানা নাম ও নানারূপ বিশেষণে পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া মান্য করিলেও তদ্বিশেষ্য এক মাত্র পরমেশ্বরের কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য নাই। যথা—"একদন্তো মহাকায়ো লম্বোদর গজানন" ইত্যাদি। একদন্ত, মহাকায়, লম্বোদর ও গজানন ইত্যাদি শব্দ বোধে পার্থক্য থাকাতেও, সমস্ত বিশেষণ এক গণেশরূপ বিশেষ্যকেই প্রতিপাদন করে, সেইরূপ সমস্ত ধ্যানগম্য এক পরমেশ্বরই হইয়াছেন। ফলতঃ বস্তুন্তর ও ব্যক্তি ভেদ হইলে তাদৃশ আপত্তির সঙ্গতি হইতে পারিত। তথাহি :—

ভজনীয়ে না দ্বিতীয়মিদং কৃৎস্নস্য তৎ স্বরূপত্বাৎ।—শাণ্ডিল্য সূত্রং॥

অদ্বিতীয় এক পরমেশ্বর ; তিনিই এই সকল দেবরূপে উপাস্য, যেহেতু ধ্যানগত সকল রূপই তাঁহার স্বরূপ। সুতরাং তদ্ভিন্ন পদার্থান্তরের আশঙ্কা রহিল না। যথা,—স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্।

স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কালোগ্নিঃ স চন্দ্রমাঃ॥ কৈবল্যোপনিষৎ।

কৈবল্যোপনিষদে আশ্বলায়ন সংবাদে উক্ত হইয়াছে, যিনি অদ্বৈত সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম, তিনিই ব্রহ্মা ও তিনিই শিব, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই অক্ষর, তিনিই স্বপ্রকাশ, তিনিই প্রাণ, তিনিই কাল, তিনিই অগ্নি, তিনিই চন্দ্র। পুনরপি :—ত্বং ব্রহ্মাত্বঞ্চবৈ বিষ্ণু ত্বং রুদ্র ত্বং প্রজাপতিঃ।

ত্বমগ্নির্বরুণোবায়ু ত্বমিন্দ্র ত্বং নিশাকরঃ॥

ত্বং মনস্ত্বংযমশ্চ ত্বং পৃথিবী ত্বমথাচ্যুতঃ।

স্বার্থে স্বাভাবিকের্থে চ বহুধা তিষ্ঠসে দিবি॥—মৈত্রেয়োপনিষৎ।

মৈত্রেয় উপনিষদেও অনুশাসন করিয়াছেন ; তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি রুদ্র, তুমি প্রজাপতি, তুমি অগ্নি, তুমি বরুণ, তুমি বায়ু, তুমি ইন্দ্র, তুমি চন্দ্র, তুমি মন, তুমি যম, তুমি পৃথিবী, এই বিশ্বকার্য্য সাধনার্থে বা উপাসনার্থে বহুরূপে স্বর্গাদি লোকে অবস্থিতি করিতেছ। তথাহি :—

ত্বমর্কস্ত্বং সোমস্ত্বমসি পবনস্ত্বং হুতবহ-

স্ত্বমাপ স্তং ব্যোমত্বমধরণিরাত্মা ত্বমিতি চ।

পরিচ্ছিন্না মেবং ত্বয়ি পরিণতা বিভ্রতি গিরং-

ন বিদ্মস্তত্তত্ত্বং বয়মিহ হি যত্ত্বং ন ভবসি।—মহিম্ন স্তোত্রং।

হে শিব! তোমার মহিমা কথনে অসমং পরিচ্ছিন্না যে বাণী, তিনি পরির্ণতা হইয়াছেন। যেহেতু তুমি সূর্য্য, তুমি চন্দ্র, তুমি বায়ু, তুমি অগ্নি, তুমি জল, তুমি আকাশ, তুমি সর্ব্বান্তর্যামী আত্মা; তোমার স্বরূপ লক্ষণ জানিবার ক্ষমতা নাই। তথাহি;—আদিত্যানামহং বিষ্ণু র্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।

মরীচি র্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণাং অহং শশী॥
বেদানাং সামবেদোস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা॥
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরাক্ষসাম্। গীতা।

অর্জ্জুনকে ভগবান্ কহিয়াছেন যে, যত দেবাদি মূর্ত্তি সকল মূর্ত্তিই আমি; যথা আদিত্যদিগের মধ্যে আমি বিষ্ণু, জ্যোতির্গণ মধ্যে আমি সূর্য্য, মরুদ্গণ মধ্যে আমি মরীচি, নক্ষত্রগণ মধ্যে আমি চন্দ্র, বেদের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবতার মধ্যে আমি ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গণ মধ্যে আমি মন, জীব মধ্যে আমি চৈতন্য, রুদ্রগণ মধ্যে আমি শঙ্কর, যক্ষ রাক্ষস মধ্যে আমি কুবের ইত্যাদি। আমিই সকল রূপ, ইহাতে মদ্ভিন্ন দেবতা অন্য, এমত আশঙ্কা করিও না। তথাহি:—তদ্যদিদমাহুরমুং যজামুং যজেত্যেকৈকং দেব মেতস্যৈব

সাবি সৃষ্টিরেষ উ হ্যেব সর্ব্বে দেবাঃ॥—বৃহদারণ্যকং।

যাগকালে যদিদং বচ আহুরমুমগ্নিং যজামুমিন্দ্রং যজেত্যাদিনা নাম মন্ত্র শস্ত্রস্তোত্র কর্ম্মাদি ভিন্নত্বাভিন্ন মেবাগ্ন্যাদি দেবমেকৈকং মন্যমানা আহু-রিত্যভিপ্রায়ঃ। তন্ন তথাবিদ্যাৎ। যস্মাদেতস্যৈব প্রজাপতেঃ সাবিসৃষ্টি র্দেব ভেদঃ সর্ব্বঃ এষ উ এব প্রজাপতিরেব। প্রাণঃ সর্ব্বেদেবাঃ॥ অত্র বিপ্রতি পদ্যাতে পর বএব হিরণ্যগর্ভ ইতি একে সংসারীত্য পরে পর এবতু মন্ত্রবর্ণাদিন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নি মাহুরিতি শ্রুতেঃ॥ শাঙ্করি ভাষ্যং।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ শর্ম্মা।

বিজ্ঞান, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

—কাশীর হিন্দু কলেজ পত্রিকায় কতকগুলি সুন্দর প্রবন্ধ বাহির হইতেছে মহোদয়া এনি বেশান্ত "রাজপুত বীরগণের চরিত" এবং "হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ" এই দুইটী প্রবন্ধ লিখিতেছেন। "ভারতরমণীগণ" নামক আর একটী প্রবন্ধও লিখিত হইতেছে। পত্রিকাখানি সকলেরই পাঠ করা উচিত।

—বিজ্ঞান, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এ দুয়ের পার্থক্য কি, তাহা বুঝিতে পারিলে, অনেক গোলযোগ মিটিয়া যায়। প্রাচ্য বিজ্ঞান স্বরূপতঃ আত্মবিজ্ঞান। যে অদ্ভুত পদার্থ সচ্চিদানন্দ জীবরূপে এবং শরীরের মধ্যে জীবনীশক্তিরূপে প্রকাশিত, তাহার স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্য এবং তদ্ব্যতীত বস্তু মাত্রেই বাস্তবিক পক্ষে আত্মচৈতন্য প্রসূত, ইহা প্রমাণ করিয়া আত্মচৈতন্যের একত্ব স্থাপন প্রাচ্য বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। প্রাচ্য বিজ্ঞানের চক্ষে উপাধির অন্তরতম চৈতন্য শক্তিই একমাত্র সত্য পদার্থ। এই চৈতন্যকে সুবিধার জন্য জৈবিক ও ঐশ্বরিক এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। এবং পরস্পর সংশ্লিষ্ট এই দুই ভাবের সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করিবার জন্য বুদ্ধির বিকাশোপযোগী বিভিন্ন স্তর বা দশা অনুযায়ী আপাততঃ বিভিন্ন দর্শনের উৎপত্তি হইয়াছে; কিন্তু কি ধর্ম্মশাস্ত্র, কি পুরাণ, কি দর্শন, কি কাব্য শাস্ত্র সকলের মধ্যেই চৈতন্যাংশের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়। সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষাতীত হইলেও পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গের জন্য; বেদান্তের মায়ার ত কথাই নাই। দ্বৈতবাদিগণের তটস্থা-শক্তিও স্বরূপশক্তির অপেক্ষা নিম্নস্তরের পদার্থ। জীবনীশক্তির উপরেই সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র স্থাপিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই জন্য গ্রহ ও উপগ্রহাদির বিজ্ঞান, ফলিত জ্যোতিষ-রূপে অবস্থিত। সেই জন্যই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও রোগ চিকিৎসার পূর্ব্বে রোগীর আধ্যাত্মিক অবস্থা ও তাহার ফলাফল নির্ণয়ের ব্যবস্থা আছে। এক কথায় হিন্দুশাস্ত্র মাত্রেরই একটি আধ্যাত্মিক গতি দৃষ্ট হয়।

—প্রতীচ্য বিজ্ঞানের গতি অন্যরূপ। তাহার উদ্দেশ্য জীবনীশক্তির প্রতিপাদক নহে। ব্যবহারিক বস্তু সকলের ক্ষণিক ব্যবহারিক ভাব নিরূপণ, এবং তাহাদের বাহ্যিক সম্বন্ধ নির্দ্ধারণই তাহার উদ্দেশ্য, সুতরাং এই বিজ্ঞান হইতে যথাসম্ভব জীবনীশক্তিকে পৃথক্ করা হইয়াছে। মানবের সুখ দুঃখ ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সহিত এই বিজ্ঞানের কোন সম্বন্ধ নাই। গ্রহ উপগ্রহাদির দ্বারা মানবের উপকার বা অপকার সাধিত হইতে পারে কি না, তাহার আলোচনা না করিয়া শুধু তাহাদের কক্ষ, গতি, প্রভৃতি পরিমাণ করিতে প্রতীচ্য বিজ্ঞান ব্যাপৃত। প্রকাণ্ড ঝড়ে কোন নগরী বিধ্বস্ত হইয়া গেলেও, প্রতীচ্য বিজ্ঞান কেবল মাত্র তাহার বেগের পরিমাণ, গতি ও স্থূল কারণ নির্দ্ধারণ করিয়াই ক্ষান্ত।

—বিজ্ঞানের চক্ষে ঝড়টী নৈসর্গিক শক্তির বিকাশ মাত্র। এবং ঐ শক্তির জ্ঞান হইলেই যথেষ্ট। সুতরাং প্রতীচ্য বিজ্ঞানের চক্ষে ঝড়ের মধ্যস্থিত শক্তি এবং যে শক্তি প্রকাশে এক মানব অন্য মানবকে হত্যা করে, এতদুভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। স্থূল লইয়া ব্যাপৃত থাকাতে প্রতীচ্য বিজ্ঞান সর্ব্ব প্রকার শক্তির বিকাশকে কেবল মাত্র স্থূল শক্তিতে পরিণত করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট। বস্তুর সত্তা নিরূপণ করিতে না পারিলেও তাহার শক্তি ও কার্য্য নিরূপিত হইলেই যথেষ্ট। এমন কি অনেকে চৈতন্য শক্তিকেও জড় পরমাণুর অন্তর্গত জড় শক্তিতে পরিণত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। প্রতীচ্য বিজ্ঞানের সাহায্যে উপাধিগত চৈতন্যকে বুঝিয়া—প্রাচ্য বিজ্ঞানের স্থূল চৈতন্যে পরিণত করিলে—প্রকৃত সামঞ্জস্য হয়।

———
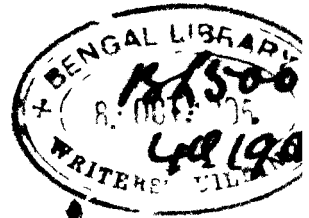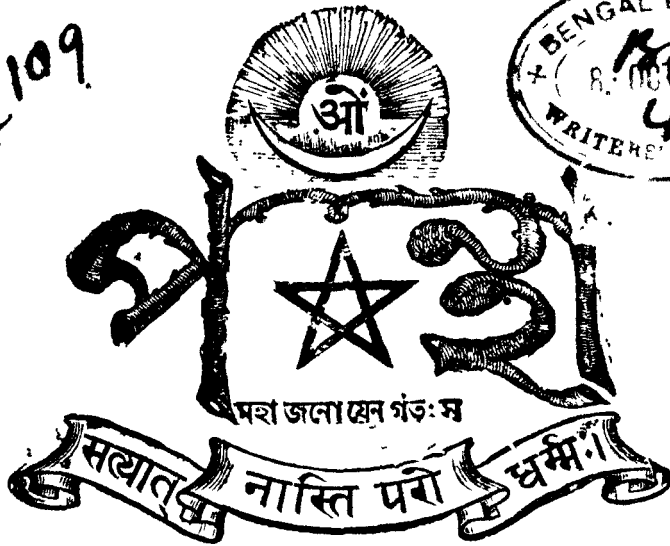
১০ম ভাগ। { শ্রাবণ, ১৩১৩ সাল। } ৪র্থ সংখ্যা।

মহিম্ন স্তব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্মশানেম্বাক্রীড়াঃ স্মরহর ! পিশাচাঃ সহচরা-
শ্চিতাভস্মালেপঃ স্রগপি নৃকরোটি পরিকরঃ।
অমঙ্গল্যং শীলং তব ভবতু নামৈবমখিলং,
তথাপি স্মর্ত্তৄণাং বরদ ! পরমং মঙ্গলমসি ॥ ২৪ ॥

আম্বয়কার্থঃ স্পষ্টঃ।

অপারার্থ। হে স্মরহর, সংকল্পনাশন, মোক্ষদেত্যর্থঃ। শ্মশানেষু শব-ভূমিষু আক্রীড়াঃ কেলয়ঃ ভবন্তি তবেতি শেষঃ। মহাপ্রলয়ে সর্ব্বস্মিন্ জগতি বিলয়ং গতে সতি, তত্র বিলয়স্থানে কেবলং ত্বমেবৈকঃ ক্রীড়সি ইতি ভাবঃ। পিশাং অবয়বাং অঞ্চন্তি অবয়বং ত্যক্ত্বা গচ্ছন্তীতি পিশাচাঃ জীবাত্মাদয়ো নিত্যপদার্থাঃ। যদ্বা পিশিতং মাংসং অশ্নন্তি ইতি পিশাচাঃ জীবদেহনাশব্যাপারে সহায়ত্বাৎ কালাদয়োঽপি পিশাচা উচ্যন্তে। তে সহ-চরাঃ সহায়াস্তবেতি শেষঃ। তেঽপি প্রলয়কালে তদংশত্বাৎ ত্বয়া সহৈব ভবন্তি

ইতিভাবঃ চিতাভস্মঃ আলেপঃ সমালভনং ; কালাগ্নিধ্বস্ত চরাচরব্রহ্মাণ্ড পরমাণবস্ত্বয়ি বিলীনাঃ সমালভনকার্য্যং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। নৃণাং মনুষ্যাণাং কে শিরসি রোটন্তে দ্যোতন্তে ইতি করোট্যঃ নরশ্রেষ্ঠাংশাঃ জীবাত্মান-স্তদৃষ্টানিচেত্যর্থঃ তেষাং পরিকরঃ সমূহঃ স্রগপি মাল্যমপি ; জীবাত্মানঃ অদৃষ্ট সূত্রে গ্রথিতাঃ পরমাত্মনি ত্বয়ি ফেনরাজীব সমুদ্রে মালাকারেণ বর্ত্তন্তে ইতি ভাবঃ। অপিরত্র সমুচ্চয় আবরকার্থে তু গর্হায়াংবোদ্ধব্যঃ। গর্হা সমুচ্চয় প্রশ্নশঙ্কাসম্ভাবনাস্বপীত্যমরঃ। এবং এতৎপ্রকারেণ অখিলং সর্ব্বং তে শীলং আচরণং অমঙ্গলাং অমঙ্গলকরং শাস্ত্রেষু মনুষ্যাণাং যন্মঙ্গলকর-মুক্তং তদ্বিপরীতং ভবতু নাম। তব লোকাতিগত্বাৎ তব চরিতমপি লোকাতি-গমিতি নিগূঢ়ার্থঃ। নামেতি সম্ভাবনায়াম। তথাপি হে বরদ অভীষ্টপ্রদ ত্বং স্মর্তৄণাং সংবন্ধে পরমং মঙ্গলমসি চতুর্ব্বর্গফলপ্রদত্বাৎ অতিশয় শুভকরো-ভবসীত্যর্থঃ। ২৪।

আবরকার্থঃ। হে কামনাশন! শ্মশান তোমার ক্রীড়ার স্থান, পিশাচগণ তোমার সহচর, চিতাভস্ম তোমার গাত্রানুলেপন,—আর এই সকল অপেক্ষাও ঘৃণার্হ শবমুণ্ড লইয়া তোমার মালা বিরচিত। এইরূপে তোমার সমস্ত ব্যাপার শাস্ত্রোক্তের বিপরীত ও লৌকিকের বিরুদ্ধ এবং কোন ক্রমেই শুভকর বলা যায় না। তথাপি হে বরদ! তোমাকে যে স্মরণ করে তাহার অশেষ মঙ্গল হইয়া থাকে। তুমিই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ ফলের দাতা। ২৪।

অপাবৃতার্থ। মহাপ্রলয়ে চরাচর সমস্ত জগৎ বিধ্বস্ত ও বিলয়প্রাপ্ত হইলে, সেই প্রলয় স্থানে কেবল তুমিই একাকী ক্রীড়া করিয়া থাক। তোমার অংশভূত কালদেশাদি অপরিমেয় অপরিচ্ছেদ্য নিত্য তত্ত্ব সকল পিশাচের ন্যায় ধ্বংসকার্য্য শেষ করিয়া কেবল তোমার সহিত বর্ত্তমান থাকে। কালাগ্নি বিধ্বস্ত চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের পরমাণু সকল তোমাতে বিলীন হইয়া সমালভনের ন্যায় কার্য্য করে। অদৃষ্টসূত্রে সম্বদ্ধ সংস্কৃত জীবাত্মারা সমুদ্রে ফেনমালার ন্যায় তোমাতে মাল্যরূপে অবস্থিতি করে। অতএব লোকে যেরূপ স্বভাব চরিত্র মনুষ্য পক্ষে মঙ্গলকর বলিয়া জানে, তোমার স্বভাব চরিত্র কোনও প্রকারে সেরূপ নহে। বিরুদ্ধ চরিত্রের নাম করিলেও

অমঙ্গল হয়, কিন্তু তোমাকে স্মরণ করিলে ইহলোক পরলোক উভয় লোকেই পরম মঙ্গল হয়; তাহাতে তুমি চতুর্ব্বর্গ দান করিয়া থাক। ২৪।

মনঃ প্রত্যক্‌চিত্তে সবিধমবধায়াত্তমরুতঃ,
প্রহৃষ্যদ্রোমাণঃ প্রমদসলিলোৎসঙ্গিতদৃশঃ।
যদালোক্যাহ্লাদং হ্রদ ইব নিমজ্জ্যামৃতময়ে,
দধত্যন্তস্তত্ত্বং কিমপি যমিনস্তৎ কিল ভবান্॥ ২৫॥

মন ইতি। বিধয়া বিধানেন সহ বর্ত্তমানং সবিধং সুবিহিতং যথা তথা আত্তঃ শরীর মধ্যে গৃহীতো মরুৎবায়ুর্যৈস্তথোক্তাঃ কৃতকুম্ভকা ইত্যর্থঃ যমিনঃ সংযমিনঃ সংযমনবন্তো যোগিনঃ প্রত্যঞ্চতীতি প্রত্যক্। অচ্‌গতাবিতি প্রতি পূর্ব্বকাৎ অচ্ ধাতোঃ ক্বিপ্। প্রতিগতং রূপাদি সর্ব্ব বিষয়েভ্যঃ বিনিবৃত্তং মনঃ মানসং চিত্তং তদীয় স্থানে আধায় স্থিরীকৃত্য নিরুধ্যেত্যর্থঃ * অন্তঃ অন্তঃকরণ মধ্যে কিমপি অনির্ব্বচনীয়ম্ যত্তত্ত্বমালোক্য দৃষ্ট্বা অমৃতময়ে হ্রদে নিমজ্জ্যেব স্নাত্বেব প্রহৃষ্যন্তি উদঞ্চন্তি রোমাণি যেষাং তে তথোক্তাঃ পুলকিত শরীরাঃ, তথা প্রমদসলিলৈরানন্দাশ্রুভিরুৎসঙ্গিতা আলিঙ্গিতা আকুলিতা ইতি যাবৎ দৃশশ্চক্ষূংষি যেষাং তথোক্তাশ্চ সন্তঃ আহ্লাদং আনন্দাতিশয়ং দধতি বিভ্রতি তৎ তত্ত্বং ভবান্ কিল ভবানেব। ২৫।

যোগিগণ যথাবিধান কুম্ভক করণান্তর মনকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত ও সংযত করিয়া অমৃত হ্রদে স্নান করার ন্যায় আহ্লাদে রোমাঞ্চিত-কলেবর ও আনন্দাশ্রুপরিপ্লুতনেত্র হইয়া অন্তঃকরণ মধ্যে যে অনির্ব্বচনীয় তত্ত্ব অবলোকন করেন, সেই তত্ত্ব তুমিই। ২৫। (ক্রমশঃ)

৺প্যারীমোহন সেন গুপ্ত।

---

* মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ।
শনৈঃ শনৈরুপরমেৎ বুদ্ধ্যা ধৃতি গৃহীতয়া॥
আত্ম সংস্থং মনঃকৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।
যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতৎ আত্মন্যেব বশং নয়েৎ।
প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসম্ ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শং অত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥ ইতি গীতায়াং

সনাতন ধর্ম্ম।

চতুর্থ অধ্যায়। কর্ম্মফলবাদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বর্ত্তমান কর্ম্মের ফল অল্প যত্নেই বর্ত্তমান জীবনে শেষ করা যাইতে পারে। যেমন ঋণ নির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বে অর্পণ করিতে পারিলে সহজে অব্যাহতি পাওয়া যায়, আর সুদ বর্দ্ধিত হইতে পারে না; তেমনি বর্ত্তমান কর্ম্ম সঞ্চিত হইবার পূর্ব্বে সহজে ভুক্ত বা প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা খণ্ডিত হইতে পারে।

এখন একটী মাত্র বিষয়ের মীমাংসা অবশিষ্ট রহিল—"মানব কিসে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে?" জীব যতদিন এই ব্রহ্মাণ্ডে থাকিবেন, ততদিন ব্রহ্মাণ্ডের সহজ সাধারণ কর্ম্ম হইতে অব্যাহতি নাই। দেবতা, মানব, পশু, পক্ষী, বৃক্ষলতাদি ও স্থাবর সমূহ সমস্তই সেই কর্ম্মচক্রের শাসনাধীন। সেই অনন্তবিধির বশ্যতা অতিক্রম করিবার ক্ষমতা প্রকট পদার্থের নাই। সেই বিধি না থাকিলে এ বিশ্ব থাকিত না, তাই দেবী ভাগবত বলিতেছেন—"ব্রহ্মাদীনাং চ সর্ব্বেষাং তদ্বশত্বং নরাধিপ॥" "হে নরাধিপ, ব্রহ্মাদি সমস্তই সেই বিধির বশ।" এই বিশ্বের বাহিরে গেলে, তবে এই কর্ম্মচক্র হইতে অব্যাহতি পাইতে পারা যায়। অর্থাৎ অব্যয়ে মিশিতে পারিলেই অব্যাহতি।

কিন্তু মানব সাধনা দ্বারা জন্ম মরণ চক্র হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন। এখন ঈশ্বরেচ্ছায় প্রকট দেহে বর্ত্তমান থাকিয়া ও নূতন কর্ম্ম না করিয়া সঞ্চিত কর্ম্মের ক্ষয় সাধন করিতে পারেন। বাসনা সূত্রেই মানব সেই কর্ম্ম চক্রে আবদ্ধ আছে, বাসনার নাশ হইলেই আর বন্ধনের উৎপত্তি হয় না। কঠোপনিষৎ বলিতেছেন:—

"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিস্থিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥"
"হৃদয়েতে আছে যতেক বাসনা, ঘুচে যায় যে সময়।
অমৃতত্ব পায় মর্ত্ত্য সে সময়ে, ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ হয়॥"

শ্রুতি পুনঃপুনঃ পরম উপাদেয় শিক্ষা বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন। গীতা বলিতেছেন—

"যস্য সর্ব্বে সমারম্ভা কাম-সংকল্প বর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মানং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥" ১৯
গত সঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিত চেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥ ২৩, ৪র্থ অধ্যায়॥
কামনা সংকল্প, বর্জ্জিত যাঁহার, জীবনের কর্ম্মচয়।
তাঁরে বুধগণ, জ্ঞানদগ্ধ কর্ম্মী, পণ্ডিত বলিয়া কয়॥"

তখনই মুক্তি অধিগত হইল। মানব তখন অজরামর ঋষিগণের ন্যায় থাকিয়া ব্রহ্মাণ্ডের ক্রমবিকাশের সহায় হইতে পারেন অথবা চিরদিনের জন্য অনন্তে বিলীন হইতে পারেন। এই অধ্যায়ে যে সমস্ত বিষয় আলোচিত হইল তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্মরণ রাখিবার উপযুক্ত:—

১। কর্ম্মের প্রকৃতি ও ফল। ২। বিধির প্রকৃতি। ৩। জীবাত্মার কর্ম্ম বন্ধের বিধিত্রয়। ৪। দৈব ও পুরুষকারের সম্বন্ধ। ৫। ত্রিবিধ কর্ম্ম। ৬। কর্ম্ম নিবৃত্তি।

পঞ্চম অধ্যায়।

যজ্ঞ।

যজ্ঞবিধিও কর্ম্মবিধির ন্যায় সুবিস্তৃত। এই বিধিবলেই বিশ্ব বিনির্ম্মিত হইয়াছে—এই বিধি বলেই বিশ্ব পালিত ও রক্ষিত হইতেছে। জীব জীবের দ্বারাই জীবিত থাকিতে পারে। "জীবো জীবস্য জীবনং।" দেহ সহযোগেই দেহ সুরক্ষিত হইতে পারে। যজ্ঞবিধি সর্ব্ব ধর্ম্মশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহা ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন "নায়ং লোকোস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম।" হে কুরুসত্তম, এই নরলোকও অযজ্ঞকারীর জন্য সুখদ নয়; অন্য লোকের কথা আর কি বলিব।

সনাতন ধর্ম্ম এই যজ্ঞ বিধিকে স্বীয় অস্থি মজ্জারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রত্যেক শ্রুতি এই বিধির কীর্ত্তন করিতেছেন—প্রত্যেক স্মৃতি ইহাকেই

সমস্ত কর্ম্মের সার বলিয়া স্বীকার করিতেছেন—প্রত্যেক পুরাণ ও ইতিহাস এই যজ্ঞবিধি ও যজ্ঞফলের বিবরণে পরিপূর্ণ। ষড়াঙ্গ এই যজ্ঞ-বিধিকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। ষড়্‌দর্শন ধীরে ধীরে, যতদিন পূর্ণজ্ঞান লব্ধ না হয় ততদিন, এই পথেই ভ্রমণ করিতে বলিতেছেন।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে আমরা আর্য্যজীবন যে যজ্ঞময় তাহা প্রদর্শন করিব। এইস্থলে আমরা সাধারণ নিয়ম ব্যতীত বিশেষ প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করিব না। যজ্ঞ হইতেই সৃষ্টি :—বৃহদারণ্যক "ওঁ উষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ।" বলিয়া গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন।

এই উষা ব্রহ্মার দিবাগমের উষা বা সৃষ্টির প্রারম্ভ কালের কথা নির্দ্দেশ করিতেছে। অশ্ব শব্দে এখানে এই ব্রহ্মাণ্ডকে বুঝাইতেছে (শ্বস্=আগামী দিন। অ+শ্ব যাহা ব্রহ্মার আগামী দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী নহে) তাহাই সেই পরম পুরুষের যজ্ঞকাণ্ড। সুতরাং মেধ্য=পরম পুরুষের পবিত্র যজ্ঞের অশ্বই এই ব্রহ্মাণ্ড তাহার শির অর্থাৎ আদি ভাগ। সেই একমেবাদ্বিতীয়ং, যিনি দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর, নর প্রভৃতির প্রকাশক, এই ব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই যজ্ঞ—ইহা পরবর্ত্তী শ্লোকে বর্ণিত আছে। এই উপনিষদে, তৎপরে বিশ্বের অপ্রকট অবস্থা হইতে প্রকটাবস্থা পর্য্যন্ত বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তেও এই যজ্ঞ বর্ণিত আছে। কিরূপে সেই পুরুষের পাদাংশে সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ প্রকট হইয়াছে এবং এই মহাযজ্ঞের পর ত্রিপাদ অমৃত ও গুহ্য আছে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

শতপথ ব্রাহ্মণে এই সৃষ্টিরূপ মহাযজ্ঞ সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে :—

"ব্রহ্ম বৈ স্বয়ম্ভূ স্তপোঽতপ্যত। স ঐক্ষত ন বৈ তপস্যানন্ত্যমস্তি হন্ত অহং ভূতেষ্বাত্মানং জুহবানি ভূতানি চ আত্মনি, ইতি। তৎসর্ব্বেষু ভূতেষ্বাত্মানংহুত্বা ভূতানি চ আত্মনি, সর্ব্বেষাং ভূতানাং শ্রৈষ্ঠ্যং স্বারাজ্যমাধিপত্যং পর্য্যৈৎ।"

"স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা তপ করিলেন। তিনি স্থির করিলেন তপ অনন্ত নহে; অতএব আমি আত্মাকে সর্ব্বভূতে ও সর্ব্বভূত আত্মাতে হোম করিব। অনন্তর তিনি আত্মাকে সর্ব্বভূতে ও সর্ব্বভূত আত্মাতে আহুতি প্রদান-

পূর্ব্বক শ্রেষ্ঠত্ব, স্বারাজ্য আধিপত্য লাভ করিলেন।" মনু বলিয়াছেন ব্রহ্মা সনাতন যজ্ঞ (১।২২) সৃষ্টি করিয়া বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর, এই বিশ্ব সৃষ্টির জন্য আত্মাহুতি প্রদানপূর্ব্বক যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এই মহা শিক্ষা বাক্য দ্বারা এই বুঝিতে হইবেক যে তিনি আপনাকে প্রাকৃত ভূত রূপে সসীম করিয়াছিলেন। এই জন্য সৃষ্টিপূর্ব্বক তিনি দেহ ত্যাগ করিলেন এই কথা পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ করিবার কারণ এই যে তাঁহার অসীম প্রাণশক্তি হইতে অসংখ্য স্বতন্ত্র সসীম জীব উদ্ভূত ও জীবিত থাকিতে পারিবেক। এই বিশ্বের প্রত্যেক জীবই তাঁহার অংশ। এইজন্য শ্রীমদ্ভগবৎগীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন:—"মমৈবাংশো জীব-লোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।"

তাঁহার এই মহাযজ্ঞ ব্যতীত এই বিশ্বের সত্তার প্রকাশ অসম্ভাব ঘটিত। কিন্তু সেই পুরুষের পাদমাত্র এই জগত প্রকাশের পক্ষে যথেষ্ট। সেই জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন—"বিষ্টভ্যাহংমিদং কৃৎস্নং একাংশেন স্থিতো জগৎ॥" একাংশে ব্যাপিয়া আছি বিশ্ব চরাচর॥"

ঈশ্বর তাঁহার অনন্ত বিশ্বের পক্ষেও অনন্ত। কিন্তু এই সমুদয় তাঁহা-তেই আছে, ইহা তাঁহার প্রাণেই অনুপ্রাণিত হইয়া রহিয়াছে; ইহার উপাদানও তাঁহা হইতেই উদ্ভূত।

শ্রীমদ্ভগবৎগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, কিরূপে প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এবং মানবকে বলিয়াছিলেন যে এই যজ্ঞই তোমাদিগের ইষ্ট ও কামধুক্ হইবেক। এই জন্য কর্ম্ম যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। গীতা বলিতেছেন —"ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্ম সংজ্ঞিতঃ।".

"ভূতসমূহের উৎপত্তি ও ক্রমশঃ বৃদ্ধিকর যজ্ঞাদিরূপত্যাগকে কর্ম্ম বলে।"

এই বিসর্গই প্রাণপ্রচ্ছন্দন। তাহাই মাত্র প্রত্যেক স্বতন্ত্র জীবকে জীবিত রাখিয়াছে। এই যজ্ঞের কথাই পুরুষ সূক্তে বর্ণিত হইয়াছে। এই তত্ত্বটী এতই সূক্ষ্মরূপে উপলব্ধ হইয়াছিল যে এই যজ্ঞই কর্ম্মনামে কথিত হইয়াছে। কর্ম্মকাণ্ড বলিলে সর্ব্ববিধ যজ্ঞের বিষয় বুঝায়।

যজ্ঞের সূক্ষ্ম রহস্য—জগতের জন্য প্রাণের বিসর্গ। এই উপায়ে প্রাণের প্রসার বর্দ্ধিত হয়। সৃষ্টির নিম্নস্তরে ইহাই বিগ্রহ ও নিরন্তর যুদ্ধ-

রূপে বর্ত্তমান। আত্মত্যাগ কার্য্য মানবের বিশেষ গৌরবের বিষয়। আত্মত্যাগের শক্তির তারতম্য অনুসারে মানবের উচ্চতা বুঝিতে পারা যায়। মানব পরম পুরুষে আপনাকে ও আপনার সমস্ত কর্ম্মকে অর্পণ করিতে পাইলেই মুক্ত হয়। ভগবান্ বলিতেছেন :—

"যৎ করোসি যদশ্নাসি, যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥
শুভাশুভ ফলৈরেবং মোক্ষসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ॥"

হে কুন্তি নন্দন! যাহা কিছু কর যা তুমি কর ভোজন।
যেবা হোমকর, কর দান, তপ আমারে কর অর্পণ॥
এরূপ করিলে, শুভ বা অশুভ, যে কিছু কর্ম্ম তোমার।
তার সেই ফল বন্ধন হবে না হবে মুক্ত জেনো সার॥"

এই যজ্ঞবিধি ভৌতিক জগতে কিরূপ কার্য্য করিতেছে তাহা এইবার আমরা আলোচনা করিব। স্থাবর পদার্থের অংশ সমূহ ভগ্ন হইয়া তাহার অন্তর্গত জীবনীশক্তির সাহায্যে উদ্ভিদগণ উৎপন্ন ও পুষ্ট হয়। স্থাবর পদার্থের আত্মত্যাগরূপ যজ্ঞ দ্বারা উদ্ভিদের পোষণ করিলে সঙ্গে সঙ্গে তদন্তঃস্থিত জীবনী উদ্ভিদে আসিয়া উন্নত হইল।

আবার উদ্ভিদের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদগণ নিজ প্রাণ দ্বারা উচ্চজাতীয় উদ্ভিদের প্রাণ পোষণ করে। এমন অনেক উদ্ভিদ আছে যাহারা একবার জন্মিয়া কিছুদিন জীবিত থাকে, এবং সেই জীবনের কাজ শেষ করিয়া অবশেষে প্রাণত্যাগপূর্ব্বক ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে; এবং তাহাতে বৃক্ষাদি বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হয়। আবার অনেক উদ্ভিদ প্রাণিগণের আহাররূপে ব্যবহৃত হইয়া নিজ শরীর জীবনীশক্তিদ্বারা জীবগণের বর্দ্ধন ও পোষণ সম্পন্ন করে। তখন তাহার প্রাণাদি অপেক্ষাকৃত উন্নত হয়।

প্রাণীরাজ্যেও নিম্নশ্রেণীর জীব স্বীয় দেহ ও প্রাণের বিনিময়ে উচ্চতর জীব ও মানবের উৎকর্ষ সাধন করে। মানবগণের অসভ্যাবস্থায়ও দেখা যায় দুর্ব্বল নিজ দেহ দান করিয়া বলবানের দেহাদি পোষণে সহায়তা করিয়া থাকে। কিন্তু ক্রমে উন্নতিবশে বিবেক ও সহানুভূতির বিকাশ হইলে, আর নিজ দৈহিক উন্নতির জন্য নিম্নতর প্রাণীর দেহ গ্রহণ উপযুক্ত

বিবেচনা করেন না। সর্ব্ব প্রথমে মানবের নরমাংসে বিতৃষ্ণা হয়, পরে ক্রমে ক্ষুদ্রতর জীবের নাশও তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া পড়ে। তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে, অপরের জন্য আত্মত্যাগ ও স্বার্থত্যাগে ক্রমেই দেবভাবের বর্দ্ধন ও পোষণ হয়। নিজের জন্য অপরের নাশ দ্বারা তাহা হয় না। ক্রমে তিনি নিজের জন্য অপর জীবের নাশ যথাসাধ্য সংকোচ করিতে থাকেন এবং অপরের জন্য যথাসাধ্য আত্মত্যাগ স্বীকার করিতে আরম্ভ করেন। যতদিন মানবের দেহাত্মবুদ্ধি থাকে ততদিনই মানব অপরের দেহদ্বারা নিজ দেহ পুষ্টির প্রয়োজন বিবেচনা করে। কিন্তু আত্মজ্ঞানের উদয় হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, তিনি আত্মত্যাগের দ্বারা জগতের পোষণের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। কারণ ত্যাগই আত্মানন্দের প্রধান উপাদান। যতদিন মানব প্রবৃত্তিমার্গগামী, ততদিন তিনি গ্রহণ করেন, নিবৃত্তিমার্গে ত্যাগই তাঁহার সর্ব্বস্ব হয়। এইরূপে মানবজীবনের ক্রমবিকাশ সাধিত হয়। যজ্ঞতত্ত্বের বর্ণমালা ঋষিগণ মানবকে শিখাইয়াছিলেন, কারণ তাঁহারাই বর্ত্তমান কল্পে আর্য্যজাতির শৈশবে তাহাদের শিক্ষাগুরু ছিলেন। তাঁহারা মানবকে পূর্ণরূপে আত্মত্যাগের উপদেশ দিতে চেষ্টা করেন নাই, কেবল তাহাদের ক্রমবিধি বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, অল্পত্যাগে ভবিষ্যতে অনেক পাওয়া যায়। এই জন্য তাঁহারা স্ব স্ব জীবন রক্ষার জন্য যাহা সংগ্রহ করিতেন যথাশক্তি তাহার কিয়দংশ বলিরূপে প্রদান করিয়া ত্যাগের অভ্যাস করিতেন, ভবিষ্যতে সেই ত্যাগের ফল তাঁহাদের লক্ষ্য থাকিত।

আবাং রাজানাবধ্বরে ববৃত্যাং হব্যেভিরিন্দ্রা বরুণা নমোভিঃ॥
অস্মে ইন্দ্রাবরুণা বিশ্ববারং রয়িং ধত্তং বসুমন্তং পুরুক্ষুম্॥
ইয়মিন্দ্রং বরুণমষ্টমে গীঃ প্রাবত্তোকে তনয়ে তূতুজানা॥" ঋক্ ৯।৮৪।১-৪-৫

"হে রাজগণ! ইন্দ্র, বরুণ এই আমাদের যজ্ঞে হব্য ও নমস্কার দ্বারা সমাগত হউন। হে ইন্দ্রবরুণ, আমাদিগকে প্রচুর ধন, আহার্য্য ও আশীর্ব্বাদ প্রদান করুন। আমাদের এই গীতি ইন্দ্রবরুণ সমীপে গমনপূর্ব্বক স্বশক্তিতে বহু সন্তান সন্ততির হেতু হউক।"

ঋগ্বেদ সংহিতার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় এইরূপ অসংখ্য প্রার্থনা দৃষ্ট হয়। ইহাদ্বারা মানব ভবিষ্যৎ ফলের প্রত্যাশায় যজ্ঞাদিরূপ ত্যাগ করিতে অভ্যস্ত হয়।

এই যজ্ঞদ্বারা মানব বুঝিতে পারে যে তাহারা অনন্তের ক্ষুদ্র অংশ, এবং চরাচরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। সুতরাং যখন তাহার জীবন রক্ষা ও দেহ পুষ্টির জন্য উদ্ভিদ্ ও প্রাণিগণ নিজ দেহ প্রদান করিতেছে, তখন তাহাদের জন্যও মানবের আত্ম ও স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন আছে। অগ্নি দেবগণের মুখ, বা আস্বাদ; সুতরাং দেবগণের উদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি প্রদান কর্ত্তব্য। অপর দানযোগ্য মানবগণকে যথাশক্তি দান করা প্রয়োজন এইরূপে বাধ্যবাধকতার ভাব উৎপন্ন হয়। ইহার পর, তাহাদের যজ্ঞের প্রবৃত্তি আরও বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। যে সকল হবিঃ প্রভৃতি পদার্থ মানবের বর্ত্তমান সময়ে প্রয়োজনীয় তাহা পারত্রিক সুখের জন্য অদৃশ্য স্বর্গফলের জন্য "স্বর্গকামো যজেত" এই বাক্য দ্বারা যজ্ঞে ত্যাগ করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। শ্রুতি বলিতেছেন—

"এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু যথাকালং চাহুতয়ো হ্যাদদায়ন।
তন্নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্যস্য রশ্ময়ো যত্র দেবানাং পতিরেকোঽধিবাসং।
এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চসঃ সূর্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি।
প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোঽর্চয়ন্ত্য এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ॥"

যথাকালে যেই যজ্ঞাগ্নিশিখায়,
আহুতি ক'রয়া দান।
যজ্ঞ করে সদা দেবেন্দ্র নিলয়ে,
সেই সদা পায় স্থান॥
সূর্য্যরশ্মি তারে যতন করিয়া,
লয়ে যায় সেই স্থানে।
সে আহুতিগণ এসো এসো বলি,
সুধা ঢালে তার প্রাণে।
বহু প্রিয় বাক্যে সাদরে পূজিয়া,
বলে সুমধুর ভাবে।
"এস, এই তব সুকৃতি অর্জ্জিত,
পুণ্য ব্রহ্মলোক-বাসে॥"

এইরূপে দৃষ্ট পদার্থের দ্বারা অদৃশ্য ফলের জন্য বর্ত্তমানে সুখের পরিবর্ত্তে

ভবিষ্যতে মহাসুখের জন্ম যজ্ঞ করিতে করিতে মানব পদে পদে অগ্রসর হইয়া থাকে। কিন্তু এই যজ্ঞের প্রকৃত উদ্দেশ্য স্বর্গসুখ নহে। কারণ পার্থিব ধন সম্পদের ন্যায় স্বর্গের সম্পদও অচিরস্থায়ী, সুতরাং হেয়। এই যজ্ঞের দ্বারা মানব পরোক্ষভাবে প্রকৃত সম্পদের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। প্রথমে স্বার্থত্যাগ করিতে করিতে লোভের নাশ হয়, অনন্তের সহিত নিজ সম্পর্ক অনুভূত হয়, তখন তাহারা কেবল কর্ত্তব্য বোধে যজ্ঞ করিতে শিখে। এইবার মানব আর এক পদ অগ্রসর হইল। ইহা তৃতীয়। এইবার ফল প্রত্যাশা ত্যাগ। কর্ম্মফল সন্ন্যাস।

এইবার মানব বুঝিতে পারে নিম্নস্তরস্থিত জীবের উচ্চস্থের জন্ম আত্মত্যাগ কর্ত্তব্য। উচ্চস্তর সর্ব্বদাই নিম্নস্তরের জন্য আত্মত্যাগ করিতেছেন। ঈশ্বর স্বীয় প্রাণশক্তির ত্যাগ দ্বারা জীব পর্য্যায়ের রক্ষাবিধান করিতেছেন। এই জন্য ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য। মানবদেহ নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ ও প্রাণীর নিকট ঋণী, কারণ তাহারা ইহাকে স্বতঃপরতঃ রক্ষা করিতেছে, অতএব তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া তাহাদের সেবা করিয়া, সে ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য। তখন মানব শ্রীগীতা কথিত এই উপদেশ গ্রহণের যোগ্য হয়

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি।
যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।

কর্ম্মেতেই তব　　　আছে অধিকার,
ফলে অধিকার নাই।
ফলের আশায়　　　কর্ম্ম করিও না,
আসক্তি ত্যজ সদাই।
অকর্ম্মেতে মন　　　দিওনা কখন,
সদা যোগ যুক্ত হয়ে।
আসক্তি ত্যজিয়া　　　ওহে ধনঞ্জয়,
কর কর্ম্ম শান্ত হয়ে॥

জীবন চক্র অনবরত ঘুরিতেছে। সমুদয় জীবন পরস্পর সাপেক্ষ। যে ব্যক্তি এই তত্ত্ব অবগত হইতে পারিয়াছেন তিনিই বুঝিয়াছেন যে, এই চক্রের

আবর্ত্তনে সহায়তা করা মানব মাত্রেরই কর্ত্তব্য। এবং স্বীয় কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকা একান্ত অকর্ত্তব্য। গীতা বলিতেছেন

"এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥"

"হে পার্থ এইরূপে প্রবর্ত্তিত চক্রের, যে ব্যক্তি ইহসংসারে অনুবর্ত্তন না করে, সে পাপময়জীবন, ইন্দ্রিয়সুখপরায়ণ বৃথা জীবিত থাকে।" এই শিক্ষা বহু অভ্যাসে আয়ত্ত হইলে মানব তৃতীয় শিক্ষার অধিকারী হয়। তখন মানব সম্পূর্ণ ভাবে ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করিতে সমর্থ হয়। তখন তিনি আপনাকে ঈশ্বরেচ্ছা সাধনের যন্ত্রস্বরূপ মনে করেন। শ্রীভগবান শ্রীমদ্ভগবৎ গীতায় বলিতেছেন,—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

আমাতে একাগ্র কর মন, ভক্তি কর সতত আমারে।
কর সদা আমার যাজন, পূজহ আমারে নমস্কারে॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া সত্য বলি, এইরূপে পাইবে আমায়।
প্রিয় তুমি মম সুনিশ্চয়, সন্দেহ না কর একথায়॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম করি পরিহার, লহ তুমি শরণ আমার॥"

তখন মানবের সমস্ত জীবন যজ্ঞময় হইয়া যায়, তখন শুধু ভগবৎ ইচ্ছা পরিপূরণের জন্যই জীবনধারণের প্রয়োজন উপলব্ধ হয়। সেই অবস্থায় উপস্থিত হইলে স্বতঃই মানবের সর্ব্ববিধ ধর্ম্মই পরিত্যক্ত হইয়া যায়। তখন আর ঐ সমুদয়ের প্রয়োজন বা অপ্রয়োজন উপলব্ধি হয় না। তখন লৌকিক ধর্ম্ম কর্ম্ম আর তাহাকে আকর্ষণ করিতে পারে না। তখন ভগবৎ ইচ্ছার অনুগত হইয়া কার্য্য করাই তাঁহার একমাত্র ধর্ম্ম হয়। তখন আত্মীয় স্বজন পরিবার প্রতিবেশী অন্যান্য মানব ঈশ্বরের বলিয়া তাহার উপলব্ধি হয়। সেই সমুদয়ের মধ্যে ঈশ্বরের সত্ত্বা উপলব্ধ হয় বলিয়া তাহাদের সেবা তাঁহার কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। (ক্রমশঃ)

আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়ম।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৪। ত্যাগ।

আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি যে, যে পরিমাণে মানব তাহার ইন্দ্রিয় দমন করিতে সক্ষম হয় ও মানসিক স্থৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারে, সেই পরিমাণে মহত্তর প্রজ্ঞার বিকাশ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়। তৎপরে কর্ত্তব্যজ্ঞানের সাহায্যে উহার বিকাশ উপলব্ধি করা আরও সহজ হয় তাহারও আলোচনা করিয়াছি। মানব যে সমুদয় কর্ত্তব্যরূপ ঋণে আবদ্ধ হইয়াছে তাহা হইতে বিমুক্ত হইবার জন্য যে পরিমাণে দৃঢ় নিশ্চয় ও বদ্ধপরিকর হয় সেই পরিমাণে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথেও অগ্রসর হইয়া থাকে। ইহা আমরা দেখিয়াছি।

এক্ষণে আমরা একটী গুরুতর বিষয় আলোচনা করিব। কর্ত্তব্যজ্ঞানের পরে কি ধর্ম্ম—তাহাই আলোচ্য। কর্ত্তব্যজ্ঞানের আলোচনা আমাদের পক্ষে কঠিন, সুতরাং কর্ত্তব্যজ্ঞানের পরে কি ধর্ম্ম সাধন আবশ্যক, তৎ-সম্বন্ধে আলোচনা করা অতীব দুঃসাধ্য। মানুষ যখন কর্ত্তব্যজ্ঞানের অতীতাবস্থায় পৌছে, তখন তাহার আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে এবং ভগবানে লয় প্রাপ্ত হয়। ইহার নাম "ত্যাগ" বা 'সন্ন্যাস' বা "যজ্ঞ"।

আমাদের এই পৃথিবীতে যে দিকে চাহিয়া দেখ দেখিতে পাইবে 'যজ্ঞ' এই কথাটী সর্ব্বত্রই লেখা আছে। একের ত্যাগ অপরের প্রাণ; তাহার ত্যাগ পুনরায় অপরের জীবন। উদ্ভিদের ত্যাগে পশু জীবন ধারণ করিতেছে, পশুর ত্যাগে অপর জীব বাঁচিতেছে। এই বিশ্বমাঝে যে দিকে দৃকপাত করিবে "ত্যাগ" যেন সর্ব্বত্রই লেখা আছে। তাহা না হইবেই বা কেন? কারণ যে পৃথিবীতে আমরা বাস করিতেছি তাহাই ভগবানের আদিযজ্ঞে সমুদ্ভূত। ঈশ্বর যখন সৃষ্টির প্রাক্কালে বলিলেন "এক আমি বহু হইব"—যখন নিজের অসীম অবস্থা হইতে সসীম হইলেন—তখনই প্রথম বা আদি যজ্ঞ হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার সৃষ্ট জগতে এই যজ্ঞের ভাব

সর্ব্বদা বিগুমান আছে। সর্ব্বদেশের ধর্ম্মগ্রন্থে, সৃষ্টি যে ঈশ্বরের ত্যাগ সম্ভূত বা যজ্ঞের দ্বারা সমুদ্ভূত হইয়াছে এ বিষয়ে ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। ঐ বিষয়ে যে মতভেদ নাই তাহার প্রমাণ শাস্ত্র খুলিলেই দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু এ বিষয়টী অনেকের নিকট এত পরিচিত যে এস্থলে শাস্ত্রবাক্য প্রমাণ দেওয়া অনাবশ্যক।

এই ত্যাগ বা যজ্ঞের ভাব আমরা আদিযজ্ঞের ভাব হইতে কতকটা বুঝিতে পারি। বিমুক্ত পুরুষ যখন প্রকৃতিতে আবদ্ধ হন, যিনি অসীম তিনি যখন নিজকে প্রকাশ করিবার জন্য সীমাবদ্ধ হন, যিনি স্বভাবতঃ মুক্ত হইয়াও নিজেকে জগতে প্রকাশ করিবার জন্য বন্ধনে জড়িত করেন—তখনই ত্যাগ বা যজ্ঞের প্রথম সৃষ্টি। নিজের স্ব-ভাব হইতে বিচ্যুত হন, কারণ জীব যেন তাহার এই ভাব প্রাপ্ত হয়—ইহাই ত্যাগ। নিজে পূর্ণ হইয়াও জীবের হেতু নিজকে অসম্পূর্ণ করেন—ইহাই যজ্ঞ। বিশ্বের ক্রমোন্নতির ব্যাপার মনোনিবেশ করিয়া দেখিলে ইহা আমরা বুঝিতে পারিব যে চৈতন্য উপাধি ব্যতীত ব্যক্ত হইতে পারে না। সীমাবদ্ধতা চৈতন্যের বিকাশহেতু। চৈতন্যশক্তির ক্রমোন্নতির জন্য সীমাবদ্ধতা একটি আবশ্যকীয় অবস্থা। নাম ও রূপ গ্রহণ না করিলে চৈতন্যের বিকাশ হয় না। যেমন 'রূপ' গ্রহণ করিয়া চৈতন্যশক্তি (life) বিকাশ প্রাপ্ত হয় সেইপ্রকার একরূপ ধ্বংস হইলে রূপান্তর গ্রহণ করিয়া চৈতন্য সর্ব্বদা উন্নতির স্তরে আরোহণ করিতেছে। উপাধি না থাকিলে চৈতন্যের উন্নতি বা বিকাশ হয় না। চৈতন্য তাহার চতুর্দ্দিক্ হইতে উপাধির ভূত বা উপাদান (matter) সংগ্রহ করে এবং ইহা দ্বারা আবদ্ধ হয়। চৈতন্যের কার্য্যহেতু এক রূপ ধ্বংস বা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে চৈতন্য life অন্যরূপ গ্রহণে তৎপর হয়। রূপ যে পরিবর্ত্তনশীল তাহা আমরা দেখিতে পাই। রূপ পরিবর্ত্তন হইলে চৈতন্যের বিনাশ হয় না, পরন্তু চৈতন্যের বিকাশভূত বা উপাদান বা উপাধি দ্বারা সম্ভবপর হয়, সুতরাং চৈতন্য একপ্রকার, উপাদান নষ্ট হইলে তৎপরিবর্ত্তে অন্য উপাদান গ্রহণ করিয়া স্বীয় উপাধি সৃষ্টি করে। উপাধি বজায় না রাখিতে পারিলে চৈতন্যের ক্রমোন্নতি অসম্ভব হয়।

এই উপাধি গ্রহণের ভাব দেখিয়া জীবের মনে ধারণা হয় যে কেবল গ্রহণ করিয়াই, আত্মসাৎ বা 'নিজস্ব' করিতে পারিলেই চৈতন্যশক্তি রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হয়। এই শিক্ষাটী প্রথমতঃ প্রকৃতি matter এর সংস্পর্শে জীব শিখিতেছে বলিয়া বোধ হয়। কারণ সে তখন ইহা বুঝিতে পারে না যে, গ্রহণ করা বা আত্মসাৎ করা life চৈতন্যের বাস্তবিক আবশ্যক নহে। উহা চৈতন্যের বিকাশভূত উপাধির জন্য আবশ্যক। যে রূপে বা উপাধিতে চৈতন্য বিকাশ হয় তাহার রক্ষণ হেতু "উপাদান গ্রহণ" আবশ্যক। নূতন উপাদান ব্যতীত একপ্রকার রূপ চিরদিন থাকে না। জীবের প্রথমতঃ এই গ্রহণ তৎপরতা বা নিজস্ব করণের ভাব ক্রমোন্নতির পরিচায়ক। প্রবৃত্তিমার্গে সে সর্ব্দা এই শিক্ষা পাইতেছে—যে তাহাকে বাঁচিতে হইলে তাহাকে অবশ্য গ্রহণশীল হইতে হইবে; তাহাকে নিজের উপাধি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অন্য উপাধির সহিত মিশিতে হইবে।

যখন পূর্ব্বজেরা বা মহর্ষিরা দেখিলেন যে জীব জড়ত্বের আবশ্যকীয় সীমায় উপনীত হইয়াছে তখন সে পূর্ব্বে যে শিক্ষা পাইয়াছিল তাহার বিপরীত এক অপূর্ব্ব শিক্ষা—তাঁহারা প্রদান করিলেন। গুরু উপদেশ করিলেন—"জীবন কেবল গ্রহণ করিয়াই সংরক্ষিত হয় না, কিন্তু যাহা তুমি গ্রহণ করিয়াছ তাহার ত্যাগের দ্বারাও হয়। তুমি কেবল অপরের লইয়া বাঁচিবে ইহা ঘোর ভ্রান্তি। তোমার চতুর্দ্দিকের জীবন গ্রহণ করিয়া তুমি নিজেকে অক্ষুণ্ণ রাখিবে ইহা ভুল। এ সমগ্র পৃথিবী পরস্পরের সাহায্যের নিয়মে আবদ্ধ। পরস্পর আদান প্রদানেই সংসার চলিতেছে। রূপ জগতেও তুমি একাকী থাকিতে পার না; তুমি নিজের রূপ রাখিবার জন্য অন্যের রূপ গ্রহণ করিলে একটী ঋণগ্রস্ত হও; এবং নিজাংশের কিয়দংশ অপরের জন্য বিসর্জ্জন বা ত্যাগ না করিলে ঋণমুক্ত হইবে না। জগতের সমুদয় প্রাণীই একটি সুবর্ণ শৃঙ্খলে গ্রথিত; সেই সুবর্ণ শৃঙ্খলের নাম ত্যাগ বা যজ্ঞ। গ্রহণ তৎপরতা জগতের এ সুবর্ণ শৃঙ্খল নহে।"

এই পৃথিবী ভগবানের আদি ও মহদ্‌যজ্ঞ হইতে প্রসূত হইয়াছে এবং ইহাকে সর্ব্বদা যজ্ঞের দ্বারাই সংরক্ষিত করা যাইতে পারে।

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কি বলিয়াছেন শ্রবণ কর। দেখিবে তিনি এই যজ্ঞেরই

শিক্ষা দিয়াছেন "হে কুরুপুঙ্গব ! এ পৃথিবী যে যজ্ঞ করে না, ইহলোক তাহার জন্য নহে পরলোকের কথা দূরে থাকুক্।" অতএব দেখা যাইতেছে এই পরিবর্ত্তনশীল রূপের রাজ্যে, জীব যজ্ঞ ব্যতীত এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারে না। যদ্যপি প্রত্যেক প্রাণী এই ঘূর্ণায়মান্ সংসারচক্রকে যজ্ঞের দ্বারা সাহায্য না করে তবে ইহা চলিতে পারে না। যজ্ঞের দ্বারা জীবন সংরক্ষিত হয় এবং ক্রমোন্নতির মূল এই যজ্ঞেই নিহিত আছে।

এই নূতন উপদেশটীর মর্ম্ম জীব যাহাতে যথার্থরূপে গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়, সে জন্য জগতের আদি মহাপুরুষেরা যজ্ঞানুষ্ঠানের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে ঐ সকল কর্ম্মের দ্বারা সংসারচক্র ঘুরিতেছে এবং ইহারা আমাদের সমুদয় মঙ্গলের কারণ। হিন্দুদিগের নিত্যক্রিয়াকলাপের মধ্যে সর্ব্বজন বিদিত পঞ্চযজ্ঞের বিধি আছে; এগুলি সংসারের জীবসমূহের যথোচিত সংরক্ষণের জন্য আবশ্যক। এ যজ্ঞগুলি সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক।

১। দেব যজ্ঞ: স্থূলের অতীত সূক্ষ্ম দেবলোকের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে হইলে তাঁহাদের উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান চাই। ইহার নাম দেবযজ্ঞ। ইহার দ্বারা আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ ও নির্ভরতা রক্ষিত হয়। আমরা তাঁহাদিগের উদ্দেশে নিবেদন করি, তাঁহারাও আমাদিগকে প্রতিদান করেন; এই জন্য পরস্পর পোষণ করিয়া আমরা ঈপ্সীত সুফল লাভ করি। "এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা দেবগণের তৃপ্তি সাধন কর এবং পরিতৃপ্ত সেই দেবতাগণও তোমাদের অভ্যুদয় সাধন করুন এবং এই প্রকারে পরস্পরের বৃদ্ধি করিয়া তোমরা পরম শ্রেয়ঃ লাভ কর।"

২। ঋষিযজ্ঞ—আদি গুরু ঋষিদিগের, জ্ঞানীদিগের ও শিক্ষকদিগের উদ্দেশে যজ্ঞ। জ্ঞানানুশীলন করিয়া তাহার ত্যাগের দ্বারা আমাদের একটি ঋণ পরিশোধিত হয়। কারণ লোকশিক্ষার নিমিত্ত আমরা জ্ঞানার্জ্জন করি এবং পুরুষপরম্পরা ক্রমে এই জ্ঞান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আমরা যত্নবান্ হই।

৩। পিতৃযজ্ঞ—এই যজ্ঞ আমাদের পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে। পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট আমরা ঋণে আবদ্ধ আছি। সেই ঋণ পরিশোধ করিতে

হইলে আমরা যেমন অতীতের নিকট শিক্ষা পাইতেছি তেমনি ভবিষ্যতের জন্য আমাদিগকে দিতে হইবে।

৪। নৃযজ্ঞ—মানবজাতির প্রতি যে ঋণ আছে তাহা পরিশোধ করা আবশ্যক। প্রত্যহ একজন লোককে খাওয়াইতে হইবে এইরূপ বিধি ঋণ-মুক্তির জন্য আছে। একটী অন্নক্লিষ্ট লোক খাওয়ান ঐ ক্রিয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। যাহাতে মানব তুষ্ট হয়, তাহাতে সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর হরি তুষ্ট হন; তিনি যাহাতে তুষ্ট হন সমগ্র মানব তাহাতে তুষ্ট হয়। দৃষ্টান্ত এই—যখন দুর্ব্বাসা মুনি পাণ্ডবদিগের বনবাসের সময় সশিষ্য আতিথ্য গ্রহণ করিয়া ভোজন প্রার্থনা করিলেন, সে সময় কোন খাদ্য প্রস্তুত ছিল না। এ বিপদ্ সময়ে পাণ্ডবের সখা যজ্ঞেশ্বর হরি আসিয়া পাণ্ডবদিগকে হাঁড়িতে অবশিষ্ট ভাত অনুসন্ধান করিতে বলিলেন এবং একটি ভাত পাওয়া গেলে তিনি তাহাই ভক্ষণ করিলেন। তাঁহার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইল, এবং সশিষ্য দুর্ব্বাসারও ক্ষুধা নিবৃত্তি হইল। "তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্ট, প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ" নৃযজ্ঞের গূঢ় রহস্যই তাই। একজন ক্ষুধিত ভিক্ষুককে শ্রদ্ধাসহকারে খাওয়াইলে, সব জীবের অন্তর্যামী পুরুষকে খাওয়ান হইল; এবং ভিক্ষুক রূপধারী পরমপুরুষকে খাওয়াইলে, সমুদয় মানবজাতিকে খাওয়ান হইল।

৫। পশুযজ্ঞ পশুদিগের উদ্দেশে সাধিত হয়। দুই একটি পশুকে প্রত্যহ খাওয়াইলে পশুগণেরও অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরকেই খাওয়াইতেছি; সুতরাং এই যজ্ঞের দ্বারা সমগ্র পশু জগৎ সংরক্ষিত হয়—এই সনাতন উপদেশ। যজ্ঞ কি প্রকারে অনুষ্ঠান করিতে হয় এবং উহার সার মর্ম্ম কি? মানবকে শিক্ষা দিবার জন্য উক্ত পঞ্চ যজ্ঞের বিধান আছে। এই পঞ্চযজ্ঞের স্থূল ভাবে অক্ষরে অক্ষরে অনুষ্ঠান অপেক্ষা ইহার এই ভাবটী হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের অধিক আবশ্যক। কর্ত্তব্যজ্ঞানকে এই যজ্ঞানুষ্ঠানের ভাবে দেখিতে শেখা চাই। যখন এই যজ্ঞানুষ্ঠানের ভাবের সহিত কর্ত্তব্যজ্ঞানের একত্র সম্মিলন হয়, তখন উন্নতিশীল জীব ক্রমোন্নতির স্তরে আর এক পদ অগ্রসর এবং তখনই উচ্চতর মার্গ পরিলক্ষিত হয়।

কর্ত্তব্যজ্ঞানে কতকগুলি কর্ম্ম করণীয় বা কর্ত্তব্য বলিয়া মানুষ শিক্ষা করে; তৎপরে যজ্ঞরূপ কর্ম্মের দ্বারা সংসার চলিতেছে ইহা শিক্ষা করিতে হইবে।

কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষাই আমাদিগের সংসার চক্রে ঘুরাইতেছে ; এবং কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে হইলে আমাদিগকে ফলকামনা একবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। ভগবান্ গীতায় অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন—

"পরমেশ্বরের প্রীতিকে উদ্দেশ্য না করিয়া যে কর্ম্ম (কামনাবশে) কৃত হয়, সেই কর্ম্মকেই বন্ধনের হেতু কর্ম্ম বলা যায় ; হে কুন্তিনন্দন ! তুমি সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর"।

কর্ম্মযোগে এই কর্ত্তব্যানুরোধে কার্য্য করাই পরবর্ত্তী সোপান। এই কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগ কথাটী বড় সহজ নহে। 'যজ্ঞানুষ্ঠান' মানে ইহা নহে যে, কতকগুলি ক্রিয়াকে "যজ্ঞ" ভাবিয়া পৃথক্ করিয়া রাখ, ও তাহারই অনুষ্ঠান কর। পরন্তু সমুদয় ক্রিয়াতেই যজ্ঞের ভাবটী থাকা চাই। সর্ব্বত্রই এই যজ্ঞের আলোক দেখিয়া কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিতে হইবে। ঈশ্বরের উদ্দেশে কর্ম্মফল নিবেদন করিলে আমাদের যজ্ঞ করা হইল এবং ফল সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা যজ্ঞেশ্বরেই অর্পিত হইল। যে মুহূর্ত্তে আমরা কর্ম্মের ফল ত্যাগ করিতে পারিলাম তখনই বারংবার এ পৃথিবীতে গতায়াত বন্ধন শিথিল হইতে আরম্ভ হইল জানিবে। ভগবদ্বাক্য স্মরণ কর, দেখিবে গীতাতে এই কথাই বলা আছে :—

"যে ব্যক্তি আসক্তিশূন্য ও ধর্ম্মাধর্ম্মবন্ধন রহিত, যাহার হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞানই সর্ব্বদা একমাত্র বস্তু এবং যে ব্যক্তি কর্ত্তব্য জ্ঞানেই কর্ম্মাচরণ করিয়া থাকে, তাহার সকল কর্ম্মই বিলীন হয় ; অর্থাৎ সংসার বন্ধের প্রতি কারণ হয় না।"

যজ্ঞানুষ্ঠান ব্যতীত সর্ব্বকর্ম্মই বন্ধের কারণ স্বরূপ। প্রবৃত্তিমার্গের চরম-সীমায় উপনীত হইলে নিবৃত্তিমার্গে প্রবেশের প্রাক্কালে এই উপদেশ আমা-দের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। যখন জীব কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করে, যখন অনাসক্তভাবে কর্ত্তব্যবোধে সকল কর্ম্ম করিতে থাকে, তখন জীবের ক্রমোন্নতির ঐতিহাসিক জীবনে একটি বিষম সময় উপস্থিত হয়। তখন সে যেমন কর্ম্মের ফল পরিত্যাগ করিতেছে, সেইরূপ উচ্চতর জ্ঞানেরও বিকাশ হইতেছে ; এবং এই জ্ঞানের সাহায্যেই নিবৃত্তি-মার্গের দিকে অগ্রসর হইতে সক্ষম হয়। এ নিবৃত্তি মার্গের শিক্ষা ভগবান নিজমুখে গীতায় কহিয়াছেন :—

'হে পরন্তপ! দ্রব্যদ্বারা নিষ্পাদিত যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানরূপ যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ; কারণ হে পার্থ! সকল প্রকার কর্ম্মই সম্পূর্ণভাবে জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। (আচার্য্যগণের) সেবা, প্রণিপাত, এবং (যথাবসরে) তত্ত্ব বিষয়ে বিনীত প্রশ্নের দ্বারা জ্ঞানলাভের উপায় কি তাহা জান। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ (এই প্রকারে) তোমাকে সম্যক্ উপদেশ প্রদান করিবেন। হে পাণ্ডুপুত্র! যে জ্ঞান লাভ করিয়া তুমি আর এই প্রকার মোহের বশ হইবে না এবং যে জ্ঞানের প্রসাদে তুমি সকলের আত্মভূত আমাতে সকল ভূতই (প্রবিষ্ট আছে ইহা) দেখিতে পাইবে।"

এই ভাবই প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার ভাব। 'জ্ঞানযজ্ঞ' দ্বারা সমুদয় জীবকে আত্মাতে দেখিতে শিখিব, সুতরাং ঈশ্বরে দেখিতে শিখিব। ইহা নিবৃত্তি মার্গের সুর। উন্নতির পথে আকাঙ্ক্ষু জীবকে ইহাই শিখিতে হইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীশিশিরকুমার ঘোষাল।

আমি ও আমার দেহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

এইসকল স্নায়ুর মধ্যে কতকগুলি আমাদের ইচ্ছার বশ, কতকগুলি নহে। আমরা স্বেচ্ছামত হস্তপদ ওষ্ঠাদি সঞ্চালন করিতে পারি। তাহার কারণ এই যে, এই সকল যন্ত্রের মাংসপেশী সমূহে যে সকল স্নায়ু সংযুক্ত আছে, সে গুলি আমাদের ইচ্ছাধীন; ইচ্ছা করিলে আমরা তাহাদের ভিতর দিয়া শক্তি প্রবাহ চালিয়া দিতে পারি; ইচ্ছা করিলে আবার সে প্রবাহ বন্ধ করিতে পারি। কিন্তু দেহের সকল যন্ত্র আমার ইচ্ছামত চলে না। যে স্নায়ুগুলির সাহায্যে নিশ্বাস, প্রশ্বাস, রক্ত চলাচল, পরিপাক ক্রিয়া প্রভৃতি জীবনের অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার সকল সম্পন্ন হইতেছে, সে গুলির উপর আমার বিশেষ কর্ত্তৃত্ব নাই। সাধারণতঃ আমি মনে করিলেই হৃৎপিণ্ড বা ফুসফুসের ক্রিয়া বন্ধ করিতে পারি না। কিন্তু চেষ্টা করিলে

এ যন্ত্র গুলিকেও আয়ত্তে আনা যাইতে পারে। আমাদের দেশের হঠ-যোগীরা বহুদিন ধরিয়া স্বীয় দেহকে নানা ক্লেশ দিয়া এই সকল যন্ত্রকে স্ববশে আনয়ন করেন। তখন তাঁহারা সহজেই স্থূলদেহকে মোহাভিভূত করিয়া সূক্ষ্ম দেহের সাহায্যে ভুবর্লোকে বিচরণ করিতে পারেন। কিন্তু এই ক্ষমতা টুকুর লোভে তাঁহাদের প্রদর্শিত সাধনা প্রণালী অবলম্বন করা বড়ই ভুল। এরূপ সাধনায় নৈতিক আধ্যাত্মিক বা মানসিক উন্নতি লাভের পক্ষে কোন সাহায্য হয় না, বরং ক্ষমতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থসিদ্ধির অধিক-তর সুযোগ ঘটাতে সাধক ক্রমশঃ অবনতির পথে নামিতে থাকে। এত আয়াস স্বীকার করিয়া পিশাচ হওয়া কি বাঞ্ছনীয়? যে সাধনায় ক্রমে উন্নত হইতে উন্নততর হইতে পারা যায় তাহাই প্রকৃষ্ট পথ। বৃথা আশায় লুব্ধ হইয়া অন্য পথের পথিক হইলে পরিণাম বড়ই শোচনীয় হইয়া থাকে।

সে যাহা হউক, এই যে শক্তিস্রোত, যাহা দিবারাত্র স্নায়ুপথ দিয়া প্রবাহিত হইয়া আমাদের স্থূলদেহকে সজীব ও কর্ম্মশীল করিয়া রাখিয়াছে, ইহা কি পদার্থ? ইহার উৎপত্তি স্থানই বা কোথায়? পাশ্চাত্য শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণকে জিজ্ঞাসা করিলে এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রাচ্যবিজ্ঞান বলেন ইহা প্রাণবায়ু বা জীবনীশক্তির স্থূল বিকাশ মাত্র। যে মহা জীবনালোকে অখিল ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভাসিত, যাহার বলে সমগ্র বিশ্ব সঞ্জীবিত, যে মহা প্রাণ-সাগরে সমস্ত জগৎ প্লাবিত, তাহারই একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গ আমাদের সূক্ষ্ম দেহকে অবিরত স্পন্দিত ও তরঙ্গায়িত করিতেছে। এই স্পন্দনই প্রাণময় কোষের সাহায্যে স্নায়ুপথ দিয়া প্রবাহিত হইয়া আমাদের স্থূল দেহকে প্রাণময় করিয়া রাখিয়াছে। ইহারই প্রভাবে আমাদের স্থূলদেহস্থ যন্ত্রগণ স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে। ইহারই প্রভাবে আমরা এই স্থূল জগতে বিচরণ করিতেছি। তাপ, আলোক, তড়িৎ আকর্ষণ প্রভৃতি যে সকল শক্তির লীলা জড় জগতে প্রত্যক্ষ করা যায়, সে সমস্তই আমাদের এই জীবনীশক্তির ন্যায় সেই অদ্বিতীয় বিশ্বপ্রাণেরই আংশিক বিকাশ মাত্র। বিজ্ঞানবিৎ মাত্রেই জানেন যে ইহলোকে ইথারই এই সকল শক্তির লীলাক্ষেত্র। ইথারের স্পন্দনেই ইহাদের বিকাশ, ইথার আশ্রয় করিয়াই ইহারা স্থূলজগতে প্রকাশ পায়। আমাদের জীবনীশক্তি বা প্রাণবায়ু সেইরূপ ইথিরীয় দেহ অবলম্বন

করিয়া স্থূলদেহে কার্য্য করে। ইথিরীয় দেহ প্রাণবায়ুর আধার বা যান, তাই বৈদান্তিকেরা ইহার নাম দিয়াছেন প্রাণময় কোষ। প্রাণময় কোষে প্রাণবায়ুর যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয় তাহা স্নায়ুপথ দিয়া প্রবাহিত হয়, তাই স্নায়ুর আর এক নাম বায়ুপ্রবাহিনী নাড়ী। স্নায়ু যেন নদীগর্ভ, প্রাণময় কোষ যেন নদীনীর এবং প্রাণবায়ুর উচ্ছ্বাস যেন তাহার তরঙ্গ। জল শুকাইয়া গেলে যেমন শুষ্ক নদীগর্ভে তরঙ্গ উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ অন্নময় কোষ হইতে প্রাণময় কোষ বিচ্ছিন্ন হইলে স্নায়ুসমূহের ভিতর আর জীবনীশক্তির লীলা দেখিতে পাওয়া যায় না ; সব স্থির হইয়া স্থূলদেহ শবদেহে পরিণত হয়।

অশ্ব পরিশ্রান্ত হইলে যেমন অশ্বারোহী তাহাকে বিশ্রাম করিবার জন্য ছাড়িয়া দেন, সেইরূপ আমাদের স্থূলদেহ যখন কার্য্য করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, আমরা তাহা কিয়ৎকালের জন্য পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মদেহ অবলম্বনে বাহিরে চলিয়া যাই। ইহারই নাম নিদ্রা। এই সময় অন্নময় কোষ ও প্রাণময় কোষ শয্যায় পড়িয়া থাকে ; আমরা সূক্ষ্মতর দেহের সাহায্যে সূক্ষ্ম জগতে বিচরণ করিতে থাকি। কিন্তু তাহা বলিয়া অন্নময় ও প্রাণময় কোষের সহিত অন্যান্য কোষের সম্বন্ধ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় না। ঘুঁড়ি উড়াইবার সময় সূতা দিয়া লাটাইয়ে যেমন ঘুঁড়ি বাঁধা থাকে, সেইরূপ ঘুমাইবার সময় আমাদের অন্নময় ও প্রাণময় কোষের একটি সূক্ষ্ম রজতাভ সূত্রের দ্বারা মনোময় কোষাদি সূক্ষ্মতর দেহগুলির সহিত সংযুক্ত থাকে। সুতরাং আমি স্থূলদেহ ছাড়িয়া সূক্ষ্মদেহ অবলম্বনে বহুদূর গমন করিলেও স্থূলদেহের জীবন নষ্ট হয় না, সেই সূত্র দিয়া সূক্ষ্মদেহ হইতে প্রাণবায়ু প্রবাহিত হইয়া তাহাকে সজীব রাখে। এই সূত্রটি ছিন্ন হইলেই মৃত্যু। মৃত্যুকালে আমরা স্থূলদেহ একেবারে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই, এমন কি প্রাণময় কোষটিকে পর্য্যন্ত টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া যাই, সুতরাং স্থূলদেহ জীবনশূন্য হয় এবং ক্রমে ক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু প্রাণময় কোষটিও ভূলোকের উপাদানে নির্ম্মিত ; পরবর্ত্তী সূক্ষ্মতর লোকের উপাদানের তুলনায় তাহা এত স্থূল যে তাহা লইয়া সে সকল লোকে যাওয়া অসম্ভব, সুতরাং মৃত্যুর অব্যবহিত পরে আমরা সেটিকেও ফেলিয়া দিতে বাধ্য হই।

সময়ে সময়ে মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনেরা মৃত্যুর অল্প পরেই এই দেহটিকে শবদেহের নিকটে দেখিতে পান। কিন্তু তাহাতে জ্ঞানের কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল একটা ছায়ামূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, এই মাত্র। কবর-ভূমিতেও অনেক সময় এই মূর্ত্তি আবির্ভূত হইতে দেখা যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতে খুব অধিক সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রয়োজন হয় না। রোগ শোকাদি কারণে স্নায়ুর উদ্রেক একটু অসাধারণ রকমের হইলেই ইহা দেখিতে পাওয়া সম্ভব।

অন্নময় কোষ ও প্রাণময় কোষ উভয়ে বড় চমৎকার সম্বন্ধে পরস্পরের সহিত আবদ্ধ। এক যমজের কথা শুনা গিয়াছিল যাহাদের এক জনের অসুখ হইলে অপরের অসুখ করিত, একজন হাঁসিলে অপরে হাঁসিত, একজন কাঁদিলে অপরে কাঁদিত। আমাদের অন্নময় ও প্রাণময় কোষের মধ্যে সম্বন্ধও অনেকটা সেই প্রকার। মৃত্যুর পরেও প্রাণময় কোষ অন্নময় কোষের নিকটেই অবস্থিতি করে এবং উভয়ে একই ভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। আমরা যদি মৃত্যুর পর শবদেহ দাহ করি, সঙ্গে সঙ্গে প্রাণময় কোষও তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে যদি তাহাকে কবর দেওয়া যায়, তাহা হইলে স্থূলদেহ যেরূপ অল্পে অল্পে গলিতে ও পচিতে থাকে, প্রাণময় কোষও ঠিক্ সেইরূপ ভাবে গলিতে ও পচিতে থাকে। অন্নময় কোষের যে অংশের যতটুকু ধ্বংস, প্রাণময় কোষেরও সেই অংশের ঠিক্ ততটুকু ধ্বংস হয়। ইহার যদি হাত যায় উহারও হাত যাইবে, ইহার যদি পা যায়, উহারও পা যাইবে। বলা বাহুল্য জীবদ্দশাতেও উভয়ের মধ্যে এইরূপ প্রগাঢ় সম্বন্ধ দেখা যায়। অন্নময় কোষের যেরূপ অবস্থা, প্রাণময় কোষও ঠিক্ সেইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া থাকে। স্থূলদেহ বিকৃত হইলে প্রাণময় কোষও বিকৃত হইয়া থাকে। স্থূলদেহ পরিষ্কার করিলে প্রাণময় কোষ আপনা হইতেই পরিষ্কৃত হইয়া থাকে, তজ্জন্য আর স্বতন্ত্র চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং পূর্ব্ব অধ্যায়ে অন্নময় কোষ পরিষ্কার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছি, সেগুলি প্রাণময় কোষ সম্বন্ধেও প্রযুজ্য।

সাধারণতঃ মৃত্যু না হইলে অন্নময় কোষ ও প্রাণময় কোষের মধ্যে বিচ্ছেদ হয় না; কিন্তু এমন কতিপয় ব্যক্তি আছেন যাঁহাদের জীবদ্দশাতেও আংশিক

ভাবে এই বিচ্ছেদ ঘটিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ অবস্থা বাঞ্ছনীয় নহে, কারণ ইহা শরীরের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর ও বিপজ্জনক। যে সময় প্রাণময় কোষের কিয়দংশ বাহির হইয়া যায়, সে সময় অন্নময় কোষ প্রবল মোহে অভিভূত হইয়া পড়ে এবং তাহাতে জীবনস্রোত অতি ক্ষীণ ভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিযুক্ত অংশ ফিরিয়া আসিয়া অবশিষ্টাংশের সহিত মিলিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্থূলদেহের বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা থাকে। মিলনের পরেও শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত ও দুর্ব্বল বোধ হয়; সুখের বিষয় এরূপ দশাপন্ন ব্যক্তির সংখ্যা অত্যন্ত বিরল—কচিৎ দুই একজন দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে এগ্‌লিন্টন নামে এক সাহেব আসিয়াছিলেন তাঁহার এই ক্ষমতা বিশেষ আয়ত্ত ছিল। তিনি তাঁহার বাম পার্শ্ব দিয়া তাঁহার প্রাণময় কোষটি বাহির করিয়া দেখাইতেন। এই সময়ে তাঁহার স্থূল দেহটি সুস্পষ্টরূপে শুষ্ক ও শীর্ণ হইয়া পড়িত। ইহাতে বোধ হয় যেন প্রাণময় কোষের সহিত তাঁহার স্থূলদেহের সূক্ষ্মতর উপাদান গুলিরও কিয়দংশ বহির্গত হইয়া পড়িত। যাহা হউক এইরূপ অস্বাভাবিক অবস্থাকে একটি রোগ বলিয়াই ধরিতে হইবে। যিনি এইরূপ রোগগ্রস্ত তিনি যেন বিশেষ সাবধান হইয়া চলেন, নতুবা তাঁহাকে বিপদে পড়িতে হইবে। অন্নময় ও প্রাণময় কোষের সহিত আমাদের কি সম্পর্ক এবং তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের কি কর্ত্তব্য তাহা আমরা এই অধ্যায় ও পূর্ব্ব অধ্যায়ে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। আশা করি এক্ষণে সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এই কোষদ্বয় লইয়াই আমাদের ইহলৌকিক দেহ গঠিত হইয়াছে। এই দেহ আমাদের অন্যান্য দেহ অপেক্ষা হীন ও ক্ষুদ্র হইলেও, ভূর্লোকে কার্য্য করিতে হইলে, ইহাই আমার যন্ত্র, ইহাই আমার সহায়। কিন্তু আমার অসাবধানতার ফলে ইহাই আবার উন্নতির পথে একটি প্রকাণ্ড বাধা হইয়া দাঁড়াইতে পারে। যাহা আমার আশ্রয়স্থল, আমার কার্য্যালয়, তাহা আমার কারাগারে পরিণত হইতে পারে। সুতরাং এই দেহ উপেক্ষা করিবার নহে। যিনি এই দেহের সহিত ধর্ম্ম সাধনার কোন সম্পর্ক নাই বিবেচনা করেন তিনি ভ্রান্ত। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং।" ধর্ম্মসাধন করিতে হইলে অগ্রে শরীরের প্রতি মনোযোগ

হইতে হইবে। যাহাতে এই দেহ সুস্থ, সবল এবং নির্ম্মল থাকে তাহার জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। সাধনার ইহাই প্রথম সোপান। এই সাধনা না হইলে উচ্চতর সাধনাগুলি কষ্টসাধ্য হইবে। সৌভাগ্যক্রমে এই সাধনার ফল অনেকটা হাতে হাতে পাওয়া যায়। কিছুদিন চেষ্টা করিলেই সাধক যে অগ্রসর হইতেছেন তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল ক্রমে তীক্ষ্ণ হইতে তীক্ষ্ণতর হইতে থাকিবে এবং বহু সূক্ষ্ম বিষয় যাহা তাঁহার পূর্ব্বে অনুভবে আসিত না, তাহা তিনি প্রত্যক্ষ করিতে আরম্ভ করিবেন। এই জগতে রাশি রাশি সৌন্দর্য্য ছড়ান রহিয়াছে কিন্তু আমরা তাহার কয়টা দেখিতে পাই? দুঃখের বিষয় এ অন্ধতা, ইন্দ্রিয়ের অভাবে নহে, উপযুক্ত সাধনার অভাবেই ঘটিয়া থাকে। র‍্যাফেলের চক্ষু ও আমাদের চক্ষু, তানসেনের কর্ণ ও আমাদের কর্ণ,—উভয়ের মধ্যে কত প্রভেদ! চিত্রকর যে সূক্ষ্ম বর্ণ-বৈচিত্র্য দেখিয়া মোহিত হন সাধারণে তাহা দেখিতে পান না। যে সূক্ষ্ম তান তরঙ্গ সঙ্গীতজ্ঞের তৃপ্তি সাধন করে, সাধারণে তাহা শুনিতে পান না। কেন এরূপ হয়? বলিতে হইবে কি, কেবল সাধনার বলেই চক্ষু কর্ণ প্রভৃতির রসাস্বাদনের এরূপ অনন্য সাধারণ ক্ষমতা জন্মায়। অবশ্য সাধনার পথে অনেক কষ্ট, অনেক বাধা,—কিন্তু একবার এ বাধা বিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই যে অতুল আনন্দের অধিকারী হওয়া যায়, তাহার তুলনায় সকল কষ্টই অতি অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে। ইন্দ্রিয় সকল যখন বিকশিত হইয়া অপূর্ব্ব জাগতিক সৌন্দর্য্যের অক্ষয় রত্নভাণ্ডার সমূহ একে একে আমাদের প্রত্যক্ষীভূত করিতে থাকে, তখন কি আর সামান্য সংযমকে কষ্ট বলিয়া বোধ হয়?

কিন্তু ক্ষমতা লাভ করিয়া যেন মোহবশতঃ আমরা লক্ষ্যচ্যুত হইয়া না পড়ি। সকল সময়ে মনে রাখিতে হইবে এ জগৎকে লইয়া আমাকে উঠিতে হইবে। জগৎকে বঞ্চিত করিয়া যিনি কেবল নিজের স্বার্থ সিদ্ধি ভোগ লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য প্রয়াসী, তাঁহার পতন অবশ্যম্ভাবী। পক্ষান্তরে যিনি কেবল জগদ্হিতার্থে শক্তি কামনা করেন এবং লব্ধ শক্তি কেবল সেই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করেন, তাঁহার উন্নতি কেহই নিবারণ করিতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমন্মথ মোহন বসু।

হিন্দুর শ্রাদ্ধতত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

এই ধর্ম্মানুষ্ঠান কেন শ্রাদ্ধ নামে অভিহিত হইল তাহা একটু বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত।

"শ্রদ্ধান্বিতঃ শ্রাদ্ধং কুর্ব্বীত" (ইতি গোভিল সূত্র)—শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। "শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্মাৎ শ্রাদ্ধং তেন নিগদ্যতে" (ইতি পুলস্ত)। পিত্রোদ্দেশে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক যাহা অর্পণ করা হয় তাহাকেই শ্রাদ্ধ কহে। শ্রদ্ধা অর্থে দৃঢ় প্রত্যয়।

"প্রত্যয়োধর্ম্মকার্য্যেষু তথা শ্রদ্ধেত্যুদাহৃতা।
নাস্তিহ্যশ্রদ্দধানস্য ধর্ম্মকৃত্যে প্রয়োজনং॥" (ইতি দেবল)

শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে ধর্ম্ম কার্য্য করা হয় তাহাকে শ্রাদ্ধ বলে ; শ্রদ্ধাহীনের ধর্ম্ম কার্য্যের প্রয়োজন নাই। এখন শ্রদ্ধা কথার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে চেষ্টা করা যাউক। শ্রদ্ধা অর্থে বিশ্বাস। নিজের কর্ম্মানুষ্ঠানের শক্তির উপর বিশ্বাস এবং যাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় তাঁহার উপর বিশ্বাস। গুরুর প্রতি শিষ্যের শ্রদ্ধা, এ কথা বুঝিতে হইলে এই বুঝিতে হইবে যে, সম্পদ বিপদে শোকতাপে, সর্ব্ববিধ অবস্থায় সংসারের নানাবিধ পরীক্ষার ভিতর দিয়া শিষ্যকে সৎপথে রাখিয়া ভগবচ্চরণ লাভ করাইয়া দিবার শক্তি গুরুর আছে, এ বিশ্বাস শিষ্যের থাকা চাই। এবং গুরুর কৃপায় সংসারের ঘোর পরীক্ষা সকলের ভিতর দিয়া যাইবার নিজের সামর্থ্য আছে, এবং নিজের ভিতর যে ভগবদ্ভক্তি লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহার স্ফুরণে সেও যে একদিন গুরুর সাধিষ্ঠান লাভ করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিবার অধিকারী হইতে পারিবে, এ বিশ্বাসও শিষ্যের থাকা চাই। এই দুই বিশ্বাসের সম্মিলনে শ্রদ্ধার উৎপত্তি। এখন দেখুন পুত্র পিত্রোদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিবে, ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রাদ্ধ করিবে। এই শ্রাদ্ধ কার্য্যে যে পুত্র সমর্থ, তাহা পুত্রের বিশ্বাস থাকা আবশ্যক ; এবং তাহার উৎসর্গীকৃত সামগ্রী যে মৃত পিতৃপুরুষদিগের নিকট পৌঁছিতে পারে ও তাঁহাদের

কর্তৃক ভুক্ত হইবে, এ বিশ্বাস পুত্রের থাকা আবশ্যক। এইরূপ বিশ্বাস যুক্ত শ্রাদ্ধ কর্ম্মই প্রকৃতশ্রাদ্ধ; এবং এইরূপ প্রত্যয়বিহীন শ্রাদ্ধকর্ম্ম বহিদৃষ্টিতে ধর্ম্মকৃত্য হইলেও বাস্তবিক তাহা ধর্ম্মানুষ্ঠান নহে এবং শ্রাদ্ধ নামের অযোগ্য।

এখন পিত্রোদ্দেশে শ্রাদ্ধ করা বলিলে বুঝিতে হইবে যে শ্রদ্ধা সহকারে মৃত পিতৃপুরুষদিগের জন্য, উপকারীর প্রতি উপকৃতের হৃদয়ের, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ মাত্র। সর্ব্বজাতির ভিতর প্রকার ভেদে এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নানারূপ রীতি ও অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবন্ধের অযথা বহুল বিস্তৃতি ভয়ে এ বিষয়ের আলোচনা হইতে বিরত হইলাম। এক্ষণে শ্রাদ্ধ কয় প্রকার এবং তাহার প্রকার ভেদ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

বৃহস্পতিমতে শ্রাদ্ধ প্রধানতঃ পঞ্চবিধ অর্থাৎ (১) নিত্য, (২) নৈমিত্তিক, (৩) কাম্য, (৪) বৃদ্ধি এবং (৫) পার্ব্বন।

১। প্রতিদিন যে শ্রাদ্ধ করা যায় তাহার নাম নিত্য।

২। বৎসরান্তে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধকে নৈমিত্তিক কহে।

৩। কামনা করিয়া অভিপ্রেতার্থ সিদ্ধির জন্য যে শ্রাদ্ধ করা যায় তাহার নাম কাম্য।

৪। বিবাহাদি কর্ম্মকালে কৃত শ্রাদ্ধকে বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ কহে।

৫। অমাবস্যা অথবা পর্ব্বদিন কৃত শ্রাদ্ধের নাম পার্ব্বন। কূর্ম্মপুরাণেও এই পঞ্চবিধ শ্রাদ্ধের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মৎস্যপুরাণে কেবল মাত্র নিত্য, নৈমিত্তিক, ও কাম্য, এই ত্রিবিধ শ্রাদ্ধের নাম পাওয়া যায়। অন্যত্র এতদ্ব্যতীত আর কয়েকটি শ্রাদ্ধের উল্লেখ আছে। যথা—সপিণ্ডন, গোষ্ঠী ও শুদ্ধ্যর্থক, কর্ম্মাঙ্গ, দৈবিক, যাত্রার্থ পুষ্ট্যর্থ ও প্রেতশ্রাদ্ধ। মৃত্যুর পর একবর্ষ পূর্ণ হইলে পিতৃপিণ্ডের সহিত প্রেতপিণ্ডের মিশ্রীকরণরূপ শ্রাদ্ধকেই সপিণ্ডন শ্রাদ্ধ বলা যায়। বহু বিদ্বন্মণ্ডলীর সম্পদ সুখ কামনায় পিতৃগণের তৃপ্ত্যর্থ গোষ্ঠীতে যে শ্রাদ্ধ করা যায় তাহাকে গোষ্ঠী শ্রাদ্ধ কহে; শুদ্ধ্যর্থ শ্রাদ্ধ ও ব্রাহ্মণ ভোজনের নাম শুদ্ধ্যর্থ শ্রাদ্ধ। নিষেক কালে সীমন্তোন্নয়নে ও পুংসবন সময়ে কৃত শ্রাদ্ধকে কর্ম্মাঙ্গ শ্রাদ্ধ কহে। দেবতার উদ্দেশে শ্রাদ্ধের নাম দৈবিক। দেশান্তরে গমন কালে ঘৃত দ্বারা কৃত

শ্রাদ্ধকে যাত্রার্থ শ্রাদ্ধ কহে। অর্থোপচয় ও শরীরোপায়ের জন্য যে শ্রাদ্ধ করা যায় তাহার নাম পুষ্ঠার্থ শ্রাদ্ধ। এবং অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিবসে যে শ্রাদ্ধ করিতে হয় তাহার নাম প্রেতশ্রাদ্ধ।

এক্ষণে স্থূল ঔপাধিক জীব ও নিরুপাধি জীবের মধ্যে যে সম্বন্ধ সম্ভাবনা আছে, তাহা যুক্তি ও অনুমান সাহায্যে বুঝিতে চেষ্টা করিব। ফল, পুষ্প, অন্ন, পায়স ইত্যাদি উপকরণ দ্বারা মৃতের প্রীতি সাধন করা, মৃত ব্যক্তি যে প্রকৃতই শ্রাদ্ধ স্থলে উপস্থিত হয় এবং ভক্তি সহকারে উৎসর্গিত দ্রব্য সকল গ্রহণ করিতে তাঁহার বাস্তবিক শক্তি আছে ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনায় আমরা তিনটী সিদ্ধান্তে উপনীত হই। এই তিনটী সিদ্ধান্তের উপর শ্রাদ্ধতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। ইহাদের সত্যাসত্যের উপর শ্রাদ্ধতত্ত্বের সত্যাসত্য নির্ভর করিতেছে। সুতরাং আমরা বিচার ও যুক্তির সাহায্যে ইহার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব। বিষয় তিনটী এই :—

১। সূক্ষ্ম ও অন্তর্জগতের অস্তিত্ব ও তৎঅধিবাসীদিগের সম্বন্ধে হিন্দু-দিগের জ্ঞান ও বিশ্বাস।

২। অন্তর্জগত হইতে মৃত ব্যক্তিদিগকে ক্ষণকালের জন্য এই জগতে আনয়ন করিবার ক্ষমতা মনুষ্যের আছে, তৎসম্বন্ধে হিন্দুদিগের জ্ঞান ও বিশ্বাস।

৩। বিশিষ্ট উপচার সামগ্রীর দ্বারা মৃত ব্যক্তিদিগের প্রীতি সাধন করা যাইতে পারে ও তাহা উপভোগ করিবার ক্ষমতা তাহাদের আছে, তৎসম্বন্ধে হিন্দুদিগের জ্ঞান ও বিশ্বাস।

কোন বিষয়ের সত্যতা নিরূপণ করিতে হইলে কুসংস্কার বিরহিত হইয়া শুদ্ধমনে সেই বিষয়ের বিচার করা আবশ্যক। সর্ব্ববাদীত্বই কেবল মাত্র, সত্যের লক্ষণ নহে। কোন একটি বিষয় সর্ব্ববাদী ও সর্ব্বসম্মত না হইলেও, সত্য নামে অভিহিত হইতে পারে। হিন্দুর শ্রাদ্ধপ্রথা সর্ব্বজাতি সম্মত বা অনুসৃত নহে বলিয়া যে ইহা সত্যরূপে গৃহীত হইতে পারে না, ইহা ন্যায় ও যুক্তিবিরুদ্ধ। সত্য সর্ব্বজাতির ভিতর এক সময়ে সম্যক্‌রূপে বিদিত না হইলেও, তাহার অপলাপ ঘটে না। পাশ্চাত্য পণ্ডিত নিউটন (Newton) মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কারক। এই আবিষ্কারের পর হইতে সভ্যজগতে

ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই, পূর্ণমাত্রায় ইহা সত্যরূপে গৃহীত হইয়াছে, এবং ইহার দ্বারা অলৌকিক ব্যাপার সকল সংঘটিত হইতেছে। মহামতি নিউটনের পূর্ব্বে ইহার নামও কেহ জানিত না এবং ইহা যে একটী অকাট্য সত্য তাহা কাহারও জ্ঞান ছিল না। কিন্তু জ্ঞান ছিল না বলিয়া এই সত্যের অপলাপ ঘটিতে বা ইহার অস্তিত্বে কোন দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। ইহা আবহমানকাল ধরিয়া বর্ত্তমান আছে, তবে নিউটনের পূর্ব্বে ইহা মানব জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় নাই এইমাত্র। সুতরাং হিন্দুর শ্রাদ্ধপ্রথা সর্ব্বজাতি সম্মত নহে বলিয়া যে প্রামাণ্য নহে, ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ।

প্রমেয় বস্তু প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়।

"দৃষ্ট মনুমানমাপ্তবচনং চ সর্ব্ব প্রমাণ সিদ্ধত্বাৎ।

ত্রিবিধং প্রমাণমিষ্টং প্রমেয় সিদ্ধিঃ প্রমাণাদ্ধি॥" ইতি সাংখ্যকারিকা। দৃষ্ট, অনুমান ও আপ্ত বচন প্রমাণরূপে প্রসিদ্ধ থাকা হেতু প্রমাণ তিন প্রকার; প্রমাণ হইতেই প্রমেয় সিদ্ধ হয়। কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা এই পঞ্চেন্দ্রিয়,—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ বিষয় গ্রহণ করে। তজ্জন্য এই প্রমাণ প্রত্যক্ষ বা দৃষ্ট বলিয়া উক্ত। এক বিষয়ের দ্বারা বিষয়ান্তর নির্দ্দেশ করার নাম অনুমান। এবং শ্রুতি ও আপ্ত বচনই আপ্ত। আপ্ত বচন যথা :—

"আগমোহ্যাপ্ত বচনমাপ্তং দোষক্ষয়াদ্বিদুঃ।
ক্ষীণ দোষোহনৃতং বাক্যং ন ক্রুয়াদ্ধেত্বসম্ভবাৎ॥
স্বকর্ম্মণ্যভিযুক্তো যঃ সঙ্গদ্বেষ বিবর্জ্জিতঃ।
পূজিতস্তদ্বিধৈঃ নিত্যমাপ্তো জ্ঞেয়ঃ স তাদৃশঃ॥"

আগমকেই আপ্তবচন কহে, লোকে যাহাকে দোষ রহিত অভ্রান্ত বলিয়া জানে, তাহাই আপ্ত। ক্ষীণদোষ আপ্তগণ হেতুর অসম্ভাবনা বশতঃ মিথ্যাবাক্য কহেন না। যিনি রাগ দ্বেষ বিবর্জ্জিত হইয়া নিজ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন এবং নিত্য স্বসমান লোক কর্ত্তৃক সমাদৃত হন, তথাবিধ ব্যক্তিকে লোকে আপ্ত বলিয়া জানে। সুতরাং আপ্ত অর্থাৎ আচার্য্য ও ব্রহ্মাদি দেবতা এবং শ্রুতি অর্থাৎ বেদ। অনুমান দ্বারা অতীন্দ্রিয় বিষয় সকলের প্রতীতি হয় এবং আপ্তবচন দ্বারা সেই প্রতীতি দৃঢ় হয়—বিশ্বাস ঘনীভূত ও ধারণা বদ্ধমূল হয়।

আমাদের আলোচ্য শ্রাদ্ধতত্ত্ব বহুল পরিমাণে এই আপ্তবচন ও অনুমান সাপেক্ষ। আপ্তবচন ও অনুমান দ্বারা ইহার সূক্ষ্মাংশের ধারণা করিতে হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবলে অনেক নূতন নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার হইতেছে। দুইটী পদার্থ কিছুকাল একত্র থাকিলে পরস্পর অল্পাধিক পরিমাণে পরস্পরের গুণবিশিষ্ট হয়, ইহা আজ কাল অনেকেই স্বীকার করিতেছেন। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ইন্দ্রিয়ের অগোচর অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণুরাশিতে পরিপূর্ণ—বিশ্ব এই অণুপ্রবাহে সদা বিক্ষুব্ধ। এক দেহ হইতে উৎসারিত হইয়া অণুপুঞ্জ সর্ব্বদা অন্য দেহে নীত হইতেছে। প্রবল দুর্ব্বলের তেজঃ হরণ করিতেছে। ইহা হইতেই সংক্রমণ নীতির সৃষ্টি হইয়াছে। এই জন্যই চিকিৎসকেরা সংক্রামক রোগ সম্বন্ধে এত বিধি ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মেস্‌মেরিজেম (Mesmerism) ও হিপ্‌নোটিজেমএর (Hypnotism) কথা অনেকে অবগত আছেন; ইহা একটী দুর্ব্বল মনের উপর একটী প্রবল মনের ক্রিয়ামাত্র। সংযত ব্যক্তি নিজের সুশাসিত মনকে আশ্রয় করিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টি, হস্ত সঞ্চালন প্রভৃতি ক্রিয়াদ্বারা অপেক্ষাকৃত অসংযত দুর্ব্বল ব্যক্তির মনকে আয়ত্তাধীনে আনিয়া ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। ইহা হইতেই হিন্দুদিগের তন্ত্রোক্ত মারণ, বশীকরণ, ইত্যাদি বিদ্যার উদ্ভব হইয়াছে। ইহার দ্বারা আজ চিকিৎসা জগতে অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল সম্পাদিত হইতেছে। মনের শক্তিবলে বিশেষ ক্রিয়ার দ্বারা অন্তর্জগতে উপনীত হওয়া যায়—বাহ্য পদার্থের সাহায্যে অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম জগতের অণুরাশিকে ইচ্ছানুরূপ স্পন্দিত করা যায়, ইহা তাহাই প্রমাণ করিতেছে।

আবার চিন্তাশক্তি বলে পরস্পর পরস্পরের মনোভাব জ্ঞাপন করা (Thought Transference), অপরের হৃদ্‌গত লুক্কায়িত অন্তরের কথা বলা (Thought Reading) এইরূপ শক্তি সামর্থ্যের পরিচয় আজ কাল বিজ্ঞান বলে চারিদিকে পাওয়া যাইতেছে—ইহাও বাহ্য ক্রিয়াবলম্বনে অন্তর্জগৎ আয়ত্তাধীন করা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এই মনঃশক্তির ক্রিয়াকলাপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মানব মনোবলে বাহ্যজগৎ অতিক্রম করিয়া অন্তর্জগৎ ভেদ করিতে পারে—অন্তর্জগতের অতুল বিভব উপভোগ করিতে পারে এবং পরিশেষে

একদিন সেই রাজ্যের অধীশ্বর হইতে পারে। পুরাকালে আর্য্য হিন্দু সন্তান-দিগের এইরূপ শক্তি সামর্থ্যের অভাব ছিল না। আর্য্যেরা শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন ও অন্তর্জগতের সম্বাদ রাখিতেন। তাঁহাদের অনুষ্ঠিত ক্রিয়া কলাপই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ ও পরিচয় প্রদান করিতেছে। অদ্য তাই আমরা শ্রাদ্ধতত্ত্বের অনুসঙ্গিক বাহ্য বহিরঙ্গ ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাদের সূক্ষ্মদর্শিতার প্রমাণ করিতেও চেষ্টা করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।

আদর্শ-চরিত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

৩। বিভীষণ।

দশাননের উক্তি অবলম্বন করিলে বিভীষণ চরিত্র আলোচনা করিবার প্রয়োজন থাকে না। অপর পক্ষে, যাঁহার সেবাকল্পে বিভীষণ জাতি, কুল, মান এবং আত্মীয় স্বজনগৌরব সকলই উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার সেবককে ভক্ত বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃত বিভীষণ "রক্ষঃ-কুল-গ্লানি" এবং "ভক্ত" এই উভয় উক্তির সার্থকতা তাঁহার জীবনে কতদূর সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং প্রকৃত পক্ষে তাঁহাকে উক্ত উভয়বিধ তীব্র ভাষায় অভিহিত করা যায় কি না তাহা বিবেচ্য। বিভীষণ যে "মহাজন" সে বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। এখানেও দিতির ন্যায় অসময়ে পুত্র কামনা করিয়া কৈকসী বিবাহিতা হওয়াতে দ্বিজবর বিশ্রবা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"অয়ি শুভাননে! তোমার কনিষ্ঠ পুত্র মদীয় বংশানুরূপ ও ধর্ম্মাত্মা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।" এক্ষণে বিভীষণের চরিত্রে আমরা কি শিক্ষা করিতে পারি এবং মানব জীবনে সে শিক্ষার প্রয়োগ এবং অভিব্যক্তি সম্ভব কি না. দেখা যাউক।

দশস্কন্ধ দশহস্ত রাবণ, ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ এবং পুত্র মেঘনাদের সাহায্যে দেব দানব জয়ী, এবং তাঁহার শৌর্য্য ও বীর্য্যের আখ্যায়িকা অসংখ্য ; কিন্তু ইহার

একটীরও মধ্যে বিভীষণের কোন সংস্রবই লক্ষ্য হয় না। বিভীষণ রণ-কৌশলে অনভিজ্ঞ ছিলেন না, অথচ দেখা যায় তিনি ভ্রাতার দিগ্বিজয়ে অণুমাত্র সাহায্য করেন নাই। সীতাহরণের পর বিভীষণ রঙ্গভূমে প্রথম অবতীর্ণ হইলেন। প্রখর প্রদীপ্ত আলোক—যাহার খরতেজে ত্রিলোক সন্তাপিত, তাহার পার্শ্বে বর্ত্তিকার মৃদু আলোক শোভা পাইল না; সুতরাং বিভীষণ অগ্রজ কর্ত্তৃক প্রত্যাখিত হইয়া স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, স্বজন পরিত্যাগপূর্ব্বক রামসেবায় দৃঢ়নিশ্চয় হইলেন। এই দোষেই তিনি রক্ষঃ-কুল-গ্লানি নামে অভিহিত, এবং বিশেষরূপে দেখিতে গেলে কথাটা নিতান্ত বিসদৃশ বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না। ভ্রাতা বলদর্পে দর্পিত হইয়া সীতা হরণ করিয়াছিলেন, এবং বিভীষণ এই গুরুতর পাপের অবশ্যম্ভাবী ফল বুঝিতে পারিয়া ভ্রাতাকে সীতা পরিহারপূর্ব্বক রামের চরণে আশ্রয় লইতে অনুরোধ করেন এবং তাহার ফলে অবমানিত হইয়া নিজের কুলচ্ছেদে কৃতসংকল্প হন। রাম এবং সীতা কে—এবং কি জন্য আজ তাঁহাদের সোণার লঙ্কায় আবির্ভাব হইয়াছে বিভীষণ তাহা জানিতেন এবং তাহা জানিয়াই তিনি অগ্রজকে তদুপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করিবার জন্য পরামর্শ দিতে গিয়াছিলেন। রাবণের ভক্তির মাত্রা যে বিভীষণের অপেক্ষা কম ছিল তাহা নহে, এবং যদিচ পূর্ব্বজন্মস্মৃতির অভাবে সীতাহরণে তিনি নিজেও কুৎসিৎ ইচ্ছা প্রবণতা ভিন্ন অন্য কিছু বলিতে পারিতেন না, তথাপি তাঁহার জীবনের গূঢ় উদ্দেশ্য সাধন পক্ষে সীতাহরণ ভিন্ন অন্য প্রকৃষ্ট উপায় ছিল না। রাবণ অহঙ্কারবলে ভগবানকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিলেন; কিন্তু বিভীষণ ভক্তিরসে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার চরণে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সামান্যত দেখিতে গেলে অগ্রজকে বিপদ্‌কালে যে কোন কারণে হউক পরিত্যাগ করিয়া শত্রুপক্ষ অবলম্বন করায় বিভীষণের চরিত্রে যে কালিমা পড়িয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে রক্ষঃ-কুল-গ্লানি বলা অত্যুক্তি নহে। বিভীষণও বোধ হয় এ কথা বুঝিয়াছিলেন। তাই দেখিতে পাই যে শ্রীরাম কর্ত্তৃক ভ্রাতা রাবণের অগ্নিকার্য্য সমাধা করিতে আদিষ্ট হইয়া তিনি বলিতেছেন—"যে ব্যক্তি ধর্ম্মত্যাগী, ক্রূর, মিথ্যাবাদী ও পরস্ত্রী-স্পর্শ-নিবন্ধন পাতকী, তাহার অগ্নিসংস্কার আমি কর্ত্তব্য মনে করি না। এই রাক্ষসরাজ সম্বন্ধে অগ্রজ, সুতরাং গুরুত্ব গৌরবে পূজ্য, কিন্তু এব্যক্তি ভ্রাতৃরূপী শত্রু, কিছুতেই

পূজা পাইবার উপযুক্ত নহে। আমি ইহার অগ্নিকার্য্য না করিলে, হয়ত পৃথিবীস্থ সকল মনুষ্যে আমাকে নিষ্ঠুর বলিয়া ঘোষণা করিবে; কিন্তু ইহার ব্যবহারের পরিচয় পাইলে, তাহারা পুনর্ব্বার বলিবে, বিভীষণ অন্যায় কার্য্য করে নাই।" দুর্য্যোধনও তদ্রূপ ছিলেন, কিন্তু ভীষ্ম তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডব পক্ষ অবলম্বন করিতে পারেন নাই। বিভীষণ ও ভীষ্ম চরিত্র তুলনা করিতে গেলে ভীষ্ম চরিত্র শীর্ষস্থান পাইবার যোগ্য। "তুমি" ও "আমি" না থাকিলে সেবা অথবা মিলনের সার্থকতা থাকে না; কিন্তু এস্থলে বিভীষণের "তুমি" যেন পূর্ণ প্রীতির পদার্থ বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীরামচন্দ্র নানা প্রকার অলৌকিক কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহার হস্তে রাক্ষসকুল অবশ্যই ধ্বংস হইবে, সুতরাং যখন ভ্রাতা সৎপরামর্শ গ্রাহ্য করিলেন না তখন তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করাই শ্রেয় বিবেচনায় তিনি ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিলেন। ভীষ্মও এইরূপ ঘটনাবলীর মধ্যে পড়িয়াছিলেন। এস্থলেও কুরুকুলবধূ কৃষ্ণা সভাস্থলে ববং অধিকতর অপমানিত হইয়া ছিলেন বলিয়া ধারণা হয়। শ্রীকৃষ্ণ যে পূর্ণাবতার তাহা ভীষ্মের অবিদিত ছিল না এবং এস্থলেও ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মের সৎপরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। ভীষ্ম জানিতেন যে তিনি যেখানেই থাকুক না কেন, যে পক্ষই অবলম্বন করুন না কেন তিনি শ্রীকৃষ্ণেরই এবং দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে তাঁহার সেবার ক্রটী সম্ভব নহে।

বিভীষণ রাম সকাশে উপস্থিত হইলে তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছিল। আমরা সুগ্রীবের উক্তি এবং রামের উত্তর পাঠ করিলে বুঝিতে পারিব রামচন্দ্রের অভিমত কি। সুগ্রীব বলিতেছেন—"বিপদ জানিয়া যে ব্যক্তি আপনার ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করে, দোষী বা নির্দ্দোষ হউক, তাহাকে সংগ্রহ করা কখনও কর্ত্তব্য নহে; বিশেষতঃ সঙ্কটকালে সে যে আমাদিগকেও ত্যাগ করিবে না, তাহারই বা বিশেষ প্রমাণ কি?" তদুত্তরে রামচন্দ্র বলিতেছেন—"প্রিয়সখা সুগ্রীব যাহা কহিলেন, বিশেষ রূপে শাস্ত্রজ্ঞান এবং বৃদ্ধজন সেবা ব্যতীত এরূপ কথা বলা বড় সহজ কথা নহে।...... রাজ্যলাভ তাঁহার কামনা, সুতরাং স্বার্থানুরোধে আমাদের সহিত সৌহৃদ্য স্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছেন......বিভীষণ ভ্রাতৃবিরোধ নিবন্ধন এখানে আসিয়াছেন, অতএব ইঁহাকে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। সখে! সকল ভ্রাতা ভরততুল্য

নহে, সকলেই কিছু আমার ন্যায় পুত্র নহে এবং সকলেই কিছু তোমার মত মিত্র হইতে পারে না।" রামচন্দ্রের উক্তি তাঁহারই উপযুক্ত—উদার। সুতরাং ইহাই বলিতে হয় যে কেবল বানর সৈন্য অবলম্বন পূর্ব্বক সাগর পারে রাক্ষস কুল ধ্বংস করা অসম্ভব এবং সেই জন্য বিভীষণ যাহা কিছু করিয়াছেন, সকলই পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট। যাহা জগতের কল্যাণকর তাহা সাধারণতঃ অপ্রিয় বোধ হইলেও প্রকৃত পক্ষে অপ্রিয় অথবা অমঙ্গল নহে। *

রামচন্দ্রের সেবকরূপে বিভীষণ চরিত্র অতীব শিক্ষাপ্রদ। বিভীষণ জীবন উৎসর্গ করিয়া সেবা করিয়াছেন এবং নির্ম্মম হৃদয়ে যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন, তাহা যে রাজ্যাভিলাষরূপ গূঢ় স্বার্থ প্রণোদিত, ইহা সম্ভবপর নহে। উক্ত স্বার্থ প্রিয়তম আত্মীয় বর্গের ধ্বংস সাধনে প্রযুক্ত হইতে পারে না। আজন্মকাল যে সমস্ত আশা, ভরসা, স্নেহ, মমতা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিয়াছেন, তাহা কেবল রাজ্যাভিলাষরূপ স্বার্থোদ্দেশে এত অল্প মূল্যে বিক্রয় করা সম্ভবপর নহে। ভ্রাতাকে পরিত্যাগ কালে বিভীষণ ক্ষোভ, ক্রোধ এবং স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিয়া থাকিতে পারেন কিন্তু রামচন্দ্রের সেবাকল্পে বিভীষণ চরিত্রে বিশেষ কিছু দোষ লক্ষ্য হয় না এবং ইহার স্বপক্ষে রাবণের অগ্নিকার্য্য উপলক্ষে রামচন্দ্রের প্রতি বিভীষণের উক্তিই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

রাবণবধের পর মন্দোদরীর উক্তিতে বিভীষণ চরিত্রের উৎকর্ষ উপলব্ধি হয়। মন্দোদরী বলিতেছেন—"আমার বোধ হয় যিনি সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মা সনাতন, যিনি নিত্য পুরুষ ও মহা যোগী, যিনি আদি, অন্ত ও মধ্যহীন, অর্থাৎ জরা-জন্ম-বিনাশ-বিহীন, যিনি মহৎ হইতেও মহৎ, যিনি প্রকৃতির প্রবর্ত্তক, যিনি শঙ্খ চক্র ও গদাধারী, যাঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎস-লাঞ্ছিত এবং যিনি অজেয় ও অটল, সেই সত্য পরাক্রম মহাযোগী শ্রীমান্ বিষ্ণু মানুষরূপ ধারণ করিয়া বানররূপী সুরগণে পরিবৃত হইয়া, রাক্ষসগণের সহিত ভয়াবহ দেবশত্রু তোমাকে বিনষ্ট করিয়াছেন।" "স্থাবর জঙ্গমাত্মক যে কোন প্রাণী সেই কাকুৎস্থ রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়াছিল, সেই আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল।" সুতরাং বিভীষণও সেই নিত্য পুরুষ সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মার সেবক হইবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

বিভীষণের চরিত্র আলোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাই যে বিভীষণ রামসেবার ক্রটী কিছুই রাখেন নাই। তাঁহার পক্ষে যাহা সম্ভব তাহা আমাদের ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর এবং সঙ্কীর্ণ হৃদয়ে সম্ভব না হইতে পারে; তথাপি একটী আদর্শ অবলম্বন করিয়া আদর্শোপযোগী হইবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করিলে সুফল অবশ্যম্ভাবী। (ক্রমশঃ)

পঞ্চীকরণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

যোসাবতীন্দ্রিয়োঽগ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ।
সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্বভৌ॥ মনুঃ॥

যিনি অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন, ক্ষয় রহিত অব্যক্ত অতি সূক্ষ্ম সর্ব্বভূতের আত্মাস্বরূপ অচিন্তনীয়, তিনি স্বয়ং প্রকাশিত হইলেন, অর্থাৎ বিগ্রহ ধারণ করিলেন; একারণ তাঁহাকে স্বয়ম্ভু কহে। স্বয়ং পরমেশ্বর শরীর ধারণে তৎস্বভাবকে অঙ্গীকার করিলেন; যথা, "সর্ব্বান্ পাপ্মন ঔষদিতি শ্রুতিভিঃ" শরীরোত্থিত কাম ক্রোধ লোভাদি সকল গ্রহণ করিলেন, যথা—শ্রুতিঃ, "ভয়রহিত সংযোগ শ্রবণাচ্চ" ইতি, যেহেতু শরীর গ্রহণে ভয় ও রতি এবং দার সংযোগাদির শ্রবণ বেদে আছে। ইহাতে পরমেশ্বরকে সংসারী অর্থাৎ শরীরী কহিতে হইল, নতুবা অসংসারী পরমেশ্বরে এতৎ সাংসারিক ধর্ম্মের কোন প্রসঙ্গ নাই। তবে তিনি মনুষ্যবৎ শরীরধর্ম্মে লিপ্ত নহেন, যথা ভাষ্যটীকায়াং,"হিরণ্যগর্ভস্য পরত্বমাদৌ দ্বিতীয়ে কল্পে সংসারিত্বং বিধেয়মিতি। আদৌ পরমেশ্বরের পরব্রহ্মত্ব অঙ্গীকারে অসংসারী কহিয়া, দ্বিতীয় কল্পে তাঁহার সংসারিত্ব বিধান করিয়াছেন। অতএব দেবভেদ স্বীকার করিয়া পরমেশ্বরের অদ্বৈততা খণ্ডন করা হয় না; তবে যদি এরূপ কহ, "যে বস্তু সকলের পার্থক্য জ্ঞানের প্রতি তাহাদিগের পৃথক অবস্থা, পৃথক্ পরিমাণ, পৃথক আধার ও পৃথক আকারাদিই ভিন্ন বোধের কারণ হইয়াছে, যদি নাম রূপ বস্তু ভেদাদি গ্রহণ করিয়া, নানা দেবতার ঐক্য

করা যায়, তবে বস্তু ভেদ জ্ঞানের নিমিত্ত জগতে অন্য কি উপায় রহিল? ইহাতে পূর্ব্বে যে লম্বোদরের সাদৃশ্য উক্ত করিয়াছেন, তাহাতে এক গণেশেই তুল্যাধিকরণতা আছে। কিন্তু শিব বিষ্ণু প্রভৃতিতে যে ভিন্নাধিকরণতা দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে গণেশরূপ নামাদিবৎ সিদ্ধান্তের সঙ্গতি ঘটে না?" উত্তর এই যে, দেবতা বিষয়ক জ্ঞানে ভিন্নাধিকরণতা কুত্রাপি দেখাইতে পারিবে না, অর্থাৎ নামার্থবিশেষণে এক ঈশ্বর মহিমাই বিশেষ্য হইয়াছে; যথা,—"যথা ব্রহ্মা তথা বিষ্ণু যথা বিষ্ণু স্তথা শিব, ইত্যাদি।" যে ব্রহ্মা সেই বিষ্ণু, যে বিষ্ণু সেই শিব,—এই বচনেও ভিন্নাধিকরণতা নাই, তথাচ শিবের যে নাম বিষ্ণুর সেই নাম ও ব্রহ্মার সেই নাম, উক্ত হইয়াছে; ইহাতে কিরূপে ব্রহ্মেতর দেবতান্তর কহিতে পারা যায়? যথা—

অনন্তমজমব্যক্তমক্ষরং শান্তমচ্যুতং।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং যৎ শিবং শুদ্ধমব্যয়ং॥—শিবধর্ম্মং॥

যাঁহাকে শিব কহি, তিনি অনন্ত অর্থাৎ অন্ত রহিত, জন্ম রহিত, অক্ষর, শান্ত, ক্ষয়রহিত, অপ্রতর্ক্য, অবিজ্ঞেয়, অর্থাৎ তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না, মৃত্যুরহিত, অত্যন্ত নির্ম্মল অর্থাৎ গুণাদিতে নির্লিপ্ত।

যস্মাৎ সৃষ্টিঃ সমুৎপন্না সা যেন প্রতিপাল্যতে।
উপসংহ্রিয়তে যেন সোঽসৌ রুদ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
সর্ব্বদর্শীচ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বর পতির্ভবঃ॥—শিবপুরাণং॥

যাঁহা হইতে সৃষ্টি উৎপন্ন হইয়া যাঁহাতে প্রতিপালিত হয়, এবং প্রলয়ে যাঁহাতে সংহার হয়, তাঁহাকে রুদ্র কহি। যিনি সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বরক্ষক, তিনিই ভব নামে আখ্যাত।

এই নাম বিশেষণে এক শিব রূপই বিশেষ্য হইয়াছে, পুনঃ শিব বিশেষণ দ্বারা এক পরব্রহ্মকে নিশ্চয় করিয়াছেন। পুনরপি বিষ্ণুর স্বরূপ কথনেও ব্রহ্মকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যথা।

সর্ব্বাণি তত্র ভূতানি বসন্তি পরমাত্মনি।
ভূতেষুচ স সর্ব্বাত্মা বাসুদেব স্ততঃ স্মৃতঃ॥—বিষ্ণুপুরাণ॥

যে পরমাত্মাতে প্রলয়ে সকল জীব অধিবাস করে, এবং আত্মারূপে সর্ব্বভূতে যিনি অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকেই বাসুদেব বলিয়া উক্ত করিয়া-

ছেন। তথা পঞ্চাত্মারূপে হরিকে কহিয়াছেন ; যথা—

ভূতাত্মা চেন্দ্রিয়াত্মাচ প্রধানাত্মা তথা ভবান্।
আত্মাচ পরমাত্মাচ ত্বমেকঃ পঞ্চধাস্থিতঃ ॥—ব্রহ্মপুরাণং ॥

শ্রীকৃষ্ণকে পঞ্চধা রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অর্থাৎ ভূতাত্মা, ইন্দ্রিয়াত্মা, প্রধানাত্মা, [মহান্] আত্মা [জীব] এবং পরমাত্মা ; এই পঞ্চরূপে এক কৃষ্ণ অবস্থান করিতেছেন। এই সকল বিশেষণের এক বিশেষ্য শ্রীকৃষ্ণই হইয়াছেন, এবং তদ্বিশেষণেও কেবল পরমাত্মাই বিশেষ্য ইহাতে কোন আপত্তি নাই। তথাহি—

যং ব্রহ্ম বেদান্তবিদোবদন্তি, পরং প্রধানং পুরুষং তথান্যে।
বিশ্বোদ্গতঃ কারণমীশ্বরম্বা তস্মৈ নমো বিঘ্নবিনাশকায় ॥—ভাগবতং ॥

বেদান্তবিৎ জ্ঞানীরা যাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, অন্যে যাঁহাকে প্রধান পুরুষ রূপ কহেন, কেহ বা সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের এক কারণ বলিয়া যাঁহাকে মান্য করেন, সেই বিঘ্নবিনাশন গণপতিকে নমস্কার করি। ইহাতেও গণেশরূপ বিশেষণে এক পরমেশ্বরই বিশেষ্য হইতেছেন। শক্তি বিষয়েও সেইরূপ যথা—

যা দুর্গা সৈব ললিতা, ললিতা সৈব রাধিকা।
ইয়ং সা ললিতা দেবী পুংরূপা কৃষ্ণ বিগ্রহা ॥—পদ্মপুরাণং ॥

তথাচ।—

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি স্তয়া সর্ব্বমিদং ততং।
প্রকৃতি স্ত্বংহি সর্ব্বস্য গুণত্রয় বিভাবিনী ॥ মার্কণ্ডেয় পুরাণং ॥

যিনি দুর্গা তিনিই ললিতা ; যিনি ললিতা, তিনিই রাধিকা ; এই ললিতা দেবীই পুংরূপে কৃষ্ণ বিগ্রহধারিণী। সেই দুর্গাই সকল জগদ্রূপিণী, তাঁহাতেই জগৎ আছে এবং তিনিই সকল প্রকৃতি ; অতএব ব্রহ্মা তাঁহাকে স্তব করিয়াছেন যে, মা! তুমিই সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ গুণত্রয়ের উৎপত্তিকারিণী। পুনস্তত্রৈব "একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়াকা মমাপরা, ইতি"—শুম্ভ দৈত্যকে ভগবতী কহিয়াছিলেন যে, এতজ্জগতে এক আমিই মাত্র, আমার অপর দ্বিতীয় আর কে আছে, অতএব নিশ্চয় জানিবেন যে, সকল দেব দেবী সংজ্ঞা ভেদ মাত্র, বাস্তব ভিন্ন নহেন। অপিচ রাম বিষয়ে—

রামোহচিন্ত্যো নিত্যাচিৎ সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বান্তঃস্থঃ সর্ব্বলোকৈক কর্ত্তা।
ভর্ত্তা হর্ত্তা নন্দ মূর্ত্তির্বিভূর্ম্মা সীতা যোগাচ্চিন্ত্যতে যোগবিদ্ভিঃ ॥ অঃ রামায়ণং ॥

য়াম যিনি অচিন্ত্য, নিত্য জ্ঞান স্বরূপ, সর্ব্বসাক্ষী, সকলের অন্তর্যামী, সর্ব্ব লোকের এক কর্ত্তা, সকলের ভর্ত্তা এবং সকলের সংহর্ত্তা, আনন্দমূর্ত্তি, সর্ব্বব্যাপী, সীতা যোগেই যোগিগণ কর্ত্তৃক চিন্তনীয় হইয়াছেন। ইহাতে এই সংগতি হইল যে, পৃথক্ পৃথক্ রূপে দেবতার উপাসনা করিলেও সেই এক ঈশ্বরের উপাসনা হয়। ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মরূপ সুতরাং নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের রূপ অচিন্তনীয় বিধায় ব্রহ্ম এই সকল রূপ ধারণে জীবের চিন্তনীয় হইয়াছেন। যদি কহ, "ঈশ্বর সেবা সগুণরূপে আবশ্যক হইলেও শিব, দুর্গা, কালী, রাধা, কৃষ্ণ, রাম ইত্যাদি নানারূপের মধ্যে কোন এক নাম রূপ নিয়মিত হইলেই উপাসনা সিদ্ধ হইতে পারিত, তাহাতে নানা শাস্ত্রে নানা দেবতার নানা নাম ও নানা ধ্যান লিখিত হওয়াতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে পূজার বিধি করিয়া লোক সকলকে ব্যস্ত করিবার তাৎপর্য্য কি? পঞ্চায়তনী দীক্ষার উদ্দেশ্য কি, যদি একই ব্রহ্ম উপাস্য, তবে এককে পঞ্চ বলিয়া পুনঃ পঞ্চকে এক বলাতে উপাসকের উপকার কি? বরং নানা সাঙ্কর্য্য হেতুক চিত্তের ব্যস্ততা ও ভেদতা জন্য দোষ সমূহই জন্মিতে পারে"। উত্তর,—যে সকল অদ্বৈতমতের প্রস্তাব উপরে স্থানে স্থানে কথিত হইল, তাহার মর্ম্ম বিবেচনা করিলেই ইহার সিদ্ধান্ত হয়; নচেৎ বুঝিয়াও যে না বুঝে তাহাকে কে বুঝাইতে শক্ত হয়? যেহেতু আধুনিক নব্য ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানিগণ আপনারাই বলেন যথা—"বাস্তবিক যাহার বিস্তৃতি আছে, সেই বিভক্তব্য, সুতরাং সে কখন এক বস্তু নহে।" ইহাতে বক্তব্য এই যে, ব্যাপনশীল ব্রহ্ম, যাঁহার অতি বিস্তৃতি আছে, তাঁহাকে জগৎ হইতে ভিন্ন কহিয়া কিরূপে এক কহিতে শক্ত হয়েন? আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকল রূপই তিনি; বিশেষতঃ বৈদিক গোপনীয় তত্ত্বকথা কিছু বলিতে হইল, যথা, "একোহং বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি" শ্রুতিঃ। পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলেন আমি অনেক হইব, অনন্তর অনেক হইলেন; যদি এক পরমেশ্বর অনেক হইতে না পারেন, তবে এ শ্রুতির কি গতি হইবে, এবং যোগবাশিষ্ঠে দাশূর মুনির প্রস্তাবে খোল্য রাজার কথায় কৌশলে উক্ত আছে, যথা।

ব্রহ্মবিষ্ণ্বিন্দ্ররুদ্রাদীন্ তত্তৈবাবয়বান্ বিদুঃ।
জায়তে স্বয়মেবাসৌ স্বয়মেববিলীয়তে॥ যোগবাশিষ্ঠং।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, রুদ্রাদি দেবতা সকলই পরমেশ্বরের রূপ; ইঁহারা মনুষ্যবৎ জন্ম নহেন; ইঁহারা স্বয়ং আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়েন। অতএব ইঁহারা ঈশ্বরেতর অন্য দেবতা নহেন; অনেক হইয়াও এক, ইঁহাদিগের মধ্যে যে কোন রূপের উপাসনা কর, তাহাতেই পরমেশ্বরের উপাসনা হয়। তাহার আরও প্রমাণ যে, অনেক জীব, অনেক পদার্থ, অনেক জাতি, অনেক গুণ, অনেক সংযোগ, অনেক প্রকারতা অনেক বিশেষ, তাহাতে কি এমন কহিতে পার যে, আমি সকল প্রকারের তাৎপর্য্য বুঝিয়াছি, যাহা কস্মিন্ কালে কেহই বুঝিতে পারেন নাই। ফলিতার্থ, ঐশীক্রিয়ার মর্ম্ম কেহই বুঝিতে শক্ত নহেন, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। অতএব সেই অনেকের মধ্যে যদি উপাসনার অনেকতা হয়, তবে সে উপাসনা কি দোষাবহ হইবে? শ্রুতি প্রমাণে, ঈশ্বর অনেক হইয়াছেন; জীবও অনেক, সুতরাং তাহাতে উপাসনার অনেক প্রকারতা না হইবার বিষয় কি? অতএব নব্য তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশকেরা, "এক ব্রহ্মের সত্বার প্রতি নির্ভর" করতঃ, অগ্নি ইন্দ্রাদিকে বেদ প্রমাণে, ব্রহ্মরূপ জানিয়াও যে, দেব এবং ব্রহ্মে পরস্পর ভেদ করিয়া নিন্দায় প্রবৃত্ত হয়েন, তাহাতে তাঁহাদিগের পরিণামে যে কি দুরবস্থা ঘটিবে, তাহা ভবিষ্য ও শিব এবং বরাহ পুরাণাদিতে স্পষ্ট করিয়া কহিয়াছেন। যথা—

একং প্রশস্যমানস্তু সর্ব্বানেব প্রশংসতি।
একং নিন্দতি যস্তেষাং সর্ব্বানেব বিনিন্দতি॥
দেবী বিষ্ণু শিবাদীনাং একত্বং পরিচিন্তয়েৎ।
ভেদকৃন্নরকং যাতি যাবদাভূত সংপ্লবং॥
যোহন্যথা ভাবয়েদেতাঃ পক্ষপাতেন মূঢধীঃ।
স যাতি নরকং ঘোরং রৌরবং পাপ পুরুষঃ॥

এই সকল দেবতা এক ব্রহ্ম ভিন্ন নহে, ইঁহাদিগের একের প্রশংসাতে সকলের প্রশংসা হয় ও একের নিন্দায় সকলের নিন্দা হয়; দুর্গা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতিকে এক ব্রহ্ম রূপে চিন্তা করিবেক, ভেদ করিলেই আপ্রলয় কাল পর্য্যন্ত নরকে বাস হয়। ইঁহারা ব্রহ্ম নহেন, এরূপ পক্ষপাত করিয়া যে মূঢ়েরা নিন্দা করে, তাহারা রৌরব নামক ঘোর নরকে বাস করে।

যে, যে বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় সে তাহার উন্নতির নিমিত্ত জনসমাজে তৎপ্রশংসা অবশ্যই করিতে পারে। কিন্তু যখন নব্য সভ্যেরা পূর্ব্বাপর প্রচলিত বৈদিক ধর্ম্ম লোপের চেষ্টায় নিরত যত্নবান্ হইয়া কর্ম্মকাণ্ড, যাগ, যজ্ঞ, দেবার্চ্চনা এবং ভগবদবতারের প্রতিকূলে লেখনী ধারণ পূর্ব্বক উপাস্য দেবতাদিগকে তিরস্কার করিয়া তদুপাসকদিগকে অধার্ম্মিক কহিতেছেন, তখন তদুত্তরে প্রবোধ প্রদানে নিরস্ত থাকা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না; ভগবন্নিন্দা শ্রবণে কে সুখী হয়? সর্ব্বযজ্ঞভুক্ যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুর উপাসনা বিলোপ করা যদ্রূপ অসুরদিগের মুখ্য ধর্ম্ম ছিল এক্ষণে তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণনিন্দা করাই ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানপ্রকাশক নব্যসভ্যদিগের প্রধান সংকল্প হইয়াছে, যেহেতু তাঁহারা বলেন যে,—

"অষ্টম অবতার শ্রীকৃষ্ণ, মনুষ্যের মনকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলরূপে অধিকার করিয়াছেন। রামচন্দ্র তাঁহার বলবীর্য্য ও সুচরিত্র নিমিত্ত অবতাররূপে গৃহীত হইয়াছিলেন; কিন্তু উত্তরকালিক মনুষ্যদিগের শিথিল ধর্ম্মানুসারে কৃষ্ণের কেলি-কৌতুক-রসান্বিত চরিত্র বর্ণনাই লোকের মনোরঞ্জনের কারণ হইল এবং তন্নিমিত্ত একালে তাঁহারই উপাসনা সর্ব্বাপেক্ষা প্রচুররূপে ব্যাপ্ত হইল।"

(ক্রমশঃ)

শ্রী অপূর্ব্বকৃষ্ণ শর্ম্মা

বিজ্ঞান, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

একটি নূতন ঘটনা লইয়া, সম্প্রতি প্যারিস নগরের লোকেরা অত্যন্ত আন্দোলন করিয়াছেন। এই ঘটনাকে "সঙ্গীত আবেশ" Musical Mediumship নাম দেওয়া হইয়াছে। কয়েক বৎসর অতীত হইল ফরাসী বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা যেমন ভাব চালনা thought transference বিষয়ে নিযুক্ত ছিলেন, সেইরূপ অধুনা ফরাসী রাজধানীতে অনেক অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ সঙ্গীতাবিষ্ট লোকের দ্বারায় যাহা ফলিতেছে, সেই বিষয়ে সযত্ন পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

অল্পদিন হইল প্রকাশিত হইয়াছে 'জরনাল ডি বার্ট্' নামক পত্রিকার কোন সংখ্যায় এম হেন্‌রি ডি, পারভিলি, এই বিষয়ের সম্যক রূপে আলোচনা করিয়া, আলোচিত ঘটনা গুলি সাধারণের চিন্তার বিষয় করিয়াছেন। প্রথমতঃ এম ডি, পারভিল, অবার্ট নামক কোন আবিষ্ট ব্যক্তির ঘটনা ধরিয়াছেন। এই ব্যক্তি যদিও সঙ্গীত বিদ্যার সামান্য

প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়াছেন কিন্তু অর্দ্ধাবিষ্ট অবস্থায় পিয়ানো সংযোগে এরূপ স্বরলয় বাহির করিয়া থাকেন যাহাতে মোসার্ট, কোপিন, বিট হোভেন, স্কাবার্ট ও অন্যান্য সুবিখ্যাত সঙ্গীত বিদ্যাধরের ছন্দোবন্ধাদি ক্রমশঃ আসিতে থাকে। দ্বিতীয় ঘটনা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যজনক, মিলি নিডিয়া নামক একটী স্ত্রীলোকের বৃত্তান্ত। এই যুবতী আবিষ্ট অবস্থায় (In a hypnotic state) কাপড়ের দ্বারায় তাহার চক্ষুদ্বয় বাঁধিয়া দিলেও তাহাকে যে কোন সঙ্গীত লিখিয়া দিবেন সে তাহাই পিয়ানোতে বাজাইতে পারিবে। এইরূপে ব্রাসেল্ নগরের ডি-লা-মনেল নামক রঙ্গমঞ্চে মিলি নিডিয়াকে নাট্যশালার সঙ্গীত অধিনায়ক এম সিলভান ডুপাই নামক ব্যক্তির নিকট লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। ডুপাই পূর্ব্বে যাহা কখন প্রকাশিত হয় নাই, এরূপ একটী স্বরচিত গান লিখিয়া নিডিয়াকে বাজাইতে দিলেন ও সেই সময়ে এম ডুপাই ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন যে ঐ যুবতীর চক্ষুর উপরের কাপড় সুদৃঢ়রূপে বাঁধা আছে। মিলি নিডিয়া ঐ কাগজ খানি লইয়া কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য হাতে লইয়া বসিলেন এবং অনতিবিলম্বে ঐ গানটী পিয়ানোতে বাজাইয়া উপস্থিত সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছিলেন।

দুই জন শারীরতত্ত্ববিদ্ চিকিৎসক দ্বারা যুবতী নিডিয়ার দেহ পরীক্ষা করা হইলে, জানা গেল যে, সে বাস্তবিক আবিষ্ট অবস্থায় ছিল ও বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থায় ছিল।

তাহার পর ঐ নিডিয়ার চক্ষের উপরি একটী কাল ও একটী সাদা রঙ্গের এই ভাবে অনেকগুলি কাপড় জড়াইয়া বাঁধা হইল ও তাহাকে পিয়ানো সন্নিকটে পৌঁছিয়া দেওয়া হইল। দর্শকবৃন্দের মধ্যে একজন একটী নূতন গানাবলী দিলেন, ঐ কাগজ পিয়ানোর উপর রাখা হইল; আবেশকারী hypnotizer ব্যক্তি তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন এবং সেই মুহূর্ত্তে ঐ বালিকা বিশেষ নিপুণতার সহিত সেই গান গুলি পিয়ানোতে বাজাইতে লাগিলেন।

তাহার পর নিউজিলাণ্ড হইতে আগত, অপর একজন দর্শক যাহা পূর্ব্বে ইয়ুরোপের কোন স্থানে অভিনীত হয় নাই এরূপ একটী গান মিলি নিডিয়াকে বাজাইতে দিলেন এইটীও সে একেবারে বাজাইয়া ফেলিল; এবং পূর্ব্বে অজানিত পাডেরস্কির রচিত একটী গানও সেইরূপ সুদক্ষতার সহিত বাজাইল।

পরিশেষে একটী স্ত্রীলোক একখানি গানের নাম মাত্র এক খণ্ড কাগজে লিখিয়া উহা খামের মধ্যে আবরিত করিয়া ও তাহার উপর শিল মোহর করিয়া ঐ বালিকাকে দিলেন। সে উহা এক মুহূর্ত্তের জন্য কপোলদেশে রাখিল এবং পরক্ষণেই বিটহোভেনের "ক্রেয়ার ডুলুন" সোনেটা গান বাজাইতে লাগিল।

১০ম ভাগ। {ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩১৩ সাল।} ৫ম,৬ষ্ঠ সংখ্যা।

মহিম্ন স্তব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

ত্বমর্কস্ত্বং সোমস্ত্বমসি পবনস্ত্বং হুতবহ-
ত্বমাপস্ত্বং ব্যোমত্বমুধরণীরাত্মা ত্বমিতি চ।
পরিচ্ছিন্নামেবং ত্বয়ি পরিণতা বিভ্রতি গিরং,
ন বিদ্মস্তত্তত্বং পরমিহহি যত্ত্বং ন ভবসি ॥২৬॥

সম্প্রতি ব্রহ্মণো বিশ্বমূর্ত্তিত্বং বর্ণয়তি। ত্বমিতি। ত্বমর্কঃ সূর্য্যঃ (১) ত্বং সোমশ্চন্দ্রঃ (২) ত্বং পবনোবায়ুঃ (৩) ত্বংহুতবহোঽগ্নিঃ (৪) ত্বমাপো জলং (৫) ত্বং ব্যোম আকাশং (৬) ত্বং উ সংবোধনে ধরণীঃ পৃথিবী (৭) ত্বমাত্মাচ ইন্দ্রিয়া-ভ্যধিষ্ঠাতা জীবশ্চ (৮) অসীত্যর্থঃ সর্ব্বেষামন্বয়ঃ।

ক্ষিতির্জলং তথাচাগ্নি র্বায়ুরাকাশমেব চ।
সূর্য্যচন্দ্রমসৌদেবৌ যাজীচেত্যষ্টমূর্ত্তয়ঃ ॥

ইতি ঈশ্বরস্যাষ্ট মূর্ত্তি কথনাদিতি ভাবঃ। পরিণতাঃ পরিণতমতয়ো

বিচক্ষণাঃ ত্বয়িত্বয়িদেশ বিষয়ে এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারাং গিরিং বাচং বিভ্রতি ধারয়ন্তি অপরিচ্ছিন্নমপিত্বাং পরিচ্ছিন্নংইব ব্রুবন্তীত্যর্থঃ। পরং কিন্তু বয়ংচ ইহ খলু সংসারে ত্বং যৎ তত্ত্বং যদ্বস্তু ন ভবসি বয়মিত্যাহং তৎ তাদৃশং তত্ত্বং ন বিদ্মঃ ন জানীমঃ। ত্বং যত্তত্ত্বং ন ভবসি এবংভূতং তত্ত্বং নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ। ত্বমেব জ্ঞেয়জ্ঞানজ্ঞাতৃরূপনিখিলজগদ্রূপেণ প্রতিজানীমিতিভাবঃ। আবলি দীপকোঽয়মলঙ্কারঃ। যদুক্তং দীপকপ্রস্তাবে ভোজরাজেন "অর্থাবৃত্তিঃ পদাবৃত্তিরুভয়াবৃত্তিরাবলী" ইতি। দণ্ডিনাপি জাতিক্রিয়াগুণদ্রব্যবাচিনৈক এবর্ত্তিনা। সর্ব্ববাক্যোপকারশ্চেৎতমাহুর্দ্দীপকং বুধঃ॥ ইতি অর্থাবৃত্তি পদাবৃত্তি উভয়াবৃত্তিরেবচ দীপক স্থান এবেষ্টমেতি চ ।২৬।

তুমি সূর্য্য তুমি চন্দ্র, তুমি বায়ু, তুমি আকাশ, তুমি অগ্নি, তুমি জল, আবার তুমিই পৃথিবী এবং তুমি আত্মা—এই প্রকারে এই আটটীকে পণ্ডিতেরা তোমার মূর্ত্তি বলিয়া থাকেন ; কিন্তু আমরা জানি না যে সংসারে এমন কি আছে যাহা তুমি নও ।২৬।

ত্রয়ীং তিস্রো বৃত্তীস্ত্রিভুবনমথো ত্রীনপি সুরা-
নকারাদ্যৈর্ব্বর্ণৈস্ত্রিভিরপি দধত্তীর্ণবিকৃতি।
তুরীয়ন্তে ধাম ধ্বনিভিরবরুন্ধান মণুভিঃ,
সমস্তং ব্যস্তং ত্বাং শরণদ গৃণাত্যোমিতিপদম্ ॥২৭॥

ত্রয়ীমিতি। হে শরণদ আশ্রয়প্রদ, ওমিতি পদং সমস্তং পূর্ণং ব্যস্তং বিভক্তঞ্চ সংস্থামেব গৃণাতি প্রতিপাদয়তি। তত্র বাহুল্যাৎ প্রথমতো ব্যস্তপ্রকারমাহ। অকারাদ্যৈঃ পৃথগ্‌ভূতৈ স্ত্রিভির্বর্ণৈঃ করণৈঃ অকার উকার মকার ইতি ত্রিবর্ণৈঃ ব্যস্তং বিভক্তং ওঁ ইতি পদং ওমিতি পদস্য বিশ্লেষেণ যৎ পদং স্যাৎ তদেব অ উ ম ইতি পৃথগ্বর্ণত্রয়রূপং নতু সমস্তং সংহিতরূপঞ্চ ওমিতি পদমিত্যর্থঃ। যথাক্রমং ত্রয়ীং ঋগ্‌যজুঃসামাখ্যং বেদত্রয়ং অভিদধৎ প্রতিপাদয়ৎ ত্বাং গৃণোতি, তথা তিস্রোবৃত্তীঃ সৃষ্টিস্থিতি লয়াখ্যং জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাখ্যঞ্চ অবস্থাত্রয়ং অভিদধৎ ত্বাং গৃণোতি ; তথা ত্রিভুবনং ভূর্ভুবঃস্বরিতি লোকত্রয়ং প্রতিপাদয়ৎ ত্বাং গৃণোতি। অথো পুনঃ ত্রীন্ সুরানপি বিধিহরিহরাংশ্চ অভিদধৎ ত্বাং গৃণোতি কার্য্যকারণয়োরভেদাদিতি সর্ব্বত্রানুসন্ধেয়ম্। ব্যস্তং প্রদর্শ্য ইদানীং সমস্তং প্রদর্শয়তি। অণুভিঃ

সূক্ষ্মতমৈঃ ধ্বনিভিঃ যোগিনাং নাভিপদ্মাৎ স্বয়মুত্থিতনাদবিন্দুভিঃ করণৈঃ সমস্তং ওমিতি পদম্ (কর্ত্তৃ) অবরুন্ধানং বিশ্বং ব্যাপ্নুবৎ তথাতীর্ণা বিকৃতি র্বিকারো যেন তথোক্তং বিকার-রহিতং তে তুরীয়ং ধাম বিধিহরিহরাণামপি মূলত্বাৎত্বদনচ্চতুর্থং পদং চৈতন্যব্রহ্মাখ্যপরাভিধানকং কিমপ্যতেয়মখণ্ড মবিকারমদ্বিতীয়ং পদং (কর্ম্ম) গৃণাতি প্রতিপাদয়তি। ।২৭।

হে জগদাশ্রয়, ওম্ এই পদটী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তোমাকেই প্রতিপাদন করিতেছে। অ উ ম এই তিন বর্ণে ব্যস্ত অর্থাৎ বিভক্ত হইয়া যে ঋক্ যজুঃ ও সামকে বুঝাইতেছে তাহাতে তোমাকেই বুঝাইতেছে। সৃষ্টি স্থিতি লয়, ও জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাকে যে বুঝাইতেছে ইহাতে তোমাকেই বুঝাইতেছে। ভূ ভুব স্বঃ এই তিন লোককে যে বুঝাইতেছে ইহাতেও তোমাকেই বুঝাইতেছে। আর সমস্ত ভাবে অর্থাৎ ওম্ এই অবিভক্ত পূর্ণ এক ভাবে যোগিগণের নাভিপদ্ম হইতে স্বয়মুত্থিত অতি সূক্ষ্মতম যে নাদবিন্দুধ্বনি, তাহাও এই সমস্ত সংসার হইতে ভিন্ন বিশ্বব্যাপী নির্ব্বিকার নিরাকার তুরীয় চৈতন্যরূপ তোমাকেই বুঝাইতেছে। ২৭।

ভবঃ সর্ব্বো রুদ্রঃ পশুপতিরথোগ্রঃ সহমহাং-
স্তথাভীমেশানাবিতিযদভিধানাষ্টকমিদং।
অমুষ্মিন্ প্রত্যেকং প্রবিচরতি দেব! শ্রুতিবপি,
প্রিয়ায়াস্মৈ ধাম্নে প্রণিহিতনমস্যোঽস্মিভবতে ॥ ২৮ ॥

ভবইতি। ভবত্যস্মাদিতি ভবো বিধাতা ব্রহ্মা, সর্ব্বতি ব্যাপ্নোতি বিশ্বমিতি সর্ব্বঃ বিষ্ণুঃ, রোদিতি প্রলয়কালে বিশ্বং ব্যাপ্য ঘোরং নিনদতীতি রুদ্রো হরঃ প্রলয়করঃ, পশ্যন্তে মায়য়া বধ্যন্তে ইতি পশবঃ দেহিনঃ তান্ পাতীতিপশুপতিঃ, যদ্বা পশ্যন্তি ইষ্টানিষ্টানীতি পশবঃ, তত্রাপি স এবার্থঃ। উচ্ছতি অতিক্রমতে লোকানি উগ্রঃ, যদ্বা উচাতি যুনক্তি প্রকৃতিং আত্মনেত্যুগ্রঃ, মহান্ সহি মহাদেব ইত্যর্থঃ। বিভেত্যস্মাদিতি ভীমো ভয়ানকঃ, ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানামিতি কথনাৎ। ঈশতে ইতি ঈশানঃ সর্ব্বশক্তিমান্ দেবঃ। হে দেব ইতীদং যদ্ অভিধানাষ্টকং তবেতি শেষঃ, শ্রুতিরপিবেদোঽপি অমুষ্মিন্ নামাষ্টকে অমীষু অষ্টসু নামসু ইত্যর্থং প্রত্যেকং পৃথক্ পৃথক্ যথাতথা বিচরতি। শ্রুত্যাবপোতৈরষ্টভির্নামভি স্তুং স্তুয়সে ইতি ভাবঃ।

অহমপি প্রিয়ায় মে প্রীতিকরায় অস্মৈ একস্মৈ একস্মৈ নাম্নে, অমীষাং নাম্নাং প্রত্যেক মুদ্দিশ্যেত্যর্থঃ। যদুদ্দিশ্য ক্রিয়া ভবতি ইতি চতুর্থী ভবতে তুভ্যং প্রণিহিতা কৃতা নমস্যা নমস্কারঃ যেন স তথোক্তঃ কৃতনমস্কারঃ অস্মিভবামি। তব একস্মৈ একস্মৈ নাম্নে তুভ্যম্ একো একো মে নমস্কারঃ। ইত্যর্থঃ। নমঃ স্বস্তীত্যাদিনা চতুর্থী। অত্র ভবাদি নামাষ্টকেন ক্রমেণ কারণ-বারিক্ষিত্যগ্নিযজমানবায়ুসূর্য্যাকাশসোমরূপাষ্টমূর্ত্তয়োলক্ষ্যন্তে ইতি কেচিৎ। তত্রাপি ন কচিদনর্থাপত্তিরীশ্বরস্য বিশ্বরূপত্বাত্তদ্বীজত্বাচ্চেতি বোদ্ধব্যং।

পূর্ব্বস্যাং দিশি মহাদেবায় সূর্য্যামূর্ত্তয়ে নমঃ। ১। আগ্নেয্যাং রুদ্রায়াগ্নি মূর্ত্তয়ে নমঃ। ২। যাম্যাং ভীমায়াকাশ মূর্ত্তয়ে নমঃ। ৩। নৈঋর্ত্যাং পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ। ৪। বারুণ্যাং ভবায় জল মূর্ত্তয়ে নমঃ। ৫। বায়ব্যাং উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ। ৬। কৌবের্য্যাং সর্ব্বায় ক্ষিতি মূর্ত্তয়ে নমঃ। ৭। ঐশান্যাং ঈশানায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ। ৮। কেচিচ্চ মধ্যে উর্দ্ধাধো নমঃ শিবায়েতি কল্পয়ন্তি। ২৮।

ভব, সর্ব্ব, রুদ্র, পশুপতি, উগ্র, মহাদেব, ভীম, ঈশান এই যে তোমার আটটী নাম ইহার প্রত্যেকটীকে অবলম্বন করিয়া শ্রুতিও চলিয়াছেন। আমার প্রিয় এই সকল নামের প্রত্যেকটীর নিমিত্ত আমি তোমাকে এক একটী নমস্কার করিতেছি। ২৮। (ক্রমশঃ)

৺প্যারীমোহন সেন গুপ্ত।

যোগচিন্তা।

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।—পাতঞ্জল, সমাধিপাদ ২য় সূত্র।

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানং।—ঐ ৩য় সূত্র।

চিত্তের বৃত্তি নিরোধ অবস্থার নাম যোগ। সেই নিরোধ অবস্থা কিরূপ? টীকাকারগণ উহার কি অর্থ বলেন?

ব্যাসভাষ্য নামে পাতঞ্জল দর্শনের এক টীকা আছে। বাচস্পতি মিশ্র ও বিজ্ঞানভিক্ষু ব্যাসভাষ্যের আবার টীকা করিয়াছেন। এই সব টীকা পড়িয়া যোগশাস্ত্রের ভিতর কিছুই রস পাই নাই। 'তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানং' এই সূত্রের যে অর্থ ব্যাসভাষ্যে আছে তাহা এই যে, সেই সময় অর্থাৎ যোগের

অবস্থাতে দ্রষ্টার যে কৈবল্য স্বরূপ, সেই স্বরূপে, দ্রষ্টা (পুরুষ) অবস্থান করেন। বৃত্তি নিরোধ কি তাও বুঝিলাম না; কৈবল্য কি তাও বুঝিলাম না। সুখ দুঃখের অতীত এক কৈবল্য অবস্থার কথা শাস্ত্রে আছে এবং শাস্ত্রে ইহাও বলা আছে যে, ঐ কৈবল্য অবস্থা কিরূপ তাহা বুদ্ধিদ্বারা বুঝা যায় না। যিনি মুক্ত হইয়াছেন তিনি ঐ কৈবল্য অবস্থা বুঝিতে পারেন। ঐ কৈবল্য অবস্থা আমাদের বুদ্ধির বাহিরে। সুতরাং কৈবল্য অবস্থা বুঝা হল না—আর যোগের অর্থও বুঝা হল না। কিন্তু পতঞ্জলি চিত্তবৃত্তির নিরোধের যে উপায় বলিয়াছেন, তাহাতে সেই অবস্থা যদি বুদ্ধিগম্য অবস্থা না হয়, তাহা হইলে পতঞ্জলিকে পাগল বলেই বুঝিতে হয়।

পতঞ্জলি বলেন অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়। অভ্যাস কাহাকে বলে তাহার সংজ্ঞা দিলেন:—তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ। সেই নিরোধ অবস্থাতে থাকার জন্য যে যত্ন তাহারই নাম অভ্যাস। বেশ ভাল উপদেশ। যে অবস্থা আমি আমার বুদ্ধি সহকারে বুঝিতে পারিব না—যাহার কোন কল্পনাও করিতে পারিব না, সে অবস্থাতে থাকিবার জন্য মানুষ কেমন করিয়া যত্ন করিবে? ভগবান্ পতঞ্জলি কি পাগল যে তিনি এইরূপ সূত্র লিখিয়া গিয়াছেন। অব্যক্ত কৈবল্য অবস্থার কথা শাস্ত্রে আছে এবং সেই অবস্থা লাভের পথও বেদান্তাদি শাস্ত্রে কথিত আছে। কিন্তু যে অবস্থা বুদ্ধিগম্য নহে এবং সেই অবস্থা অভ্যাস করিতে উপদেশ দেওয়া নিশ্চয়ই বাতুলতা। ছাত্রকে বলিলাম যে সেই কথাটা অভ্যাস করিবে, কিন্তু কথাটা কি তাহা সে জানে না; এরূপ বলা নিশ্চয়ই অসঙ্গত ও অসম্ভব। শম দমাদি গুণের অভ্যাস এবং শাস্ত্রের তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের অর্থচিন্তা-দ্বারা কৈবল্য লাভ হয় এ উপদেশ আমরা বুঝিতে সক্ষম। কিন্তু কৈবল্য অবস্থার অভ্যাস করার উপদেশ আমরা কোনরূপেই বুঝিতে পারি না। যাঁরা কৈবল্য পাইয়াছেন পাতঞ্জল দর্শন কি কেবল তাঁহাদের জন্য লেখা? 'তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ' এই সূত্রের অর্থ ব্যাসভাষ্যে যাহা আছে তাহা এই—চিত্তস্যাবৃত্তিকস্য প্রশান্তবাহিতা স্থিতিঃ তদর্থঃ প্রযত্নঃ। চিত্তের বৃত্তিশূন্য অবস্থার যে প্রশান্তবাহিতা তাহার নাম স্থিতি; এই প্রশান্তবাহিতার জন্য প্রযত্নকে অভ্যাস বলে। চিত্তের বৃত্তিশূন্য অবস্থা

কিরূপ তাহা বুঝিয়া, তাহার প্রশান্তবাহিতা বুঝিয়া তবে সেই জন্ম যত্ন করিতে হইবে। কিন্তু বৃত্তিশূন্য অবস্থা যদি কৈবল্য অবস্থা হয় তবে সে যত্ন অসম্ভব।

এইরূপ ভাবিতেছি, চাকর তামাক দিয়া গেল; বেশ ভাল তামাক, বড় কল্‌কেতে তাওয়া দিয়া তামাক সাজিয়া দিয়া গেল; তামাক টানিতে লাগিলাম কিন্তু ধূঁয়া পাই না। গুড়গুড়ির নল টানিতেছি, বেশ গুড়‌ড়ড় শব্দ হইতেছে, কিন্তু ধূঁয়া নাই; তামাকের রস কিছুই পাইতেছি না। কল্‌কে হাতে করে দেখি তামাকের উপর এক রাশি টীকা চাপাইয়াছে; নীচের টীকা দুই এক খানা ধরিয়াছিল তাহাও ছাই পড়ে নিভিয়া গিয়াছে। অনেক ফুঁ দিলাম কিন্তু আগুন সব নিভে গেছে; টীকা আর ধরিল না। দেখিলাম ভিজা টীকা; সব টীকাগুলি ফেলিয়া দিলাম; ঘরে শুক্‌না কয়লা ছিল, তাইতে আগুন দিয়া ধরাইয়া কল্‌কেতে চাপাইয়া দিলাম। এইবার তামাক ধরিয়াছে; টানিতেছি বড় মিঠে, বড় সরস। যদি কেহ এক টান চান, দিতে পারি।

পাতঞ্জল সূত্রের উপর যে একরাশি টীকা চাপান আছে, উহা আমি ফেলিয়া দিয়াছি। ব্যাসদেব ভগবদ্গীতাতে যে জ্ঞানের আগুন জ্বালিয়া রাখিয়াছেন সেই আগুন পাতঞ্জল সূত্রের উপর ধরিয়া যিনি টানিবেন তিনিই সূত্রগুলির প্রকৃত রসাস্বাদন করিতে সক্ষম হইবেন। তাহা হইলে তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন যে পাতঞ্জল দর্শনের "সাংখ্যপ্রবচন" ভাষ্যকার পণ্ডিত ব্যাস এবং ভগবদ্গীতা রচয়িতা ঋষি ব্যাসদেব নিশ্চয়ই এক লোক নহেন। ঋষি ব্যাসদেব যোগ সম্বন্ধে ভগবদ্গীতাতে যাহা বলিয়াছেন, ভগবান্ পতঞ্জলিও তাহাই বলিয়াছেন; একজনের কথা বুঝিলেই আর একজনের কথার অর্থ বুঝা যাইবে। ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ঋষি ব্যাসদেব যোগের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা এই :—

যদা বিনিয়তং চিত্তং আত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যঃ যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা॥
যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্রচৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি।
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্‌বুদ্ধি গ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম।
বেত্তিযত্র নচৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ।
যংলব্ধাচাপরং লোভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো নদুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতং।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোহনির্ব্বিণ্ণচেতসা।

আত্মাতেই অবস্থিত চিত্ত হয় যবে, নিয়মেতে বশীভূত হইয়া যোগীর।
সকল কামের স্পৃহা, হয় তাঁর দূর তখন প্রকৃত তিনি হন যোগযুক্ত॥ ১৮
আত্মার যোগেতে যুক্ত সতত যে জন, যতচিত্ত সে যোগীর যেরূপ উপমা।
দেন সাধুগণ তাহা বলিতেছি শুন, নিবাত গৃহেতে দীপ নিষ্কম্প যেমন॥ ১৯
যোগের সাধনে চিত্ত হইলে নিরুদ্ধ, যেথা উপরতি করয়ে সম্ভোগ।
আপন ভিতর দিয়া আপন আধারে দেখি আপনাকে যেথা পরম সন্তোষ॥ ২০
বুদ্ধিগ্রাহ্য সুখ যেথা সুখ আত্যন্তিক ইন্দ্রিয় ভিতর দিয়া সে সুখ না আসে।
যাহাতে হইলে স্থিতি অন্যত্র চলন প্রকৃত পক্ষেতে আর না হয় চিত্তের॥ ২১
যাহা পেলে অন্যলাভ তদধিক কিছু হইতে যে পারে আর মনে নাহি লয়।
উঠেছেন যিনি তথা, সুদারুণ দুখ বিচলিত নাহি তাঁরে করিবারে পারে॥ ২২
দুঃখ সংযোগের সদা এই যে বিয়োগ, এই যে অবস্থা জেনো, এরে বলে যোগ।
নির্ব্বেদ রহিত হয়ে তবে এই যোগে নিশ্চয়ই হবে যুক্ত ছাড়ি কামভোগ॥ ২৩

যোগের সংজ্ঞা ব্যাসদেব যেমন বলিয়াছেন তাহাতে উহা পরম সুখের অবস্থা, কিন্তু সে সুখ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখ নহে; উহা বুদ্ধিগ্রাহ্য সুখ। এই অবস্থা জ্ঞানের অতীত কৈবল্য অবস্থা নহে। সুতরাং ঐ অবস্থা আমরা বুঝিতে সক্ষম এবং বুঝিয়া আমরা উহা অভ্যাস করিতেও সক্ষম। পতঞ্জলির মতেও যদি যোগের এই অর্থ হয় তবে তিনি পাগল নন; তাহা হইলে যোগের অবস্থাতে থাকিবার জন্য যত্ন করার যে উপদেশ তিনি দিয়াছেন সে উপদেশ সঙ্গত। পাতঞ্জলদর্শনের দুটি সূত্র থেকে যোগের অর্থ বুঝিতে হইবে। তাহারা এইঃ—
যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ। তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানং।

গীতার—"যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া" এই টুকু ঐ দুই সূত্রের সঙ্গে স্পষ্টই অভিন্ন।

'যদা বিনিয়তং চিত্তং আত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে'

গীতার এই কয়টি কথা হইতে বুঝা গেল যে যোগের অবস্থাতে ও আত্মাতে চিত্তের অবস্থান হয়।

পাতঞ্জল সূত্রে—তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানং। এই সূত্রটিরও অন্য অর্থ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

সেই সময় দ্রষ্টার স্বরূপে অর্থাৎ আত্মাতে চিত্তের অবস্থান হয়, এই সোজা অর্থ থাকিতে 'কৈবল্য স্বরূপে তখন পুরুষের অবস্থান হয়' এ অর্থ করে যোগ-শাস্ত্রটাকে নীরস করার কোন দরকার দেখি না।

ভারতবর্ষে এক সময়ে নিরীশ্বর সাংখ্যবাদ কিছু বাড়াবাড়ি রকম হইয়াছিল; মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের তীক্ষ্ণ অসি প্রয়োগে সেই নিরীশ্বর সাংখ্যবাদ ক্ষীণবল হইয়া যায়। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণলাভের কয়েক শতাব্দী পরে বুদ্ধের ধর্ম্মকে লোকে নিরীশ্বর ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে আরম্ভ করে। ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে ভারতের ঐ সময়টা একটা অন্ধকারের সময় গিয়াছে। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য সেই অন্ধকার দূর করিতেই আসিয়াছিলেন। কপিলসূত্র নামে যে নিরীশ্বর সাংখ্যসূত্র আছে; সেই গ্রন্থের মতের বাড়াবাড়ি সেই অন্ধকারের সময় হইয়াছিল। ব্যাসনামে যিনি পাতঞ্জলসূত্রের টীকা করিয়াছেন তাঁহার টীকা পড়িয়া বোধ হয় যে, নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শণের মতগুলিতেই তাঁহার মস্তিষ্ক ভরিয়াছিল এবং সেই মতগুলি সব তাঁহার ভাবে প্রবেশ করাইয়া পবিত্র যোগবিদ্যাকে নিরীশ্বর বাদের দিকে টানিয়া আনিয়াছেন। এই ব্যাস যিনি পাতঞ্জল দর্শনের টীকা করিয়াছেন নিশ্চয়ই তিনি সেই অন্ধকারের সময় একজন গণ্য পণ্ডিত হইয়া-ছিলেন; নচেৎ তাঁহার ভাষ্যই প্রধান ভাষ্যরূপে ব্যবহৃত হইত না। তিনি গণ্য পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার ভাষ্য অবলম্বনেই পাতঞ্জলদর্শনের চর্চ্চা এত দিন হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং তাঁহার ভাষ্যকে যে আমরা একেবারে উপেক্ষা করিব তাহা কখনই সঙ্গত নহে। তবে ঋষি ব্যাসের কথা অবলম্বনে যদি সহজে পাতঞ্জলসূত্র বোঝা যায়, তবে পণ্ডিত ব্যাসের কাছে যাইবার আর দরকার হইবে না। যদি পাতঞ্জলসূত্রে এবং ভগবদ্গীতাতে আমরা সমান উক্তি

(parallel passage) পাই, তবে সেই সেই উক্তিগুলি পতঞ্জলি ও ব্যাস যে একই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে,।

আমরা পাতঞ্জলদর্শন হইতে এবং ভগবদ্গীতা হইতে যে দুইটি কথার উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি। সেই দুইটি আবার এইখানে পাশাপাশি রাখিয়া দিই, তাহা হইলেই ভগবদ্গীতার সাহায্যে পাঠকগণ যোগসূত্র বুঝিতে পারিবেন।

পাতঞ্জল সূত্র।	গীতা।
যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। ২ সূত্র।	যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
তদা দ্রষ্টুঃস্বরূপেঽবস্থানং। ৩ সূত্র।	যদা বিনিয়তং চিত্তং আত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।

পাতঞ্জলদর্শনের এই যে ৩য় সূত্রটি ঐটিই প্রকৃত যোগ শব্দের অর্থ। চিত্তের আত্মাতে অবস্থান; চিত্তের সহিত আত্মার যোগই যোগ শব্দের অর্থ। যোগশব্দের অর্থ উক্ত কৈবল্য অবস্থা নহে। যোগমার্গের শেষ সীমাতে কৈবল্য ধাম আছে; ইহা পাতঞ্জলদর্শনেও বলা হইয়াছে এবং ভগবদ্গীতাতেও বলা হইয়াছে; কিন্তু সেই কৈবল্য ধাম যোগীর লক্ষ্য নহে। কৈবল্য লাভ হ'ল কিম্বা নাই হ'ল, যোগী সে জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত নহেন। প্রহ্লাদের ন্যায় অনেক যোগী কৈবল্যমুক্তি হাতে পাইয়াও গ্রহণ করেন নাই। যোগীর কাছে It is not the goal but the course that makes him happy.

ভোজরাজ পাতঞ্জল দর্শনের এক টীকা করিয়াছেন. তিনি অনেক স্থলে ব্যাসভাষ্যের কথা আপনার টীকাতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু ব্যাসভাষ্যের প্রধান ভ্রম যেখানে, ভোজরাজ সেখানে তাঁহার মতানুযায়ী চলেন নাই। ভোজবৃত্তি অনুসারে যোগ ও কৈবল্য এক নহে; কৈবল্য যোগের ফল। ভোজরাজের মতে, বুদ্ধিতে আত্মার যে অবস্থান উহাই তৃতীয় সূত্রের অর্থ। আমরা গীতার আলোকে পাতঞ্জল দর্শনের তৃতীয় সূত্রের যে অর্থ পাইয়াছি তাহা এই যে যোগের অবস্থাতে চিত্ত আত্মাতে অবস্থিত হন। চিত্তের আত্মা—আলিঙ্গনের এই যে অবস্থা ইহা নীরস অবস্থা নহে; এই রস চরম রস। চিত্তস্বামীর সহিত চিত্তের এই মিলন, এই পরমানন্দ অবস্থাই যোগানন্দ। চিত্তের সহিত আত্মার স্ব-স্বামি সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়া যিনি চিত্তকে 'আমার ধন,' "স্বামীর স্ব" বলিয়া বুঝিয়াছেন, তিনি

যোগের আনন্দ কল্পনা করিতে পারিবেন। তার পর এই 'আমার ধন'কে তিনি 'শ্রীকৃষ্ণের ধন' বলিয়া বুঝিতে সক্ষম হইবেন।

'ধন আমার, তুমি যে কৃষ্ণের ধন' এই রকম করে চিত্তকে 'তুমি' সম্ভাষণে আদর করিতে শিখিতে হইবে। এই রস পাতঞ্জল দর্শন থেকে শিখিয়াছি। অস্মিতা (personality) উহা আমার গুণ নহে,উহা চিত্তের গুণ, এইটি বুঝিলে চিত্তকে 'তুমি' সম্ভাষণ করা আর কবির কল্পনার কথা হবে না; উহা তখন দর্শনশাস্ত্রের সত্যজ্ঞানের বিষয় হবে। চিত্ত তখন আমা হইতে পৃথক্ ও অন্য রূপে আমার ভালবাসার পাত্র হইয়া আমার সঙ্গে কথা কহিবে। পাতঞ্জল দর্শনে বলা হইয়াছে,—দৃক্দর্শনয়োরেকাত্মতা অস্মিতা।

আমি ও আমার চিত্ত দুইজনে পৃথক্, এই জ্ঞান না থাকাই অস্মিতা; এই অস্মিতা হইতেই রাগদ্বেষ জন্মে। কিন্তু যাঁর অস্মিতা গেছে তিনি আপন হৃদয়ের মধ্যে আপনার প্রিয়তমাকে (চিত্তকে) দেখিয়া 'তুমি' সম্ভাষণে তাঁহার সহিত প্রেমানন্দে থাকেন; রাগ দ্বেষ সব সেই প্রিয়তমার প্রেমে ভাসিয়া যায়। তার পর রসের চরম অবস্থা—সেই প্রিয়তমাকে কৃষ্ণের করে সমর্পণ। 'আমার ধন, তুমি যে কৃষ্ণের ধন' যিনি ইহা বলিতে শিখিলেন তিনি সেই "পর" পুরুষকে, সেই পুরুষোত্তমকে জানিতে এবং জানিয়া তাঁহাতে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইবেন। ওঁ

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

তন্ত্র ও ব্রহ্মবিদ্যা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

২। অধিকারি-বিচার।

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে সাধারণ ভাবে তন্ত্র ও ব্রহ্মবিদ্যার একত্ব প্রদর্শন করিয়াছি। এক্ষণে এক একটী বিশেষ বিষয় অবলম্বন পূর্ব্বক এই একত্ব আরও স্পষ্টরূপে দেখান যাইতেছে। অদ্যকার আলোচ্য-বিষয় অধিকারি—বিচার। আমরা দেখাইব ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হইতে হইলে যেরূপ উপযোগিতার

প্রয়োজন, তন্ত্রশাস্ত্রের অধিকারী হইতে হইলেও ঠিক্ সেইরূপ উপযোগিতার আবশ্যক। তন্ত্র ও ব্রহ্মবিদ্যা একই বলিয়া উভয় শাস্ত্রের অধিকারীকেই একই রূপ উপযোগিতা অর্জ্জন করিতে হয়।

ভক্তিভাজন শ্রীমতী এনি বেশান্ত স্ব-প্রণীত "পুরাতনী প্রজ্ঞা" (Ancient Wisdom) "শিষ্যত্বের পন্থা" (The Path of Discipleship) নামক গ্রন্থে কিরূপে ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হইতে হয় তাহা সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার সার সঙ্কলন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অধিকারিত্ব লাভের পূর্ব্বাবস্থায় মানবকে নিজের উদ্যমে ও নিজের শক্তিতে কতক গুলি সদ্‌গুণ অর্জ্জন করিতে হয় ও সেই সমস্ত সদ্‌গুণ অর্জ্জিত হইলে সে মহাত্মা গুরুগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও গুরুগণ তাহাকে বিবিধ অবস্থায় পাতিত করিয়া অলক্ষ্যে তাহার শক্তি উন্মেষণের সহায়তা করেন, ও ক্রমে তাহাকে অধিকারি-মার্গে আরোহণ করাইয়া দেন ; এবং অধিকারি মার্গে আরূঢ় হইয়া অধিকারিতার পূর্ণতা সাধন জন্য তাহাকে কতকগুলি বিশেষ বিষয়ের সাধনা করিতে হয় ও সেই সাধনার শেষ হইলে তাহার গুরুসাক্ষাৎকার হয় এবং তখন গুরুদেব কর্ত্তৃক প্রকৃত জ্ঞানে অভিষিক্ত হইয়া স্বীকৃত ব্রহ্মবিদ্যা মার্গে অধিরোহণ করে ও ক্রমে সাধনা দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়।

সাধারণ ভাবে মানবের মঙ্গলের জন্য দেশভেদে ও কালভেদে জগতে যে সমস্ত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত ও যে সমস্ত অধ্যাত্ম শাস্ত্র প্রকাশিত আছে, অধিকারিত্ব লাভের পূর্ব্বাবস্থায় মানবকে অধ্যয়ন, মনন, অনুষ্ঠানাদি দ্বারা নিজের যত্নে ও উদ্যমে, তাহা হইতে যত টুকু লাভ করিবার তাহা করিতে হইবে ও তাহা লাভ হইলে তখন তাহা দ্বারা তাহার আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হইবে না— সেই অতৃপ্তি তখন কতকটা বিবেক ও কতকটা বৈরাগ্য রূপে ফুটিয়া উঠিবে। সে দেখিবে ঐহিক ও পারত্রিক সুখের কোন মূল্য নাই। সুখের বস্তু, কামনার বস্তু সে বহুবার লাভ করিয়াছে—বহুবার উপভোগ করিয়াছে ; কিন্তু তাহাতে ত প্রকৃত সুখ হয় না, প্রকৃত শান্তি মিলে না। তাহা নশ্বর—এই আসে এই যায়—তাহা মায়ার খেলামাত্র। সে আর তাহা চায় না,সে তখন সেই মায়াতীত, সেই অনশ্বর, সেই নিত্য পদার্থের আকাঙ্ক্ষা করে। যাহা হইতে চ্যুতির সম্ভাবনা নাই,যাহা লাভ হইলে আর কোন লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে না,

সেই পরম পদার্থ লাভের জন্ত তাহার ব্যাকুলতা বৃদ্ধি হইলে সে সাধারণ মনুষ্যের গণ্ডি অতিক্রম করে ও সেই পরম কারুণিক গুরুগণের করুণা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই পরম কারুণিক গুরুগণ, বেদে যাঁহাদিগকে "পরম ঋষি" ও তন্ত্রে যাঁহাদিগকে "পরম গুরু" আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে, সেই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ নির্ব্বাণ লাভ করিয়াও মানবজাতির কল্যাণার্থ নির্ব্বাণের সুখ পরিত্যাগ করিয়া দেহ ধারণ পূর্ব্বক মানব মণ্ডলীর মধ্যেও অবস্থিত রহিয়াছেন। ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ভোগের প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া যদি কাহারও মনে সেই পরম বস্তু লাভের জন্য ব্যাকুলতা হয়, তবে সেই পুণ্যবান্ ব্যক্তি তাহার সেই ব্যাকুলতার ফলে সেই পরম কারুণিক গুরুগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও তাঁহারা তাহাকে বিশেষ বিশেষ অবস্থার মধ্যদিয়া লইয়া যান ও তাহার শক্তির পরীক্ষা করেন ও যাহাতে তাহার চরিত্রে পবিত্রতা, প্রেম, স্বার্থত্যাগ, জীব-হিতৈষণা প্রভৃতি সৎবৃত্তি প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে তাহার সহায়তা করেন। সে এইরূপ গুণালঙ্কৃত হইলে ঋষিদিগের করুণায় সে অধিকারি পদবীতে অধিরোহণ করে। তখন গুরুগণের মধ্যে কোন একজন তাহার মঙ্গলামঙ্গলের ভার গ্রহণ করেন ও তাঁহার তত্ত্বাবধানে তাহার অধিকারিতা সাধন আরম্ভ হয়।

অধিকারি-পদবীতে আরোহণ করিয়া অধিকারীর পূর্ণতা সাধন জন্ত তাহাকে যে যে বিষয়ে সাধনা করিতে হয়, ভক্তিভাজন শ্রীমতী এনি বেশান্ত উল্লিখিত গ্রন্থে তাহার ও সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। সেই সাধনাকে ব্রহ্মবিদ্যাশাস্ত্রে সাধনচতুষ্টয়ের অর্জ্জন করা বলা হইয়া থাকে। সেই সাধনচতুষ্টয় এই :—বিবেক, বৈরাগ্য, ষট্সম্পত্তি ও মুমুক্ষা। ব্রহ্মই নিত্যবস্তু আর সমস্ত অনিত্য এইরূপ জ্ঞানের নাম বিবেক ; ঐহিক বিষয় (স্রক্ চন্দনাদি সুখ সাধনের বস্তু) ও পারত্রিক বিষয় সকল (স্বর্গসুখাদি) কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন ; কর্ম্মক্ষয়ে তাহাদিগের ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী—তাহাদের এইরূপ অনিত্যতা বোধে তাহাদিগের হইতে বিরতির নাম বৈরাগ্য। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা এই ষট্ সম্পদ্ অর্জ্জনের নাম ষট্সম্পত্তি ; অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহের নাম শম, বাহেন্দ্রিয় নিগ্রহের নাম দম, প্রিয়তা ও অপ্রিয়তা বোধ হইতে মনের নিবৃত্তির নাম উপরতি, * শীতোষ্ণাদি ও সুখ

* উপরতি শব্দে হিন্দুশাস্ত্রে বিষয় হইতে মনের উপরমণ অথবা বিহিত কার্য্যের ত্যাগ ও বুঝায়।

দুঃখাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতার নাম তিতিক্ষা, ইষ্টানিষ্ট সকল অবস্থাতে মনের সমচিত্তত্বের নাম সমাধান, গুরু এবং বেদবাক্যে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা; সমস্ত কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া সেই পরম বস্তুর সহিত মিলিত হইবার জন্য ইচ্ছার নাম মুমুক্ষা। এইরূপ সাধন চতুষ্টয় অর্জ্জিত হইলে মানব তখন ব্রহ্মবিদ্যা লাভের অধিকারী হয় ও তখন তাহার গুরুসাক্ষাৎকার ও অভিষেক হয় ও সে ব্রহ্মবিদ্যা সাধনমার্গে অধিরূঢ় হয়।

শ্রীমতী এনি বেশান্ত যাহা কহিয়াছেন, শাস্ত্রেও ঠিক সেইরূপ কথিত আছে যথা—শ্রীমৎ সদানন্দযোগী প্রণীত বেদান্তসার নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে অধিকারি বিচার স্থলে—"অধিকারী তু বিধিবদধীত বেদ বেদাঙ্গ ত্বেনাপাত-তোঽধিগতাখিল বেদার্থোঽস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্যনিষিদ্ধ বর্জ্জন পুরঃসরং নিত্যনৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গত নিখিল কল্মষতয়া নিতান্ত নির্ম্মল স্বান্তঃ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ প্রমাতা।"

ইহার অর্থ এই :—"অধিকারী কে? তদুত্তরে বলিয়াছেন "যিনি বিধিপূর্ব্বক বেদ বেদাঙ্গ অধ্যয়ন দ্বারা আপাততঃ নিখিল বেদার্থ অধিগত করিয়াছেন, যিনি এই জন্মে কিম্বা জন্মান্তরে কাম্য অর্থাৎ স্বর্গাদি ইষ্ট সাধন কর্ম্ম ও নিষিদ্ধ অর্থাৎ নরকাদি অনিষ্ট সাধন কর্ম্ম পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক নিত্য অর্থাৎ যাহার অকরণে প্রত্যবায় আছে এরূপ কার্য্য যথা সন্ধ্যাবন্দনাদি এবং নৈমিত্তিক, অর্থাৎ বৎসর মাসাদি নিয়ম অপেক্ষা না করিয়া যে সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হয় তদনুসঙ্গী কার্য্য যথা পুত্রাদি জন্মিলে জাতেষ্ট্যাদি কার্য্য ও প্রায়শ্চিত্ত ও সগুণ ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা সমস্ত পাপ দূরীভূত করিয়া নিতান্ত নির্ম্মলান্তঃকরণ হইয়া সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়াছেন, তিনিই অধিকারী।

এবম্ভূত অধিকারী সংসারের অসারতা উপলব্ধি করিয়া সংসার হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুকে আশ্রয় করেন যথা—উক্ত বেদান্তসার গ্রন্থে—

"অয়মধিকারী জননমরণাদিসংসারানলসন্তপ্তো দীপ্তশিরা জলরাশি-মিবোপহারপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুমনুসৃত্য তমুপসরতি"

ইহার অর্থ এই—"এবম্ভূত অধিকারী জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি প্রভৃত সঙ্কুল সংসাররূপ অনল হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অদ্ধদগ্ধমস্তক পুরুষ দাহ

নিবৃত্তির জন্য যেমন ঝটিতি শীতল জলরাশিতে প্রবেশ করে, সেইরূপ ব্যাকুলতার সহিত হস্তে সমিদাদি উপহার গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরু প্রাপ্ত হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার শুশ্রূষা করেন।'

ব্রহ্মবিদ্যাশাস্ত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও শ্রীভগবান্ প্রকারান্তরে এই কথাই বলিয়াছেন যথা :

ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।

ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি । ১৮—৬৭

"এই গীতার্থ তত্ত্ব অর্থাৎ এই ব্রহ্মবিদ্যা কখনও তপস্যাবিহীন, অভক্ত অশুশ্রূষু ও আমার প্রতি অসূয়াবান্ কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিবে না।" অর্থাৎ তপস্যা, ভক্তি, গুরুশুশ্রূষা ও মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ আত্মস্বরূপ শ্রীভগবানে অনসূয়া,—এতগুলি উপযোগিতা একাধারে থাকিলে মানব ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হয়। তপস্যা কি তাহা শ্রীভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।

ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাচ শারীরং তপ উচ্যতে ॥

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয় হিতঞ্চ যৎ।

স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥

মনঃপ্রসাদ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।

ভাবসং শুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে ॥ গীতা ১৪শ অঃ (১৪—১৬)

তপস্যা ত্রিবিধ—শারীর, বাচিক ও মানস। দেবদ্বিজ গুরু প্রাজ্ঞদিগের পূজা, শৌচ, ঋজুতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসাকে শারীর তপস্যা কহা হইয়া থাকে। যে বাক্য বলিলে অন্যের উদ্বেগ হইবে না অথচ যাহা সত্য, প্রিয় ও হিতকর এরূপ বাক্য, ও বেদাভ্যাসকে বাঙ্ময় তপঃ কহা হইয়া থাকে। মনের প্রশান্তি (স্বচ্ছতা), সৌম্যত্ব (অক্রূরতা) মৌন (মনঃসংযম পূর্ব্বক বাক্ সংযম) আত্মনিগ্রহ (বিষয় হইতে মনের প্রত্যাহার) ও ভাব সংশুদ্ধিকে (ব্যবহারে অমায়িকতা) মানস তপঃ কথা হইয়া থাকে"

ভক্তি কি তাহাও শ্রীভগবান্ নিজে কহিয়াছেন।

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এবচ।

নির্ম্মমো নিরহংকারঃ সমদুঃখসুখ ক্ষমী।

সন্তুষ্টঃ,সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।

ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি র্যোমদ্ ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ গীতা ১২শ অঃ (১২—১৪)

যাঁহার কাহারও প্রতি দ্বেষ নাই, সর্ব্বভূতের প্রতি যাঁহার মৈত্রী, সর্ব্বভূতের উপর যাঁহার করুণা, যাঁহার কোন বিষয়ের উপর মমত্ব জ্ঞান নাই, যাঁহার কোন প্রকার অহংকার বুদ্ধি নাই, যিনি সর্ব্বদাই সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট, যিনি সমাহিতচিত্ত, যিনি সংযত স্বভাব, যিনি আত্মতত্ব বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয়, যিনি সর্ব্বতোভাবে পুরুষোত্তম আমাতে মনঃ ও বুদ্ধি সমর্পণ করিয়াছেন এতাদৃশ গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিই আমার ভক্ত ও আমার প্রিয়।

শুশ্রূষা সম্বন্ধেও ভগবদ্‌বাক্য এই—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ গীতা ৪—৩৪

তত্ত্বদর্শী আচার্য্যগণকে প্রণিপাত করিয়া তাঁহাদিগের নিকট প্রশ্ন করিয়া ও তাঁহাদিগকে সেই আত্মবুদ্ধিতে সর্ব্বজীবের শুশ্রূষা দ্বারা প্রসাদিত করিয়া তত্ত্বদর্শী আচার্য্যগণ তোমাকে তত্বজ্ঞান উপদেশ করিবেন।

স্বয়ং ব্রহ্মবিদ্যার প্রকাশক শ্রীভগবান্ মানুষী তনু গ্রহণ করিলেও তিনি মানব নহেন; তিনি সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম, কেবল জীবের প্রতি করুণা বশতঃ মনুষ্যদেহ ধারণরূপ ত্যাগের (Sacrifice) অনুষ্ঠান করিয়াছেন। এই প্রকার জ্ঞান যাঁহার নাই তাহার হৃদয়ে বিশ্বপ্রেমের প্রতিবিম্ব পড়িতে পারে না ও তাহার সমস্তই বৃথা হয়। এইজন্য শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্।

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।

রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥

গীতা—৯ (১১।১২)

"আমি সর্ব্বভূতের ঈশ্বর, আমি নিত্য শুদ্ধ মুক্তস্বভাব হইয়াও স্বেচ্ছায় মানুষদেহ ধারণ করি এই পরমতত্ব অবগত না হইয়া মানবদেহধারী আমাকে যাহারা অবজ্ঞা করে, তাহারা বুদ্ধিভ্রংশকারী রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতির অধীন হওয়ায় তাহাদের আশা বিফল, কার্য্য বিফল, জ্ঞান বিফল এবং তাহাদের চিত্তও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে।"

অধিকারী সম্বন্ধে যে সমস্ত সদ্‌গুণের কথা শ্রীভগবান্ গীতায় কহিয়াছেন একটু অনুধাবন করিলে বুঝা যাইবে তাহার অধিকাংশই পূর্ব্বোক্ত সাধন চতুষ্টয়ের অন্তর্ভূত। ভগবান্ কেবল সর্ব্বভূতে মৈত্রী ও করুণা অর্থাৎ বিশ্বহিত ব্রতের ও ভগবদ্‌ভক্তির প্রতি একটু বিশেষ জোর দিয়াছেন।

এক্ষণে দেখা যাউক প্রকৃত তত্ত্বের অধিকারী সম্বন্ধে তন্ত্র কি কহিতেছেন।

অধিকারি পদবীতে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে শিষ্যকে আত্মপ্রযত্নে যে সমস্ত সদ্‌গুণ অর্জ্জন করিবার কথা ব্রহ্মবিদ্যাশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, তন্ত্রও প্রথমতঃ সেই গুলিকে লক্ষ্য করিয়া দীক্ষার পর ইষ্টমন্ত্র চৈতন্যের যে প্রয়াস—প্রকারান্তরে তাহাই অধিকারি মার্গের সাধনা। কিরূপ শিষ্য দীক্ষার অধিকারী? ইহার উত্তরে গৌতমীয় তন্ত্র ও শারদাতিলক বলিতেছেন।

শিষ্যঃ কুলীনঃ শুদ্ধাত্মা পুরুষার্থপরায়ণঃ।
অধীতবেদকুশলঃ পিতৃমাতৃহিতেরতঃ॥
ধর্ম্মবিদ্ ধর্ম্মবর্ত্তাচ গুরুশুশ্রূষণে রতঃ।
সদা শাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো দৃঢ়দেহো দৃঢ়াশয়ঃ।
হিতৈষী প্রাণিনাং নিত্যং পরলোকার্থ-কর্ম্মকৃৎ।
অনিত্যকর্ম্মণস্ত্যাগী নিত্যানুষ্ঠান তৎপরঃ॥
জিতেন্দ্রিয়ো জিতালস্যো জিতমোহা বিমৎসরঃ।
এবম্বিধো ভবেচ্ছিষ্যস্থিতরো গুরুদুঃখদঃ॥ গৌতমীয় তন্ত্র—৫ম অধ্যায়।

শিষ্যঃ কুলীনঃ শুদ্ধাত্মা পুরুষার্থপরায়ণঃ।
অধিতবেদকুশলো দূরমুক্ত মনোভবঃ॥
হিতৈষী প্রাণিণাং নিত্য মাস্তিকস্ত্যক্ত নাস্তিকঃ।
স্বধর্ম্ম-নিরতো ভক্ত্যা পিতৃ-মাতৃ-হিতোদ্যতঃ॥
বাঙ্মনোকায় বসুভি গু‍রু শুশ্রূষণে রতঃ।
এতাদৃশ গুণোপেতঃ শিষ্যো ভবতি নাপরঃ॥ শারদাতিলক—২য় পটল।

ইহার মর্ম্মার্থ এই:—যিনি সদ্‌বংশ জাত, শুদ্ধাত্মা (নিতান্ত নির্ম্মলস্বান্তঃ—বেদান্তসার) ও পুরুষার্থপরায়ণ (ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত—গীতা); যিনি নিখিল বেদ অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে কুশলতা লাভ করিয়াছেন ও যিনি সর্ব্বদা শাস্ত্রার্থতত্ত্ব অবগত আছেন (বিধিবদধীত বেদবেদাঙ্গত্বেনাপাততোঽধিগতাখিল

বেদার্থঃ—বেদান্তসার); যাঁহার চিত্ত হইতে কাম দূরীভূত হইয়াছে, যিনি ধর্ম্মবিদ্ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী ও স্বধর্ম্মনিরত * যিনি দৃঢ়দেহ (শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণু) যিনি দৃঢ়াশয় (তত্ত্বজ্ঞানার্থনিশ্চয়—গীতা) যিনি ভক্তিপূর্ব্বক পিতা মাতার হিতে রত; যিনি সর্ব্বদাই সর্ব্বপ্রাণীর হিতৈষী (অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এবচ—গীতা) যিনি আস্তিক ও যিনি নাস্তিকের সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছেন, (অর্থাৎ যিনি গুরুবেদবাক্যে শ্রদ্ধাবান) যিনি অনিত্য কর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন ও নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন (কাম্যনিষিদ্ধ বর্জ্জন পুরঃসরং ইত্যাদি—বেদান্তসার) যিনি পরলোকের জন্য কর্ম্ম করেন (অর্থাৎ যিনি এখনও সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মত্যাগ করিতে পারেন নাই; কিন্তু যে কর্ম্ম করেন তাহা পরলোকের জন্য এবং যাঁহার কর্ম্ম ও দৃষ্টি স্থূলাতীত-গতি) যিনি ইন্দ্রিয় বিজয় করিয়াছেন (অর্থাৎ যাঁহার শম ও দম অর্জ্জিত হইয়াছে), যিনি আলস্যকে জয় করিয়াছেন ও মোহকে অতিক্রম করিয়াছেন (অর্থাৎ যাঁহার বিবেক উৎপন্ন হইয়াছে); যাঁহার কোন প্রকার মাৎসর্য্য নাই (অর্থাৎ যিনি অনসূয়) ও যিনি সর্ব্বদাই শরীরের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা, মনের দ্বারা ও বিত্তের দ্বারা গুরুর শুশ্রূষায় রত, তিনি (এতগুলি গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিই) শিষ্য। যাহার এই সমস্ত গুণ নাই, সে ব্যক্তি শিষ্য হইবার যোগ্য নহেন;—হইলেও কেবল গুরুর দুঃখদায়ক হইয়া থাকেন।

এইরূপ গুণবিশিষ্ট শিষ্য দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক তন্ত্রোক্ত প্রণালীতে যে সাধনা আরম্ভ করেন, প্রকৃত পক্ষে তাহা অধিকারি মার্গের (Probationary Path) সাধনা; অর্থাৎ সেই সাধনাদ্বারা সাধন চতুষ্টয় অর্জ্জিত ও অধিকারিতার পূর্ণতা সমাধান হইবে। যথা তন্ত্রসারে সিদ্ধিলক্ষণ প্রকরণে—

বৈরাগ্যঞ্চ মুমুক্ষুত্বং ত্যাগিতা সর্ব্ববশ্যতা।
অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যসনং ভোগেচ্ছাপরিবর্জ্জনং॥
সর্ব্বভূতেষ্বনুকম্পা সর্ব্বজ্ঞাদি গুণোদয়ঃ।
ইত্যাদি গুণসম্পত্তি র্মধ্যে সিদ্ধেস্তু লক্ষণম॥

অর্থাৎ বৈরাগ্য, মুমুক্ষুতা, ত্যাগিতা, সর্ব্ববশ্যতা, অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাস, ভোগেচ্ছা পরিবর্জ্জন, সর্ব্বভূতে অনুকম্পা, সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণের উদয় ইত্যাদি গুণসম্পদ্

* গীতায় শ্রীভগবান্ যেরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানের কথা কহিয়াছেন।

সিদ্ধির মধ্যাবস্থার লক্ষণ। সিদ্ধির মধ্যাবস্থা অর্থাৎ এই অবস্থার ভিতর দিয়া সিদ্ধির চরমাবস্থা পরমাত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয়।

ভক্তিভাজন শ্রীমতী এনি বেশান্ত প্রণীত পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে অধিকারি-মার্গে (Probationary Path) সাধনার সময় সাধকের চিত্ত শুদ্ধির ও চিত্তের একাগ্রতা সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে সাধকের কোষ সমূহ মার্জ্জিত হয়; সাধকও স্বপ্নাবস্থায় অনেক বিষয়ের জ্ঞান লাভ করেন ও স্থূল শরীরের নিদ্রাবস্থায় সূক্ষ্মশরীরে অন্য লোকে বিচরণপূর্ব্বক গুরুর নির্দেশ মতে লোকহিতকর বিবিধ কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। তন্ত্রে এই বিষয় পরিস্ফুট ভাবে না থাকিলেও ইহার ইঙ্গিত আছে, বোধ হয় পরিস্ফুট ভাবে বলা উদ্দেশ্য ছিল না বলিয়াই বলা হয় নাই। এ বিষয়ে গৌতমীয় তন্ত্রে দেখিতে পাই—

ততঃ প্রাতঃ সমুত্থায় কৃতনিত্যক্রিয়ো গুরুঃ।
কৃতকৃত্যোঽপি শিষ্যস্তু নিষীদেদ্‌গুরুসন্নিধৌ॥
কথয়েদ্রাত্রি বৃত্তান্তং শুভং বা যদি বাঽশুভং।
সুমঙ্গলীভির্নারীভিঃ সহ সংভোজনং মিথঃ॥
গিরিশৃঙ্গারোহণঞ্চ হস্ত্যশ্বরথারোহণং।
আরোহণং সৌধগেহে দেবোৎসব নিরীক্ষণম্॥
মঙ্গলঞ্চ স্ববামাংশ দর্শনং স্পর্শনং তথা।
মন্ত্র সিদ্ধস্ত লিঙ্গানি প্রোক্তানি তব সুব্রত॥
অনাকুলানি কথয়ে শৃণু নিন্দ্যানি সর্ব্বতঃ।
কৃষ্ণবর্ণৈর্ভটৈঃ স্বপ্নে প্রহারস্তৈল লেপনং॥
বিপ্রাণাং রোষবাদেচ পরস্ত্রীণাং নিষেবনং।
সিদ্ধি বিঘ্নানি চোক্তানি অন্যানি নিন্দিতানি চ॥

অনন্তর গুরু প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া নিত্যক্রিয়াদি সম্পাদন করিবেন। শিষ্যও প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক গুরুর নিকট উপবেশন করিবেন ও তাঁহার নিকট রাত্রির শুভাশুভ বৃত্তান্ত বর্ণন করিবেন। অতিশয় মঙ্গল চিহ্ন-ধারিণী নারীগণের সহিত একান্তে সংভোজন, গিরিশৃঙ্গারোহণ, হস্তী, অশ্ব ও রথে আরোহণ, সৌধগেহে আরোহণ, দেবতাদিগের উৎসব দর্শন, নিজের বামাংশ দর্শন ও স্পর্শন মন্ত্রসিদ্ধি হইবার পক্ষে শুভ চিহ্ন। কৃষ্ণবর্ণ ভট

কর্ত্তৃক প্রহার, শরীরে তৈললেপন, ব্রাহ্মণগণের প্রতি সক্রোধ বাক্য প্রয়োগ, পরস্ত্রী নিষেবণ ইত্যাদি মন্ত্রসিদ্ধির বিঘ্নকর অশুভ চিহ্ন। এই সকল চিহ্ন শিষ্যের অব্যক্ত অথচ মহত্তর প্রজ্ঞা Subliminal selfএর অবস্থা ও গতি ইঙ্গিতে নির্দ্দেশ করে। এতদ্দ্বারা তাহার আভ্যন্তরীণ অবস্থা স্থিরীকৃত করিতে পারা যায়।

সাধনা করিতে করিতে নিত্যবস্তু লাভের জন্য যখন ব্যাকুলতা হয় তখন গুরুর করুণা হয়। গুরুর করুণা না হইলে অধিকারিতার পূর্ণতা হয় না ও তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয় না।

যাবন্ন গুরুকারুণ্যং তাবৎ তত্ত্বকথা কুতঃ? কুলার্ণব।

কিন্তু এ গুরু কে? ইনি সাধারণ মানব গুরু নহেন। রাত্রিশেষে নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্রই যে গুরুদেবের ধ্যান করা তন্ত্রশাস্ত্রের আদেশ, "ধ্যায়েৎ শিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুং" ইত্যাদি মন্ত্রে যাঁহার ধ্যান করিতে হয় সেই নরাকৃতি পরব্রহ্ম, সেই মানব ও ভগবানের সন্ধিস্থল ও সম্বন্ধস্থাপক, সেই পরম কারুণিক পুরুষ যাঁহার করুণা অনুক্ষণ জগৎকে প্লাবিত করিতেছে বলিয়া তন্ত্রে যাঁহাকে সর্ব্বদাই সুপ্রসন্ন স্মেরানন ও সাধকের অভীষ্টদায়ক বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন সেই পরম পুরুষই সেই গুরু *।

গুরুর করুণা লাভের দ্বারা অধিকারিতার পূর্ণতা সাধন হইলে অধিকারীর যে অবস্থা হয় গান্ধর্ব্ব তন্ত্রে তাহা সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছেন।

আস্তিকোঽথ শুচির্দ্দান্তো দ্বৈতহীনো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ব্রহ্মিষ্ঠো ব্রহ্মবাদী চ ব্রহ্মী ব্রহ্মপরায়ণঃ॥
সর্ব্ব হিংসা বিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্ব প্রাণি হিতেরতঃ।
সোঽস্মিন্ শাস্ত্রেঽধিকারী স্যাৎ তদন্যো ভ্রমসাধকঃ॥

যিনি আস্তিক অর্থাৎ শাস্ত্রবাক্যে, গুরুতে ও পরতত্ত্বে যাঁহার শ্রদ্ধা অচলা, যিনি শুচি অর্থাৎ যিনি সর্ব্বদা বাহ্য ও আভ্যন্তর সর্ব্বপ্রকার শৌচসম্পন্ন, এবং যাঁহার

---

* যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন করেন তাঁহারা জানেন তন্ত্রোক্ত এই গুরু গুরুআশ্রমের মহর্ষি সম্প্রদায়ের আদর্শ। প্রবন্ধান্তরে এই বিষয় বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইবে।

উপাধি সকল সুগঠিত হওয়ায় নির্ম্মল এবং সত্ত্বগুণ প্রবল, যিনি দান্ত অর্থাৎ দমগুণযুক্ত, যাহার উপাধি সকল অন্তস্থিত প্রজ্ঞার বশে নীত যিনি দ্বৈতহীন অর্থাৎ "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" এইজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে, যিনি জিতেন্দ্রিয় অর্থাৎ শমাদি গুণসম্পন্ন, যিনি ব্রহ্মিষ্ঠ অর্থাৎ যিনি বহুপরিমাণে অর্থাৎ সর্ব্বক্ষণ ব্রহ্মতেই অবস্থান করিতেছেন, যিনি ব্রহ্ম-বাদী অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের কথা ভিন্ন যিনি অন্য কথা বলেন না, যিনি ব্রহ্মী অর্থাৎ যাঁহার সর্ব্বস্ব ধনই ব্রহ্ম, যিনি ব্রহ্মপরায়ণ অর্থাৎ ব্রহ্মই যাঁহার পরমগতি এইরূপ সর্ব্বতোভাবে ব্রহ্মনিষ্ঠ, যিনি হিংসা বিনির্ম্মুক্ত ও সর্ব্ব প্রাণি হিতে রত,তিনিই এই তন্ত্রশাস্ত্রের অধিকারী; অন্য যে সমস্ত সাধক তাহারা ভ্রমসাধক। উপরে অধিকারিতার পূর্ব্বাবস্থা, অধিকারিতার সাধনাবস্থা ও অধিকারিতার পরিপাক অবস্থাত্রয়ে সাধকের যে যে গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে,পাঠক দেখিবেন তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রাণি-হিতৈষণা একটি অপরিহার্য্য গুণ বটে। তান্ত্রিক সাধক জানেন যে পরিমাণে তিনি বিশ্বহিতব্রত সাধন করিতে পারিবেন, সেই পরিমাণে সেই বিশ্বাত্মা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন; যথা মহানির্ব্বাণতন্ত্রে পরমগুরু শ্রীসদাশিব কহিতেছেন :—

> তুষ্টে বিশ্বহিতে দেবি বিশ্বেশঃ পরমেশ্বরি।
> প্রীতো ভবতি বিশ্বাত্মা যতো বিশ্বং তদাশ্রয়ম্ ॥

হে দেবি, হে পরমেশ্বরি, বিশ্বহিত সাধন করিতে পারিলে বিশ্বের আত্মা বিশ্বেশ্বর প্রীত হয়েন, কেন না বিশ্ব তাঁহাতেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে।

তান্ত্রিক সাধক জানেন সেই পরম দেবতা, জীবের মঙ্গল সাধন জন্য বিশ্বময় মহামঙ্গলব্রত অনুষ্ঠান করিয়া বসিয়া আছেন, যে সেই বিশ্বমঙ্গল ব্রতে যোগ দান করিতে পারিবে সেই ধন্য, সেই কৃতকৃত্য। তাই তন্ত্রের শাসন, সর্ব্বপ্রাণি হিতে রত হও; নতুবা অধিকারিত্বের দ্বারোদ্ঘাটিত হইবে না।

তাই জিজ্ঞাসা করি যে শাস্ত্রের অধিকারী হইতে হইলে সর্ব্বপ্রাণিহিতেরত ও ব্রহ্মিষ্ঠ, ব্রহ্মবাদী, ব্রহ্মী ও ব্রহ্মপরায়ণ হইতে হয়, সে শাস্ত্র ব্রহ্মবিদ্যা নহে ত কোন্ শাস্ত্র ব্রহ্মবিদ্যা? ওঁ নমঃ পরম ঋষিভ্যঃ ওঁ নমঃ পরম ঋষিভ্যঃ ওঁ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য।

হিন্দুর শ্রাদ্ধতত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

শ্রাদ্ধের মন্ত্র আলোচনা করিলে আর্য্যদের সূক্ষ্মদর্শিতা ও অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। উপচার সামগ্রীর নির্ব্বাচন, অনুকূল স্থান ও কালের নির্দ্ধারণ এবং ক্রিয়া প্রণালী প্রভৃতির বিচার করিলে, তাঁহাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ করিবার অবসর থাকে না, ও আমাদের নিজের প্রতীতি ও উপলব্ধি সম্বন্ধে অনুমান ও প্রমাণেরও অভাব হয় না। শ্রাদ্ধমন্ত্র সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিলে তাহাতে অনেকগুলি বিষয়ের উল্লেখ ও মীমাংসা দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয় কয়েকটি বিচারার্থ নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

১। শ্রাদ্ধের পূর্ব্ব দিবসে কর্ম্মীকে কিরূপ অবস্থায় থাকিতে বা কি প্রকারে কাল হরণ করিতে হয়।

২। যাজ্ঞিক বা কর্ম্মকারয়িতৃ ব্রাহ্মণ নির্ব্বাচন।

৩। পিতৃপুরুষদিগের আবাহন।

৪। শ্রাদ্ধের উপচার সামগ্রী।

৫। শ্রাদ্ধ কাল।

৬। শ্রাদ্ধ স্থান।

৭। শ্রাদ্ধমন্ত্র হইতে অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান নিরূপণ।

(১) শ্রাদ্ধের পূর্ব্ব দিনে শরীর বা মনের বিকার উপস্থিত হয় এরূপ কার্য্য হইতে কর্ম্মীকে বিরত থাকিতে হইবে। তিনি মিথ্যাকথন, ক্রোধ প্রকাশ বা স্ত্রী-সঙ্গ করিতে পারিবেন না। দুগ্ধ, ফল ইত্যাদি লঘু ও সাত্ত্বিক আহার করিতে হইবে। মৎস্য, মাংস, মদিরা প্রভৃতি সেবন করিতে পারিবেন না, নিরামিষ ভোজন ও মৈথুন বর্জ্জন নিতান্ত আবশ্যক। মৈথুন অষ্টবিধ যথা :—

স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুপ্তভাষণং।
সংকল্পোধ্যাবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তি রেবচ॥

শরীর পরিচ্ছন্ন ও মন পবিত্র রাখিতে হইবে। অন্তর্ব্বাহ্য শুচি আবশ্যক,। শৌচ দুই প্রকার যথা :—

"শৌচঞ্চ দ্বিবিধং দেবি বাহ্যাভ্যন্তর ভেদতঃ।
ব্রহ্মণ্যাত্মার্পণং যত্তৎ শৌচমান্তরিকং স্মৃতম্ ॥"
"অদ্ভির্ব্বা ভস্মনা বাপি মলানামপকর্ষণম্
দেহ শুদ্ধির্ভবেদ্ যেন বহিঃ শৌচং তদুচ্যতে ॥". মহানির্ব্বাণ তন্ত্রম্।

দেবি! বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে শৌচ দুই প্রকার। ব্রহ্মে আত্মসমর্পণ করাকে আন্তরিক শৌচ বলিয়া থাকে। আর জল বা ভস্ম দ্বারা মলাপনয়ন পূর্ব্বক যে দেহ শুদ্ধি করা হয়, তাহাকে বহিঃশৌচ বলা যায়। মনের পবিত্রতাই শুদ্ধাচার। যথা—

"কিমত্র বহুনোক্তেন শৌচাশৌচবিধৌ শিবে।
মনঃ পূতং ভবেদ যেন গৃহস্থ স্তত্তদাচরেৎ ॥" মহানির্ব্বাণ তন্ত্রম্।

শিবে! এই শৌচাশৌচ বিষয়ে আর কি বলিব, যাহাতে মন পূত হয়, গৃহস্থগণ সেইরূপ আচরণ করিবে।

বহু ভ্রমণ দ্বারা শরীরকে ক্লিষ্ট, তর্ক ও অযথা কথোপকথনে মনকে বিক্ষুব্ধ করিতে পারিবে না। বিশুদ্ধভাবে ভগবচ্চিন্তায় রত থাকিতে হইবে এবং পর দিনের অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের জন্য বিনীত ভাবে ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে। এখন দেখা যাইতেছে যে সংযত মনে অকলঙ্কিত দেহে বাহ্যাভ্যন্তর উভয়বিধ শুচি লক্ষ্য করিয়া শ্রাদ্ধের পূর্ব্ব-কাল যাপন করিতে হয়। সাত্ত্বিক আহার, সদাচার ও কঠোর ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা শরীরকে মনের আয়ত্তাধীন করিতে হয়। এবং ভগবচ্চিন্তা ভগবৎ স্মরণ, কীর্ত্তন ইত্যাদির দ্বারা মনকে সংযত করিয়া অন্তর্ম্মুখী করিতে হয়। অন্তর্নিবিষ্ট মনই সূক্ষ্মজগতে বিচরণ করিতে পারে, এই জন্য মনু শ্রাদ্ধকার্য্যে শুদ্ধভাব, শান্তভাব, ও ধৈর্য্যভাব প্রশস্ত বলিয়াছেন; যথা—

"ত্রীনি চাত্র প্রশংসন্তি শৌচম ক্রোধম ত্বরাং"।

'পূজা প্রভৃতি প্রত্যেক মাঙ্গলিক কার্য্যে হিন্দুর ভূতশুদ্ধি নামে একটি বিধির অনুসরণ অনিবার্য্য বলিয়া উক্ত আছে। শৌচ ও সদাচার ব্যতি-রেকে ভূতশুদ্ধি সিদ্ধ হয় না। আমরা পূর্ব্বে যে নিয়ম ও সংযমের উল্লেখ করিয়াছি তাহা প্রতিপালন না করিলে ভূতশুদ্ধি লাভ হয় না এবং ইহা না লাভ হইলেও অন্তর্জগৎ প্রবেশ করিবার ক্ষমতাও জন্মায় না। এই

ভূতশুদ্ধি বিশেষ রহস্য পরিপূর্ণ এবং ইহার অনুষ্ঠানও বহু আয়াসসাধ্য। আমরা এস্থলে ইহার কিঞ্চিন্মাত্র আভাস দিলাম। ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রভৃতির সহিত পৃথিবী তত্ত্বকে অপতত্ত্বে লীন করিতে হইবে। এইরূপ পর পর তত্ত্বের লয় সাধন করার নামই ভূতশুদ্ধি। এইরূপে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের লয় করিতে পারিলে জীব পাপদেহ হইতে মুক্ত হইয়া পুণ্যদেহ লাভ করে—জরা মরণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়, অমরত্ব লাভ করে।

সংক্ষিপ্য পূরয়েত্তেন বায়ুং ষোড়শ মাত্রয়া।

তেন পাপাত্মকং দেহং শোষয়েৎ সাধকাগ্রণীঃ॥ মহানির্ব্বাণ তন্ত্রম।

সাধকশ্রেষ্ঠ যথাবিধি প্রাণায়াম দ্বারা পাপময় দেহ পবিশুদ্ধ ও শুষ্ক হইয়াছে এইরূপ ভাবনা করিবে। তদনন্তর :—

"আপাদশীর্ষ পর্য্যন্তম্ আপ্লাব্য তদনন্তরম।

উৎপন্নং ভাবয়েদ্দেহং নবীনং দেবতাময়ং॥ মহানির্ব্বাণ তন্ত্রম্।

আপাদ মস্তক পর্য্যন্ত অমৃতবারি দ্বারা আপ্লাবিত করিয়া নূতন দিব্য শরীর উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ ভাবনা করিবে। এইরূপ ভাবনা করিতে হইলে মনের একাগ্রতা সাধন চাই। মনের উৎসর্পিণী শক্তির সাহায্যে বাহ্য জগৎ অতিক্রম করিয়া অন্তর্জগতে প্রবেশ করিতে হইবে। যিনি এ কার্য্যে কৃতকার্য্য হন, তিনি অন্তর্জগৎ মধ্যে যথেচ্ছা বিচরণ ও তাহার রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে সক্ষম হন। সাধু শ্রাদ্ধকর্ত্তা মনোবলে এ কার্য্য সম্পন্ন করেন এবং জড়োপাধি রহিত মৃতাত্মার সহিত অনায়াসে নিজের সম্বন্ধ স্থাপন করেন।

(২) যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ নির্ব্বাচন।

কিরূপ ব্রাহ্মণ আমন্ত্রণ করা উচিত তৎসম্বন্ধে ভগবান্ মনু এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"বিদ্যাতপঃ সমৃদ্ধেষু হুতং বিপ্রমুখাগ্নিষু।

নিস্তারয়তি দুর্গাচ্চ মহতশ্চৈব কিল্বিষাৎ॥ ৩য় অঃ ৯৮।

জ্ঞানোৎকৃষ্টায় দেয়ানি কব্যানি চ হবীংষি চ।

নহি হস্তাব সৃগ্‌দিগ্ধৌ রুধিরেণৈব শুদ্ধতঃ॥ ২য় অঃ ১৩২।

জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বিজাঃ কেচিৎ তপোনিষ্ঠাস্তথা পরে।

তপঃ স্বাধ্যায় নিষ্ঠাশ্চ কর্ম্মনিষ্ঠা স্তথাপরে॥ ৩য় অঃ ১৩৪।

জ্ঞাননিষ্ঠেষু কব্যানি প্রতিষ্ঠাপ্যানি যত্নতঃ।
হব্যানি তু যথা ন্যায়ং সর্ব্বেষেব চতুর্ষ্বপি॥ ৩য় অঃ ১৩৫।

বিদ্যা, তপঃ, ও তেজঃসম্পন্ন ব্রাহ্মণের মুখাগ্নিতে যে গৃহী হোম করেন, সেই হোম তাঁহাকে দুস্তরব্যাধি শত্রু ও রাজপীড়াদি ভয় ও মহৎ পাপ হইতে পরিত্রাণ করে; দেব ও পিতৃ উদ্দেশে হব্যকব্যাদি জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণকেই প্রদান করা কর্ত্তব্য।

কোন দ্বিজ জ্ঞাননিষ্ঠ, কেহ বা তপস্যা ও অধ্যয়ননিষ্ঠ, কতকগুলি বা যাগাদিনিষ্ঠ হন। আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে প্রযত্ন সহকারে কব্যান্ন প্রদান করিবে। আর হব্যান্ন পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ জ্ঞানী লোককেই ন্যায়ানুসারে দেওয়া যাইতে পারে।

কিরূপ ব্রাহ্মণ এরূপ কার্য্যে পরিহার করা উচিত, তৎ সম্বন্ধে মনু এই রূপ বলিয়াছেন:—

"যে স্তেন পতিত ক্লীবা যে চ নাস্তিক বৃত্তয়ঃ।
তান্ হব্যাকব্যয়োর্বিপ্রাননর্হান্মনুরব্রবীৎ॥ ৩য় অঃ ১৫০।
জটিলঞ্চানধীয়ানং দুর্ব্বলং কিতবস্তথা।
যাজয়ন্তি চ যে পূগাংস্তাংশ্চ শ্রাদ্ধে ন ভোজয়েৎ॥" ৩য় অঃ ১৫১।
চিকিৎসকান্ দেবলকান্ মাংস বিক্রয়িণ স্তথা।
বিপণেন চ জীবন্তো বর্জ্যাঃ স্যুর্হব্যকব্যয়োঃ॥ ৩য় অঃ ১৫২।
প্রেষ্যো গ্রামস্য রাজ্ঞশ্চ কুনখী শ্যাবদন্তকঃ।
প্রতিরোদ্ধা গুরোশ্চৈব ত্যক্তাগ্নির্বার্দ্ধুষিস্তথা॥ ৩য় অঃ ১৫৩।
যক্ষ্মী চ পশুপালশ্চ পরিবেত্তা নিরাকৃতিঃ।
ব্রহ্মদ্বিট্ পরিবিত্তিশ্চ গণাভ্যন্তর এব চ॥ ৩য় অঃ ১৫৪।
কুশীলবোহবকীর্ণী চ বৃষলী পতিরেব চ।
পৌনর্ভবশ্চ কাণশ্চ যস্য চোপ পতির্গৃহে॥ ৩য় অঃ ১৫৫।
"ভৃতকাধ্যাপকো যশ্চ ভৃতকাধ্যাপিতস্তথা।
শূদ্রশিষ্যো গুরুশ্চৈব বাগ্দুষ্টঃ কুণ্ডগোলকৌ॥ ৩য় অঃ ১৫৬।
অকারণ পরিত্যক্তা মাতা পিত্রোর্গুরোস্তথা।
ব্রাহ্মৈর্যৌনৈশ্চ সম্বন্ধৈঃ সংযোগং পতিতৈর্গতঃ॥ ৩য় অঃ ১৫৭।

আগারদাহী গরদঃ কুণ্ডাশী সোমবিক্রয়ী।
সমুদ্রযায়ী বন্দীচ তৈলিকঃ কূটকারকঃ॥ ৩য় অঃ ১৫৮।
পিত্রা বিবদমানশ্চ কিতবো মদ্যপস্তথা।
পাপরোগ্যভিশস্তশ্চ দাম্ভিকো রসবিক্রয়ী॥ ৩য় অঃ ১৫৯।
ধনুঃ শরাণাং কর্ত্তা চ যশ্চাগ্রেদিধিষুপতিঃ।
মিত্রধ্রুক্ দ্যূতবৃত্তিশ্চ পুত্রাচার্য্যস্তথৈব চ॥ ৩য় অঃ ১৬০।
ভ্রামরী গণ্ডমালী চ শ্বিত্র্যথো পিশুনস্তথা।
উন্মত্তোঽন্ধশ্চ বর্জ্জ্যাঃ স্যুর্বেদনিন্দক এব চ॥ ৩য় অঃ ১৬১।
হস্তিগোঽশ্বোষ্ট্রদমকো নক্ষত্রৈর্যশ্চ জীবতি।
পক্ষিণাং পোষকো যশ্চ যুদ্ধাচার্য্যস্তথৈব চ॥ ৩য় অঃ ১৬২।
ব্রাহ্মণ স্বনধীয়ানস্তৃণাগ্নিরিব শাম্যতি।
তস্মৈ হব্যং ন দাতব্যং নহি ভস্মানি হূয়তে॥ ৩য় অঃ ১৬৮।

"চোর, মহাপাতকী, নপুংসক, নাস্তিক এবম্বিধ ব্রাহ্মণ দৈব ও পিতৃকার্য্যে মনুর মতে অগ্রাহ্য। জটিল, বেদাধ্যয়নশূন্য, লোহিতকেশ, দ্যূতপরায়ণ, এবং বহু যাজনশীল ইহাদিগকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না। চিকিৎসক, প্রতিমাপরিচারক, মাংসবিক্রেতা, এবং বাণিজ্যকারী ইহাদিগকে হব্য কব্যে পরিবর্জ্জন করিবে। গ্রামবাসী বা রাজবেতনভোগী, কুৎসিৎ নখরোগবিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ দন্তবিশিষ্ট, গুরুর প্রতিকূলাচারী, স্মৃত্যুক্ত অগ্নিত্যাগী, নৃত্য-গীত ব্যবসায়ী ইহাদিগকে হব্য কব্যে পরিত্যাগ করিবে। যক্ষ্মারোগী, পশুপালক, পরিবেত্তা, ও পরিবেত্তী, পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান রহিত, ব্রাহ্মণদ্বেষ্টা, অন্যদেয় দ্রব্য স্বয়ং গ্রহণকারী ইহাদিগকে হব্য কব্যে ভোজন করাইবে না। নট, অবকীর্ণি, শূদ্রাপতি, পুনর্ভূপুত্র, কান, এবং ব্যভিচারিণীর স্বামী ইহাদিগকে হব্য কব্যে নিমন্ত্রণ করিবে না। বেতন গ্রাহী, অধ্যাপক অথবা যে শিষ্য অধ্যাপকের নিকট অর্থ লইয়া অধ্যয়ন করে, শূদ্রশিষ্য, শূদ্রের অধ্যাপক, পুরুষভাষী, কুণ্ড ও গোলক, যে অকারণ পিতামাতা ও গুরুকে ত্যাগ করিয়াছে, পতিত লোকের সহিত অধ্যয়ন ও আদান প্রদান সম্বন্ধে মিলিত, গৃহদাহী, বিষদাতা, কুণ্ডান্নভোজী, সোমলতা বিক্রয়ী, সমুদ্রযাত্রী, বৈতালীক, তৈলীক ও যে ব্যক্তি

শিক্ষা দিয়া মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়ায়। পিতার সহিত কলহকারী, কিতব, সুরাপায়ী, কুষ্ঠী, অভিশপ্ত, দাম্ভিক, ও রসবিক্রয়ী এই সকল ব্যক্তিকেও হব্য কব্যে ভোজন করাইবে না। ধনুঃশর নির্ম্মাতা, অগ্রেদিধিষুপতি, মিত্রের অপকারক, দ্যূতজীবি, ও পুত্রের নিকট বেদাধ্যায়ী, অপস্মারী গণ্ডমালা, শ্বিত্ররোগী, পিশুন, উন্মত্ত, অন্ধ, ও বেদনিন্দুক ইহাদিগকে বর্জ্জন করিবে। হস্তী, অশ্ব, গো, ও উষ্ট্রের বিক্রেতা, গ্রহ ও নক্ষত্রগণোপজীবি, পক্ষিপালক, ও ধনুর্বিদ্যার অধ্যাপক। তৃণাগ্নিতে ঘৃতদ্বারা হোম করিলে যেমন অগ্নি সত্বরেই নির্ব্বাণ হইয়া যায়, অনধীতবেদ ব্রাহ্মণকে হব্য কব্যে ভোজন করাইলেও তদ্রূপ নিস্ফল হয়। যেহেতু কেহই ভস্মে ঘৃত প্রক্ষেপ করিয়া হোম করেন না।”

এখন স্পষ্ট দেখা গেল যে কিরূপ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত ও আমন্ত্রণ করা উচিত। যিনি যতি অর্থাৎ যাঁহার মন সংযত হইয়াছে এরূপ ব্রাহ্মণের নির্ব্বাচন আবশ্যক। তিনি ব্রহ্মচারী হইতে পারেন কিম্বা পবিত্র স্বভাব ও সদাচাররত গৃহস্থ হইলেও চলিতে পারে।

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ নির্ব্বাচনে এত কঠিন বিধি ব্যবস্থা কেন তাহার উদ্দেশ্য ও হেতু স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। যাঁহারা মেসমেরিজিম ক্রিয়া সন্দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে মেস্‌ম্যারাইজার অর্থাৎ যিনি এই কার্য্যের অনুষ্ঠাতা অর্থাৎ কার্য্যকারক তাঁহার মানসিক শক্তি প্রবল, ও যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া এই কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় তাঁহার চিত্ত স্থির হওয়া চাই; এক দিকে মানসিক শক্ত্যাধিক্য, অপর দিকে সেই শক্তির কার্য্যকারিতার সৌকর্য্যার্থে স্থৈর্য্যভাব আবশ্যক। এই উভয় অবস্থার উপর শক্তি সঞ্চার সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। শ্রাদ্ধকার্য্যে এরূপ শক্তি সঞ্চারের যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে। পূর্ব্বে আমরা কর্ম্মীর প্রশান্ত চিত্তের কথা উল্লেখ করিয়াছি। এখন কর্ম্মকারয়িত্রিক ব্রাহ্মণের শক্তি সামর্থ্যের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কর্ম্মকারয়িত্রিক ব্রাহ্মণের শক্তি-সামর্থ্যের কথা উল্লিখিত হইতেছে। কর্ম্মকারয়িত্রিক ব্রাহ্মণ শক্তিশালী পুরুষ হওয়া চাই। হিন্দুর কর্ম্মানুষ্ঠানে যে যে বিশেষ মন্ত্র ব্যবহৃত হয় সেই মন্ত্রের ভিতর তত্তৎ কার্য্যোপযোগী শক্তি নিহিত আছে—সুতরাং

বিশেষ বিশেষ কার্য্যোদ্দেশে ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র প্রয়োগের সামর্থ্য কর্ম্মকারয়িত্রিক ব্রাহ্মণের থাকা আবশ্যক। শ্রাদ্ধ ব্যাপার সূক্ষ্ম ও স্থূল জগতের সম্মিলন ক্ষেত্র। বিশেষ শক্তি প্রয়োগ দ্বারা এই সম্মিলন সাধিত হইয়া থাকে। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ এই উভয় ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে উপস্থাপিত থাকিয়া এই কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া থাকেন। তিনি এই উভয় ক্ষেত্রের যোজক স্বরূপ। সুতরাং তাঁহার উপর এই কার্য্যের শুভাশুভ ফলাফল সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। তজ্জন্য তাঁহার নির্ব্বাচন সম্বন্ধে এত কঠোর ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এরূপ ব্রাহ্মণের অসদ্ভাব সম্ভাবনায় শাস্ত্রে কুশময় ব্রাহ্মণের ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে যথা :—

ব্রাহ্মণো সম্পত্তৌ কৃত্বা দর্ভময়ান্ দ্বিজান্।
শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানেন পশ্চাদ্বিপ্রেষু দাপয়েৎ॥ ইতি শ্রাদ্ধ সূত্রভাষা।

অধুনা উপযুক্ত ব্রাহ্মণের অভাব বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। শ্রাদ্ধকার্য্যে কিরূপ ব্রাহ্মণের আমন্ত্রণ কর্ত্তব্য দেখুন। আমন্ত্রণ নিয়ম যথা:—

"অক্রোধনৈঃ শৌচপরৈঃ সততং ব্রহ্মচারিভিঃ।
ভবিতব্যং ভবদ্ভিশ্চ ময়াত্র শ্রাদ্ধ কর্ম্মণি॥"

ব্রাহ্মণ দেবতাস্বরূপ। কিরূপ লক্ষণাক্রান্ত ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে দেবতা হইবার উপযুক্ত তাহা ভগবান মনু এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অক্রোধিনান্ সপ্রসাদান বদন্ত্যেতান্ পুরাতনান্।
লোকস্যায়নে যুক্তান্ শ্রাদ্ধদেবান দ্বিজোত্তমান্" ৩য় অঃ ২১৩।

ক্রোধশূন্য প্রসন্নবদন, সৃষ্টির অনাদিত্ব প্রযুক্ত পুরাতন, এবং প্রজা বৃদ্ধার্থে যত্নশীলদিগকে শ্রাদ্ধের পাত্রভূত মন্বাদি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।　　　　(ক্রমশঃ)

শ্রীভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিশু-যোগী।

[বসুরহাটের রাজপথে একটি বালকমূর্ত্তি প্রায়শঃ নয়নপথে পতিত হয়। মূর্ত্তিটি সম্পূর্ণ উলঙ্গ, কাহারও সহিত কখনও কোন কথা কহে না, প্রায়ই হাস্য-বদন, কচিৎ রোদন-পর। শীতাগমে কেহ তাহার গাত্রে বসন পরাইয়া দিলে, বালক শীতের সামান্য হ্রাস হইলেই তাহা ফেলিয়া দেয়। একপাত্রে কুকুরের সহিত অন্নগ্রহণ করিতে কখনও কুণ্ঠিত হয় না; যখন বসিয়া থাকে তখন পদ্মাসন বা হংসাসন গ্রহণ করে। সংসারের যাবতীয় সুখ দুঃখ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কেহ কেহ এই বালককে মায়ামুক্ত পুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করেন, কেহ বা জড়ভাবাপন্ন জীব (idiotic) বলিয়া উপেক্ষা করেন। আমার নিকট এই শিশুমূর্ত্তি এক বিষম সমস্যা। ক্ষমতা থাকিলে ইহার প্রতি-মূর্ত্তি পাঠাইতাম।]

[যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ব বর্ণ দীর্ঘ উচ্চারিত হইবে।]

১

ধূলি-ধূসরিত উলঙ্গ কায়
রাজ-পথ দিয়ে কে গো ওই যায়
মানব-শিশুর মূরতি ধরি'?
স্বপন-বিভোর যুগল নয়ন,
মুখে নাহি সরে বারেক বচন,
কি জানি কোথা রে করিছে গমন
আপনার ভাবে মগন, মরি!
জনক জননী ছিল নাকি তা'র?
কেহ ত জানে না কাহার কুমার,
কোথা হ'তে এল কেমন করি'!
অম্বর হ'তে খসিল কি তারা?
বাঁধিল কি তা'রে নর-দেহ-কারা?
তাই কি ত্রিদিব কিরণের ধারা
এখনো নয়নে পড়িছে ঝরি'?

ধূলি-ধূসরিত উলঙ্গ কায়
রাজপথ দিয়ে কেগো ওই ধায়
　　　মানব শিশুর মূরতি ধরি' ?

২

যখন গগনে গরজে গভীর
জলদ, দামিনী চমকে অধীর,
　　　ঘন ঘন ঘোর বরজ হাঁকে,
জল-ধারা পশে ভবন-ভিতরে,
জলধারা ঝরে ভুবন উপরে,
তখনো ফেরিবে রাজ-পথ'পরে
　　　ভয়-হীন চিত বালক থাকে।
উদ্দাম-মতি প্রকৃতি বালার
পাগলিনী পারা দুলে কেশভার,
কল-কল্লোলে লুটে বারবার
　　　তরঙ্গময়ী তটিনী পায়,
দেখিবে তখন দাঁড়াইয়া কুলে
উল্লাস-ভরা আঁখি দুটি তুলে'
　　　চেয়ে আছে শিশু গগন-গায়।
নিবিড় তিমির কিরণে উজলি'
নভ-কোলে যবে চমকে বিজলি,
বালক তখন দিয়ে করতালি
　　　হাহারবে তুলে হাসির রোল,
কপট কোপেতে কষায় লোচন
ভ্রূকুটি-কুটিল মায়ের বদন
যেন রে নেহারি' নির্ভয় মন
　　　হাসি' শিশু চায় জননী-কোল।
অমনি করুণা-বিগলিত মন

লুকায় প্রকৃতি মূরতি ভীষণ,
স্নেহ-নির্ঝর উথলে কেমন,
ধরে শিশু-মুখে পীযূষ মরি !
ধূলি ধূসরিত উলঙ্গ কায়
রাজপথ দিয়ে কেগো ওই যায়
মানব-শিশুর মূরতি ধরি' ?

৩

কভু, নিশিশেষে তারা-দীপ যবে
নিভে একে একে নিষ্প্রভ নভে
ঢলে' পড়ে শশী প্রতীচি-বুকে ;
পূরব-গগন-বাতায়ন টুটি'
জবাফুল সম উঠে ধীরে ফুটি'
উষা-সুন্দরী সহাস-মুখে ;
ঘুম-ভাঙ্গা চোখে উষা-সতী চায়,
শষ্পিত মাঠে দেখিবারে পায়
যোগ-নিমগন শিশুর ছবি ;
হংস আসন, শান্ত বদন ;
উষা-মুখ পানে নয়ন লগন ;
যেন রে করিছে একাগ্র মন
উষা-জ্যোতি-পান প্রথম কবি !
নদী, পদতলে, কুলুকুলু গায় ;
মর্ম্মরে তরু পুষ্পিত কায় ;
ভঁয়রো মধুর মধুপ ফুটায়
গুঞ্জরি মরি ! কুসুম-বনে ;
সঙ্গীত-সুর উথলে যত রে,
হাসি তত ফুটে বালক-অধরে,
জগত অতীত স্বপন যেন রে
জমে সে বালক যোগীর মনে !

মধুর প্রভাত, মৃদু সমীরণ,
মাধুরীর স্রোতে ভুবন মগন,
তাহে ছবি সম মূরতি মোহন
　　　　নেহারি' পাশরি মরত মরি !
ধূলি-ধূসরিত উলঙ্গ কায়
রাজপথ পরে ও কে দেখা যায়
　　　　মানব-শিশুর মূরতি ধরি ?

৪

দুপুরে যখন জন-কল্লোল
করম-সাগরে তুলে উতরোল,
　　　　বিষয়-তুফান আকুল করে,
দেখিবে তখন সে সাগর-কূলে
নিষ্ক্রিয় শিশু চাহিয়া অকূলে
　　　　রয়েছে বসিয়া উপেক্ষা ভরে !
কি ভাবিয়া মনে হাসে বা কখন,
বালু-ঘর গড়ি খেলে আনমন,
আনমনে কভু ভাঙ্গে সে ভবন
　　　　খেলা-ছলে তার চরণ দিয়া ;
অপূর্ব্ব সেই খেলা হেরি তা'র
আমাদের এই ভাঙ্গা গড়া ছার,
মায়ার ছলনে খেলা অনিবার
　　　　মনে পড়ে, উঠে চমকি' হিয়া।
ভাবি বুঝি এই যোগীর কুমার
জেনেছে মরম যেন এ খেলার,
　　　　উপহাস তাই করিছে মরি !
ধূলি-ধূসরিত উলঙ্গ কায়
রাজপথে বসি' কে ওই খেলায়
　　　　মানব-শিশুর মূরতি ধরি' ?

৫

সন্ধ্যার কালে সুর-মন্দিরে
ঘণ্টা-রণন বিহরে সমীরে,
ঝাঁঝর কাঁশর নিনাদে ঘোর ;
শঙ্খ-শব্দ উঠে ঘন ঘন,
পূত ধূপ-বাস বহে সমীরণ,
পুরোহিত স্মরি' মায়ের চরণ
করিছে আরতি হইয়ে ভোর ;
হেন কালে হের মন্দির-দ্বারে
মৌন-মূরতি জনতার আড়ে
নিশ্চল যেন প্রতিমা মরি !
ধূলি-ধূসরিত উলঙ্গ কায়
কে দাঁড়ায়ে ওই সন্ধ্যার ছায়
মানব-শিশুর মূরতি ধরি' ?

৬

কেগো ওই শিশু মূরতি যোগীর ?
কেন ধরিয়াছে মানব শরীর
জীবের কামনা বাসনা মদির
মাদকতা যদি না আনে মনে ?
কোথা, কোন কুলে জনম তাহার ?
কি উপাধি, পুন কিবা নাম তা'র ?
বন্ধন মরি ! কাহার সনে ?
নলিনীর দলে সলিল যেমন,
আছে তবু যেন নাহি মিশ্রণ,
দেহ মাঝে চিত তেমতি তা'র ;
ধরাতে নিবসে, ধরা না পরশে,
না মজে ধরার বিষাদ হরষে,
আত্মা যেন রে নাহি তনু-বশে,
আবরণ যেন টুটেছে আর ;

শিশির, নিদাঘ, বরষা তাহার,
সমভাবে কাটে নাহিক বিচার,
তিক্ত, মধুর সকলি আহার,
　　ধূলি-মুঠা সম ধনের মান ;
মুক্ত ক্ষেত্র, বদ্ধ ভবন,
নগন শরীর, ধৌত বসন,
গ্রাম, জনপদ, নির্জ্জন বন,
　　সকলি সমান করয়ে জ্ঞান।
আছে ক্ষুধা তৃষা, তাহে না কাতর,
নাহি যাচে কভু, না খুলে অধর,
দয়া, অকরুণা, সমান আদর,
　　না জানি কি ব্রত সাধিছে মরি!
ধূলি ধূসরিত উলঙ্গ কায়
রাজপথ বাহি' কেগো ওই যায়
　　মানব-শিশুর মূরতি ধরি'?

৭

নীরদে যেমতি রবি ঢাকা রয়,
জড়তাবরণে তেমতি হৃদয় ;
করিছে পূরব জনমের ক্ষয়
　　না করে নূতন করম আর ;
মহান্ শূন্য গগন মতন
স্বচ্ছ শুদ্ধ সূক্ষ্ম চেতন
কর্ম্ম-সূত্র করিতে ছেদন
　　বহে যেন শেষ তনুর ভার ;
শান্ত, সুপ্ত সরসী মতন,
নাহি সংগ্রাম, নাহি আলোড়ন,
মৃদুল বহিছে জীবন-পবন
　　নাহিক ঊর্ম্মি হৃদয়োপরি ;

ধূলি ধূসরিত উলঙ্গ কায়
রাজ-পথ বাহি' কোথা ওই যায়
মানব-শিশুর মূরতি ধরি' ?

শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী

হিন্দুদর্শন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

"যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হতমিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ
সোহয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্য-নাথো হরি॥"

'শিব' বলি শৈবগণ যাঁর উপাসনা করে।
'ব্রহ্ম' বলি বেদান্তীরা সদা যাঁর ধ্যান ধরে॥
বৌদ্ধগণ 'বুদ্ধ' বলি যাঁরে করে পূজন।
নৈয়ায়িক 'কর্ত্তা' বলি করে যাঁরে আরাধন॥
'অর্হৎ' বলিয়া যাঁর জৈনদল করে স্তব।
'কর্ম্ম' বলি মীমাংসক করে যাঁর অনুভব॥
এ তিনলোকের পতি ইনি সেই, সেই হরি।
পূরান সকল বাঞ্ছা তোমাদের দয়া করি॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ৮৭ অধ্যায়ে নিখিলমন্ত্রস্বরূপিণী শ্রুতিগণ স্ব স্ব মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া শ্রীভগবানকে যে স্তব করিয়াছিলেন, তাহাতে অত্যাশ্চর্য্যরূপে ষড়দর্শন-সমন্বয় ও ভক্তিধর্ম্ম বিবৃত হইয়াছে। ঐ সকল শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামী, সনাতন গোস্বামী, জীব গোস্বামী, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও দীপিকা-দীপন যেরূপ পাণ্ডিত্য, উপনিষৎ ও দর্শনশাস্ত্রের গভীর জ্ঞান প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অতীব বিস্ময়কর। সমগ্র উপনিষদাবলী মন্থন করিয়া দর্শন সমন্বয় করা হইয়াছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে অতি অল্পলোকেই তাহা পাঠ করিবার অবসর পাইয়া থাকেন। আজ কাল অনেকেই গীতা পাঠ করেন, কারণ গীতা ক্ষুদ্র গ্রন্থ, গীতার ভাষা অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল ও সামান্য মূল্যেই গীতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু শ্রীভাগবত অতি বিপুল গ্রন্থ, ভাগবতের ভাব কঠিন, ভাগবত ক্লিষ্ট সংস্কৃতে লিখিত এবং উক্ত ব্যাখ্যা সম্বলিত ভাগবত অতি দুর্মূল্য। সে যাহা হউক আমি উক্ত ৮৭ অধ্যায় হইতে ২১ শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া তাহার সরল বঙ্গানুবাদ দিলাম।

"জনিং অসতঃ সতঃমৃতিং উত আত্মনি যে চ ভিদাং
বিপণং ঋতং স্মরন্তি উপদিশন্তি ত আরুপিতৈঃ।
ত্রিগুণময়ঃ পুমানিতি ভিদা যদবোধকৃতা ত্বয়ি
ন ততঃ পরত্র স ভবেৎ অববোধর মে ॥"

এই শ্লোকটির অর্থ পরিস্ফুটভাবে বুঝিতে পারিলে প্রাচ্য দর্শন ও প্রতীচ্য বিজ্ঞান সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে। "র‍্যাডিয়াম্" (Radium) নামক ধাতুর আবিষ্কারের পর হইতে এবং অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের "জড়েরও জীবন আছে" এই তত্ত্ব আবিষ্কার করার পর হইতে হিন্দুদর্শন ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে একসূত্রে গ্রথিত করা সহজসাধ্য হইয়াছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে—Electron = Unit of force = শক্তির চরম দশা। Ion = Unit of matter = পদার্থের চরমাবয়ব। (ক) = Corpuscle = protoplasmic animal cell.

আজ কাল বিজ্ঞান বলিতেছেন—ইলেক্‌ট্রন্ ও আয়োন্ এক বস্তুরই বিভিন্ন প্রকাশ (different manifestation of the same thing)। সাংখ্য-দর্শনের প্রকৃতি বা সত্ত্বরজঃতমগুণকে ইলেক্‌ট্রন্ বলিলে এবং বৈশেষিক দর্শনের জগতের উপাদান পরমাণুকে আয়োন্ বলিলে বিজ্ঞান ও দর্শন মতের কোন বিবাদ থাকে না। যদি প্রকৃতি সৃষ্টিকর্ত্রী হয়েন তাহা হইলে শক্তির সূক্ষ্মাবস্থাই সৃষ্টির উপাদান; আর বৈশেষিক দর্শনের পরমাণু হইতেই যদি জগৎ সৃষ্ট হইয়া থাকে তাহা হইলে পরমাণু পদার্থের সূক্ষ্মাবস্থা।

(ক) One of the elements which appear at the respective poles where a body is subjected to electro-chemical decomposition.

সাংখ্যদর্শনেও আছে সত্ত্বরজতমগুণ মহাণু পদার্থ, অতি সূক্ষ্ম ; সুতরাং অব্যক্ত ও অবিশেষ। এই অবিশেষ হইতে বিশেষ উৎপন্ন হইয়াছে। অবিশেষকে অসৎ বলিলে, অর্থাৎ নামরূপ বর্জ্জিত অতি সূক্ষ্মাবস্থা বা পরমাণু বলিলে, বৈশেষিক বলিবেন এই অসৎ বা পরমাণু হইতেই দ্ব্যণু, ত্রসরেণু প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং উপরোদ্ধৃত ভাগবতের শ্লোকের— "জনিং অসতঃ"এর অর্থ এই যে "অসতঃ জগতঃ জনিং উৎপত্তিং যে বৈশেষিকাদয়" বদন্তি (শ্রীধরস্বামী)—বৈশেষিকাঃ কাণাদাঃ পরমাণ্বাদিষু অসতঃ এব দ্ব্যণুকাদেঃ উৎপত্তিং বদন্তি, তেষাং মতে প্রাগভাবস্য নিমিত্ত কারণত্বাভ্যুপগমাৎ" (দীপিকাদীপনং)। বৈশেষিকদিগের মতে পরমাণু হইতেই জগতের উৎপত্তি। ইহা অসৎ কার্য্যবাদ।

"সৎকার্য্যবাদিনৌ সাংখ্যবেদান্তিনৌ উৎপত্তেঃ পূর্ব্বমপি সূক্ষ্মরূপত্বেন কার্য্যস্য কারণে সত্ত্বমুপগচ্ছন্তি কুলালাদিকারকেণ তু কার্য্যস্য স্থূলতয়া উৎপাদন মাত্রং ক্রিয়ত ইতি" (দীপিকাদীপনং)। সাংখ্য ও বেদান্ত সৎ-কার্য্যবাদী, কার্য্য বা জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে সূক্ষ্মরূপে কারণে প্রবিষ্ট ছিল, তৎপর স্থূলরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। স্ত্রীশক্তি ও পুংশক্তি একত্র অবস্থান করিলে (negative ও positive অণু) তাহাকে অণ্ড বলা যায়। হিরণ্ময় অণ্ড হইতেই অথবা অগ্নিময় বা সুবর্ণময় অণ্ড হইতেই জগতের উৎপত্তি। অণ্ড positive এবং negative দুই ভাগে বিভক্ত হইলেই;ধাতা (ব্রহ্মা) উৎপন্ন হইলেন।

"তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত"—পরমাত্মা সঙ্কল্প করিলেন যে আমি বহু হইয়া জন্মিব, এই সঙ্কল্প হইতে তেজ উৎপন্ন হইল। এই তেজই হিরণ্ময় অণ্ড বা সুবর্ণময় অগ্নিপর্ব্বত,—বা কনল—বা ইলেকট্রন্ (জ্যোতির্বিম্ব)—বা আয়োন্ (কারণ সলিল)। পরমাত্মা ক্ষীরসাগরে যোগ নিদ্রায় শয়ান। দুগ্ধের স্নেহ অংশ যেমন অব্যাকৃত থাকে, কিন্তু অপর অংশ দধি তক্র প্রভৃতিরূপে বিকার প্রাপ্ত হয় ; ক্ষীরসাগরশায়ী ভগবান্ যোগনিদ্রাবলে স্বীয় স্বরূপে অব্যাকৃত অবস্থায় কারণ সলিলের উপর বা জ্যোতির্বিম্বের মধ্যে শয়ান ছিলেন। সঙ্কল্প প্রভাবে কারণ সলিল বা জ্যোতির্বিম্ব বিক্ষুব্ধ হইলে—আন্দোলিত হইলে মহত্তত্ত্বাদি উৎপন্ন হইল। ব্রহ্ম কারণ কার্য্যে অনুপ্রবিষ্ট না হইলে সৃষ্টি হয় না।

বৈশেষিক দর্শনের পরমাণু, বিজ্ঞানের য়্যাটম্ (Atom) অপেক্ষা সূক্ষ্মতর, প্রায় ১৫০ পরমাণু দ্বারা একটী য়্যাটম্ গঠিত হয়। 'র‍্যাডিয়াম (Radium) নামক ধাতু আবিষ্কৃত হওয়ার পর হইতে বৈজ্ঞানিক জগতে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে একটী য়্যাটম্ প্রায় সাত শত ইলেক্ট্রন্ (জ্যোতির্বিম্ব) সমষ্টি। সুতরাং একটী পরমাণু প্রায় পাঁচটী জ্যোতির্বিম্ব সমষ্টি। এই জ্যোতির্বিম্বের কেন্দ্রকে "ওম্" বলিলে ওম্ হইতেই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। পতঞ্জলি বলেন —"তস্য বাচকঃ প্রণবঃ"—ওঙ্কার ঈশ্বরের বাচক।

উল্লিখিত ভাগবতের শ্লোকের বঙ্গানুবাদ এইরূপ :——যে বৈশেষিকেরা এই অসৎ জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেন, যে পাতঞ্জলেরা অসৎ হইতেই ব্রহ্মাণ্ডের আবির্ভাব বর্ণন করেন, যে নৈয়ায়িকেরা একবিংশতি প্রকার (ষড়িন্দ্রিয়ানি ষড়্‌ বুদ্ধয়ঃ ষড়্‌ বিষয়াঃ সুখ দুঃখ শরীরঞ্চেতি) দুঃখের বিনাশকেই মোক্ষ বলিয়াই অবধারণ করেন, যে সাংখ্যেরা আত্মার বহুত্ব নির্ণয় করেন, এবং যে মীমাংসকেরা কর্ম্মফল ব্যবহারকে (বিপণ) সত্য বলিয়া উপদেশ দেন, তাঁহারা সকলেই কেবল আরোপিত ভ্রমমাত্রে আবদ্ধ করেন। আর নির্ব্বোধ লোকেরা ত্রিগুণময় পুরুষ বলিয়া জ্ঞানঘনরূপ আপনাতে যে ভেদ কল্পনা করে, তাহাদিগের অজ্ঞানতা দূর হইলে পর সে ভেদ আর থাকে না।

পাঠকগণ! চলুন একবার মায়ার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা কল্পনানেত্রে নিরীক্ষণ করিতে চেষ্টা করি।

সমগ্র বিজ্ঞান ও সমগ্র দর্শন এই সার্ব্বভৌমিক যুক্তি স্বীকার্য্য প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন।—

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।" (গীতা ২।১৬)।

অসতের (যাহা নাই) অস্তিত্ব সম্ভবে না, সতের (যাহা আছে) তাহারা একান্ত বিনাশ সম্ভবে না। শ্রীশঙ্করাচার্য্য এই যুক্তিবলে বৌদ্ধ মত খণ্ডন করিয়াছেন, ইহা পরে দেখান যাইবেক।

প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিকেরাও এই যুক্তির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক শিরোমণি M. de Humboldt বলেন :—

"Throughout the range of animated existence, and of

moving forces in the physical universe, there is an especial fascination in the recognition of that which *is becoming, or about to be,* ever greater than in that *which is,* though the former be indeed no more than a *new condition of matter already existing*; for of the act of creation itself, *the ariginal calling forth of existence out of non-existence,* we have *no experience, nor can we form any conception of it.*" (ফরাসী ভাষা হইতে অনুবাদিত)।

কিছু ছিল না, তাহা হইতে কিছু হইল। 'ইচ্ছা তব হইল, ভানু বিরাজিল।' 'God said let there be sun and there was sun'। 'Out of nothing some thing came out' ইত্যাদি চিন্তা মনুষ্যের ধারণাতীত। আবার, কিছু আছে, তাহা একবারে বিনষ্ট হইবে, তাহার একান্ত অভাব হইবে, এই চিন্তাও মনুষ্যবুদ্ধির অতীত। যদি আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলে আত্মার অবিনাশিত্ব, নিত্যত্ব (গত কালে, বর্ত্তমান কালে ও ভূতকালে স্থায়িত্ব) অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বিজ্ঞান বলিলেন, একখণ্ড কাষ্ঠ দগ্ধ কর, তাহার ধূম, কয়লা প্রভৃতি ওজন কর, দেখিবে কাষ্ঠের অনুমাত্রও নষ্ট হয় নাই, অবস্থান্তরিত হইয়াছে মাত্র। অতএব, এই মানবজগতে আত্মার বা পদার্থের মৃত্যু—একান্ত বিনাশ নাই। অবস্থার—নামরূপের পরিবর্ত্তন মাত্র হইতে পারে। যদি জগৎকে সৎ বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে বলিতে হইবে জগৎ ত্রিকালেই সৎ—অতি সূক্ষ্মাবস্থায় বা অব্যাকৃত অবস্থায় থাকিয়া ব্যক্ত অবস্থায় আসিয়াছে। যদি বল কার্য্য ও কারণ একই, তাহা হইলে বল জগৎ কিছুই না, ব্রহ্ম সৎ— সৎ কারণ সৎকার্য্যে পরিণত। ব্রহ্ম নিজে নিজকে বলিয়াছেন— 'স্বয়মকুরুত'। অভিনব সৃষ্টি করা জ্ঞানের অবার্য্য, সুতরাং বলিতে হইবে পরমাত্মা ছিলেন, পরমাত্মা আছেন, পরমাত্মা থাকিবেন।

দার্শনিকগণ সময়ে সময়ে অব্যক্ত অবস্থাকে, অপ্রকাশিত অবস্থাকে অসৎ এবং ব্যক্ত অবস্থাকে, প্রকাশিত অবস্থাকে সৎ বলিয়া থাকেন। প্রকাশও আপেক্ষিক শব্দ—দ্বৈতভাব সম্পন্ন—এক বস্তু প্রকাশিত হয় ও অন্যে

প্রকাশ অনুভব করে; যেমন জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, ভোক্তা ও ভোগ্য ইত্যাদি এই দ্বৈত সম্বন্ধ না থাকিলে, এই সম্বন্ধ চিন্তা নষ্ট করিতে পারিলে বৌদ্ধগণের মহাশূন্যতা—নির্ব্বাণমুক্তি। বধিরের পক্ষে সঙ্গীত থাকা না থাকা সমান, অন্ধের পক্ষে সুন্দর চিত্র থাকা না থাকা সমান, অজ্ঞানী ও অভক্তের পক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত থাকা না থাকা সমান। আমিই যদি না থাকিলাম তাহা হইলে বিশ্বকে কে অনুভব করিবে? তবে আমি কে? কতকগুলি জ্ঞানসমষ্টি। জ্ঞান বলিলেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের প্রয়োজন। যদি জ্ঞাতা জ্ঞেয় এক হন, তাহা হইলে তিনি স্বরাট্, স্বপ্রকাশ। তাহা হইলে তিনি একমেবাদ্বিতীয়ং। তিনি বহু হইবার সঙ্কল্প করিলেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় হইলেন। অতএব 'স্বয়মকুরুত'।

এই সৃষ্টি কিরূপে হইল? ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্ত (১০ম মণ্ডল, ১২৯ সূক্ত—৭ম শ্লোক) বলেন:—

"ইয়ং বিসৃষ্টিঃ যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্য অধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ॥"

এই বিবিধ সৃষ্টি যে উপাদানভূত পরমাত্মা হইতে হইয়াছে (পরমাত্মা সৃষ্টির উপাদান কারণ, যেমন মৃত্তিকা ঘটের উপাদান কারণ, তদ্রূপ পরমাত্মা দ্রব্যান্তরের সাহায্য না লইয়া "স্বয়মকুরুত"), এবং যে উপাদানভূত পরমাত্মা নিমিত্ত কারণ হইয়া ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন (যেমন কুম্ভকার ঘটের নিমিত্ত কারণ), আকাশবৎ নির্ম্মল স্বপ্রকাশ বা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যিনি সৃষ্টির অধ্যক্ষ স্বরূপ রহিয়াছেন (যিনি এই সৃষ্টি পালন বা রক্ষা করিতেছেন তাঁহার সত্তায় সৃষ্টির সত্তা ও তাঁহার অসত্তায় সৃষ্টির অসত্তা—অন্বয়—ব্যতিরেক ভাবে পালন করিতেছেন),ইহা জানিলে তিনিই জানেন, না জানিলে কেহই জানেন না, অর্থাৎ উহা তিনিই অবগত আছেন, অন্য কেহ (সৃষ্ট জীব বা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর) অবগত নহেন। (১) (এই নাসদীয় সূক্ত বেদান্তদর্শনের ভিত্তিভূমি, সুতরাং ইহার বিস্তৃত আলোচনা কর্ত্তব্য।) "Darkness alone filled the Boundless All ; for father, mother

---

(১) Mr. R. C. Datta অনুবাদ করিয়াছেন, 'সৃষ্টি তিনিও জানেন না'। কি অদ্ভুত! ঋষি সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। ঋষি বাক্যের উদ্দেশ্য এই যিনি "তমসঃ পরস্তাৎ" তিনিই জানেন, প্রাকৃত বা সৃষ্ট জীব কেহই জানেন না।

and son, were once more one," says one of the archaic stanzas on which Madam Blavatsky's phenomenal work, *The Secret Docdrine*, is based.) এই উদ্ধৃত শ্লোকের "Darkness" শব্দের অর্থ কি তমঃ বা অন্ধকার, অথবা অব্যাকৃত অবস্থা? যদি "Darkness" শব্দের অর্থ নামরূপ বিবর্জ্জিত, অপ্রতর্ক্য অব্যাকৃত অবস্থা হয় তাহা হইলে "darkness"এর পরিবর্ত্তে "অসৎ" প্রযুক্ত হইতে পারে। ঋগ্বেদের উক্ত সূক্তের প্রথম শ্লোকে আছে :—

"না সদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং, নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্॥

মহাপ্রলয় অবস্থায় অসৎ ছিল না, সৎ ছিল না, অর্থাৎ সদসদাত্মক বা মায়াত্মক জগৎ ছিল না। (আলোক ভাব, অন্ধকার অভাব, ভাব বিদ্যুৎ, অভাব বিদ্যুৎ, উষ্ণতা, শৈত্য প্রভৃতি positive এবং negative শক্তি একত্র মিশ্রিত ছিল; পৃথক অবস্থায় ব্যক্তভাবে ছিল না, সকলই অব্যক্ত অবস্থায় ছিল। মনু বলেন—অপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং; অপ্রতর্ক, অনির্দ্দেশ্য, প্রসুপ্ত অবস্থা ছিল। যখন মায়াদ্বারা ব্রহ্ম পরিমিত বা প্রকাশিত হয়েন—মীয়তে ব্রহ্ম-অনয়া, তখন ভাব শক্তি ও অভাব শক্তি পৃথক হয়। মায়া সৎ নহে, কারণ ব্রহ্মই একমাত্র সৎ। মায়া অসৎ নহে, কারণ মায়া ব্যবহারিক জগতের কারণ। মায়াদ্বারাই সৃষ্টি হয়, এ কারণ মায়া সদসদাত্মিকা। নামরূপ বর্জ্জিত ভাব শক্তি ও অভাব শক্তি অব্যাকৃত অবস্থায় ছিল)। তখন রজঃ অর্থাৎ ভূর্ভুবাদি লোক ছিল না, তখন ব্যোম অর্থাৎ অন্তরীক্ষ লোক ছিল না, তখন অন্তরীক্ষ লোকের উপরিস্থ লোকও ছিল না, তখন আবরক কিছুই ছিল না, তখন সুখ ভোগের জন্য কোন ভোক্তা জীবও ছিল না, তখন গহন ও গভীর জলও ছিল না।

রমেশ বাবু অনুবাদ করিয়াছেন যে তখন "যাহা নাই তাহাও ছিল না, যাহা আছে তাহাও ছিল না।" ইহা ভুল, কারণ গীতার উক্তি ও হিন্দুদর্শনের উক্তি এই—"না সতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ"। উল্লিখিত শ্রুতি বাক্যের "সদসৎ" শব্দের অর্থ এই যে "ভাবব্যঞ্জক ও অভাব ব্যঞ্জক শক্তিদ্বয় একত্র অপ্রকাশিত অবস্থায় ছিল, মায়াব্রহ্ম হইতে পৃথগ্‌ভাবে ছিলেন

না, সুতরাং সৃষ্টিও ছিল না।" থিওসফি সম্প্রদায় হইতে এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে—"Then was not non-existence nor existence." (সনাতন ধর্ম্ম, তৃতীয় ভাগ, ৩৮ পৃষ্ঠা)। উক্ত ঋকের পরের শ্লোক এই:—

"ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চ নাস॥"

"তৎকালে মৃত্যু ছিল না, তখন অমৃত ছিল না, তখন রাত্রি দিনের প্রভেদ ছিল না।" তবে তখন কি ছিল? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে:—"আনীৎ—প্রাণিতবৎ—প্রাণন ক্রিয়া করিতেছিলেন। কে? উত্তর—তৎ—ব্রহ্ম। প্রাণন ক্রিয়ার বায়ু কোথায় পাইলেন? উত্তর—অবাতং—বায়ুর সাহায্য ব্যতীত। কি ভাবে? উত্তর—একং—মায়ার সহিত অবিভক্ত ভাবে। সে আবার কিরূপ? উত্তর—স্বধয়া—স্বধা দ্বারা, অর্থাৎ যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া। "স্বস্মিন্ ধীয়তে ধ্রিয়তে আশ্রিতা বর্ত্ততে ইতি স্বধা মায়া"। যোগমায়া ব্রহ্মের অঘটন-ঘটন পটীয়সী-শক্তি। যোগমায়ার সাহায্যে একমাত্র ব্রহ্ম কিরূপ ভাবে জীবিত ছিলেন তাহা তিনিই জানেন। তৎকালে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, তৎকালে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ছিল না।" ইহাকেই বলে—ওঁ তৎসৎ, একমেবাদ্বিতীয়ং।

রমেশ বাবু অনুবাদ করিয়াছেন যে, তখন একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মামাত্র অবলম্বনে নিশ্বাস-প্রশ্বাস যুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন।" বোধ হইতেছে তিনি ঋকের "তৎ" শব্দের অর্থ "বস্তু" এবং "একং" অর্থে "একমাত্র" করিয়াছেন, এবং "স্বধয়া" শব্দের অর্থ "আত্মামাত্র অবলম্বনে" করিয়াছেন। সায়নাচার্য্যের টীকায় এরূপ অর্থ নাই। সায়নাচার্য্যের মতে 'স্বধা' অর্থে মায়া। (১)

---

(১) থিওসফি সম্প্রদায়ের সদস্যগণ উক্ত ঋকের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—"That Only breathed by its own nature: apart from That was naught." (সনাতন ধর্ম্ম—An Advanceed Text Bock. p. 38)। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, বেদে মায়াবাদের নামগন্ধও নাই, মায়াবাদ দার্শনিকদিগের সৃষ্টি। কিন্তু এই ঋকের 'স্বধা' অর্থ মায়া। সায়নাচার্য্যের এই অর্থ ত্যাগ করিয়া 'একমাত্র ব্রহ্ম জীবিত ছিলেন, এইরূপ অর্থ করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। সংস্কৃত শাস্ত্রে 'স্বধা শব্দের অনেক অর্থ আছে, তাহার প্রত্যেক অর্থেই 'own nature' এরূপ অর্থ পাওয়া যায় না। থিওসফি সম্প্রদায়ের নিকট হিন্দুধর্ম্ম অনেকাংশে ঋণী, এই সম্প্রদায়ের সদস্যগণ বেদ হইতে মায়া বা যোগমায়াকে তাড়াইয়া দিলে আমরা কাহার মুখ পানে তাকাইব? বিনীত লেখক।

ইহার পরের শ্লোকে আছে :—

"তম আসীত্তমসা গূড়্হমগ্রেপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্।

তুচ্ছেনাভ্বপিহিতং সদাসীত্তপসস্তন্মহিনা অজায়তৈকম্॥

অগ্রে (সৃষ্টির পূর্ব্বে) অন্ধকার অন্ধকার দ্বারা আবৃত ছিল, অর্থাৎ ঘন অন্ধকারে যেমন এক বস্তু হইতে বস্তন্তর পৃথক্ করা যায় না, সেইরূপ সৃষ্টির পূর্ব্বে কার্য্যজগৎ কারণরূপ মায়াতে লীন ছিল—অব্যক্তভাবে অপ্রজ্ঞায়মান ছিল। জগৎ অপ্রকেত (অপ্রজ্ঞায়মান) ছিল। এই সমস্ত সলিল (কারণের সহিত সঙ্গত অবিভাবাপন্ন) অর্থাৎ মায়ার সহিত অবিভক্ত অবস্থায় ছিল। অথবা, জগৎ কারণসলিলে (দুগ্ধ ও সলিল মিশ্রণের ন্যায়) বিলীন ছিল। তখন জগৎ তুচ্ছকল্প (সদসদাত্মিকা) মায়া দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া এক (একীভূত অবস্থায়) থাকা সত্ত্বেও—তৎ তপসঃ মহিনা অজায়ত—সেই ব্রহ্মের তপঃপ্রভাবে (সৃষ্টি পর্য্যালোচনা বা সঙ্কল্প) উৎপন্ন হইল। সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বলেন—"By the great power of Tapas uprose The One." (৪৪ পৃষ্ঠা)। ইহা কি ব্রহ্মের জন্মবৃত্তান্ত ?

রমেশ বাবু অনুবাদ করিয়াছেন—"সর্ব্বপ্রথমে অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্ন বর্জ্জিত ও চতুর্দ্দিকে জলময় ছিল। অবিদ্যমান্ বস্তুর দ্বারা সেই সর্ব্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিল। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন।" তখন রাত্রি দিবা ছিল না, অন্ধকার ও জল কোথা হইতে আসিল ? অবিদ্যমান্ বস্তুটি কি ? অবিদ্যমান্ বস্তুই কি তপস্যা করিয়া নিজে এক বস্তু হইয়া জন্মিলেন। এইরূপ অর্থ কোথা হইতে সংগৃহীত হইল ?

ব্রহ্মের তপঃপ্রভাবের কথা পর শ্লোকে বর্ণিত আছে :—

"কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধিমনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।

সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা॥"

অগ্রে (সৃষ্টির পূর্ব্বে) ব্রহ্মের মনে কাম (সৃষ্টির ইচ্ছা) জন্মিয়াছিল। প্রথমে (অতীত কল্পে) যেহেতু রেতঃ (সৃষ্টিবীজ—প্রাণিগণের পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম) ছিল, সেই হেতু ব্রহ্মের মনে সৃষ্টির কামনা জন্মিয়াছিল। কবিগণ (ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমানবেত্তা যোগীগণ) বুদ্ধিদ্বারা আপন হৃদয়ে বিচার করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে অসতি (অসতে অর্থাৎ মায়াতে) সতঃ

(সতের অর্থাৎ ব্যবহারিক জগতের) বন্ধু (বন্ধক অর্থাৎ হেতুভূত) পূর্ব্বকল্পকৃত কর্ম্ম।

তৎপরের শ্লোকের অনুবাদ এইরূপ :—সূর্য্যরশ্মির ন্যায় অবিদ্যা কাম কর্ম্ম সমূহের রশ্মি নিমেষ মধ্যে উর্দ্ধে, নিম্নে এবং উভয় পার্শ্বে বিস্তৃত হইয়া সৃষ্টি আরম্ভ করিল, তখন ভোক্তা জীব এবং ভোগ্য ভূতপ্রপঞ্চ সৃষ্ট হইল। ভোক্তা জীব প্রধান এবং ভোগ্য প্রপঞ্চ নিকৃষ্ট গণ্য হইল। (১)

তৎপরবর্ত্তী শ্লোকটী এই :—

"কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত অজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।

অর্ব্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জ্জনে নাথ কো বেদ যত আবভূব ॥"

কুতঃ অজাতা—কোন্ উপাদান কারণ হইতে সৃষ্টি হইল? কুতঃ ইয়ং বিসৃষ্টিঃ—কোন্ নিমিত্ত কারণ হইতে এই বিবিধ সৃষ্টি হইল? এই কথা কঃ অদ্ধা বেদ—কোন্ পুরুষ যথার্থ ভাবে জানে? দেবতারাও ভূত-সৃষ্টির পশ্চাৎ জন্মিয়াছেন, তাঁহারাও উহা জানেন না। যে কারণ হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা কোন্ মনুষ্য জানে?

এই সূক্ত অনুসারে জীবের পূর্ব্ব কল্পে কৃত কর্ম্মফলই সৃষ্টিবীজ। তাহাই ব্রহ্মের মনে সৃষ্টি কামনা জন্মাইয়া দেয় ও সৃষ্টি আরম্ভ হয়। ভোক্তা-জীবও ভোগ্য অন্ন সৃষ্ট হয়। এই সৃষ্টিপ্রক্রিয়া দেবতারাও জানেন না, অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বের কথা সৃষ্টির পরের জীব—প্রাকৃত (সৃষ্ট) জীব জানিতে পারেন না, ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের হৃদয়ে উদ্ভূত হয় মাত্র। উপনিষদে আছে—"তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়।" "সো কাময়ত বহুঃ স্যাং প্রজায়েয়েতি স তপোতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিং চেতি।"

সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা—প্রকট বিশ্বের পূর্ব্বের অব্যক্ত অবস্থা—অজ্ঞেয়—The Unknowable (Herbert Spencer.) কবিগণ ইহা বুদ্ধিদ্বারা জানিয়াছেন। মহর্ষি বেদব্যাস সমাধি অবলম্বনে প্রকৃত অবস্থা জানিয়াছিলেন, তাহা পরে নিবেদন করিতেছি।

---

(১) মূল শ্লোকটী এইরূপ :—

"তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষামধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ।

রেতোধা আসন্মহিমান আসন্ত্স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ।"

এষাং—অবিদ্যা কামকর্ম্মাণা। রেতোধা—বীজভূত কর্ম্মসম্পাদনকারী কর্ত্তা, ভোক্তা জীব। স্বধা—ভোগ্য প্রপঞ্চ। প্রযতিঃ—ভোক্তা। মহিমানঃ—পঞ্চভূত।

কর্ম্মফল অর্থে জীবের কর্ম্মফল, সুতরাং জীবই অগ্রে সৃষ্ট কি কর্ম্মফলই অগ্রে সৃষ্ট, এই প্রশ্নের উত্তর দানে দর্শন অসমর্থ। দর্শন বলিবেন এইরূপ অবিশ্রান্ত প্রশ্ন করিলে "অনবস্থতা" দোষ ঘটে, তর্কের মীমাংসা হয় না।

হিন্দুদিগের দৈনিক সন্ধ্যামন্ত্রেও সৃষ্টি প্রক্রিয়া এইরূপই বর্ণিত আছে:—

"ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ তপসোহধ্যজায়ত। ততো রাত্রিরজায়ত, ততঃ সমুদ্রোর্ণবঃ সমুদ্রাদর্ণবাদধি সম্বৎসরোহজায়ত অহো রাত্রানি বিদধৎবিশ্বস্য মিষ্যতোবশী সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথোস্বঃ॥"

মহাপ্রলয় অবস্থায় "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং" ব্রহ্ম মাত্র ছিলেন। তখন অন্ধকার মাত্র অর্থাৎ মহাশূন্য, মহাকাশ ও মহাকাল মাত্র ছিল। তৎপর তপোবলে (জীবের অদৃষ্টবশতঃ বা পূর্ব্ব কল্পকৃত কর্ম্মফলে) কারণ সমুদ্র হইল। তৎপরে মহাপ্রলয়ে বিলুপ্ত বিশ্বের নির্ম্মাণসমর্থ ধাতা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সেই ধাতা দিবারাত্রি বিধানকারী সূর্য্য চন্দ্র সৃষ্টি করিলেন। তৎপর মহঃ, জন, তপঃ, সত্যলোক ও ভূর্ভুবস্বর্লোক সৃষ্টি করিলেন। কিরূপ ভাবে, না, যেমন পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রলয়ের পর পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

সৃষ্টির প্রলয়ের সঙ্গে জাগরণ ও সুষুপ্ত অবস্থার তুলনা দেওয়া হইয়া থাকে। সুষুপ্ত অবস্থায় জীবের জাগরণ অবস্থার স্মরণ বিলুপ্ত হয় না। পুনরায় জাগরিত হইলেই আরব্ধ কর্ম্মের পরিশিষ্ট সমাপ্ত করিতে প্রবৃত্তি হয়। তদ্রূপ মহাপ্রলয় কালেও মহামায়া সৃষ্টি বীজ কুড়াইয়া রাখেন, শ্রীভগবানের নিদ্রাবসানে সেই বীজ বা কর্ম্মবীজ হইতে নূতন বিশ্ব "যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ" অর্থাৎ পূর্ব্বের নিয়ম অনুসারে কল্পিত বা সৃজিত হয়। প্রলয় অবস্থায় কে জীব, কে ব্রহ্ম, কে মায়া তাহার বিশেষত্ব থাকে না, কেবল মহাকাল ও মহাকাশ অবস্থামাত্র থাকে। মহাকাল অর্থে অনন্তকাল, মহাকাশ অর্থে অনন্ত আকাশ বুঝায়। এই মহাকাল ও মহাকাশই ব্রহ্মের তৃতীয় অবস্থা। যথা—বেদান্ত দর্শনের ১২শ সূত্রে "আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ" আকাশ ব্রহ্ম-লিঙ্গ (চিহ্ন)।

সৃষ্টিপ্রকরণ সম্বন্ধে যজুর্ব্বেদ হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

"আপোহ যদ্বৃহতী বিশ্বমায়ন্ গর্ভং দধান জনয়ন্তীরগ্নিম।
ততো দেবানাং সমবর্ত্ততাসুরেকঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥"

অপরিমেয় জলরাশি গর্ভ ধারণ করিয়া অগ্নিরূপ হিরণ্যগর্ভকে উৎপন্ন করিয়া যখন বিশ্বভুবন ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তখন দেবতাদিগের প্রাণরূপ আত্মা উৎপন্ন হইয়াছিল। এবম্বিধ প্রজাপতিদেবকে ভিন্ন আমরা আর কাহাকে উপাসনা করিব।

"যশ্চিদাপো মহিনা পর্য্যপশ্যদ্দক্ষং দধানা জনয়ন্তী যজ্ঞম্।
যে দেবেষধিদেব এক আসীৎ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।"

যিনি স্বীয় মহিমার প্রভাবে সৃষ্টিবীজধারণকারী এবং বিশ্ব উৎপাদনকারী জলরাশির সর্ব্বভাগেই নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, যিনি সকল দেবতার মধ্যে এক অদ্বিতীয় দেবতা, এবম্বিধ প্রজাপতিদেবকে ভিন্ন আমরা আর কাহাকে অর্চ্চনা করিব?

"বেনস্তৎ পশ্যন্নিহিতং গুহা সদ্যত্র বিশ্বস্তবত্যেকনীড়ম্।
তস্মিন্নিদং সঞ্চবিচৈতি সর্ব্বং স ওতঃপ্রোতশ্চ বিভুঃ প্রজাসু ॥"

বেন (পণ্ডিত ব্যক্তিরা) তৎ অর্থাৎ সেই ব্রহ্মকে স্বীয় স্বীয় গুহাতে (বুদ্ধিতে বা হৃদয়ে) স্থাপিত দেখিয়া থাকেন। তিনি "তৎসৎ" নিত্য, সেই ব্রহ্মে বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ একনীড় ভাবে আছে অর্থাৎ তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আছে। কিরূপ ভাবে? সঞ্চবিচৈতি (সং+চ, বি+চ, এতি, সমেতি, ব্যেতিচ) প্রলয়কালে তাঁহাতেই গমন করিতেছে, সৃষ্টি-কালে তাঁহা হইতেই বহির্গত হইতেছে। সে কিরূপ ভাবে? সেই পর-মাত্মা সমস্ত সৃষ্টি পদার্থে (প্রজাসু) ওতঃপ্রোতভাবে (ওতঃ—ঊর্দ্ধ তন্তু শরীর ভাবে, প্রোতঃ—বস্ত্রের তির্য্যগ্ তন্তু শরীরীভাবে, অর্থাৎ শরীর ও শরীরীরূপে) বিভু হইয়া আছেন। (ভবতি ইতি বিভুঃ, কার্য্য-কারণ রূপেন বিবিধং ভবতি ইতি বিভুঃ) অর্থাৎ তিনি কার্য্যকারণরূপে বিবিধরূপ ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন।

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে ১২১ সূক্তের প্রথম শ্লোক এবং যজুর্ব্বেদের ১৩

অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোক, ২৫শ অধ্যায়ের ১০ম ও ২১শ অধ্যায়ের ১ম শ্লোকটি একই, ইহারই অনুরূপ শ্লোক মনুসংহিতার প্রথমেই আছে। সেই শ্লোকটী এই :—

"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
সদাধার পৃথিবীং দ্যাং উতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥"

অগ্রে (প্রথম সৃষ্টি কালে, অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চ উৎপত্তির পূর্ব্বে), হিরণ্যগর্ভ (হিরণ্ময়, বিজ্ঞানময় গর্ভ ইতি নিরুক্তম্) উৎপন্ন হইলেন। তিনি জন্মিয়া ভূতসমূহের একমাত্র রক্ষিতা হইলেন। তিনি পৃথিবী (এ স্থানে পৃথিবী অর্থে অন্তরীক্ষ), দ্যুলোক ও এই ভূমি ধারণ করিয়াছিলেন। আমরা এবম্ভূত প্রজাপতি দেবকে পূজা করি।

মনুসংহিতায় আছে—ভগবান্ স্বয়ম্ভু প্রজা সৃষ্টি করিবার জন্য অগ্রে সলিল সৃষ্টি করেন (যজুর্ব্বেদে "আঁপশ্চন্দ্রদাঃ"—আনন্দদায়িনী জল এবং "অন্তরীক্ষে রজসো বিমানঃ"—অন্তরীক্ষ জলের নির্ম্মাতা বলা হইয়াছে), তৎপর তাহাতে শক্তিরূপ বীজ অর্পণ করেন। যজুর্ব্বেদে আছে—"য আবিবেশ ভুবনানি বিশ্বা। প্রজাপতিঃ প্রজায় সংররাণঃ ত্রীণি জ্যোতীংষি সচতে"—যিনি বিশ্বের তাবৎ পদার্থেই অনুপ্রবিষ্ট আছেন, যিনি কারণ শরীর ত্যাগ করিয়া কার্য্য শরীর ধারণ করতঃ প্রজারূপে সম্যক্ রমণ করিতেছেন, যিনি বিদ্যুৎ, অগ্নি ও সূর্য্য এই তিন জ্যোতিকে স্বীয় জ্যোতি দিয়া জ্যোতিষ্মান্ করিয়াছেন। ঐ বীজ হিরণ্ময় অণ্ড হইয়াছিল ("অণ্ডং অভবৎ হৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভং"—স্বর্ণময় এবং সহস্র সূর্য্যসম প্রভাবিশিষ্ট), ঐ অণ্ড হইতে সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

এই কারণ সলিলকে যদি পদার্থের চরম অবস্থা (Ion) এবং হিরণ্ময় অণ্ডকে শক্তির চরম অবস্থা (Electron বা জ্যোতির্বিম্ব) বলা যায়, তাহা হইলে বিজ্ঞানের সহিত বেদের সৃষ্টি প্রক্রিয়ার মিল হয়।

পুষ্পদন্ত গন্ধর্ব্ব মহিম্নস্তোত্রে গাহিয়াছেন :—

"ত্রয়ী সাঙ্খ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃ ঋজুকুটিল নানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥"

হে ভগবন্! ঋক্, যজু, সাম এই তিন বেদ, সাঙ্খ্যদর্শন, পাতঞ্জলাদি যোগশাস্ত্র, শৈবমত, বৈষ্ণবমত প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মপথাবলম্বী ব্যক্তি, এই পথ শ্রেষ্ঠ, এই পথ হিতকারী, ইত্যাদি প্রকার বলিয়া থাকেন। যেমন নদী সকল সরল বা বক্র পথ অবলম্বন করিয়া সকলেই সমুদ্রে গমন করে, সেইরূপ রুচিভেদে সরল পথ, কুটিল পথ প্রভৃতি নানা পথাবলম্বী সাধকদিগের তুমিই একমাত্র গম্যস্থান।

সৃষ্টির পূর্ব্বে যে ব্রহ্ম ছিলেন তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ং।" এই "একমেবাদ্বিতীয়ং" এর দার্শনিক অর্থ কি ?

একমেবাদ্বিতীয়ং = একং + এব + অদ্বিতীয়ং ॥

ব্রহ্ম এক, এই জন্য তাঁহার স্বগত ভেদ নাই, তিনি এব (তিনিই) এই জন্য তাঁহার স্বজাতীয় ভেদ নাই। তিনি অদ্বিতীয়, এই জন্য তাঁহার বিজাতীয় ভেদ নাই। ভেদ তিন প্রকার, স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয়। বৃক্ষের নিজের পত্র, পুষ্প ফলাদির সহিত বৃক্ষের যে প্রভেদ তাহার নাম স্বগত ভেদ। এক বৃক্ষের অন্য বৃক্ষ হইতে যে প্রভেদ তাহার নাম স্বজাতীয় ভেদ। শিলাদি হইতে বৃক্ষের যে প্রভেদ তাহার নাম বিজাতীয় ভেদ। ব্রহ্মের সমান কেহ নাই, অধিকও কেহ নাই, ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কেহই নাই, তাঁহার চক্ষু নাই তিনি দেখিতে পারেন, কর্ণ নাই শুনিতে পারেন, হস্ত নাই গ্রহণ করিতে পারেন ইত্যাদি। ইহা সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থার বর্ণনা।

"ব্রহ্ম" শব্দের অর্থ কি ? বৃহত্বাৎ বৃংহণত্বাৎ চ তদ্রূপম্ ব্রহ্ম-সংজ্ঞিতম্ (বিষ্ণু পুরাণম)—যিনি অতি বৃহৎ, প্রমাণের অতীত, অপ্রমেয় তিনি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম – ব্রহ্মন্ – বৃংহ + নন্ অকারস্য নকারস্য ইতি ব্রহ্মন্ (বৃহংতি প্রমাণাৎ বর্দ্ধতে ইতি)।

বৃহৎ অস্য শরীরম্ অপ্রমেয়ম্ প্রমাণতঃ।
বৃহদ্বিস্তীর্ণ মিত্যুক্তম্ ব্রহ্ম তেনায়মুচ্যতে॥ শাম্বপুরাণম্।

একদা মহর্ষিগণ ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধানের জন্য সমবেত হইয়া পরস্পরের মধ্যে এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিলেন : —

"কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতাঃ
জীবাম কেন ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ।

অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু
বর্ত্তামহে ব্রহ্ম বিদো ব্যবস্থাম্ ॥
"কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা
ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যা।
সংযোগ এষাং ন ত্বাত্মভাবাৎ
আত্মাহপ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ ॥ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ॥

ব্রহ্মই কি এই বিশ্ব সৃষ্টির কারণ? না, কারণ ব্যতিরেকেই এই বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে? আমরা কোথা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি এবং কেনই বা জীবিত আছি? মহাপ্রলয় সময়ে এই বিশ্বের জীবসঙ্ঘ কোথায় অবস্থান করিয়াছিল এবং কোথায় বা অবস্থান করিবে? কি জন্য ও কাহার কর্ত্তৃক আমরা সুখ দুঃখে আবদ্ধ হইয়া কালাতিপাত করিতেছি? ব্রহ্মই কি এই সমুদয় ব্যাপারের কারণ, না আপনা আপনি এই বিশ্ব সৃষ্ট ও পালিত হইতেছে? কালই কি এই বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের হেতু, অথবা পদার্থের প্রতিনিয়ত শক্তি স্বভাবই হেতু? অথবা কোন কারণ ব্যতীত অকস্মাৎ এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে? অথবা ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম এই বিশ্বের কারণ? অথবা বিজ্ঞানময় আত্মাই এই জগদুৎপত্তির কারণ?

তে ধ্যান যোগানুগতা অপশ্যন
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈ নিগূঢ়াং।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্ম যুক্তান্যধিতিষ্ঠ ত্যেকঃ ॥ (ঐ)

সেই ব্রহ্মর্ষিগণ ধ্যান যোগবলে দেখিতে পাইলেন যে পূর্ব্বোক্ত "কালাত্ম" প্রভৃতি কারণসমূহ এক অদ্বিতীয় পরমাত্মার আয়ত্তাধীন, সেই পরমাত্মার নিজগুণাচ্ছাদিত আত্মশক্তিই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জনয়িত্রী। মহর্ষিগণ আরও দেখিতে পাইলেন—"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ" এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা সর্ব্বভূতে গূঢ়রূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। "স্বগুণৈর্নিগুঢ়াং আত্মশক্তিং" কি বস্তু? ব্যাখ্যাকারকেরা বলেন—আত্মশক্তি—সত্বগুণে ব্রহ্মা, রজোগুণে বিষ্ণু এবং তমোগুণে রুদ্ররূপে স্বকীয় শক্তি। স্বগুণৈর্নিগূঢ়া—স্বগুণ—সত্বরজস্তমোগুণ, এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি দ্বারা সংবৃতা আত্মশক্তি (সদংশে

সন্ধিনী, চিৎ অংশে সম্বিৎ বা জ্ঞান, এবং আনন্দাংশে হ্লাদিনী শক্তি—বৈষ্ণবদর্শন)।

পরমাত্মার সৎ—চিৎ—আনন্দ শক্তি, স্বীয় প্রকৃতির সত্ত্ব-রজ-তমোগুণের সহিত অশেষপ্রকার মিলিত হইয়া এই বিচিত্র প্রপঞ্চ রচিত হইয়াছে। সাংখ্যদর্শন মতে সত্ত্ব-রজ-তম গুণত্রয় মহানু পদার্থ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অনুসারে ইহাকে Protyle ও Fohat, কিম্বা Ion ও Electron বলিলে এই সত্ত্ব-রজ-তমোগুণকে যথাযথভাবে সন্নিবেশিত করিয়া জগদ্রূপে পরিণত করিতে হইলে আরও তিনটি শক্তির আবশ্যক হয়; তাহা সৎ (সন্ধিনী), চিৎ (জ্ঞানশক্তি) এবং আনন্দ (হ্লাদিনী শক্তি)। এই জন্যই বলা হইয়াছে "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ"।

বেদান্তের পঞ্চদশী নাম্নী গ্রন্থে বৌদ্ধমত খণ্ডনস্থলে "সৎ" ও "অসতের" অতি চমৎকার বিচার আছে। বেদান্তদর্শন বলেন সচ্চিদানন্দ স্বরূপ অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম সর্ব্বভূতে বিদ্যমান আছেন। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সাকার ব্রহ্মবাদীরা (মাধ্যমিক) বলিয়া থাকেন যে "এ জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল অসৎ বা শূন্য মাত্র ছিল, কোন সৎপদার্থ বিদ্যমান্ ছিল না।" গৌড়াচার্য্যেরা (গৌড়দেশবাসী ব্রহ্মবিদ্ আচার্য্যগণ) বার্ত্তিক শ্লোক নিরূপণ করিয়া বৌদ্ধমত নিরস্ত করিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য বার্ত্তিক শ্লোকের যুক্তি দেখাইয়া বৌদ্ধমতের ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। বৌদ্ধগণ বলেন অগ্রে "শূন্যমাসীৎ", শূন্য ছিল। 'শূন্য' = অভাব, এবং 'ছিল' = ভাব। যে অভাব, সে কখনও ভাব হইতে পারে না, এবং যে 'ভাব', সে কখনও 'অভাব' হয় না। বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ বলেন যে 'ক্ষিত্যপতেজোমরুদ্ব্যোম' হইতে এই জগৎ হইয়াছে। অগ্রে যাহার অস্তিত্ব ছিল না, তাহা হইতে অস্তিত্ব হইবে কিরূপে? যদি আদিতে সৎ (চৈতন্য), জ্ঞান (চিচ্ছক্তি) ও আনন্দ না থাকে তাহা হইলে ক্ষিত্যপতেজো মরুদ্ব্যোমের সংযোগে চৈতন্য কিরূপে জন্মিবে? রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা বস্তুর রূপান্তর জন্মে, কিন্তু অভিনব তত্ত্ব জন্মে না। যদি বল যে এই সৃষ্টির মধ্যে চৈতন্য, জ্ঞান ও আনন্দ নামে স্বতন্ত্র কোন কিছুই ছিল না ও এখনও নাই, তাহা হইলে জড়পদার্থের পরস্পরের সংযোগ ক্রিয়াকেই চৈতন্য ও জ্ঞান নামে অভিহিত করিতে হয়।

কিন্তু জড়পদার্থসমূহকে সংযুক্ত করে কে? ইহার কর্ত্তা কে? যদি বল যে জড়পদার্থের স্বভাবই এই প্রকার—ইহার স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্ব শক্তি আছে। তাহা হইলে বলিতে হইবে এই কর্ত্তৃত্বের মধ্যে সর্ব্ব সামঞ্জস্য-সাধিনী শক্তিও (Power of organisation) আছে, তদ্দ্বারা যেখানে যদ্রূপ আবশ্যক হইতেছে তাহাই সম্পাদিত হইতেছে। তাহা হইলে আরও বলিতে হইবে জড়ের মধ্যে সংযোগ ও সামঞ্জস্য-সাধিনী শক্তির সঙ্গে জ্ঞানশক্তিও আছে। তাহা হইলেই চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইল। কারণে যাহা নাই তাহা কার্য্যে বিকাশিত হয় না। জগতে আমরা চৈতন্যশক্তি দেখিতেছি, সুতরাং আদিতে চৈতন্য ও জ্ঞান না থাকিলে এই চৈতন্য ও জ্ঞানের অপর কোন কারণ থাকিতে পারে না। জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, মাংসাস্থি নির্ম্মিত চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি প্রকৃত জ্ঞানেন্দ্রিয় নহে। তাহারা জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ। প্রকৃত জ্ঞানেন্দ্রিয় অতি সূক্ষ্ম। ইন্দ্রিয়গণের পৃথক ভাব বশতঃ বুদ্ধি বিকার প্রাপ্ত হয়; বুদ্ধি একই, বুদ্ধির বিকারসমষ্টিই ইন্দ্রিয়। শ্রোত্রাদিতে বুদ্ধি অদৃশ্যভাবে বর্ত্তমান থাকে।

"ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্ ভাবাদ্ বুদ্ধিবিক্রিয়তে হ্যতঃ।
শৃণ্বতী ভবতি শ্রোত্রং, স্পৃশতী স্পর্শ উচ্যতে॥
পশ্যন্তী ভবতি দৃষ্টি, রসতী রসনং ভবেৎ।
জিঘ্রতী ভবতী ঘ্রাণং, বুদ্ধির্বিক্রিয়তে পৃথক্॥" (শান্তিপর্ব্বণি—২৪৭)।

ইন্দ্রিয়গণের পৃথক ভাববশতঃ বুদ্ধি বিকার প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধি যখন শ্রবণ করে তখন শ্রোত্র, যখন স্পর্শ করে তখন স্পর্শেন্দ্রিয়, যখন দৃষ্টি করে তখন দর্শন, যখন আস্বাদন করে তখন রসনা, যখন আঘ্রাণ করে তখন ঘ্রাণ বলিয়া কথিত হয়।

পঞ্চদশী বলেন—

"কদাচিৎ পিহিতে কর্ণে শ্রূয়তে শব্দ আন্তরঃ;
প্রাণবায়ৌ জঠরাগ্নৌ জলপানেঽন্ন ভক্ষণে॥
ব্যজ্যন্তে হ্যান্তরস্পর্শা মীলনে চান্তরং তমঃ।
উদ্গারে রসগন্ধৌ চেত্যক্ষণো মান্তরগ্রহঃ॥"

কদাচিৎ কর্ণ বন্ধ করিলে প্রাণবায়ু ও জঠরাগ্নিতে বিদ্যমান যে আন্তরিক শব্দ

তাহা শ্রবণ করা যায়। জলপানে ও অন্নভক্ষণে আভ্যন্তরিক স্পর্শ অনুভব করা যায়। চক্ষু মুদ্রিত করিলেও অন্তরের অন্ধকার উপলব্ধি করা যায়। উদ্গার হইলে রস ও গন্ধ গ্রহণ করা যায়। এই প্রকারে ইন্দ্রিয়গণের আন্তরিক শব্দ-স্পর্শাদি-অনুভব শক্তি জানিতে পারা যায়।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত এই চারিটি অন্তরিন্দ্রিয় আছে। যদিও অন্তঃকরণ একমাত্র অন্তরিন্দ্রিয় কিন্তু বৃত্তিভেদে উক্ত চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। বেদান্তসারে বুদ্ধি, মন, চিত্ত, ও অহঙ্কারের লক্ষণ আছে, কিন্তু চিত্ত ও অহঙ্কারকে বুদ্ধি ও মনের অন্তর্গত দুইটি বৃত্তি বলা হইয়াছে। নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তিকে বুদ্ধি কহে। সঙ্কল্প ও বিকল্পাত্মকর অন্তঃকরণ বৃত্তিকে মন কহে। অনুসন্ধানাত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তিকে চিত্ত কহে। অভিমানাত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তিকে অহঙ্কার বলে। সংশয়, নিশ্চয়, গর্ব্ব, স্মরণ এই গুলি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্তের বিষয়। আত্মার উপাধি অন্তঃকরণ, মন, বুদ্ধি, বিজ্ঞান ও চিত্ত। চক্ষুদ্বারা আলোচনা করিয়া মন সংশয় করে, বুদ্ধি নিশ্চয় করে, ক্ষেত্রজ্ঞ সাক্ষীর ন্যায় থাকেন। সাংখ্যদর্শন বলেন—বুদ্ধির বৃত্তি অধ্যবসায়, অহঙ্কারের বৃত্তি অভিমান, মনের বৃত্তি সংকল্প ও বিকল্প। কার্য্য করিবার ইচ্ছাকে সঙ্কল্প ও সংশয়কে বিকল্প কহে। এই জন্য উপনিষদে আত্মাকে শ্রোত্রের শ্রোত্র, চক্ষুর চক্ষু প্রভৃতি বলা হইয়াছে। বাস্তবিক বুদ্ধি একই, এবং বুদ্ধি আত্মার উপাধি। বেদ বেদান্ত তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন যে আদিতে একমাত্র সৎস্বরূপ অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম ছিলেন। বৌদ্ধগণ বেদের এই বাণী না মানিয়া বলেন যে, আদিতে মহাশূন্য ছিল। এইজন্য বৌদ্ধগণকে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে নাস্তিক সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়।

"অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।

একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥" কঠোপনিষৎ।

এক অগ্নি যেমন ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া বস্তুভেদে বিভিন্নরূপ হইয়াছে, তদ্রূপ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা নানা বস্তুভেদে বিভিন্নরূপ হইয়াছেন এবং উঁহাদের বাহিরেও আছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীজানকীনাথ পাল শাস্ত্রী, বি, এল্।

আদর্শ-চরিত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কর্ণ।

কর্ণ অর্দ্ধরথী হইলেও কুরুক্ষেত্রে সমবেত বীরমণ্ডলীর মধ্যে এক জন শ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া খ্যাত। বীরত্ব কাহিনী অপেক্ষা কর্ণ তাঁহার চরিত্রে যে সুন্দর শিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহাই এক্ষণে আলোচ্য। সেই বীর হৃদয়ে অর্জ্জুনের অপ্রতিহত বীরত্ব হেতু ঈর্ষা এবং মাতৃস্নেহাভাব প্রযুক্ত দুঃখচ্ছায়া সমদ্ভূত দোষ ভিন্ন অন্য কোন দোষ লক্ষ্য হয় না। তাঁহার হৃদয়ের উদারতা, নিঃস্বার্থপরতা, দানশীলতা প্রভৃতি অশেষ সদ্‌গুণাবলী কেবল মহর্ষি দুর্ব্বাসার মন্ত্রপুত্রের পক্ষেই সম্ভব। আলোচনা করিয়া দেখিতে গেলে কর্ণচরিত্রে প্রতিজ্ঞাপরায়ণতা ও আত্মোৎসর্গ ভীষ্মচরিত্র ভিন্ন অন্য কোথাও লক্ষ্য হয় না। কর্ণচরিত্র আলোচনা করিতে করিতে হৃদয় খেদপূর্ণ হইয়া উঠে এবং মনে হয় যে জননীর কন্যাবস্থার অবিবেকিতায় কর্ণের প্রশস্ত হৃদয়ে যে ঘন দুঃখচ্ছায়া আজন্ম দেখিতে পাই, তাহা কোমল স্পর্শে অপসারিত করিয়া দিই। কুন্তীভোজের পালিতা কন্যা কুন্তীর—প্রথম পুত্র রাধাভর্ত্তার পালিত পুত্র! বস্তুতঃই কর্ম্মের গতি অতীব দুর্ব্বোধ!

সূর্য্যদেব-সহবাস ফলে কুন্তী পুত্র প্রসবপূর্ব্বক "বন্ধুজন ভয়ে আত্মদোষ গোপন করাই শ্রেয়ঃকল্প স্থির করিয়া সেই মহাবল পরাক্রান্ত সদ্যঃপ্রসূত কুমারকে লইয়া সলিলে নিক্ষেপ করিলেন। যশস্বী রাধাভর্ত্তা সেই নবকুমারকে জলে ভাসমান দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে গৃহানয়নপূর্ব্বক পুত্রত্বে পরিগ্রহ করিলেন এবং কবচ কুণ্ডলরূপ ধনের সহিত জন্মিয়াছে বলিয়া উহার নাম বসুষেণ রাখিলেন।" সূর্য্যদেব কুন্তীর চপলতা ক্ষমা করিতে পারিলেন না এবং কুন্তীর যে ভ্রম প্রমাদ ঘটিল তাহাতে মাতা পুত্র উভয়ে যাবজ্জীবনের জন্য ঘোর দুঃখানলে দগ্ধ হইলেন। কিন্তু ধন্য কর্ণ! মাতার সেবায়—তাঁহার প্রিয় পুত্রগণের রক্ষার্থ কি অমানুষিক আত্মোৎসর্গ! মাতৃসেবায় কর্ণের আদর্শ আমাদের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রসৃত হউক ইহাই প্রার্থনীয়।

অধিরথ সূত কর্ণকে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ করিয়াছিলেন এবং কর্ণের ধর্ম্ম-জীবনও তদুপযুক্ত ছিল। আমরা দেখিতে পাই কর্ণ "প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সূর্য্যের আরাধনা করিতেন ; এবং এই সময়ে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার নিকট যাহা প্রার্থনা করিতেন, অতি দুষ্প্রাপ্য হইলেও তিনি তৎপ্রদানে পরাঙ্মুখ হইতেন না।" সৌর্য্য ও বীর্য্য সম্বন্ধে আমরা দেখিতে পাই "তিনি দীপ্তি, কান্তি ও দ্যুতি দ্বারা চন্দ্র, সূর্য্য ও অনলের তুল্য ছিলেন। তিনি মৃগরাজ সিংহ ও হস্তী সমূহের বল একাকী ধারণ করিতেন। তিনি উন্নতকায় ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছিলেন।" তিনি মহাবল পরশুরাম হইতে অস্ত্রশিক্ষা লাভ করেন এবং এখানে আমরা তাঁহার অন্তর্নিহিত ক্ষাত্রতেজ ও দৃঢ়তা দেখিতে পাই। যদিও সূত গৃহে পালিত তথাপি তাহার ক্ষত্রিয় স্বভাব অনিচ্ছা সত্বেও প্রকাশ হইয়া পড়িত। পরশুরাম তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বোধে অস্ত্রশিক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু উরুপ্রদেশে বজ্রকীটের কঠোর দংশন অবিচলিত ভাবে সহ্য করিতে দেখিয়া কর্ণ যে ক্ষত্রিয় তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারিলেন এবং গুরু-প্রবঞ্চনাপরাধে তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। প্রকৃত পক্ষে কর্ণ শিষ্যাকল্পে পরশুরামের সেবা করিয়াছিলেন এবং ভক্তি শ্রদ্ধা প্রভৃতি কিছুরই অভাব দেখান নাই। কর্ণের ব্যবহার কদাচ আর্য্যোচিত নহে, কিন্তু দেখিতে গেলে বোধ হয় কর্ণ ইহাতে যে বিশেষ অপরাধ হইবে তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ক্ষত্রকুলধ্বংসকারী পরশুরাম কর্ণের এ অপরাধ ক্ষমা করিতে পারিলেন না; অগত্যা কর্ণকে অবনতমস্তকে এ অভিশাপ বহন করিতে হইল। জ্ঞান বা অজ্ঞানকৃত কর্ম্মের ফল অব্যাকুল চিত্তে ভোগ করিতে কর্ণচরিত্র উৎকৃষ্ট আদর্শ।

কর্ণজীবনে পাণ্ডব প্রতিদ্বন্দ্বীতা মূলমন্ত্র। যদি কর্ণ জননী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত না হইয়া তাঁহার স্নেহরসে পরিবর্দ্ধিত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার চরিত্র অন্যরূপে পরিস্ফুট হইত, তাঁহার জীবনে এ ঘন বিষাদচ্ছায়া লক্ষিত হইত না—ষষ্ঠ পাণ্ডব পঞ্চ পাণ্ডব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর স্থান অধিকার করিতেন।

সূতগৃহে প্রতিপালিত হইয়া কর্ণ সূতকেই পিতা বলিয়া জানিতেন এবং তাঁহাকে যেরূপ সম্মান ও ভক্তি করিতেন তাহা রঙ্গস্থলে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত হইবার সময় পরিচয় দিয়াছেন। অভিষেক জলসিক্ত মস্তক সূত

চরণে রাজন্যবর্গের সমক্ষে নত করিয়া অকৃত্রিম পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। রঙ্গস্থলে যখন কর্ণ ভীমাদি কর্তৃক লাঞ্ছিত হইতেছেন, তখন দুর্য্যোধন তাঁহাকে অঙ্গরাজ্যে অভিষেক করিয়া তাঁহার যে তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন তিনি তাহা জীবনে বিস্মৃত হন নাই। দুর্যোধন ও কর্ণ এ উভয়ের চরিত্র এতই বিসদৃশ যে তাহাতে সখ্যভাব বদ্ধমূল হওয়া সুসম্ভব নহে; কিন্তু কর্ণ অকৃত্রিম এবং প্রগাঢ় সখ্যভাব, কৃতজ্ঞতা সম্ভূত হইলেও— একভাবে আজীবন রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন।

কর্ণের দানশীলতা, কর্ণের উদারতা অমানুষিক। অর্জ্জুনের হিতার্থে ইন্দ্র কর্ণের চিত্তের দৃঢ়তা, দানশীলতা এবং উদারতার আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক বজ্রকীট রূপে তাঁহার উরুদেশ ভেদ করিয়া তাঁহাকে পরশুরামের অভিশাপ ভাজন করিয়াছিলেন এবং পুনরায় বৃদ্ধব্রাহ্মণবেশে তাঁহার সহজাত কবচকুণ্ডল গ্রহণ করিয়া অর্জ্জুন হস্তে তাঁহার নিধনের পথ পরিষ্কার করিয়াছেন। তিনি সূর্য্যদেবের উপদেশ অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রের যাচ্ঞা পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং সহজাত কবচ অঙ্গচ্ছেদ করিয়া ইন্দ্রকে প্রদান পূর্ব্বক কর্ণ ও বৈকর্ত্তন নামে অভিহিত হন। কর্ণ এখানে যেরূপ আত্মোৎসর্গ দেখাইয়াছেন তাহা যেন গল্প বলিয়াই বোধ হয় এবং এই উচ্চ আদর্শের উপর লক্ষ্য স্থাপন করিতে গিয়া আমাদের আপন ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি হয়।

সভাস্থলে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার প্রশ্রয় প্রদান করিয়া কর্ণ তাঁহার চরিত্রে একটী গাঢ় দোষারোপ করিয়াছেন। তিনি দুর্য্যোধনের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী সুতরাং সর্ব্বপ্রকারে দুর্য্যোধনের প্রীতিসাধন করা তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু এ স্থলে ধারণা হয় যে, কর্ণ স্বয়ম্বরস্থলে তৎপ্রতি দ্রৌপদীর কটূক্তির প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কর্ণের পক্ষে এই ব্যবহার বীরহৃদয়ের উপযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না এবং তজ্জন্য পুরাণে দ্রৌপদীর প্রতি সভাস্থলে কর্ণের উক্তি সমূহ ভিত্তিহীন এবং অতিরঞ্জিত বলিয়া জ্ঞান হয়। কর্ণচরিত্রে আর একটী দোষ আমরা দেখিতে পাই। বালক অভিমন্যুর প্রতি অন্যায় যুদ্ধে লিপ্ত থাকিয়া কর্ণ তাঁহার বীরত্বে কালিমা দিয়াছেন। রণক্ষেত্রে সপ্তরথী মধ্যস্থ বালক অভিমন্যুর কাত-

রোক্তি এবং রণকৌশলনিপুণ কর্ণের কর্দ্দম প্রোথিত রথচক্র উদ্ধারার্থে অর্জ্জুনের প্রতি কাতরোক্তি কর্ম্মফলের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। কর্ণচরিত্রে উক্ত দোষ অনুমোদন করিতে গেলে ইহাই বলিতে হয় যে "ধর্ম্মের গতি সূক্ষ্ম এবং যাহা ধর্ম্মের নিতান্ত বিপরীত তাহাও ধর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হয়।"

কর্ণের প্রতি সূর্য্যদেবের উপদেশ এবং তৎসম্বন্ধীয় কথোপকথন পাঠ করিলে কর্ণচরিত্রে সত্যপ্রিয়তা, দানশীলতা, আত্মোৎসর্গ এবং দেবদ্বিজে ভক্তি প্রভৃতি অশেষ সদ্‌গুণাবলী লক্ষিত হয়। কর্ণ কীর্ত্তিপ্রিয় ছিলেন এবং সেজন্য কীর্ত্তিলোপাশঙ্কায় সূর্য্যদেবের উপদেশ গ্রহণ করিতে স্বীকার করেন নাই। সকাম হইলেও কর্ণচরিত্র উৎকৃষ্ট আদর্শ এবং যদিও মনুষ্যজীবনে উক্ত চরিত্রের গুণাবলী পর্য্যবসিত করা সুকঠিন তথাপি আগ্রহ সহকারে পর্য্যালোচনা করিয়া লক্ষ্য পথে দৃষ্টি রাখিলে যে ফলদায়ক এবং শিক্ষাপ্রদ তাহাতে সন্দেহ নাই। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বিশ্বাস।

আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়ম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

উন্নতিশীল জীবের এই অবস্থা বড়ই বিষম। এখন সে বাস্তবিক "বিষমে সমুপস্থিত"। সে এক্ষণে কর্ম্মফল ত্যাগ করিতে চেষ্টা করে, আসক্তিকে চিরকালের জন্য বলি দিতে যত্নবান্ হয় এবং ইহার অপরিহার্য্য ফলে তাহার ফলাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয়, বৈরাগ্যের সঞ্চার হয় এবং অনাসক্তি প্রবল হইয়া উঠে। তখন জীবের মনে হয়—যেন সে শূন্যে অবলম্বন রহিত হইয়া ঝুলিতেছে। কর্ম্মের আসক্তি, প্রেরণা, সঙ্কল্প ও উদ্দেশ্য তাহার মন হইতে দূরীভূত হইয়াছে, প্রবৃত্তিমার্গের উদ্দীপনাশক্তি ক্ষীণ হইয়াছে অথচ নিবৃত্তিমার্গের উচ্চতর প্রেরণা শক্তি এখনও তাহার মনে সম্যক্ প্রকট হয় নাই। সমুদয় পার্থিব বিষয়ে তাহার বিরক্তিভাব পরিলক্ষিত হয়;

কর্ত্তব্যের শাসন তাহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। অথচ ত্যাগধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব এখনও তাহার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি তাহাকে তাহাকে চালাইতে পারে না; কিন্তু এখনও তাহার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিরূপ প্রেরণা প্রকাশিত হয় নাই। এই পরম সন্ধিস্থলে ভেদজ্ঞানের চরমাবস্থায় তাহার হৃদয়ে আর "আমি" ও "আমার" ইত্যাকার জ্ঞানের অবকাশ নাই; অথচ এখনও ভগবানই যে সকল কর্ম্ম ও জ্ঞানের কেন্দ্র ও প্রকাশক তাহা স্পষ্টরূপে অনুভূত হয় নাই। বাহুশক্তির ধারণা নাই, অথচ ঈশ্বরে আত্মনিবেদন হয় নাই; সুতরাং যেন বাহ্য জগতের সহিত তাহার সম্বন্ধ রহিত হইয়াছে, অথচ অন্তর্জগতের সহিত সম্বন্ধ এখনও আরব্ধ হয় নাই। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমার্গের মধ্যস্থলে এই একটি মহা শূন্যতার ভাব বিদ্যমান। একটি ছাড়িয়া অপরটি যতদিন ধরিতে না পারে ততদিন জীব সেই শূন্যেই ঝুলিতে থাকে।

অপ্রশস্ত সেতুযোগে গিরিশিখর হইতে গিরিশিখরান্তরে যাইতে যাইতে মধ্যবর্ত্তী সুগভীর গহ্বরের উপরিভাগে হঠাৎ সেতু ভগ্ন হইলে, মানুষ যেমন উভয় কুলচ্যুত হইয়া শূন্যে সন্তরণ করিতে থাকে—উপরে স্পর্শাতীত অনন্ত আকাশ, নিম্নে অতলস্পর্শ গিরিগহ্বর মুখব্যাদান করিয়া আছে, পশ্চাতে ফিরিবার উপায় নাই, সম্মুখে অগ্রসর হইবার পন্থা নাই, চতুর্দ্দিকে কেবল শূন্য,—প্রবৃত্তিমার্গ ও অহংভাবের স্থাপন ছাড়িয়া, নিবৃত্তিমার্গ অথবা ঈশ্বর বা পরমাত্মাই সকল ক্রিয়া,জ্ঞান ও প্রযত্নের কেন্দ্রে এই মূল ভাব—উপস্থিত হইবার প্রাক্কালে জীবের তদ্রূপ অবস্থা হয়। প্রবৃত্তিমার্গ দিয়া নিবৃত্তিমার্গের দিকে জীব যতই অগ্রসর হয়, তাহার সম্মুখস্থ প্রবৃত্তিমার্গ ততই অপ্রশস্ত হইতে থাকে এবং অবশেষে অদৃশ্য হইয়া যায়। তখন প্রবৃত্তিমার্গের আর কোন বস্তু তাহাতে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে না—সে সমুদয় বস্তুতেই জীব আস্থা বা স্পৃহাশূন্য হইয়াছে, অথচ অপর পারে নিবৃত্তিমার্গের মূলভাব আত্মনিবেদনে উপনীত হইতে পারে নাই; কাজেই অবলম্বন বিহীন হইয়া অজ্ঞাতসীম শূন্যের মধ্যে যেন সন্তরণ করিতে থাকে। এতদিন সর্ব্বকর্ম্ম ও জ্ঞানের মূলে ভেদাত্মক বিশিষ্ট আমিত্ব অবস্থিত ছিল—এক্ষণে এই বিশিষ্টতা এই ভেদাত্মক আমি ও জগৎ ভাব ত্যাগ করিয়া জীব ও জগৎ এই দুই

বিভাবের সমন্বয়কারী এক অদ্বিতীয় পূর্ণস্বরূপ পরমাত্মাকে গ্রহণ করিতে হইবে। এতদিন ভগবানও সখাস্বরূপ ছিলেন—এইবার তাঁহাকে তাঁহার পরম বা স্বরূপ ভাবে জানিতে হইবে। ব্যবহারিক জগৎকূল ত্যাগ করিয়া ভক্তিভেলার সাহায্যে অকূল সমুদ্রে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে।

এ বিষয় সময় যখন সমুপস্থিত হইবে তখন ভীত হইও না। অপর পারে যাইবার পূর্ব্বে এ পারের ব্যবহারিক সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিতে ভীত হইও না। একমাত্র নিত্যবস্তুর সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে এই নশ্বর পরিবর্ত্তনশীল সংসারের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে কিছুমাত্র শঙ্কিত হইও না। যাঁহারা জীবনে এই মহা শূন্যতা অতিক্রম করিয়া অপর পারে উপনীত হইয়াছেন এবং যাঁহারা এই শূন্যবৎ প্রতীয়মান অবস্থাকে বাস্তবিক পূর্ণং পূর্ণমিদং বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের আশ্বাস বাক্য শ্রবণ কর। তুমি যে জীবন লাভ করিতে যাইতেছ, সেই প্রকৃত জীবনের যে ধর্ম্ম তাঁহারা কীর্ত্তন করিতেছেন; তাহাতে মনঃসংযোগ কর। তাহারা বলিয়াছেন :—

"যে নিজের জীবনকে ভালবাসে সে তাহা হারাইবে, কিন্তু যে উহা ছাড়িতে পারে, সে অনন্ত জীবন পুনরায় লাভ করিবে।" অর্থাৎ কোন এক বিশিষ্টরূপে বা সীমাবদ্ধ ভাবে জীবনকে ভাল বাসিলে, রূপের বিনাশ হইলে জীবনও বিনষ্ট হইবে; কিন্তু যে নিজের ঐ সঙ্কীর্ণ বা সীমাবদ্ধ ভাবকে বলি দিবে সে অনন্ত জীবনের সহিত মিশিয়া যাইবে।

ইহাই অধ্যাত্মিক জীবনের পরীক্ষার উপায়। যতদিন ব্যবহারিক বিশিষ্ট ভাব ও সুখের মোহ না যাইবে, ততদিন উচ্চজীবন লাভ হওয়া অসম্ভব। নিম্নজীবনের প্রবৃত্তি ও প্রেরণা সমূহ বিনষ্ট না হইলে, উচ্চজীবনের ভাব গ্রহণ করা যায় না। বদ্ধজীবনকে বলি না দিলে, কিরূপে অনন্তজীবন লাভ করিবে? নিম্ন প্রদেশের সংস্পর্শ পরিত্যাগ কর, তবে উচ্চ প্রদেশে আরোহণ করিতে পাইবে। কিন্তু সাহস চাই, ভক্তি চাই, পূর্ণবিশ্বাস চাই। মনে কর সুগভীর গিরিগহ্বর অতিক্রম করিয়া অত্যুচ্চ শিখরাসীন, কিন্তু অদৃষ্ট, জনকের সন্নিহিত হইবার জন্য গহ্বরের উপর দিয়া পর্ব্বতের গায়ে মই লাগাইয়া ক্ষুদ্র বালক ক্রমশঃ উপরে উঠিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু মইএর অগ্রভাগে পৌছিলে মই ছাড়িয়া জনকের দিকে হস্ত প্রসারণ করিতে হইবে; জনক

হস্তদ্বয় ধারণ করত: উপরে টানিয়া লইবেন। বালক অগ্রভাগে উঠিয়া মই সংলগ্ন হস্তদ্বয় প্রসারিত করিবার পূর্ব্বে একবার নিম্নস্থ ভীষণ গহ্বরের দিকে দৃষ্টিপাত করিল; আর মই ছাড়িতে সাহস হয় না। একদিকে পিতার নিকট যাইবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়াছে; কিন্তু তখনই মনে হয় যে নিম্নস্থিত গহ্বর তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য মুখব্যাদান করিয়া আছে এবং তখনই বালক মইটাকে দুই হস্তে আরও দৃঢ় করিয়া ধরে। উপর হইতে, দৃষ্টি-বহির্ভূত পিতার আহ্বান ও পিতার আশ্বাসবাণী কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, "সিঁড়ির অবলম্বন ছাড়িয়া উপর দিকে মাথার উপর দিয়া বাহু প্রসারণ কর—আমি উপরে টানিয়া লইব"। কিন্তু বালকের ত ভয় যায় না। তাহার মনে হয় যদি সে হাত ছাড়িয়া দেয় তবে কি নিম্নস্থ গভীর গর্ত্তে পড়িয়া যাইবে না? শিখরস্থিত পিতার করযুগল তাহার নয়ন গোচর হইতেছে না,—শূন্য আকাশে অবলম্বনের উপযোগী কিছুই দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইতেছে না; কেবল জনকের বাণীমাত্র শুনিয়া সে কিরূপে মই ছাড়িয়া হস্ত বিস্তার করিবে? এই বার বিশ্বাসের শক্তি ও অনন্যশরণতার পরীক্ষা। যতক্ষণ সে পিতার আশ্বাসে পূর্ণবিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিবে, ততক্ষণ হস্ত বাড়াইতে তাহার কোন মতেই সাহস হইবে না। কিন্তু যখনই মহান বিশ্বাস বা আত্মনিবেদনে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইবে, তখনই নিঃসঙ্কোচে মই ছাড়িয়া উপরে হাত বাড়াইয়া দিবে, এবং নিমেষ মধ্যে পিতার প্রবল আকর্ষণে পিতৃসন্নিধানে নীত হইবা অভূতপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিবে। ইহাই উচ্চজীবনের নিয়ম। ক্ষুদ্র জীবন বিসর্জ্জন দিয়া মহত্তর জীবন লাভ হয়। কিন্তু যখন সেই বিষম সন্ধিমুহূর্ত্ত সমুপস্থিত হয়, তখন পরম পিতার প্রতি সেই সুমহান বিশ্বাসে অন্তর পরিপূর্ণ হওয়া চাই। সেই শূন্যতার মধ্যে উহা ভিন্ন দ্বিতীয় অবলম্বন নাই। ভগবানে বিশ্বাস থাকিলে, আমাদের ক্ষুদ্র জীবন তাঁহার চরণকমলে উৎসর্গিত করিলে আমরা সেই নিত্য ও অসীম জীবন লাভের অধিকারী হইতে পারি।

ব্যবহারিক জগতের প্রতি আসক্তি লুপ্ত হইয়াছে অথচ প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবনের সত্তা ও শক্তি অনুভূত হইতেছে না—এই সময়ে, এই সন্ধিক্ষণের শূন্যতা যে কি বিষম—কি ভীতিপ্রদ—তাহা যাহারা ভুক্তভোগী অর্থাৎ এই অবস্থায় পতিত হইয়া তাহা অতিক্রম করিতেছেন, তাঁহারা ভিন্ন অন্য কেহ

যথার্থরূপে অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু এই বাহ্যজীবন ও অন্তর্জীবনের মধ্যে ইহা ভিন্ন দ্বিতীয় পন্থা নাই ; এবং ইহাদের মধ্যে এই যে বিস্তৃত ব্যবধান আছে তাহা উত্তীর্ণ হইতেই হইবে। আপাততঃ আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইলেও, মানুষ যখন এবম্বিধ অসহায় ও নিরুপায় অবস্থায় নীত হয়, তখন সকল ব্যবহারিক জ্ঞান ও ভাব পরিত্যাগ করিয়া ও সর্ব্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তাহাকে একমাত্র নিজের উপরেই নির্ভর করিতে হয়। চতুর্দ্দিকে মহাশূন্যতা ভিন্ন আর কিছুই অনুভূত হয় না। সেই সময়েই সেই শূন্যতার, সেই অহঙ্কারের বিধ্বস্তকারী নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে, জ্যোতির্ম্ময় নিত্যবস্তুর আবির্ভাব হয়। যে কেহ পরম-আত্ম-স্বরূপ ভগবানে বিশ্বাস করিয়া, সাহসের সহিত নশ্বর পার্থিব পদার্থের ভাব ও সংশ্রব পরিত্যাগ করতঃ এই শূন্যতার মধ্যে ঝম্প প্রদান করিতে পারে নিশ্চয়ই সে অপর পারে উপনীত হইয়া নিত্যবস্তুর সহিত চিরসম্বন্ধ স্থাপন করিয়া থাকে। আমরা সর্ব্বক্ষণ ব্যক্তিগত ভাব পোষণ করি বলিয়া বিশিষ্ট বস্তু ভিন্ন ভিন্ন কিছু অনুভূত হয় না ; সেই জন্য বিশিষ্ট ভাব ত্যাগ করিতে গেলে মনে হয় যেন মহাশূন্যে পতিত হইলাম। সেই জন্য বিশিষ্ট ভাব গুলিকে ভগবানে অর্পণ করিলে ব্যক্ত ভাবের অতিরিক্ত সত্তার অনুভূত হয়।

সকল সাধকেরাই জানেন যে, যে সকল মহাত্মা এই প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই একবার এই অবস্থায় পড়িতে হইয়াছে। এ বিষম মহাশূন্যরূপ সমুদ্র যখন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে তখন আমরা শঙ্কিত না হইয়া যাহাতে অনায়াসে আনন্দসহকারে উত্তীর্ণ হইতে পারি, সেজন্য তাঁহারা নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া আমাদিগকে সাহস ও আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন। শাস্ত্রে আমরা দেখিতে পাই যখন শিষ্য গুরুর নিকট উপদেশের জন্য যাইত, তখন তাঁহাকে সমিধ্‌পাণি হইতে হইত। এই বাহ্যিক ব্যাপারের ভিতর একটি নিগূঢ় অর্থ আছে। এই সমিধ্ বা যজ্ঞকাষ্ঠের তাৎপর্য্য কি ? ইহা প্রাকৃতিক জীবনের মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম সমষ্টি। ইহাদ্বারা ব্যক্তিগত ব্যবহারিক জীবনের স্থূল এবং সূক্ষ্ম ধর্ম্ম বা লক্ষণ সমস্ত বুঝায়। এই সমস্তই আত্মযজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান কর, কিছুই অবশিষ্ট রাখিও না। নিজের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ভাবকে ও নিম্নবৃত্তিসমূহকে নিজ হস্তে

দগ্ধ করিতে, স্বহস্তে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া নিজকে নিজেই আহুতি দিতে হইবে; অন্যে করিলে চলিবে না। অতএব জীবন সম্পূর্ণরূপে—সেই সর্ব্বেন্দ্রিয়-গুণাভাষং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং নামরূপশূন্য মহান্ পরমাত্মার চরণে উৎসর্গ কর। যাহা কিছু নিজস্ব বলিয়া জান, তাহার কিছুমাত্রও রাখিও না; সমস্তই এই চিতানলে ভস্মীভূত কর। শ্মশানপতির নিকট যুক্তকরে মুক্তকণ্ঠে বল যেন তিনি এ আহুতি গ্রহণ করেন। আর তুমি এই সর্ব্ব ভস্মকারী অগ্নি হইতে যেন ভয়ে পশ্চাৎপদ হইও না। এই মহাশূন্যতার মধ্যে বিধাতার অটল নিয়মে বিশ্বাস রাখিও।

যখন ত্যাগ ধর্ম্মেই এই বিশ্ব চলিতেছে, যখন সমগ্র জগতের ভারেও এই মহাবল ত্যাগ ধর্ম্ম কিছুমাত্র অবনত হয় না, তখন আমার ন্যায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পরমাণুর ভারে কি ইহা ভগ্ন হইতে পারে? কখনই নহে। ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন কর; ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও বলবত্তর ধর্ম্ম জগতে নাই। দান কর, গ্রহণ করিও না; মুক্ত কর, বদ্ধ করিও না; আত্মবলিদান কর, আত্মসাৎ করিও না; আত্মভাবে সর্ব্ব বস্তু ও জ্ঞান লয় কর, দেখিবে শূন্যস্থান দিব্যজীবন কর্ত্তৃক অধিকৃত হইবে। নিশ্চয় জান, নিজের যাহা কিছু আছে সমস্ত ত্যাগ করিলে শূন্যতা বা পরিপূর্ণতা লাভ করিবে;—ইহাই ত্যাগ ধর্ম্মের সত্য। এটা কতদূর স্বাভাবিক দেখা যাউক। আত্মা সর্ব্বদাই পূর্ণ। এই অনন্ত পূর্ণতার মধ্য হইতে অক্ষয় জীবন নিরন্তর ভাসিয়া উঠিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। জীবন অনন্ত ও অসীম; উপাধি ঐ জীবনের প্রকাশক, সুতরাং উহা সসীম। উপাধি জীবন গ্রহণ বা আত্মসাৎ করিয়া বাঁচিয়া থাকে; জীবন আপনাকে উৎসর্গ করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যে পরিমাণে আমরা নিজস্ব বিসর্জ্জন দিয়া শূন্যতা লাভ করিতে পারি, সেই পরিমাণে নিত্যপূর্ণ অসীম জীবন চিত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ত্যাগের অবকাশ অধিকার করতঃ আমাদিগের অন্তর পূর্ণ হইতে পূর্ণতর করিয়া থাকে। অতএব নিবৃত্তিমার্গের লক্ষণ, ত্যাগ বা সন্ন্যাস; যেমন উপাধির ধর্ম্ম গ্রহণ, সেইরূপ জীবনের ধর্ম্ম ত্যাগ।

নিজের ক্ষুদ্র আমিত্বে যাহা কিছু আছে সানন্দে বিসর্জ্জন দেও, তবে অনন্ত-জীবন পাইবে। ইহাই ত্যাগধর্ম্ম। ইহাই আমাদিগের নিজের জীবনে অভ্যাস

করিতে হইবে। নিজস্ব দিলে কিরূপে বাঁচিব, সে ভাবনা করিও না; কারণ তাহা উপাধির ভাবনা; সে কেবল গ্রহণ করিয়াই জীবিত থাকে। জীবনের ধর্ম্ম তাহা নহে; কেবল অন্যকে দান করিয়াই ইহার উৎকর্ষ সাধিত হয়। ইহার নাম প্রকৃত সন্ন্যাস বা ত্যাগ; ইহাই গোপীদের ত্যাগ।

নিবৃত্তিমার্গে প্রথম প্রবেশ করিবার সময় যখন ত্যাগ ধর্ম্ম আমাদের পথ প্রদর্শকরূপে উপস্থিত হয়, তখন উহার শাসনবাণী বড়ই কর্কশ ও নিষ্ঠুর এবং উহার মূর্ত্তি বড়ই ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তথাপি উহা যত ভয়ঙ্কর হউক না কেন, তাহাতে ভীত হইও না। পরন্তু উহাতেই বিশ্বাস স্থাপন কর। এই ত্যাগধর্ম্ম, কেন আমাদিগের নিকট প্রথম প্রথম ভীতিপ্রদ ও কষ্টকর মনে হয়, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

উপাধির পক্ষ হইতে দেখিতে গেলে, ত্যাগের অর্থ উপাধির বিনাশ। উপাধি যখন দেখে যে জীবন তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছে, তখন সে ভয়ে ও দুঃখে অভিভূত হইয়া যেন জীবনের পশ্চাতে ডাকিতে থাকে। আমরাও যতদিন উপাধি বা রূপের সহিত আপনাদিগকে এক ভাবিব—যতদিন উপাধি ও রূপের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে না পারিব, ততদিন ত্যাগকে এইরূপ ক্লেশকর মনে করিব। ততদিন ত্যাগের কথা মনে করিলে আমাদের অন্তরে ভীতি ও দুঃখের সঞ্চার হইবে; ততদিন শ্যামারূপ ভয়ঙ্করী বোধ হইবে।

কিন্তু যখন আমরা আত্মারাম হইতে শিখিব, যখন দেখিব নানাবিধ রূপের ভিতর একই চৈতন্য বিরাজমান, তখন ত্যাগ যে যন্ত্রণাদায়ক নহে পরন্তু হর্ষজনক এই পরম আধ্যাত্মিক সত্য আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব; তখন বুঝিব ত্যাগে দুঃখ নাই, সুখ আছে। তখন বুঝিব দেহের পক্ষে যাহা ক্লেশ, আত্মার পক্ষে তাহা আনন্দ। ত্যাগের এই কষ্টকর ভাব তখন আমরা মোহজ বলিয়া বুঝিতে পারিব। তখন আমরা দেখিব ত্যাগে যত সুখ, ত্যাগে যত প্রীতি, ত্যাগে যত আনন্দ, ধন বল, ঐশ্বর্য্য বল, জগতের কোথায়ও কোন স্থানে, তাহা নাই। ইহাই আত্মার আনন্দময় ভাব; ইহা অতুলনীয়। এই ত্যাগশীল আত্মা তখন আপনাকে সর্ব্বজীবে প্রকাশিত দেখিতে পায়; নানাবিধ উপাধিতে আপনাকেই বিরাজিত দেখিতে পায়, এবং বিশিষ্ট সীমাবদ্ধ রূপের পরিবর্ত্তে বিশ্বব্যাপীরূপ গ্রহণ করে। ইহাই আত্মার মুক্তাবস্থা; ইহার

আনন্দ অপ্রমেয়। নিজের ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ ভাব ত্যাগ না করিলে এ আত্মাবস্থান ও এ আনন্দ অনুভব হয় না, শ্যামকে কেবল "কাল" বলিয়া বোধ হয়।

মানবজাতির পরিত্রাণের নিমিত্ত যে সকল মহাপুরুষ ধরাতলে অবতীর্ণ রহিয়াছেন, যাঁহারা এই একত্বের জ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং যাঁহারা মনুষ্যকুলের গুরু, হিতকারী ও মুক্তিদাতারূপে জগতে পরিচিত আছেন, তাঁহারা সকলেই এই আনন্দ অনুভব করিয়াছেন। শনৈঃ শনৈঃ ক্রমে ক্রমে তাঁহারা উর্দ্ধগামী হইয়াছেন, এবং এই দুস্তর শূন্যতারূপ সমুদ্র অতিক্রম করিয়া অপর পারে উপনীত হইয়াছেন। এই শূন্যতার ভিতরে পড়িয়া তাঁহাদেরও কিয়ৎকালের জন্য "বিনষ্ট হইলাম" এইরূপ ভাব হইয়াছিল, কিন্তু অপর পারে পৌঁছিবামাত্র তাঁহারা প্রকৃত জীবনের সত্তা অনুভব করিয়াছেন। এখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা সকল নাম ও রূপের অতীত এক অবস্থা অনুভব করিয়াছেন। এই উচ্চস্থান হইতে সমুদয়ই রূপই একই চৈতন্যের আধার বলিয়া মনে হয়। এখানে আসিয়া তাঁহারা দেখিয়াছেন যে একই চৈতন্য-উপাধি নির্ব্বিশেষে—উপাধির ভিতর বাহির ও তদুপরি—সকল ভাবেই—একরূপে নানা উপাধিতে বিরাজ করিতেছে এবং দেখিয়া এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে বিভোর হইয়াছেন। এই সকল মহাপুরুষগণ যে তাঁহাদের দুর্ব্বল ভ্রাতৃগণের সাহায্যে ও পরিত্রাণে সক্ষম হইয়াছেন, তাহার কারণ এই একত্ব-পরিজ্ঞান। তাঁহারা যে উচ্চ স্থানে উপনীত হইয়াছেন, তথায় সকল আত্মাই এক, ভিন্ন ভিন্ন রূপ সকল তাঁহার আপন রূপান্তর মাত্র। তিনি সকল জীবেই নিজের আবির্ভাব দেখিয়া থাকেন। তিনি অপরের আনন্দে আনন্দ লাভ করেন, অপরের দুঃখে দুঃখিত হন, দুর্ব্বলের সহিত দুর্ব্বল হন, বলীর সহিত বলবান হন;—সর্ব্ববিধ অবস্থাই তাঁহার অংশ স্বরূপ। তাঁহার নিকট পুণ্যাত্মা ও পাপীতে কোন প্রভেদ নাই; তিনি উভয়কে সমভাবে দেখেন, একজনের প্রতি প্রীতি এবং অপরের প্রতি ঘৃণা নাই। তিনি প্রত্যেক বিভিন্ন রূপের মধ্যে একই আত্মাকে দেখেন, এবং সেই আত্মার সহিত নিজের একতা অনুভব করেন। প্রস্তরে ও উদ্ভিদে, পশুতে ও দেবতায়, সাধুতে ও জ্ঞানীতে, তিনি সর্ব্বত্রই আপনার বা আত্মার সত্তা অনুভব করেন। "বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে, গরু, হস্তি ও চণ্ডালে তিনি সমদর্শী"

তিনি সর্ব্বস্থানে একই চৈতন্যের প্রবাহ দেখিতে পান ও সেই চৈতন্যের সহিত নিজের মৌলিক একতা উপলব্ধি করেন। তবে ভয় কোথায়? "তত্র কঃ শোকঃ কঃ মোহঃ একত্বমনুপশ্যতঃ"—যে এই একত্ব উপলব্ধি করিয়াছে তাঁহার শোকই বা কোথায়, মোহই বা কোথায়? এক আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই—সুতরাং ভীতির কারণ নাই।

ইহাই প্রকৃত শান্তি; ইহাই প্রকৃত জ্ঞান। এই জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত ও নিয়মিত জীবনই আধ্যাত্মিক জীবন, এবং তাহাই আনন্দ ও শান্তির আকরস্বরূপ। এই প্রেমে হৃদয় প্লাবিত হইয়া জগতও ভাসিয়া যায়। এই ত্যাগ ধর্ম্মই জীবন বা চৈতন্যের ধর্ম, এবং ইহাই পরম আনন্দের উৎস। আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে গ্রহণে প্রকৃত আনন্দ পাওয়া যায় না; উহা উপাধির ধর্ম্ম। প্রকৃত জীবন ত্যাগেই বৃদ্ধি এবং উহাই পরম আনন্দ লাভের উপায়। ফলতঃ প্রাকৃতিক সকল আনন্দই সীমাবদ্ধ; আত্মনিবেদনের আনন্দের সহিত তাহার তুলনা হয় না। গোপীর আনন্দ কামগন্ধহীন হইলেও অসীম।

যদি আমরা মুহূর্ত্তের জন্যও এই আধ্যাত্মিক জীবনের ক্ষীণ আভাস মাত্রও প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে এই নশ্বর জগতের প্রকৃত ভাব আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে; এবং সাধারণতঃ মানব যাহাকে মূল্যবান মনে করে তৎসমুদয় আমাদের চক্ষে অকিঞ্চিৎকর প্রতীয়মান হয়।

এই ত্যাগ ধর্ম্মই প্রকৃত জীবনের ধর্ম্ম, আনন্দের হেতু ও শান্তির আকর। "সোহহং" বা "আমি তাঁর" এই মহাবাক্যই উহার বাচক।

অনেকে বলিতে পারেন যে এই ত্যাগধর্ম্মের ভাব বড় উন্নত; সুতরাং ইহা আলোচনা করিতে ভাল, কিন্তু দৈনিক জীবনে অনুষ্ঠানের জন্য নহে। অতএব দেখা যাউক ত্যাগধর্ম্ম বাহ্য জগতে কি প্রকারে বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

আমরা মুহূর্ত্তের জন্যও যখন আত্মার একত্ব অনুভব করিতে শিখি, তখন জ্ঞানরূপ পুস্তকের একটি অক্ষর পরিচয় মাত্র হয়। এই জ্ঞান টুকু লাভ করিয়া এক্ষণে অন্যান্য মানুষের প্রতি আমরা কিরূপ আচরণ করিব? বাহ্য জগতে আমরা কিরূপ চলিব তাহা দেখা যাউক। মনে

কর—আমরা নীচ, পতিত, মূর্খ ও অপবিত্র একটি লোক দেখিলাম; তাহার সহিত আমাদের কোন প্রকার সম্বন্ধ বা কুটুম্বিতা নাই; লৌকিক হিসাবে তাহার প্রতি আমাদের কোন কর্ত্তব্যও নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি? না, তাহা পারি না। কারণ এই ত্যাগধর্ম্মের বলে আমরা আত্মার একত্ব অনুভব করিয়াছি। এক্ষণে সেই পতিত ব্যক্তি আমাদের সম্মুখীন হইলে, আমরা তাহাতেও সেই এক আত্মার বিকাশ বা রূপ দেখিতে পাইব। আর তাহার বাহ্যিক রূপ ও ভাব আমাদের দৃষ্টিপথ বদ্ধ করিতে পারিবে না; ফলতঃ তাহার সহিত আমাদের কোন পার্থক্যই অনুভব করিব না। আমরা বুঝিব সে ও আমরা এক। এই কারণে সাধারণ লোকে যাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে ত্যাগধর্ম্মানুষ্ঠান-কারী তাহাকে দয়ার চক্ষে দেখিবেন। এই ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে অন্তরে ঘৃণার পরিবর্ত্তে প্রেমের সঞ্চার হইবে এবং ঔদাসীন্যের পরিবর্ত্তে কোমলতা আমাদের হৃদয় অধিকার করিবে। সকলের প্রতি এই প্রকার করুণ ব্যবহারেই পরম ত্যাগধর্ম্মশীল ব্যক্তি সাধারণে বিখ্যাত। তিনি বাহ্যিক রূপের উৎকর্ষতা বা নিকৃষ্টতা দেখেন না; জীবের অবস্থা বা স্থান দেখেন না; কেবল অভ্যন্তরস্থ আত্মাকেই দেখেন। সুতরাং যে স্থলে লৌকিক বা ধর্ম্ম ব্যবহার মতে বা কাহারও প্রতি কোন কর্ত্তব্য নাই, সেখানেও তাঁহার আত্মবিসর্জ্জন দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ বাহ্যিক জগতেও তাঁহার কার্য্যের অভাব নাই; এবং এই দৈনিক ব্যবহারিক জীবনেও এই ত্যাগধর্ম্মের অনুষ্ঠান অসম্ভব নহে; পরন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্যাগেই জীবনের মাধুর্য্য।

যদি মহাজ্ঞানী ত্যাগধর্ম্মশীল ব্যক্তি, অজ্ঞানী ও মূর্খের সংস্পর্শে আসেন, তিনি সাধারণ গর্ব্বিত জ্ঞানী লোকের ন্যায় মূর্খকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন না, বা আপনাকে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বা তাহা হইতে পৃথক মনে করিবেন না? জ্ঞান যে তাঁহার নিজের সম্পত্তি, এ ধারণা তাঁহার নাই; তিনি জানেন উহা সকলের, সাধারণ সামগ্রী। তিনি জানেন যে জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়েই এক আত্মার প্রকাশ, উভয়ের ভিতর একই চিন্ময় আত্মা সমভাবে বর্ত্তমান। তিনি জানেন যে অল্প ঐকদেশিক জ্ঞানই অজ্ঞানরূপে প্রতিভাত। তিনি স্বীয় পৃথক রূপে এই জ্ঞানাংশ ধারণ করিয়াছেন, অপরে পৃথক রূপে মূর্খতাংশ ধারণ

করিয়াছে। তিনি এই মূর্খকে তাঁহার জ্ঞানের অংশীদার করিয়া তুলেন আত্মার একতা অনুভব করিয়াছেন বলিয়া, তিনি রূপের পার্থক্যে সেই মৌলিক একতা হারাইয়া ফেলেন না।

জগতের অন্যান্য পার্থক্য সম্বন্ধেও এই কথা। যিনি মহা ত্যাগধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছেন, তিনি আত্মার একতা অনুভব করিয়াছেন। তিনি উপাধি বা রূপ দেখেন বটে; কিন্তু অন্তঃস্থিত চৈতন্যে কোন পার্থক্য দেখেন না। সুতরাং তিনি যে জ্ঞান অর্জ্জন করেন, সকলকেই তাহার অংশ প্রদান করেন। তিনি তাঁহার নিজের পৃথক সীমাবদ্ধ ভাব হারাইয়া ফেলেন এবং কেবল চৈতন্যের আংশিক প্রকাশহেতু উপাধি বলিয়া আপনাকে গণ্য করেন মাত্র। যখন তিনি উপলব্ধি করেন যে উপাধি উচ্চজীবন লাভের হেতুমাত্র—উহা চৈতন্যের বিকাশ যন্ত্রস্বরূপ—তদ্ব্যতীত অন্য কিছু নহে, তখন হইতে এই একতার ভাব ভিন্ন আর সকল ভাব ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। তিনি আপনাকে এই দুঃখময় পৃথিবীর অংশীভূত বিবেচনা করেন। তখন তিনি মানব মাত্রের দুঃখকে নিজের দুঃখ, মানবজাতির পাপকে নিজের পাপ, মানবজাতির দুর্ব্বলতাকে নিজের দুর্ব্বলতা মনে করেন। তিনি এইরূপে আত্মার একত্ব উপলব্ধি করেন এবং সকল বাহ্যিক পদার্থের মধ্যে একমাত্র অন্তঃস্থিত আত্মাকে দেখিতে থাকেন। কেবল এই প্রকারেই আমরা নিত্যজীবন লাভ করিতে পারি এবং সর্ব্বদা নিত্য বস্তুতে বাস করিতে সক্ষম হই।

শ্রুতি বলেনঃ—"যাহারা প্রভেদ-দর্শী তাহারা মৃত্যু হইতে মৃত্যুতেই উপাগত হয়।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্যক্তি একরূপ বা বস্তুকে অন্য রূপ বা বস্তু হইতে পৃথক মনে করে, সে সর্ব্বদাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়; কারণ রূপ ভিন্ন সে অন্য কিছু দেখিতে পায় না; তাহার চিত্ত রূপের মধ্যেই সর্ব্বদা আবদ্ধ, এবং রূপ যেমন প্রতিমুহূর্ত্তে বিনাশ প্রাপ্ত হয় তাহারও সেইরূপ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে রূপের সহিত বিনাশ সংঘটিত হয়। ফলতঃ প্রভেদকারক রূপই মৃত্যুজনক এবং একত্বজ্ঞাপক আত্মাই জীবন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে পরিমাণে আমরা পরস্পরের বাহ্যিক ভেদজ্ঞান শূন্য হইয়া অন্তঃস্থিত ঐক্যভাব অনুভব করিতে পারি এবং

সকলের অন্তরে একই আত্মা আছেন,—সুতরাং বাহিক উৎকৃষ্টতা লাভে গর্ব্বিত হইবার কিছু নাই, ইহা সম্যকৃরূপে বুঝিতে পারি, সেই পরিমাণে আমরা প্রকৃত অধ্যাত্মিক জীবন লাভ করিতে সমর্থ হই।

এইটি মহাত্মা ঋষিদিগের শেষ উপদেশ বলিয়া মনে হয়। ইহা ভিন্ন অন্য কিছু আধ্যাত্মিক নহে; প্রকৃত জ্ঞান ইহা ব্যতীত অপর কিছু নহে। প্রকৃত জীবন ইহা ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

যদি কোন ব্যক্তি এক মুহূর্ত্তের জন্যও এই প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবনের মহত্ত্ব ও সৌজন্য অনুভব করিতে পারে, যদি মুহূর্ত্তকালের জন্যও তাহার ভেদ-জ্ঞান ও পার্থক্যভাব তিরোহিত হয়, তাহা হইলে সেই মহত্ত্বে ও সৌন্দর্য্যে তাহার হৃদয় এমন বিমোহিত হইবে যে পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য্য তাহার পক্ষে কুশ্রী, সকল সুখসম্পদ আবর্জ্জনামাত্র, এবং সকল ধনসম্পত্তি ধুলিবৎ প্রতীয়মান হইবে। ফলতঃ যে ব্যক্তি একবার এই একত্ব ভাব অনুভব করিয়াছেন, ব্যবহারিক সকল পদার্থ সকল আনন্দই তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়।

এ ভাবটি একবার হৃদয়ঙ্গম করিলেও ভেদভাবাপন্ন মনুষ্য জীবনের মধ্যে, বাসনার কুহকে ও মোহান্ধকারে সর্ব্বদা হৃদয়ে উহা জাগরূক রাখা বড়ই দুষ্কর। কিন্তু এই ভাব অতি সামান্য ক্ষণের জন্যও একবার অন্তরে প্রকাশিত হইলে জীবন প্রবাহ ফিরিয়া যায়, সমস্ত পৃথিবীর অবস্থা পরি-বর্ত্তিত হয়। আত্মার মহত্ত্ব ও আত্মার গৌরব একবার নিরীক্ষণ করিলে আধ্যাত্মিক জীবন ভিন্ন অন্য জীবন দুর্ব্বিসহ মনে হয়।

এই আধ্যাত্মিক জীবন—এই পরম জ্ঞান আমরা কিরূপে অর্জ্জন করিতে পারি? কিরূপে এই আধ্যাত্মিক জীবন আমরা লাভ করিতে পারি? হঠাৎ বা কোন বিশেষ প্রক্রিয়ায় দ্বারা এ জীবন লাভ হয় না। দৈনিক জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে সর্ব্বদা আত্মভাবে ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে; সর্ব্বভাবেই আত্মনিবেদন অভ্যাস করিতে হইবে। চিন্তাস্রোত সেই একতার দিকে প্রবাহিত করিবে, প্রত্যেক বাক্য ও কার্য্যকে সেই একতার দিকে প্রধাবিত করিতে শিখিবে। সংক্ষেপতঃ কায়মনোবাক্যে সেই এক নিত্য-বস্তুতে যুক্ত হইতে ও তাঁহাকে ভালবাসিতে ও তাঁহাতে আপনার ব্যবহারিক

জ্ঞান, বৃত্তি ও কর্ম্ম হারাইয়া ফেলিতে শিখিতে হইবে। কেবল তাহাই নহে, জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে ইহাই অভ্যাস করিতে হইবে। সুযোগ উপস্থিত হইলে অপরকে অগ্রবর্ত্তী হইতে দিয়া আপনাকে পশ্চাদ্গামী করিতে হইবে। কাহারও অভাব দেখিলে অগ্রে তাহা পূর্ণ করিবে। নিম্ন বৃত্তিসমূহকে ও ব্যবহারিক সত্তা এবং ভাব গুলিকে একেবারে আত্মাতে নিয়ন্ত্রিত করিবে, তাহাদের কোন কথায় কর্ণপাত করিবে না। *ফলতঃ এই দুরারোহ উন্নত পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিতে হইলে অধ্যবসায় সহকারে এই পথে সর্ব্বদা অগ্রসর হইতে হইবে। এতদ্ব্যতীত দ্বিতীয় পন্থা নাই। নির্ব্বাণ বা মুক্তি হস্তামলক ভাবে পাইয়াও, জীবের প্রতি করুণাবশতঃ এবং ভগবানের সেবার জন্য ত্যাগকে আমরা মহান্ ত্যাগ বলিয়া থাকি এবং যাঁহারা এইরূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন তাঁহাদের উদ্দেশে আমরা প্রণাম করিয়া থাকি। অনেকে মনে করেন যে তাঁহারা নির্ব্বাণের সম্মুখীন হইয়া হঠাৎ এই ত্যাগ করিয়া ফেলেন; কিন্তু তাহা নহে। স্বপ্নেও ভাবিও না যে, নির্ব্বাণের পরম নিবৃত্তির দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া যেমন তাঁহারা পৃথিবীস্থ জীবের করুণ আর্ত্তনাদ শ্রবণ করতঃ সাহায্যার্থ প্রত্যাগমন করিলেন, অমনই সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহাদের এই মহান্ ত্যাগ স্বীকার করা হইল। স্বপ্নেও ভাবিও না যে এক মুহূর্ত্তমধ্যে এই মহান্ ত্যাগ এই আত্মনিবেদন ও আত্মবিসর্জ্জন সাধিত হয়। তাঁহারা অতীত শত শত জীবনে পুনঃ পুনঃ এইরূপ ত্যাগ সাধন করিয়া আসিয়াছেন। দৈনিক জীবনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্যাগের দ্বারা, অবিচ্ছিন্ন দয়াশীলতা, এবং করুণার দ্বারা ও বারংবার আত্মোৎসর্গের দ্বারা ইহার সাধন করিয়া আসিয়াছেন; নির্ব্বাণের শেষ সোপানে উপনীত হইয়া শেষ মুহূর্ত্তে হঠাৎ এই ত্যাগ করিয়া ফেলেন নাই। পরন্তু তাঁহাদের অতীত জীবনে নিরন্তর সাধনের দ্বারা এই ভাব তাঁহাদের জীবনের শুকতারা বা কেন্দ্রস্বরূপ হইয়াছিল; তাই যখন নির্ব্বাণ তাঁহাদের করতলগত, যখন পদমাত্র অগ্রসর হইলেই তিনি সংসারের সকল বন্ধন হইতে একেবারে বিমুক্ত হইয়া অনন্তকালের জন্য অপার আনন্দের অধিকারী হইতে পারেন, তখন—সেই শেষ মুহূর্ত্তেও, সেই বিষম পরীক্ষাস্থলে সেই চিরভ্যস্ত ত্যাগের ও আত্মবিসর্জ্জনের ভাব তাঁহারা নিরোধ করিলেন না বা করিতে পারিলেন না। জগতের ইতিহাসে অসংখ্য ত্যাগ স্বীকারের

ও আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত মধ্যে তাঁহাদিগের এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সকল লিপিবদ্ধ করিয়া যাইলেন।

আমরা যদি এই ত্যাগমার্গ অবলম্বন করিতে চাই, তবে এই মুহূর্ত্তেই আমাদের ক্ষুদ্র জীবনে এই মহান্ আত্মত্যাগের সূত্রপাত করিতে পারি। যদি আমরা দৈনিক জীবনে লোকের প্রতি নিত্যব্যবহারে ইহার সাধন না করি, তবে নিশ্চয় জানিও যে নির্ব্বাণের সমীপবর্ত্তী হইলে এ মহান্ ত্যাগ ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে কখনই পারিব না। এ মহান্ ত্যাগ সাধন করিতে হইলে দৈনিক জীবনে সর্ব্বদা তাহার অভ্যাস করিতে হইবে; নিরন্তর মোহ-বশীভূত না হইয়া, এই আত্মোৎসর্গ ও আত্মনিবেদন শিক্ষা করিতে হইবে। আমরা মহৎ কর্ম্ম ও কর্ম্মবীরের কার্য্যকলাপ আলোচনা করিয়া থাকি, জীবনের সুকঠিন পরীক্ষার কথাও ভাবিয়া থাকি। আমরা মনে করি যে শিষ্যের জীবনে কেবলই পরীক্ষা, শিষ্যত্ব কেবল বৃহৎ পরীক্ষার জন্য। শিষ্য তাহা জানিয়া তাহার জন্য প্রস্তুত হয় এবং সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে থাকে, এবং অবশেষে একটীবারমাত্র মহৎ চেষ্টার বলে—একবার মাত্র সাহস প্রকাশের ফলস্বরূপ সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিজয়লাভ করে। কিন্তু তাহা নহে। এইরূপ দুই একটি বৃহৎ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই শিষ্যের জীবনে পূর্ণতা লাভ হয় না। শিষ্যের জীবন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং লোক-চক্ষু হইতে প্রচ্ছন্ন ত্যাগসমূহে সংগঠিত। ইহা নিত্য ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত; আজীবনব্যাপী আত্মোৎসর্গের দ্বারা পরিপূর্ণ। অনন্ত জীবন লাভ করিবার জন্য শিষ্যকে সর্ব্বদা প্রতিনিয়ত আত্মত্যাগ করিতে হয়। অথচ সেই ত্যাগের মূলে বিরক্তি নাই, শ্মশান বৈরাগ্য নাই, ভেদজ্ঞান নাই ও অহংকার নাই। তাহার মূলে "কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি" ও "জীবে দয়া" বর্ত্তমান। যদি কেবল একটি মাত্র বৃহৎ ক্রিয়ার দ্বারা প্রকৃত শিষ্যত্ব লাভ করা যাইত তাহা হইলে কর্ম্মবীর হইতে শিষ্য মহত্তর কিসে? কি গৃহস্থাশ্রমে, কি কর্ম্মস্থলে, কি সহরে কি বাজারে—এমন কি সামান্য দোকানেও শিষ্যজীবন সংগঠিত হইতে পারে। যে আপনাকে ভুলিয়া অপরের জন্য প্রাণ ঢালিয়া দেয়—যাহার পক্ষে ত্যাগ এত "সহজ" ও সামান্য, যে তজ্জন্য কোন চেষ্টার, কোন বিশিষ্ট কৃচ্ছ্রসাধ্য উদ্যম বা প্রয়াসের আবশ্যকতা হয় না—যেন তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সহজ,

সেই প্রকৃত ত্যাগধর্ম্মশীল। ইহাই প্রকৃত সন্ন্যাস। "নিরগ্নি" হইলে বা কৌপীনবস্ত্রধারণ করিলেই প্রকৃত সন্ন্যাস হয় না। আমরাও যদি এই প্রকৃত সন্ন্যাস গ্রহণ করি—যদি আত্মোৎসর্গ আমাদের জীবনের ব্রত হয়, যদি ত্যাগই আমাদের মন্ত্র হয়, যদি অধ্যবসায় সহকারে সর্ব্বজীবে, বেষ্টি ও সমষ্টিভাবে, পরমাত্মার বিকাশ বা প্রকাশ অপরিস্ফুট ভাবেও হৃদয়ঙ্গম করিয়া নিরন্তর পরের জন্য জীবন ঢালিয়া দিই—যদি ভগবান বা আত্মাকে ব্যক্তভাবাতীত, বিভিন্ন ভাবের একীকরণকারী মহান একত্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি এবং প্রতিক্ষণে, প্রতি কর্ম্মের ভাবের ও প্রযত্নের একমাত্র উদ্দেশ্য ও গতি বলিয়া জানিয়া কর্ম্ম সাহায্যে ভেদাত্মক কেন্দ্ররূপ আমিকে ত্যাগ করিয়া—সেই একরস পরম একতাকে অবলম্বন করিতে পারি, তাহা হইলে আমরাও একদিন আধ্যাত্মিক জীবনের এই দুরধিগম্য পবিত্র পর্ব্বত শিখরে উন্নীত হইব এবং দেখিব যে আমরাও এই মহান্ ত্যাগ বিনা আয়াসে সাধন করিয়া ফেলিয়াছি। তখন আর স্বপ্নেও ভাবিব না, যে ইহা ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম হইতে পারে। ফলতঃ ক্ষুদ্রজীবনের ঘটনার ও বিষয়ত্যাগে অভ্যস্ত হইয়া আসিলে. যথার্থ মহান্ ত্যাগের সময় আর তাহাকে ত্যাগ বলিয়া জানিতে পারিব না। তখন উহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সহজ বলিয়াই বোধ হইবে। ভক্তিভাবে ব্যবহারিক জ্ঞান, ক্রিয়া ও প্রযত্ন সকল, সর্ব্বজীবের আত্মস্বরূপ ভগবানে অর্পণ করিতে করিতে ত্যাগধর্ম্ম প্রেমময় ও মধুর ভাবে দেখিতে শিখিব। সর্ব্বভাবের মধ্যে কিরূপে বা একরশ জ্ঞানরূপে বর্ত্তমান—শ্রীভগবান লৌকিক বা ব্যবহারিক জ্ঞান সমর্পণ করিতে করিতে, ত্যাগের ভিতরে জ্ঞানময় পরমাত্মার অনুভূতি করিতে শিখিব। সুতরাং এই মহান্ আত্মনিবেদন বা নিশেষিতরূপে আমাকে বিসর্জ্জনের সময়, হৃদয়ে কঠোরতা অন্ধকার বা মোহ আসিতে পারিবে না। পরন্তু সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়াও পরম প্রেম ও অদ্বয় জ্ঞানের স্রোতে হৃদয় প্লাবিত হইবে। এই প্রকৃত সন্ন্যাস লাভ করিতে হইলে, এখন হইতেই তদ্বিষয়ে মনোযোগী হও। অতএব মহান্ ত্যাগ বা সন্ন্যাসের আরম্ভও ক্ষুদ্র জীবনেই করিতে অভ্যাস কর। ওঁ

শ্রীশিশির কুমার ঘোষাল।

যোগক্ষেম।

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"—গীতা, ৯।২২।

"অন্য দেবতার উপাসনা না করিয়া আমাকে চিন্তাকরতঃ যাঁহারা উপাসনা করেন, আমি সর্ব্বপ্রকারে মৎপরায়ণ তাঁহাদের যোগক্ষেম (সমাধি এবং তৎসংরক্ষণ বা মোক্ষ) বহন করি।" ৯।২২।

"যোগক্ষেম" শব্দের অর্থ—"অপ্রাপ্তস্বীকারো যোগঃ প্রাপ্তপরিপালনং ক্ষেমঃ" অর্থাৎ "অলব্ধবস্তু লাভ ও লব্ধবস্তু রক্ষা।" সমস্ত প্রার্থনীয় বস্তুর পূরণ-কর্ত্তা একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কেহই নয়। মানব-জীবনের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ—কি পরিবারে, কি কার্য্যক্ষেত্রে, কি সামাজিক ব্যবহারে, কি রাজ-দ্বারে, কি সাধনমার্গে,—যখন যাহা কিছু লাভ করা যায়, তৎসমস্তই সেই সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থিত একমাত্র ভগবান্ হইতে আসিয়া থাকে। সকলের অন্তর্য্যামী নিয়ন্তারূপে তিনি প্রতিক্ষণই যাহার পক্ষে যাহা কিছু মঙ্গলকর, তাহাই তাহাকে বিধান করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা, সর্ব্বভূতের কর্ত্তৃত্বের মূলে যে ভগবান্ বিরাজ করেন, তাহা বুঝিতে পারে না; যাহারা রাগ ও দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া নিজকেই কর্ত্তা মনে করিয়া থাকে; তাহারা সর্ব্বান্তরগত অখণ্ড ভগবৎসত্তা উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইয়া আপনাপন অদূরদৃষ্টিবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে স্ব স্ব সুখদুঃখাদির কারণ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে যাঁহাদের চিত্তক্ষেত্র নির্ম্মল ও প্রশান্ত হইয়াছে, যাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাঁহাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ও প্রযত্ন ভগবানের বিশ্ব-বিধানের কল্যাণময়ী ইচ্ছায় নিবেদিত হইয়াছে, তাঁহাদের সেই শুদ্ধসত্তাও বিশ্বব্যাপী ও বিশ্বাতীত ব্রহ্মসত্তায় উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। জগতের প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে তাঁহারা অভিন্নরূপে সংবদ্ধ থাকায়, তাঁহাদের অন্তরস্থিত সেই শান্ত ও প্রসন্ন অখণ্ড জ্যোতিঃ প্রত্যেক বস্তুর অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া, উহাকে সুন্দর ও মহিমান্বিত রূপে প্রতিভাত করিয়া থাকে; এবং তাহা হইতে যুগপৎ সুললিত একতান বিনির্গত হইয়া বিশ্বের মধুর একত্ব প্রতিপাদন করে। ইহাই "বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব" বা Universal Brotherhood। তখন

তাঁহারা সেই পূর্ণস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব পরব্রহ্মে নিত্য সমাধিস্থ থাকিয়া সর্ব্বত্রই অবিচ্ছিন্ন সমত্বে ও পূর্ণত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তাঁহাদের আর কিছুই প্রার্থনীয় থাকে না, সর্ব্বত্রই কেবল মঙ্গলজ্যোতিঃতে পরিপূর্ণ দেখেন। তখন মোক্ষ আপনা হইতেই তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করে।

'যোগক্ষেম' আপেক্ষিক ভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর যোগক্ষেম লাভের তারতম্য হইয়া থাকে। সকল মানবের চরমলক্ষ্য এক হইলেও, শিশুর পক্ষে শৈশবকালে যাহা প্রয়োজনীয়, একজন বিষয়ী লোকের পক্ষে সংসারক্ষেত্রে তাহা প্রার্থনীয় নহে। আবার একজন বিষয়-বিতৃষ্ণ মুমুক্ষুর পক্ষে সাধনমার্গে তাহা কখনও অবলম্বনীয় হইতে পারে না। যাহার জীবনের অভীষ্ট পদার্থ যখন যে ক্ষেত্রের সাধনীয় হইবে, তাহার তদুপযোগী সিদ্ধি লাভই সংঘটিত হইবে।

মানবজীবনের পূর্ণবিকাশের প্রারম্ভে অভিজ্ঞতা বা ভোগই প্রধান সাধনরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। লব্ধ ভূয়োদর্শন সংরক্ষণ ও অনাগত বহুদর্শিতা অর্জ্জন দ্বারাই এই বিকাশ সংঘটিত হইয়া থাকে। কি পারিবারিক, কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি ধর্ম্মনৈতিক সর্ব্ব অবস্থাতেই অর্জ্জিত জ্ঞানকে আত্মস্থ করিয়া সময়োপযোগী নূতন জ্ঞানলাভের জন্য চিত্ত স্বতঃই ধাবিত হয়। জীবনের প্রথমাবস্থায় সচরাচর লোকে বিশুদ্ধ জ্ঞানাপেক্ষা জ্ঞানের আধারভূত বাসনাজড়িত বাহ্যবিষয়ের প্রতিই অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া উহার রক্ষা ও অর্জ্জনে এবং অধিকতর সাক্ষাৎ ভাবে কিছু পাইতে হইলে ও তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যোগ সংস্থাপন করিতে হইলে, শক্তি নিয়োগ করিয়া থাকে। কিন্তু ভগবানের নিকট হইতে অগ্রে ব্যক্তিগত যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই তাঁহার চরণে বিসর্জ্জন দিয়া, সর্ব্বতোভাবে তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিতে হইবে। নিজের ব্যক্তিগত 'যোগক্ষেমের' অতীত হইতে হইবে। ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষাকে সংযত করিয়া প্রসারিত না করিলে মহত্তর আকাঙ্ক্ষা কখনও অন্তরে জাগ্রত হইতে পারিবে না। তাই গীতায় উক্ত হইয়াছে,—

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্" ॥ গীতা, ২।৪৫।

"হে অর্জ্জুন, বেদ সকল [সকাম ব্যক্তিগণের] কর্ম্মফলপ্রতিপাদক, তুমি ত্রৈগুণ্যরহিত (নিষ্কাম) হও ; শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বরহিত হও ; নিত্য শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিত হও ; 'অলব্ধবস্তু লাভ ও লব্ধবস্তু রক্ষায়' যত্নশূন্য হও এবং অপ্রমত্ত অর্থাৎ অনাসক্ত হও"।

'যোগক্ষেম' শব্দ, সাধারণতঃ লোকের চিরাকাঙ্ক্ষিত আদর্শবস্তু লাভ ও সযত্নে তাহার সংরক্ষণ অর্থে বর্ণিত হইয়া থাকে। রামায়ণে এই 'যোগক্ষেম' শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অযোধ্যাকাণ্ডের দ্বাদশাধিকশততম সর্গে চিত্রকূটস্থিত নির্ব্বাসিত শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভরতের উক্তিতে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়,—"অনন্তর ভরত দিবাকরের ন্যায় তেজস্বী দ্বিতীয়ার চন্দ্রের ন্যায় সুদর্শন রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আর্য্য! এক্ষণে আপনি পদতল হইতে এই কনকখচিত পাদুকা যুগল উন্মুক্ত করুন, অতঃপর ইহাই লোকের "যোগক্ষেম" বিধান করিবে।"

সাধন মার্গের প্রারম্ভে স্বভাবতঃই লোকের মনে হয় যে, পরমেশ্বর আমাদের যে অভাব মোচন করিয়া করিয়া থাকেন, তাহাত তিনি নিজ হাতে করেন না, আমাদের নিজের চেষ্টায় বা অন্য লোকের মধ্যবর্ত্তিতায় তাহা সম্পাদন করিয়া থাকেন। কিন্তু যখন সাধক সম্পূর্ণরূপে যোগযুক্ত হইয়া সর্ব্বভূতে একমাত্র আরাধ্যদেবেরই অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করেন, সর্ব্বক্ষণ নানা আধারে নানা ভাবে কেবল তাঁহারই লীলারসে মগ্ন থাকেন, তখন কেবল একমাত্র তাঁহাকেই "যোগক্ষেমের" বহনকারী বলিয়া পরিচয় প্রাপ্ত হন। এ সম্বন্ধে "ভক্তমাল" গ্রন্থের দ্বাদশ মালায় গীতার সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার ভক্তপ্রবর অর্জ্জুন মিশ্রের একটী আখ্যায়িকা আছে। মিশ্র মহাশয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন, সুতরাং আখ্যায়িকাটি ঠিক বৈষ্ণব ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। একে ত মিশ্র মহাশয়ের ন্যায় ভক্তচরিতের পবিত্রকথা, তাহাতে আবার পরমভক্ত লালদাস বাবাজীঠাকুর এরূপ সরল প্রাণস্পর্শী মধুর ছন্দে বিষয়টী বর্ণনা করিয়াছেন যে, পড়িতে পড়িতে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। কিন্তু বিস্তৃতি ভয়ে 'পন্থার' পাঠকগণের সুবিধার জন্য আখ্যায়িকাটি উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

শ্রীরামচন্দ্র চৌধুরী।

পঞ্চীকরণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ৷)

নব্যজ্ঞান প্রকাশকদিগেরশাস্ত্রে নিপুণতা ও বিজ্ঞতা এবং দক্ষতার ধন্যবাদ করিতে হয়; যেহেতু ইহারা বিষ্ণুর দশাবতার বর্ণনার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে অষ্টমাবতার বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। ইহাও কি বর্ণন কালে তাঁহাদের মনে উপস্থিত হয় নাই যে, অশাস্ত্রীয় বাক্যে লোকের হাস্যাস্পদ হইতে হয়। কারণ, কোন শাস্ত্রেই যুগাবতার ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণকে দশাবতার মধ্যে উক্ত করেন নাই; যথা শ্রীভাগবতে নন্দং প্রতি গর্গ বাক্যং—"আসন বর্ণাস্ত্রয়োহস্য গৃহ্নতোহনুযুগং তনূঃ। শুক্লোরক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।" গর্গ কহিয়াছিলেন "হে নন্দ! এই তোমার পুত্রের আরও বর্ণত্রয় আছে; প্রতি যুগেই লোকহিতার্থে রূপান্তরে অবতার হয়েন; সত্যযুগে শুক্লবর্ণ নাম শুক্ল, ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ নাম রক্ত, এই দ্বাপরযুগে কৃষ্ণবর্ণ নাম ও কৃষ্ণ, আগত কলিতে পীত অর্থাৎ গৌরবর্ণ নাম গৌর। এই যুগাবতার প্রসঙ্গে কৃষ্ণাবতার আখ্যাত হয়। পরন্তু দশাবতার প্রমাণে কৃষ্ণনাম উক্ত হয় নাই।

যথা—"মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা। রামোরামশ্চ রামশ্চ বুদ্ধকল্কী চ তে দশ।" এবং রামায়ণান্তরে—"বনজৌ বনজৌ খর্ব্বী ত্রিরামা বুদ্ধকল্কিনৌ।" অষ্টম অবতার শ্রীবলরাম, কিন্তু তত্নপাখ্যানকে মুখেও আনা হয় নাই; কেবল শ্রীকৃষ্ণের মনুষ্যত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্যই সমস্ত যত্ন। শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবানের মনুষ্যাবতার, তাহা সর্ব্ব শাস্ত্র উক্ত করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগের ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন কি? যেহেতু সর্ব্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণ যথার্থ মনুষ্যের ন্যায় কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন; তাহার লক্ষ লক্ষ প্রমাণ আছে। কিন্তু তন্মধ্যে বিশেষ বিবেচনা করিলেই স্থির করিতে পারা যায় যে, ঈশ্বর ব্যতীত সর্ব্বমনোহারিত্ব-শক্তি প্রাকৃত ব্যক্তিতে সম্ভবে না; এবং যৎকালে শ্রীকৃষ্ণ অবতার হইয়া মনুষ্যবৎ কর্ম্ম সাধন করিয়াছিলেন, তৎকালে জাত মনুষ্যেরা যদ্যপি তাঁহার অলৌকিক অমানুষিক ঐশ্বরী ক্ষমতা অবলোকন না করিতেন, তবে কি তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া মান্য করিতেন। যদি বল, সকলে "তৎকালে তাঁহাকে ঈশ্বর বলেন নাই; তাহার প্রমাণ শিশুপাল, জরাসন্ধ, দুর্য্যোধন, প্রভৃতি রাজারা তাঁহাকে গোপোচ্ছিষ্টভুক্ ও

গোপীজার, দুরাত্মা বলিয়া তাঁহাকে নিন্দা করিয়াছেন।" উত্তর এই যে, ইহা সত্য; কিন্তু যে সকল এতদ্রূপ উক্তি আছে, সেই সকল শাস্ত্রেই তত্ত্বদ্ব্যক্তির উক্তিতে পুনর্ব্বার ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। ভারতোক্ত পাণ্ডবগীতায় দুর্য্যোধন শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়াছেন, যথা, "জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তি, র্জানাম্য ধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি যথা করো- মীতি" এবং শিশুপালও সভাপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণনিন্দা করণানন্তর চক্রাহত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব করেন এবং মরণানন্তর সর্ব্বলোকের সাক্ষাতে তদ্দেহোত্থিত তেজ উল্কার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ চরণে লীন হইয়া যায়। ইহাও যদি বিশ্বাস যোগ্য না হয়, তথাপি লৌকিক যুক্তি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যৎকালে দেশাধি- পতি মহাবলবান্ জরাসন্ধ ও শিশুপাল প্রভৃতি রাজারা শ্রীকৃষ্ণের বিদ্বেষী ছিলেন, তৎকালে পৃথিবীস্থ বহুতর লোক তাঁহাদিগের বশীভূত থাকিয়াও তদভিপ্রায় গ্রহণে কেহই শ্রীকৃষ্ণকে অনীশ্বর জ্ঞান করেন নাই, এবং তদুপা- সনায়ও বিরত হয়েন নাই। বরং ঐ সকল ভূপতিগণকে ঈশ্বরদ্বেষ্টা পাষণ্ড ও অসুর বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অধুনা ভক্তিতত্ত্বজ্ঞান প্রকাশকেরা আপনাদিগের অভিপ্রায়ানুসারে কালবশতঃ ধর্ম্মশৈথিল্যপ্রযুক্ত যদ্রূপ অভিনব বালকদিগের যথেষ্টাচার দৃষ্টে, তাঁহাদিগের মনোরঞ্জনের কারণ এক মনোহারিণী সভা স্থাপনা করিয়াছেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের কেলি কৌতুক রসা- ন্বিত চরিত্র বর্ণনাকেও মনোরঞ্জনের কারণ বলিয়া তদুপাসনাকে আখ্যাত করেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, তাঁহারা ইহার কারণানুসন্ধানে বিমুখ হইয়া ঈশ্বরোপাসনার প্রতি এ [illegible] রাত্ম্য প্রকাশ কেন করেন? যৎকালে পুরাণ তন্ত্র ভারতাদি ইতিহাস গ্রন্থে কৃষ্ণলীলা প্রকাশ ছিল, তৎকালে কি এরূপ কেহই সদ্ধর্ম্মিষ্ঠ বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিত ছিলেন না যে, শাস্ত্র বক্তা বেদব্যাস প্রভৃতির এ চাতুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন? বিশেষতঃ বেদব্যাসাদির ও এ চাতুর্য্যের ফল কি? তাঁহারা অর্থলোভী ছিলেন না এবং লোক প্রতিপত্তির প্রার্থনাও করেন নাই; নির্জ্জন বনস্থলে ও গিরিগহ্বরে বাস করিয়া ফল মূল সেবনে ও গলিত পত্রাসনে তপস্যা ধর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া মিথ্যা প্রবঞ্চনা বাক্য রচনা দ্বারা এই দুর্ভাগ্য মনুষ্যগণের পরকালের দক্ষিণাস্ত করা কি তাঁহাদিগের ইষ্ট ছিল, যে তজ্জন্য নষ্টশীল, কদাচারী, মহাপারদারিক, লম্পট, শঠ, চৌর, প্রাকৃত গোপবালক কৃষ্ণের উপাসনার অনুশাসন করিয়াছিলেন? গৌতমা-

চার্য্যও কি তদ্রূপ প্রবঞ্চক ছিলেন, যে, ন্যায়ের কুসুমাঞ্জলির প্রথম মঙ্গলাচরণে গোপবেশ শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন নিমিত্ত প্রণাম জন্য সূত্র লিখিয়াছিলেন, যথা, "কোপি গোপতনয়ো নমস্যতে" ইত্যাদি? ন্যায়ের টীকাকারেরও ঐরূপ আদৌ নমস্কার সূত্র; যথা:—

"নূতন জলধররচয়ে গোপবধূটীদুকূলচৌরায়।
তস্মৈ নমঃ কৃষ্ণায় সংসারমহীরুহস্য বীজায়"।

যদ্যপি রতি-কেলি কলাপ সকলের মনোরঞ্জন করে বলিয়া তৎপরায়ণ কৃষ্ণ উপাস্য হইতেন, তবে রাবণ ও কার্ত্তবীর্য্য প্রভৃতি অনেকানেক রাজারা রতিকেলিতে পরম পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদিগের উপাসনাই বা প্রচুর রূপে ব্যাপ্ত কেন না হইল? ইহাঁরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পরদারাহরণাদি যে সকল দোষ আনয়ন করিতেছেন, বর্ত্তমান কালে যদি কেহ তদ্রূপ দোষ ভাজন হয়েন, তবে তাঁহার সহিত সমাদর পূর্ব্বক আলাপ করিতে কেহই সম্মত হয়েন না। ইহাতে সর্ব্বদোষনিধি কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া যে উপাসনা করিতে সর্ব্ব শাস্ত্রে অনুশাসন করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রতিপত্তির প্রধান এক কারণ হইয়াছে। যে শাস্ত্রে পরদারাহরণে পাপোৎপত্তি কহিয়াছে, সেই শাস্ত্রেই পরদারকৃৎ পুরুষ কৃষ্ণকে ঈশ্বর কহিয়াছে, ইহার সূক্ষ্ম কারণ আদিকালাবধি এ পর্য্যন্ত কি, কেহই নিশ্চয় করিতে পারেন নাই? কেবল নব্য তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশকেরাই যথার্থ বেদদর্শী হইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিরীশ্বর ও নিরুপাস্য স্থির করিয়াছেন। না, তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণোপাসনার স্রোত অবরোধ হইবে? হা! বিধাতা, যদি সঙ্গাদি ক্রীড়াকলাপে বিরত ব্যক্তিকে ঈশ্বর বলাই নিশ্চয় হয়, তবে কৃষ্ণাবতার কালে ভীষ্মাদি মহানুভব ব্যক্তি, যাঁহারা নিতান্ত তত্তৎ কর্ম্মে বিরত ছিলেন, তাঁহারাই বা ঈশ্বর রূপে উপাস্য কেন না হইলেন? বরং ঐ মহানুভবেরা সেই কৃষ্ণের লীলা কথার আবৃত্তি পূর্ব্বক তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন। তবে ভারতাদির গুটিকয়েক বচন সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা বলেন,—"মহাভারত মধ্যে তাঁহাকে কোন স্থানে উপাস্য পরমেশ্বর, কথন বা শ্রদ্ধান উপাসক এবং সামান্যত রাজা ও যোদ্ধারূপে বর্ণনা করিয়াছেন।" কিন্তু নব্য তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশকেরা আপন আপন চিত্তে সুযুক্তি করিলেই স্থির করিতে পারিবেন, যে, এক ব্যক্তিকে কখন উপাসক ও কখন উপাস্য পরমেশ্বর বলাতে কি সে ব্যক্তিকে প্রাকৃত মনুষ্য বলা যায়?

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান উপাসক হয়, সে কি পরের অনিষ্ট ও পরদ্রব্য ও পরস্ত্রী হরণ করে? না, তাহা করিলে কখন উপাসনা হয়? এক রাত্রে ষোড়শ সহস্র স্ত্রী রমণ করিতে যে সমর্থ হয়, তাহাকে কি প্রাকৃত দুষ্কৃত-কারী মনুষ্য বলা যাইতে পারে? যে শাস্ত্রে তাঁহাকে উপাসক কহিয়াছেন, সেই শাস্ত্রেই তাহার মীমাংসা করিয়াছেন। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ যে শিবারাধনা করিয়াছিলেন, তাহার মীমাংসা কূর্ম্মপুরাণে ২৪ অধ্যায়ে কৃষ্ণ মার্কণ্ডেয় সংবাদে উক্ত হইয়াছে যথা।

মার্কণ্ডেয় উবাচ ॥
কঃ সমারাধ্যতে দেবো ভবতা কর্ম্মভিঃ শুভৈঃ।
কহিত্বং কর্ম্মভিঃ পূজ্যো যোগিনাংধ্যেয় এবচ ॥
ত্বংহি তৎপরমংব্রহ্ম নির্ব্বাণমমলং পরং।
ভারাবতারণার্থায় জাতোবৃষ্ণিকুলে হরিঃ ॥
তম ব্রবীন্মহাতেজাঃ কৃষ্ণোব্রহ্ম বিদাম্বরং।
শৃণ্বতামেব পুত্রাণাং সর্ব্বেষাং প্রহসন্নিব ॥
কৃষ্ণ উবাচ ॥
ভবতা কথিতং সর্ব্বং তথ্যমেব ন সংশয়।
তথাপি দেবমীশানং পূজয়ামি সনাতনং ॥
নমে বিপ্রাস্তি কর্ত্তব্যং নানবাপ্তং কথঞ্চন।
বিপ্র লিঙ্গে হিতায়ৈষাং লোকানাং পূজয়ে শিবং ॥

পুত্র সহিত শ্রীকৃষ্ণকে শিব পূজায় রত দেখিয়া মার্কণ্ডেয় শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "হে জগদীশ্বর! তুমি সৃষ্টি স্থিতি লয় কারণ পরম-ব্রহ্ম, নির্ম্মল নির্ব্বাণপদ, যোগিদিগের হৃদি চিন্তনীয়, এবং কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মী-দিগের পূজ্য, ভারাবতারণার্থে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছ। অতএব তোমা কর্ত্তৃক শুভ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা কোন্ দেব আরাধনীয় হইয়াছেন, এই সংশয় ছেদ করিয়া কহিতে আজ্ঞা হয়। কৃষ্ণ কহিতেছেন, "হে ঋষে, তুমি যে কহিলে আমি ভারাবতারণে অবতার হইয়াছি, ইহা সত্য; তাহাকে সংশয় কি। আমার কোন কর্ম্ম কর্ত্তব্য নাই, অথচ সর্ব্বকর্ম্ম কর্ত্তব্য, আমি ত্রৈলোক্য সৃষ্টিকর্ত্তা, আমার প্রাপ্ত্যর্থে প্রার্থনা কি? তথাপি মনুষ্যা-বতার প্রযুক্ত মনুষ্য ধর্ম্ম দেখাইবার জন্য লোকশিক্ষার্থ মনুষ্যহিতের নিমিত্ত

শিবলিঙ্গ অর্চ্চনা করিতেছি।" ইহাতে উপাসক বলাতে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব খণ্ডন হইতে পারে না; পুনরপি, উক্ত পুরাণে ভগবান লোক শিক্ষার্থ গুরুর নিকট মন্ত্রদীক্ষা ও বেদবিদ্যা ও জ্ঞান শিক্ষা এবং দেবোপাসনা, যাগযজ্ঞ কর্ম্মকাণ্ডাদি সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাহা, যে ঋষিদিগের নিকট উপদিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই সকল উক্তিতেই সুব্যক্ত আছে, যথা। কূর্ম্মপুরাণং।

অয়ং স ভগবানেকঃ সাক্ষান্নারায়ণঃ পরঃ।
আগচ্ছত্যধুনাদেব পুরাণঃ পুরুষঃ স্বয়ং॥
অয়মেবাব্যয়ঃ স্রষ্টা সংহর্ত্তাচৈব রক্ষকঃ।
অমূর্ত্তো মূর্ত্তিমান ভূত্বা মুনীন দ্রষ্টুমিহাগতঃ॥
স্বেচ্ছয়াপ্যবতীর্ণোঽসৌ কৃতকৃত্যোপিবিশ্বধৃক্।
চচারস্বাত্মনোমূলং বোধয়ন ভাবমৈশ্বরং॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যৎকালীন বিদ্যা শিক্ষার্থে মুনিদিগের আশ্রমে গমন করেন, তৎকালীন মুনিগণেরা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া কহিতেছেন যে, এই শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ পরমেশ্বর, সাক্ষাৎ নারায়ণ, অজ, অব্যয় পুরাতন পুরুষ, দীপ্ত তেজস্বী, সংপ্রতি আগমন করিতেছেন, ইনিই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের এককর্ত্তা। ইনিই বেদবেদ্য অমূর্ত্ত পুরুষ, সংপ্রতি মূর্ত্তিমান রূপে মুনিগণের দর্শনার্থে, এই তপোবনে আগমন করিয়াছেন। সর্ব্বনিয়ন্তা, ইহার নিয়ন্তা কেহই নহেন। বিশ্বধারণকর্ত্তা সত্যসংকল্প পরমাত্মা স্বীয় ইচ্ছায় অবতীর্ণ হইয়া আত্ম ঐশ্বর্য্যভাব লোকের বোধের নিমিত্ত, বিচরণ করিতেছেন।

অমর্ত্ত্যো মর্ত্তভাবেন শিক্ষার্থং ধর্ম্মধারয়ন্।
উপস্পৃশ্যাথ ভাবেন তীর্থে তীর্থেস যাদবঃ।
চকার দেবকী সূনু দৈবর্ষি পিতৃ তর্পণং॥　তত্রৈব।

অমানুষ শ্রীকৃষ্ণ, মনুষ্য ভাবে লোকের শিক্ষার্থ, ধর্ম্মাদি ধারণ করিলেন। তীর্থে তীর্থে অবগাহন করতঃ দেবকী নন্দন বাসুদেব তীর্থ জলে, দেবতা ঋষি পিতৃ তর্পণ করিলেন। তথাপি, ঋষিগণেরা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ তত্ত্ব জানিয়া কহিয়াছিলেন, যথা।

উবাচ বচনাং যোনিং জ্ঞানানঃ পরমং পদং।
বিষ্ণুমব্যক্তসংস্থানং শিষ্য ভাবেন সংস্থিতং।

ত্বংহি নারাবণঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বাত্মা পুরুষোত্তমঃ।
প্রার্থিতো দৈবতৈঃ পূর্ব্বং সংজাতো দেবকী সুতঃ॥ কৌর্ম্মং॥

পবমপদ, বাক্যযোনি, সর্ব্বেশ্বর, অব্যক্ত-সংস্থ, সাক্ষাৎ বিষ্ণু, কারণ স্বরূপ, শিষ্যভাবে আগত হইয়া সম্মুখে সংস্থিত হইয়াছেন, ইহা জ্ঞান দৃষ্টে অবলোকন করতঃ ঋষিরা কহিতেছেন, "হে ভগবন! তুমি সর্ব্বসাক্ষি, সাক্ষাৎ নারায়ণ, সর্ব্বান্তর্যামি, পরমাত্মা; পবমপুরুষ, পূর্ব্বে দেবগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া সম্প্রতি দেবকী পুত্র রূপে অবতীর্ণ হইয়াছ। ইনি জগৎ কারণ নাবায়ণ, ইহাঁ হইতে জগৎ সৃষ্টি, ইনিই সর্ব্বাধাব; এই নারায়ণ শব্দে ব্রহ্ম বাচক বলিয়া সাকাবরূপ খণ্ডন হয় না, এবং তিনিই যে দেবকী পুত্র রূপে আবির্ভাব হইয়াছেন, ইহা নাবায়ণ, আত্মবোধ ও মহোপনিষদাদিতে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে।

ওঁ নমো নাবায়ণায় শঙ্খচক্রগদাধরং তস্মাদো। নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রোপাসনা বৈকুণ্ঠং ভগবল্লোকং গমিষ্যতি॥ অথ যদিদং ব্রহ্মপুরমিদং পুণ্ডরীকং তস্য য আত্মা হেম পুণ্ডবীক মধ্যে তস্মাৎ কাবণরূপং বিজ্ঞান ঘনং তস্মাত্তড়িদাভমাত্রং দীপবৎ প্রকাশো ব্রহ্মণ্যো দেবকী পুত্রো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ॥ ইতি শ্রুতিষু।

শঙ্খচক্রগদাধব নারায়ণের ধ্যান করতঃ, অষ্টাক্ষব মন্ত্রোপাসনাতে বৈকুণ্ঠাখ্য ভগবল্লোক প্রাপ্তি হয়, যাহাকে বিষ্ণুব পরমপদ বলে, (ইহা ঋগ্বেদেব দ্বিতীয়াধ্যায়ে বৈষ্ণবী ঋচ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্বে আত্মহৃৎপ্রদেশে ঐ ভগবানকে ধ্যান কবিতে শ্রুতি অনুশাসন করিয়াছেন। হৃদয়াকাশের নাম পুণ্ডরীক, যাহাকে ব্রহ্মপুর কহে, তাহাতে স্বর্ণবর্ণ পদ্ম মধ্যে যে জীবাত্মা কারণরূপ বিজ্ঞানঘন অর্থাৎ ঘৃত কাঠিন্যের ন্যায় ঘনীভূত, বিজ্ঞান স্বরূপ তাহাতে বিদ্যুৎ দীপ্তির ন্যায় উদ্দীপ্ত দীপবৎ প্রকাশ, তদহর মধ্যে পরব্রহ্ম, সর্ব্ব বেদবেদ্য দেবকী পুত্র ব্রহ্মণ্যদেব মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ, যিনি স্বপ্রকাশ নিত্যসত্যমুক্তস্বভাব সচ্চিদানন্দ সর্ব্বদা বিরাজমান আছেন।

এই শ্রুতি দৃষ্টে সমন্বয় হইল যে, সেই নারায়ণ পরব্রহ্ম ভক্তের অভিলাষ পূরণার্থ এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্তে যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ শর্ম্মা।

বিজ্ঞান প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

Nineteenth Century পত্রিকার June সংখ্যায় Revo Forbes Philips নামক বিদ্বান্ "Ancestral memory" অর্থাৎ "বংশগত স্মৃতি" সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে মানব যেমন পূর্ব্বপুরুষগণের আকৃতি প্রভৃতির সৌসাদৃশ্য ধারণ করে, তদ্রূপ মানবের স্মৃতিও পূর্ব্বপুরুষদের স্মৃতি বা বংশপরম্পরায় আগত অতীত বিষয়ের স্মৃতির সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে সম্মিলিত হইয়া প্রকাশিত হয়। এই বংশগত স্মৃতির বশে অবস্থা বিশেষে মানব স্বীয় চৈতন্য দ্বারা অননুভূত বিষয় ও ঘটনাবলী হঠাৎ স্মরণ করে। তাঁহার মতে স্বপ্নে যে সকল ঘটনাবলী অনুভূত হয়, তাহার মধ্যে অধিকাংশই বংশগত স্মৃতির ক্রিয়ামাত্র। অব্যক্তভাবেস্থিত উক্ত স্মৃতি স্বপ্ন অবস্থায় প্রবল হয়, কারণ সেই অবস্থায় মানব চৈতন্য অপেক্ষাকৃত বলহীন (Passive) ভাবে থাকে। এই বংশগত স্মৃতি ধারাবাহিক রূপে চলিতেছে, এবং লেখকের মতে সূক্ষ্মদৃষ্টি, যোগদৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপারগুলি এই স্মৃতির বিকাশ মাত্র। তাঁহার মতে জন্মান্তরীয় সংস্কারগুলি কেবল ইহার খেলামাত্র এবং তদ্দ্বারা জন্মান্তর প্রমাণিত হয় না।

এই প্রশ্নের সমাধান করিতে গেলে অনেকগুলি বিষয় স্থির করিতে হইবে। হিন্দু জন্মান্তর বাদী। কিন্তু তাই বলিয়া কি তিনি বংশগত অভিব্যক্তির ক্রিয়া স্বীকার করেন না? তবে হিন্দুরা যাহাকে "পিতৃ" বলে সেটী কি? হিন্দুর মতে এক অদ্বিতীয় আত্ম চৈতন্য ব্যক্ত হইয়া যে বিশিষ্ট পুরুষ বা জীবরূপ ধারণ করে তাহা কেবলমাত্র উপাধির কার্য্য। এক সূর্য্য যেমন উপাধি বশে বহুরূপে প্রতীত হয়, তদ্রূপ এক আত্মা প্রকৃতি বা মায়াবশে বহুরূপে প্রকাশিত হন। কিন্তু এই উপাধি দুই শ্রেণীভুক্ত। একটীর নাম "নাম"—শক্তি এবং তদ্দ্বারা চৈতন্য কেন্দ্রীভূত হইয়া প্রকাশ পায়। অপরটী "রূপ" বা ক্ষেত্ররূপী। "নামে" বাহিরের বহুত্ব ও বিষয় সংস্পর্শ একীকৃত হয়। রূপেও বহুত্ব বাচক বিষয়গুলি নিয়মিত হয় এবং তৎসাহায্যে চৈতন্য "অন্নে" সংস্থাপিত হয়। "রূপ" আবার "নাম" হইতে উৎপন্ন,—নামের বিশেষভাব প্রকাশ জন্যই রূপ উৎপন্ন হয়। মনে করুন বিশিষ্ট শরীরকৃত স্মৃতি ও শক্তির উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। শরীরটী না থাকিলে বাহিরে স্থিত ব্রহ্মার সৃষ্টির ফল স্বরূপ তত্ত্বগুলি ও তাহাদের সম্মিলনে উৎপন্ন বিষয়গুলির জ্ঞান হইতে পারে না। শরীর সাহায্যেই ভিতরের আত্মা বা জীবকেন্দ্র বাহিরের ভাবগুলি গ্রহণে সক্ষম। কিন্তু শরীর ধ্বংস হইলে তদ্দ্বারা সাধিত উৎকর্ষও লোপ পায়। সেই জন্য ঐ সকল সংস্কারগুলি শরীর—কেন্দ্র বা Permanent atomএ বীজরূপে থাকিয়া যায়। এই Premanent atomটী শরীরের অব্যক্ত মূল কেন্দ্র, ইহা পুরুষ বা চৈতন্যের কেন্দ্র বা

অহংভাবের ছায়া মাত্র। ইহাই বংশগত সংস্কারের কেন্দ্র। পিতৃমাতৃজ স্থূল বীজটী প্রকৃতির অংশভূত, এই বীজ ব্যক্তিগত কেন্দ্রের আধার বা উপাধি। এই বীজেও কতকগুলি সংস্কার আছে। যেমন ক্ষেত্রে প্রকাশ শক্তি বা বীজের স্বীয় শক্তির প্রকট করিবার শক্তি থাকা চাই, তদ্রূপ পিতৃ মাতৃজ ক্ষেত্রবীজে স্থূল শরীরের কার্য্যকারী ভাবের বহির্মুখী শক্তিগুলি ক্রিয়ারূপে নিহিত আছে। ব্যক্তিগত কেন্দ্রে ব্যক্তিগত ভাবগুলি চৈতন্যরূপে নিহিত— যেমন "মানব" নামে রাম, শ্যাম প্রভৃতির জ্ঞান নিহিত। পিতৃজ বীজে ক্রিয়ামূলক সংস্কার গুলি নিহিত এবং এই শক্তির দ্বারাই মানব শিশু পারিপার্শ্বিক শক্তিনিচয়ের সহিত সহজে আপনার সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে পারে। যে শক্তির উত্তেজনা বশে মানব শিশু জন্ম মাত্রেই স্তনপানে সক্ষম, যাহার বলে তাহার উপাধিগত জীবন সংরক্ষিত ও সংগঠিত হয়, তাহা স্থূল পিতৃমাতৃজ সংস্কার। যাহার বশে তাহা শরীরের গুপ্ত কোন বীজ রক্ষিত হয় তাহাও ঐ জাতীয় সংস্কার।

পুরুষ বীজ এবং পিতৃজ বীজের সম্বন্ধ কি? যেমন মাতার গর্ভ সন্তানের সক্রিয় ভাব উদ্বুদ্ধ করিয়া শরীর গঠন করে, তদ্রূপ পিতৃজবীজ বিশিষ্ট-ভাবে চৈতন্যময় পুরুষ বীজকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাকে ক্রিয়াশীল করে। ফলে ভিতরের চৈতন্য এবং বাহিরের জাগতিক শক্তি এতদুভয়ের উপযোগী স্থূল শরীর গঠিত হয়। শুধু বাহিরের সংস্কারের সূত্রে বাঁধিলে শরীর কার্য্যক্ষম হইত বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা বিশিষ্ট অহংভাবের কোন উপকার সাধিত হইত না। বাহিরের সংস্কারগুলির এক প্রকার জ্ঞান আছে সত্য, কিন্তু সে জ্ঞান ক্রিয়া-মূলক, সে জ্ঞানের গতি দূরত্বের দিকে। কিন্তু অহং বীজের সংস্কারগুলির গতি কেন্দ্রের দিকে। পুনর্জন্ম অর্থে যদি কেবল ক্রিয়া বিশেষ বুঝাইত তাহা হইলে ক্রিয়াশীল বংশ সংস্কার থাকিলেই চলিত। একটা বাটী প্রস্তুত করিতে গেলে, যেমন একদিকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, এবং অপরদিকে শিল্পীর বিশিষ্ট চৈতন্যের সাহায্য আবশ্যক; তদ্রূপ মানব শরীর প্রস্তুত করিতে গেলে, অপেক্ষাকৃত অবিশেষ পিতৃ বা রূপশক্তিকে উপাদান করিয়া বিশিষ্ট শিল্পী বা জীবচৈতন্যের ইচ্ছা ও জ্ঞানের উপযোগী করিয়া গঠিত হয়। একটী উপাধি, অপরটী নিয়ন্তা। একটা উপাদানভূত অপরটা কর্ত্তাস্বরূপ। বলা বাহুল্য যে, এতদ্ভিন্ন করণ, অধিকরণ, সম্প্রদান প্রভৃতি আর কতকগুলি কারকশক্তি আছে। কিন্তু যেমন সকল কারকই কর্ত্তার ভাববাচক, তদ্রূপ পিতৃ, ইন্দ্রিয়, দেবতা, তন্মাত্র প্রভৃতি কারক গুলিও জীবের অধীনে জীবচৈতন্যের বিকাশ জন্য কার্য্য করে। জীব বা কেন্দ্রশক্তিকে বাদ দিয়ে কোন শক্তিরই ক্রিয়া হয় না। এ বিষয় পরে বিবেচিত হইবে।
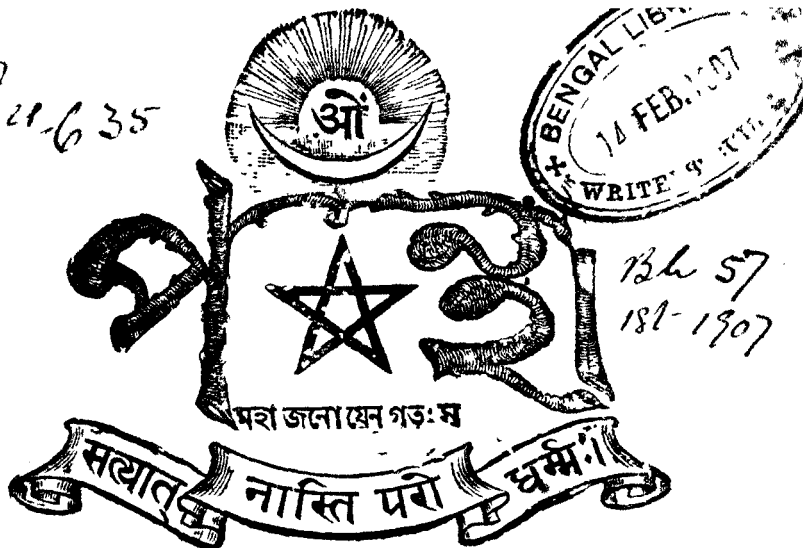
১০ম ভাগ। { কার্ত্তিক, ১৩১৩ সাল। { ৭ম সংখ্যা।

চৈতন্য কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

শ্রীশঙ্করাচার্য্য।

বুদ্ধদেব-শাস্ত্রের ভিত্তি ত্যাগ করিয়াছিলেন। যে ভিত্তি অবলম্বন করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ক্রমবিকাশ দ্বারা উচ্চতম সিংহাসন অধিকার করিয়া আছে, বুদ্ধদেব সেই ভিত্তিকে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। যদি বেদের কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা আর্য্যশিশু শৃঙ্খলাবদ্ধ না হইতেন—যদি বিধি নিষেধ দ্বারা তিনি মার্জ্জিত না হইতেন—যদি দেব উপাসনা দ্বারা ঈশ্বর জ্ঞান সুলভ না হইত—যদি সুখ দুঃখের চিন্তায় আর্য্য-হৃদয় পুনঃ পুনঃ উথলিয়া না উঠিত—যদি পূর্ব্ব পক্ষ ও অপর পক্ষ দ্বারা বিভিন্ন দর্শন হইত,—তাহা হইলে ধর্ম্মের পূর্ণত্ব থাকিত না—সর্ব্বাঙ্গীনতা থাকিত না—চিরবিকাশ থাকিত না—চিরজীবন থাকিত না। শাস্ত্রের অর্থ অনন্তযুক্তি, অনন্তভাব, অনন্ত জ্ঞান এবং অবশেষে এই অনন্ত যুক্তি, ভাব ও জ্ঞানের সমন্বয়। শাস্ত্রের ভিত্তি ত্যাগ করিলে "অনবস্থা" দোষ ঘটে। বুদ্ধদেব স্বয়ং যাহা প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহার উপদেশ দিলেন

তাহার পর বুদ্ধদেব চক্ষু মুদিত করিলেন। তখন প্রথম বিবাদ এই হইল যে নন্দের কথা প্রামাণিক কি না; এমন কি নন্দ ধর্ম্মাপরাধী কি না। অতি কষ্টে নন্দ ও উপল যাহা সঙ্কলন করিলেই তাহা বৌদ্ধ শাস্ত্র বলিয়া গৃহীত হইল। তাহার পর মহায়ন ও হীনায়ন। বুদ্ধদেব ঈশ্বরের কথা বলেন নাই, অতএব ঈশ্বর নাই। সৌগত দর্শন তবে অন্য। বুদ্ধদেব শাস্ত্রের ভিত্তি অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম সেই ভিত্তি অমান্য করিলে বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। নাগার্জ্জুনের ধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্ম নহে। সৌগত দর্শন চতুষ্টয় বুদ্ধদেবের দর্শন নহে। শঙ্করাচার্য্য শাস্ত্রের ভিত্তি অবলম্বন করিলেন। বেদের চরম উপনিষৎ। উপনিষদের সমন্বয় উত্তর মীমাংসা। উপনিষদের সার গীতা। বেদান্ত শাস্ত্রের এই তিন মহাপ্রস্থানকেই শঙ্করাচার্য্য ভিত্তি করিলেন। তিনি প্রস্থানত্রয়েরই ভাষ্য করিলেন।

অপূর্ব্ব প্রতিভায় জগৎ আলোকিত হইল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাষ্যকারগণ হার মানিলেন। সূর্য্যের আলোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোক সকল লুক্কায়িত হইল। এক আলোকে জগৎ পূর্ণ হইল। ক্রমে মূল লইয়া টানাটানি পড়িল। মূলের অর্থ ভাষ্যে আচ্ছাদিত হইল। "ব্রহ্ম" শূন্যের স্থান অধিকার করিলেন বটে। কিন্তু সে "ব্রহ্ম"—ঔপনিষদ ব্রহ্ম কি শাঙ্কর ব্রহ্ম? বাদরায়ণের "ব্রহ্ম" ও ভাষ্যকারের "ব্রহ্ম" এক কি না? শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত তাৎপর্য্য "সমুচ্চয় বাদ", কি "ক্রমবাদ"। শাস্ত্রকে শঙ্করাচার্য্য শাঙ্কর শাস্ত্র করিয়া লইলেন। শাস্ত্র থাকিল। কিন্তু সনাতন ধর্ম্ম শাস্ত্রের এক অঙ্গ লুপ্ত হইল। বাদরায়ণের সময় হইতে শঙ্করাচার্য্যের সময় পর্য্যন্ত বেদান্ত শাস্ত্রের প্রচলিত টীকা গুলি একরূপ লুপ্ত হইল। রামানুজ স্বামীর বিশেষ যত্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধার হইল বটে; কিন্তু ধর্ম্মের ধারাবাহিক সূত্রে, ধর্ম্মের মণিরত্নমালায় কতকগুলি মণির উচ্ছেদ হইল। শাঙ্কর "ব্রহ্ম" সৌগত "শূন্যের" স্থান অধিকার করিলেন। বাসনা নাশ দ্বারা জীবের নাশ না হইয়া ব্রহ্মরূপে অবস্থিতি হইল। আভাস বিশ্বে মিলিত হইল।

শূন্যের রূপান্তর হইল বটে। কিন্তু "ব্রহ্ম" ও "শূন্যে" ভেদ অতি অল্পই থাকিল। ব্রহ্মে জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় নাই; ক্রিয়া, কর্ত্তা, কর্ম্ম নাই। ব্রহ্ম "নেতি" "নেতি" শূন্য। জগদাধার "শূন্য" ও জগদাধার "ব্রহ্ম"—কেবল কথার ফের মাত্র। শাঙ্কর ব্রহ্ম বৌদ্ধ ধর্ম্মের Metaphysical necessity.

সেই সমগ্র বাসনা ত্যাগ, সেই সংসারের অলীকতা, সেই "নিজগৃহাত্তূর্ণং বিনির্গম্যতাম্" সেই সকলই বাসনাময়, সকলই ক্ষণমাত্র স্থায়ী, ক্ষণিক বিজ্ঞানাবশেষী, সকলই দুঃখ মূলক—সেই সৌগত জ্ঞান শাঙ্কর জ্ঞানে রূপান্তরিত হইল মাত্র। শঙ্কর কেবল মাত্র ক্ষণিক বিজ্ঞানকে মায়ার কল্পনাতে পরিণত করিলেন। ক্ষণিক অবস্থানও মায়া কল্পিত। একেবারে পরিষ্কার করিয়া জীব ও ঈশ্বর দুই মায়া কল্পিত। বুদ্ধদেবের শিক্ষায় ঈশ্বর ছিলেন না, সে এক প্রকার ভাল ছিল। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের কাছে ঈশ্বর হাবুডুবু খেলিতে লাগিলেন।

থাকিল কেবল এক ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মে মায়ার লহরী খেলিতে লাগিল। মায়া ব্রহ্মের শক্তি মাত্র। শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন। মায়াবাদ, আভাস বাদ, বিবর্ত্ত বাদ—এই বাদে ধর্ম্মজগৎ পরিপূর্ণ হইল। সূক্ষ্ম তর্কজালে, ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর বাঁধা পড়িলেন। এই ধাঁধা ঘুচতে অনেক দিন লাগিল। প্রতিবাদের সাহস সহজে কুলাইয়া উঠিল না। অবশেষে আচার্য্য রামানুজ অসীম সাহসের উপর নির্ভর করিয়া, পূর্ব্ব আচার্য্যদিগের নাম লইয়া সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। সেই কাল হইতে এই কাল পর্য্যন্ত অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ লইয়া প্রবল বিরোধ চলিয়া আসিতেছে। কে বলিতে পারে ইহার মীমাংসা কখনও হইবে কি না।

শাঙ্কর ভাষ্য।

শঙ্করাচার্য্য অলৌকিক প্রতিভাবলে অতি অল্পকালে সমগ্র শাস্ত্র সাগর মন্থন করিলেন। গৌতম বুদ্ধ শাস্ত্রের যষ্টি ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সেই যষ্টি দৃঢ় রূপে ধারণ করিলেন। সুতরাং শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কেহ তাঁহার বাক্য অবহেলা করিতে পারিলেন না। তিনি শাস্ত্রের বিচিত্রতায় মুগ্ধ হইলেন না; পাক্ষিক (Partial) দৃষ্টিতে শাস্ত্রের অংশ মধ্যে অবরুদ্ধ হইলেন না। পারম্পর্য্য, প্রণালী ও সম্প্রদায়ের জাল তাঁহাকে বাঁধিতে পারিল না। তিনি শাস্ত্রের সারভাগ পর্য্যালোচনা করিলেন; আর ঐশ্বরিক বাক্য উপনিষৎ মধ্যে সুস্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। দেখিলেন এখনও উপনিষদ ব্রহ্ম এবং ঐ জ্ঞানের অধিকৃত সূত্র এ দুয়ের মধ্যে ব্যবধান আছে। দেখিলেন স্বয়ং ভগবান্ বাসুদেবও ঐ অনন্ত আলোকেকে জীব ও অণ্ডের উপাধি

দ্বারা উপহিত করিয়াছেন। দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণ ও ব্যাসদেব ধর্ম্মের শিক্ষা দিয়াছেন; তথাচ তাঁহাদের উপদিষ্ট ব্রহ্মজ্ঞানে ধর্ম্মের অপেক্ষা আছে। উপদেষ্টা আছে, শিষ্য আছে, অর্জ্জুন আছে, নব আছে, তবে জ্ঞান উপদিষ্ট হয়। কেন আক্ষেপ কিসের? গৌতম বুদ্ধ কাহারও অপেক্ষা করেন নাই। শঙ্করাচার্য্য শাস্ত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন বলিয়া কি শাস্ত্রের অপেক্ষা করিবেন। মহানির্ব্বাননিষ্ট বাসনাত্যাগী শঙ্কর যদি শাস্ত্র মধ্যে নিরপেক্ষ সত্য দেখিতে না পাইতেন, তাহা হইলে শাস্ত্র ত্যাগ করিতে তাঁহার মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব হইত না। তাহা হইলে তিনি ব্যাসদেবের দোহাই মানিতেন না, শ্রীকৃষ্ণের দোহাই মানিতেন না; হয়ত ঈশ্বরের দোহাই মানিতেন না।

দেখিলেন উপনিষদের মধ্যে সত্য আছে। ভাষ্যকারগণ সে সত্যের অনেক অপলাপ করিয়াছেন। তিনি নিজের ভাষ্যদ্বারা সেই সত্যের উদ্ধার করিলেন। মহাসত্যব্যঞ্জক উপনিষৎ বাছিয়া লইলেন। তত্ত্বমসি মহাবাক্যের গভীর নির্ঘোষে ধর্ম্মজগৎ পরিপূর্ণ হইল।

উপনিষদের ভাষ্য সম্বন্ধে আমি কিছু বলিব না। মহাপ্রভু চৈতন্য দেবও কিছুই বলেন নাই। নির্ব্বিশেষে জ্ঞান-পদার্থ বলার অপেক্ষা রাখে না। অনুভবের অপেক্ষা রাখে না। সে জ্ঞান স্বয়ং প্রকাশ; সে জ্ঞান সিদ্ধ করিতে হয় না। যখন কিছুই থাকে না তখন সেই জ্ঞান থাকে। যতদিন বাসনা থাকে, ততদিন বাসনা কল্পিত পদার্থ থাকে। যখন মন থাকে না, তখন মনুষ্যত্ব থাকে না; যখন বিশেষ থাকে না, তখন নির্ব্বিশেষ জ্ঞান থাকে ইহা স্বতঃ সিদ্ধ। যদি জ্ঞান মূলক অস্তিত্ব হয়, যদি অজ্ঞান শূন্যের ভিত্তিতে ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তার না হয়, তাহা হইলে নির্ব্বিশেষে জ্ঞানের অস্তিত্ব ও সম্ভবপরতা সম্বন্ধে বিরোধ করা কেবল ধৃষ্টতা মাত্র। যাঁহারা শঙ্করাচার্য্যের সহিত এই সম্বন্ধে বিরোধ করিতে গিয়াছেন, তাঁহারাই পরাস্ত হইয়াছেন। যদি নির্ব্বিশেষে জ্ঞান হইতে পারে, তবে সেই জ্ঞানের পথিকও হইতে পারে।

কিন্তু সে জ্ঞান ও সে জ্ঞানের পথিকের সহিত জগতের সম্বন্ধ নাই, জীবের সম্বন্ধ নাই, ঈশ্বরেরও সম্বন্ধ নাই। ঈশ্বর জীব লইয়া, ঈশ্বর জগৎ লইয়া। যে জ্ঞানে জীব নাই, যে জ্ঞানে জগৎ নাই, সে জ্ঞানে ঈশ্বরও নাই। সে জ্ঞানের শিক্ষায় জীবের প্রয়োজন নাই। যেখানে জীবের প্রতি ধর্ম্মশিক্ষা আছে, সেখানে সে জ্ঞানের আভাস নাই।

উপনিষদে জ্ঞানের প্রকাশ আছে। ধর্ম্মের শিক্ষা নাই। ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা পরিতৃপ্ত হইয়াছে। ধর্ম্ম ও কর্ম্মের সীমা অতিক্রম করিয়া ঋষির হৃদয় গবাক্ষ জ্ঞানালোকের জন্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। সংসার ভুলিয়া সেই হৃদয় আলোক মাত্র গ্রহণ করিতেছে; সেই আলোক কখনও নির্ব্বিশেষ, কখনও সবিশেষ। কখনও আলোক উদ্ভাসিত সৃষ্টি, কখনও কেবল মাত্র আলোক।

এই আলোক অনুসরণ করিয়া, বাদরায়ণ ব্যাস মুক্তি-পিপাসু জীবের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা চরিতার্থ করিলেন। এবং দেখাইয়া দিলেন যে এই জ্ঞানের পথ অনুসরণ করিলে "অনাবৃত্তি" হয়। সে অনাবৃত্তি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত জীবের পুনরাবৃত্তির অভাব। এ আলোকে বিশেষ আছে, ঈশ্বর আছে।

শঙ্করাচার্য্য দেখিলেন, গোলযোগ। যেমন পূর্ব্বমীমাংসা কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদের সামঞ্জস্য, সেই রূপ জ্ঞানকাণ্ডাত্মক উপনিষদের সামঞ্জস্য উত্তর মীমাংসা। কিন্তু ব্যাসের সূত্রে সবিশেষ জ্ঞানের ছড়াছড়ি। তাই তিনি উপনিষদের দোহাই দিয়া শারীরিক সূত্রের ভাষ্য করিলেন। পরম্পরা গত বোধায়নের ভাষ্য লুপ্তপ্রায় হইল।

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান দর্শন-শাস্ত্রের অঙ্গীভূত হইল, মুক্তি-পিপাসু জীবের অধিকারের স্থল হইল। জীব অদ্বৈত জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া "ব্রহ্মাস্মি" বলিতে শিখিল। কর্ম্মের ভিত্তি ভাঙ্গিয়া গেল, উপাসনার ভিত্তি অন্তর্হিত হইল।

যেন রাস্তা হারাইল, যেন জীব মার্গভ্রষ্ট হইল।

"ব্রহ্মাস্মি" ত মুখে বলিলে চলেনা। ব্রহ্মাস্মি বলিলেও লোকে ব্রহ্ম হয় না। অদ্বৈত জ্ঞানীর একুল ওকুল দুকুল গেল। ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত হইল।

শাঙ্কর ভাষ্যের বিরুদ্ধে কথা কয়, এমন কাহারও সাহস হয় না।

সকলেই জানিল নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানই শারীরক সূত্রের তাৎপর্য্য। শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বিস্তারের জন্য, বেদের বিভাগের জন্য বেদব্যাসের অবতার। তাঁহার মীমাংসা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান। শঙ্করাচার্য্য সেই মতের সমর্থন করিলেন। অদ্বৈতবাদে সকলের শ্রদ্ধা জন্মিল। কর্ম্ম ও উপাসনা সকলের নিকট লঘু হইতে লাগিল। ধর্ম্মের বিশৃঙ্খলতা হইল।

ক্রমে ধর্ম্ম জগতে রামানুজাচার্য্যের আবির্ভাব হইল।

তিনি বোধায়ন ভাষ্য ও শাঙ্কর ভাষ্য এ দুয়ের প্রশস্ততরতা স্বাধীন ভাবে বিচার করিলেন। এবং অন্তর্য্যামীর প্রেরণায় বোধায়ন ভাষ্য অভ্রান্ত বলিয়া স্থির করিলেন।

বোধায়ন ভাষ্য অনুসরণ করিয়া রামানুজাচার্য্য ভাষ্য করিলেন।

"ভগবদ্বোধায়নকৃতাং বিস্তীর্ণাং ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিং পূর্ব্বাচার্য্যাঃ সংচিক্ষিপুস্তন্মতানুসারেণ সূত্রাক্ষরাণি ব্যাখ্যাস্যন্তে।"

এখন এক নূতন প্রশ্ন উত্থিত হইল। ব্রহ্মসূত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য কি? শাঙ্কর ভাষ্যের অর্থ নিদ্ধারণ সত্য, কি শ্রীভাষ্যের অর্থ নির্দ্ধারণ সত্য? চৈতন্য দেব ইহার মীমাংসা করিয়াছিলেন। সে মীমাংসা আমরা ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিব।

শাঙ্কর ভাষ্য ও রামানুজ ভাষ্য।

"প্রভু কহে বেদান্ত সূত্র ঈশ্বর বচন।
ব্যাস রূপে কহিয়াছেন শ্রীনারায়ণ॥
ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণা পাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে, নাহি দোষ এই সব।
উপনিষদ্ সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব।
মুখ্য বৃত্তি সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব॥
গৌণ বৃত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য।
তাহার শ্রবণে নাশ হয় সব কার্য্য॥
তাঁহার নাহিক দোষ ঈশ্বরাজ্ঞা পাঞা।
গৌণার্থ করিল মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া॥"

মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের মতে শঙ্করাচার্য্য ব্যাসসূত্রের মুখ্য অর্থ প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার ভাষ্যে যে অর্থ প্রকাশিত আছে তাহা গৌণার্থ। ঈশ্বরের আজ্ঞা পাইয়া শঙ্করাচার্য্য এই রূপে গৌণ অর্থ করিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শঙ্করাচার্য্যের প্রধান উদ্দেশ্য ভগবান গৌতম

বুদ্ধ কথিত ধর্ম্মের অভাব পূরণ এবং বুদ্ধদেবের পরবর্ত্তী বৌদ্ধাচার্য্যদিগের মত খণ্ডন। বুদ্ধদেব শাস্ত্র ত্যাগ করিয়া যাহা করিতে পারেন নাই, শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শঙ্করাচার্য্য তাহাই করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ মুক্তি ব্রহ্মাণ্ডের পারে। তিনি স্বয়ম্পতি স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকেই ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর বলিয়া জানিতেন। তাঁহার মুক্তি সেই ব্রহ্মাকে উপেক্ষা করিত।

শঙ্করাচার্য্যের মুক্তিও ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরের অপেক্ষা রাখেনা।

বুদ্ধদেব শূন্যনির্ব্বাণোদ্দেশী। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মনির্ব্বাণোদ্দেশী।

এই জন্য শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্ম নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম।

শূন্যের স্থানে নির্গুণ ব্রহ্মকে স্থাপন করিয়া মহোৎসাহে শঙ্করাচার্য্য শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সেই ব্যাখ্যা দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মের স্বতন্ত্রতা নষ্ট হইয়া গেল এবং বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতভূমি হইতে তিরোহিত হইল। আর এক কথা। বুদ্ধদেব প্রবর্ত্তিত প্রবল যোগাভ্যাসদ্বারা সিদ্ধি সকল শ্রমণের করায়ত্ত হইয়াছিল। কিন্তু তদনুরূপ নিঃস্বার্থ উদারভাবের উৎকর্ষ সাধন না হওয়ায়, এই সকল সিদ্ধি অপাত্রে ন্যস্ত হইয়াছিল। বুদ্ধদেব নিজে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার জ্ঞাতি ও শিষ্য সিদ্ধির কুহকে অজাতশত্রুকে বশীভূত করিয়া কিরূপে তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দিতা করিয়াছিল। বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গ প্রবর্ত্তনদ্বারা শঙ্করাচার্য্য তাঁহার শিষ্যদিগকে সিদ্ধির প্রলোভন হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মে ঈশ্বরের স্থান ছিল না এবং বৌদ্ধধর্ম্মকে ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য ঈশ্বরের অবতারণা করার প্রয়োজন হয় নাই।

ইহাই মহাপ্রভু কথিত ঈশ্বরাজ্ঞা; তবে শারীরিক সূত্রের যথার্থ কি? বোধায়ন ঋষি প্রবর্ত্তিত প্রাচীন বৃত্তিই যথার্থ হওয়া সম্ভব। শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ব-বর্ত্তী সময় হইতে শিষ্য পরম্পরায় যে নিরপেক্ষ অর্থ প্রচলিত ছিল, রামানুজা-চার্য্য তাহার পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। নিরপেক্ষভাবে থিব (Thibaut) সাহেব প্রতিসূত্র প্রতি অধিকরণের শাঙ্করভাষ্য ও রামানুজভাষ্য তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়াছেন এবং সেই বিচারদ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য ব্যাস সূত্রের যথার্থ নহে; রামানুজের ভাষ্য যথার্থ হইতে পারে। যে নিয়মের বশীভূত হইয়া লোকে মহাপ্রভু চৈতন্য দেবকে সাম্প্রদায়িক বলে, সেই নিয়মের

বশীভূত হইয়া এখনও শঙ্করাচার্য্যের অন্ধ অনুধাবকগণ থিব সাহেবকে অবাচ্য-পদ বলিয়া থাকেন।

"The question as to what the Sutras really teach is a critical, not a philosophical one. This distinction seems to have been imperfectly realised by several of those critics, writing in India, who have examined the views expressed in my Introduction of the translation of Sankara's commentory. A writer should not be taxed with 'philosophic incompetency', 'hopeless theistic bias due to early training', and the like, simply because he, on the basis of a purely critical investigation, considers himself entitled to maintain that a certain ancient document sets forth one philosophical view rather than another . . . . Among the remarks of critics on my treatment of this problem I have found little of solid value. The main arguments which I have set forth, not so much in favour of the adequacy of Ramanuja's interpretation, as against the validity of Sankaracharya's understanding of the Sutras, appear to me not to have been touched." Thibaut's Introduction to Vedanta Sutras with Ramanuja's Commentory.

থিব সাহেবের প্রাঞ্জল বিচার অনুসরণ করিয়া আমরা দুই ভাষ্যের মোটামুটি পার্থক্য দেখাইব। এই পার্থক্য থিব সাহেব সংক্ষেপে নিম্নলিখিত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন :—

"The chief points in which the two systems sketched above agree on the one hand and diverge on the other may be shortly stated as follows. Both systems teach advaita, *i.e.* non-duality or monism. There exists not several fundamentally distinct principles, such as the "prakriti" and the "purushas" of the Sankhyas, but there exists only one all embracing Being. While, however, the advaita taught by Sankara is a rigorous, absolute one, Ramanuja's doctrine has to be characterised as Visishta—advaita, *i.e.* qualified non-duality, non-duality with a difference. According to Sankara, whatever is, is Brahman, and Brahman itself is

absolutely, homogeneous, so that all difference and plurality must be illusory. According to Ramanuja also, whatever is, is Brahman; but Brahman is not of a homogeneous nature, but contains within itself elements of plurality owing to which it truly manifests itself in a diversified world. The world with its variety of material forms of existence and individual souls is not unreal Maya, but a real part of Brahman's nature, the body investing the universal self. The Brahman of Sankara is in itself impersonal, a homogeneous mass of objectless thought, transcending all atributes; a personal God it becomes only through its association with the unreal principle of Maya, so that—strictly speaking —Sankara's personal God, his Iswara, is himself something unreal.

Ramanuja's Brahman, on the other hand, is essentially a personal God, the all-powerful and all-wise ruler of a real world permeated and animated by his spirit. There is thus no room for the distinction between a "param nirgunam" and an "aparam sagunam" Brahma, between Brahman and Iswara. Sankara's individual soul is Brahman in so far as limited by the unreal upadhis due to Maya. The individual soul of Ramanuja, on the other hand, is really individual, it has indeed sprung from Brahman and is never outside Brahman, but nevertheless it enjoys separate personal existence and will remain a personality for ever.—The release from "samsara" means, according to Sankara the absolute merging of the individual soul in Brahman, due to the dismissal of the erroneous notion that the soul is distinct from Brahman; according to Ramanuja it only means the soul's passing from the troubles of earthly life into a kind of heaven or paradise where it will remain for ever in undisturbed personal bliss.—As Ramanuja does not distinguish a higher and lower Brahman, the distinction of a higher and lower knowledge is likewise not valid for him; the teaching of the Upanishads is not twofold but essentially one, and leads the enlightened devotee to one result only."

শঙ্কর ও রামানুজ উভয়ের মতেই এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। ব্রহ্মের অস্তিত্বেই সকলের অস্তিত্ব। শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্ম নিগুর্ণ। সদসৎ অনির্ব্বচনীয়া মায়া শক্তিদ্বারা, ব্রহ্মে গুণের ভান হয়। জীব ও ঈশ্বর এ দুয়েরই বাস্তব সত্তা নাই। মায়ার উপাধি দ্বারা ব্রহ্মে জীব ও ঈশ্বর কল্পিত হয়। জ্ঞানালোকে মায়ার উপাধি তিরোহিত হইলে, জীবও থাকেনা, ঈশ্বরও থাকে না। রজ্জুতে সর্পের বিবর্ত্ত রজ্জুজ্ঞান হইলেই নষ্ট হয়। জ্ঞানই মুক্তির একমাত্র উপায়। জ্ঞান ব্যতিরেকে অজ্ঞানের নাশ হয় না। কর্ম্ম ও উপাসনা কেবল অধম ও মধ্যম অধিকারীর জন্য। জ্ঞানের অধিকার হইলে কর্ম্ম ও উপাসনার প্রয়োজন থাকেনা। মুক্তি হইলে জীব, ঈশ্বর ও ব্রহ্মে কোন ভেদ থাকেনা। উপনিষদে দুই প্রকার বিদ্যার উল্লেখ আছে, পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা। পরা বিদ্যা দ্বারা নিগুর্ণ ব্রহ্মকে জানা যায়। অপরা বিদ্যা দ্বারা মায়া উপহিত সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে জানা যায়। যত দিন পরা বিদ্যার অধিকার না জন্মায়, ততদিন মাত্র জীব অপরা বিদ্যার আশ্রয় করে।

রামানুজের মতে নিগুর্ণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্মে ভেদনাই। এক ব্রহ্মের পরিণামেই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। ব্রহ্ম হইতেই সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। জীব ও জগৎ মায়া কল্পিত অলীক পদার্থ নহে। যাহা কিছু আছে ব্রহ্ম, ঈশ্বর বা ভগবানের অংশ। অন্তর্য্যামী রূপে ভগবান্ সকলেরই অভ্যন্তরে আছেন। জীব ও ব্রহ্মের ভেদ মায়াকল্পিত নহে। বাস্তব ভেদ। মুক্ত হইলে জীব ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হয় না; কিন্তু সালোক্যাদি লাভ করিয়া অনন্ত কালের জন্য বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভব করে। উপনিষদে পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা বলিয়া কোন ভেদ নাই। চিৎ ও অচিৎ ঈশ্বরের প্রকার এবং অনাদি কাল হইতে এই দুই প্রকার আছে ও থাকিবে। প্রলয় কালে অচিৎ অব্যক্ত ভাবে থাকে, চিৎ সঙ্কোচ অবস্থায় থাকে; ও ব্রহ্ম কারণাবস্থায় থাকে। সৃষ্টির কালে অচিৎ ব্যক্ত হয়, চিতের বিকাশ হয় ও ব্রহ্ম কার্য্যাবস্থায় পরিণত হয়। এই দুই পক্ষ অবলম্বন করিয়া শাঙ্কর ভাষ্য ও রামানুজ ভাষ্য। (ক্রমশঃ)

শ্রীপূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ।

ভারতীয় কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আদি পর্ব্ব—নায়কগণের যৌবনাবস্থা

ভীমের প্রতি বিষপ্রয়োগ

দুর্য্যোধন রাজমুকুট ধারণের উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইলেও বয়োজ্যেষ্ঠ পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকেই রাজসিংহাসন অর্পিত হইল। পাণ্ডবগণ কুরুপুত্রদিগের সহিত হৃষ্টচিত্তে পরম সুখে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন এবং সমস্ত বাল্যক্রীড়াতেই তেজোদ্বারা তাঁহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেন। ভীমসেনের ভীমপরাক্রম বাল্যক্রীড়াতেই সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

তিনি সকলকে ধরিয়া অশ্লিষ্ট করিয়া দিতেন, জলক্রীড়া করিতে করিতে ভুজযুগল দ্বারা বালকগণকে ধরিয়া জলমগ্ন করিতেন এবং যতক্ষণ না মৃতকল্প হয় ততক্ষণ ছাড়িতেন না। কুরুপুত্রগণ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া ফলচয়ন করিত, তখন ভীম সেই বৃক্ষ সকল পদদ্বারা কম্পিত করিতে থাকিতেন। প্রহারবেগে অভিভূত ও ঘূর্ণিত হইয়া বালকগণ তৎক্ষণাৎ বৃক্ষ হইতে প্রচ্যুত হইয়া ফলের সহিত ভূপতিত হইত।

ভীমের বাল্যক্রীড়া

ক্রীড়ারসে বলে শ্রেষ্ঠ পঞ্চসহোদর।
সবার অধিক বলী বীর বৃকোদর॥
যাইতে পবন সম সিংহ সম হাঁকে।
আস্ফালনে গজ যেন মেঘ সম ডাকে॥

*   *   *   *

জলের ভিতরে ডুবে চাপি দুই কক্ষে।
মৃতকল্প করি ছাড়ে প্রাণ মাত্র রাখে॥

এইরূপে যদিও ভীমসেন বাল্যক্রীড়ায় বালকগণকে ভীতি প্রদর্শন করিতেন; কিন্তু কদাচ কখনও ঈর্ষাপরবশ হইয়া কাহারও অনিষ্টজনক

কার্য্য করিতেন না ঃ—যাহা করিতেন তাহা বাস্তবিকই ক্রীড়াচ্ছলে করিতেন। বাস্তবিক প্রকৃত বীরত্বের এইত একটি লক্ষণ। বাল্যকালে ব্যায়াম ক্রীড়া হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃই বীরত্বের সঞ্চার হয়। যিনি প্রকৃত বীর হইবেন, তিনি ঈর্ষা বা দ্বেষ কিছুই মনে স্থান দিবেন না। যাহা করিবেন, তাহা মাত্র ক্রীড়াচ্ছলে, মনে কোন প্রকার 'কিন্তু' রাখিবেন না। শারীরিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক উন্নতি না হইলে "বীরত্ব" প্রতিফলিত হয় না; উত্তম ক্রীড়নশীল বালক যদি মনে রোষ পোষণ করে, তবে তাঁহাকে "গোঁয়ার ছেলে" বলে এবং পরিণামে সে সকলের ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়ায়—কিন্তু তদ্রূপ ক্রীড়নশীল বালক যদি নির্ম্মল হৃদয়, রোষবিকারশূন্য হয়, তাহাকে প্রকৃত বীরবালক বলা যায় এবং পরিণামে সে প্রকৃত বীরই হয়।

"যন্নবেভাজনেলগ্নে সংস্কারনান্যথা ভবেৎ"

বালকগণের বাল্যকালের সকল শিক্ষা সম্বন্ধেই এক কথা। ক্রমশঃ আমরা এই কুরুবালকগণের চরিত্র আন্দোলনে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাইব। আবার প্রকাশধর্ম্মী ও সুখকর গুণকে সত্ত্বগুণ ও বৃদ্ধিধর্ম্মী রাগাত্মক চঞ্চল গুণকে রজোগুণ বলে। প্রকৃত বীরের সকল গুণগুলিই প্রকাশধর্ম্মী হইবে অর্থাৎ তাঁহার মনের ভাব কার্য্যে পরিণত হইবে, আবার তৎসঙ্গে সেগুলি সুখকরও হইবে; অর্থাৎ কখনও ঈর্ষাপরবশ হইয়া কাহারও অনিষ্ট চিন্তা মনে আসিবে না। এইরূপ বীরত্বের আভাষ পাইলে এবং তৎসঙ্গে উত্তমাঙ্গের (মনের) প্রকৃত পরিচর্য্যা রাখিলে সেই বীর প্রকৃতির সহকারী হইতে পারেন—প্রকৃত মনুষ্যত্ব এমন কি দেবত্বও প্রাপ্ত হয়েন। নচেৎ রাগাত্মক চঞ্চলগুণবিশিষ্ট পুরুষের সহিত নিবিড় অরণ্যবাসী অতিহিংস্র শোণিতলেলিহান শার্দ্দূলের কোনও প্রভেদ নাই। শরীর ও মনের এরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধে যে কোন কারণে মন দুর্ব্বল হইলে, অর্থাৎ হিংসা দ্বেষ ইত্যাদি পরিচালিত হইলে, শারীরিক বলে বলীয়ান্ বীরজনেরাও নিতান্ত হীনবীর্য্য কাপুরুষের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকেন। আমরা দুর্য্যোধনাদি কুরুপুত্রগণের এই মানসিক দুর্ব্বলতা নিবন্ধন বাল্যকাল ক্রীড়ার অবস্থা হইতেই অবনতির বিকাশ দেখিতে পাইব।

কুরুপুত্রগণ ভীমের এইরূপ অমানুষিক ক্রীড়া কিছুতেই মনোতীত করিতে পারিলেন না; উপরন্তু মানসিক দুর্ব্বলতা বশতঃ তাঁহার উপর ঈর্ষা পোষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই স্থানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, বলিষ্ঠ বালকেরা পূর্ব্বাপর চিন্তা না করিয়া স্বীয় বীর্য্য প্রকাশ করতঃ এইরূপ নিজের শত্রুবৃদ্ধি করিয়া থাকে। ভীমের পক্ষে তাহাই হইল। আর দুর্য্যোধনের—"একে মনসা তাতে ধূনার গন্ধ" হইল। একে স্বভাবতঃ তিনি একছত্রাভিলাষী পরন্তু ঈর্ষাপরায়ণ হওয়ায় ভীমেব এইরূপ পরাক্রম তাঁহার গাত্রে উষ্ণবারি সিঞ্চন করিতে লাগিল। সদা কর্ত্তৃত্বাভিমানী, মদহঙ্কারেপূর্ণ দুর্য্যোধন বীরত্বের মহিমা ভুলিলেন;—তাঁহাব স্বার্থের ব্যাঘাত, একত্বের কণ্টক ভীমসেনকে একেবারে হত্যা কবিতে কৃতসংকল্প হইলেন। একটি মানসিক দুর্ব্বলতা হইতে আনুসঙ্গিক সকল দোষ গুলিই একে একে দুর্য্যোধনের হৃদয় আশ্রয় কবিল; স্বার্থপরতা হইতে ঈর্ষা এবং ঈর্ষা হইতে ভীমসেনের হত্যাসঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য "খলতা"ও তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিল। পাঠক পাঠিকাগণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, একমাত্র স্বার্থপরতার জন্যই দুর্য্যোধনের সকল দুবৃপ্রত্তিই ক্রমান্বয়ে আসিয়াছিল; এখন এক একটি করিয়া তাহার প্রমাণ দেখুন। তিনি অবশেষে ক্রূর মনে কেবল ভীমসেনেব সর্ব্বনাশ সাধনের উপায় দেখিতে লাগিলেন।

ভীমের প্রতি বিষপ্রয়োগ

অনন্তর তিনি জলবিহারের নিমিত্ত উদ্যানবনশোভিত গঙ্গাতীরে "প্রমাণ কোটী" নামক স্থানে একটি সুন্দব প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইলেন। পরে নিতান্ত সৌহার্দ্দেব সহিত পাণ্ডবগণকে জলক্রীড়া করিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। সিংহ যেরূপ গিরিগুহায়প্রবেশ করে পাণ্ডুপুত্রগণও তদ্রূপ সেই "উদকক্রীড়ন" প্রাসাদে প্রবিষ্ট হইলেন। ইত্যবসরে দুর্য্যোধন ভীমসেনের বিনাশ বাসনায় তদীয় ভক্ষ্য দ্রব্যে কালকূট মিশ্রিত করিলেন এবং তৎপরে "বিষকুম্ভ পয়োমুখম্" হইয়া ভ্রাতা ও সুহৃদের ন্যায় ভীমসেনের মুখে বহুপরিমাণে সেই বিষাক্ত ভক্ষ্য দ্রব্য প্রদান করিলেন।

"হেন কালে ক্রুদ্ধ কুরুপতি দুর্য্যোধনে।
দুষ্ট কালকূট দিল ভীমের বদনে॥

পুনঃ পুনঃ তথি পর দিল উপহার।
ভক্ষণে সন্তুষ্ট বীর আনন্দ অপার॥
কালকূট পান করিলেন বৃকোদর।
দুর্য্যোধন হৈল বড় হরিষ অন্তর।

দুর্য্যোধনের কি অধঃপতন হইল !! শেষে আতিথ্যধর্ম্মেও জলাঞ্জলি দিলেন। পুত্রহন্তা অতিথি হইলে তাহারও আদর ধর্ম্ম। কিন্তু দুর্য্যোধন তাহাও বুঝিলেন না; স্বার্থসাধনে উন্মত্ত দুর্য্যোধন ক্রমশঃ সকল ধর্ম্মেরই উচ্ছেদ করিলেন।

জলক্রীড়াবসানে সকলেই বিশ্রাম অভিলাষে প্রাসাদে যাইয়া শয়ন করিলেন, কিন্তু পাণ্ডুনন্দন ভীম শ্রান্ত ও কালকূটমদে বিমোহিত ছিলেন, তাহাতে শীতল বায়ু প্রাপ্ত হইয়া ক্রীড়াস্থলেই নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িলেন। পাপ দুর্য্যোধন অবশ্য পশ্চাৎ হইতে ভীমের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, এবং তাহাকে মৃতকল্প হতজ্ঞান দেখিয়া লতাপাশ দ্বারা স্বয়ং বন্ধন করিয়া স্থল হইতে গভীর জলে নিক্ষেপ করিয়া—হৃদয়ের কণ্টক ও দুশ্চিন্তার জ্বালা হইতে পরিত্রাণ পাইলেন।

বিষেতে আবৃত ভীম হৈল অচেতন।
সবে নিদ্রা গেল বাকি জাগে দুর্য্যোধন॥
অচেতন ভীমেরে দেখিয়া কুরুপতি।
হস্তপদ বন্ধন করিল শীঘ্রগতি॥
ধরিয়া ফেলিল গঙ্গা অগাধ সলিলে।
নাহিক শরীরে জ্ঞান জারিল গরলে॥"

সংজ্ঞাশূন্য মধ্যম পাণ্ডব জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া নাগ ভবনে নাগকুমারগণের উপর পতিত হইলেন। বহুসংখ্যক মহাদংষ্ট্র বিষোল্বন মহাবিষ নাগগণ বিদিত হইয়া ভীমের দেহে অতিশয় দংশন আঘাত করিল। সেইরূপ দংশিত হওয়ায় তাঁহার শরীরস্থ স্থাবর বিষ জঙ্গম সর্পবিষ দ্বারা অপসারিত হইল। বিষে বিষক্ষয় হইল। চেতনা প্রাপ্ত হইয়া কুন্তীনন্দন বন্ধননিচয় ছেদনপূর্ব্বক নাগগণকে ধ্বংস করিতে লাগিলেন।

বিষে বিষক্ষয়

ভীমের চেতনাপ্রাপ্তি ও নাগ ধ্বংস।

চেতন পাইয়া ভীম দেখে চতুর্ভিতে ॥
অবহেলে ছিণ্ডে কর পদের বন্ধনে।
মুষ্ট্যাঘাত প্রহারে যতেক নাগগণে ॥
ভীমের মুষ্টিকাঘাত বজ্রের সমান।
পলায় সকল নাগ লইয়া পরাণ ॥

নাগকুল ভীত হইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়া সর্পরাজ বাসুকির নিকট উপস্থিত হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। অনন্তর বাসুকি অনুগত নাগগণের সহিত তথায় আগমনপূর্ব্বক ভীমপরাক্রম মহাবাহু ভীমকে দেখিলেন। উপস্থিত নাগগণের মধ্যে ভীমের মাতৃদেবীর এক পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন এবং সর্পরাজ বাসুকি তাঁহার অনুরোধে ভীমকে মহাবলপ্রদ অমৃত পান করিতে অনুজ্ঞা দিলেন। অষ্টাহ পরে ভীমসেন জননী এবং ভ্রাতৃগণের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। জননী এবং ভ্রাতৃগণ তাঁহার সহসা অনুপস্থিতিতে বিষম সন্দিহান এবং চিন্তাকুল হইয়াছিলেন। ভীমসেন এখন তাঁহার অনুপস্থিতির কারণ এবং দুর্য্যোধনের কীর্ত্তি যথাযথ জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু বিদুর এবং যুধিষ্ঠিরের পরামর্শে দুর্য্যোধনের বিপক্ষে কোন প্রকার কথা উল্লেখ হইল না। দুর্যোধনের চেষ্টা এমনে ব্যর্থ হইল, ভীমসেন প্রাণে বাঁচিলেন। এই বৈরীতার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কর্ম্মসূত্রে বাঁধা—ইহারা সকলেই বিধাতার হাতের যষ্টি।

অবশ্য ভব্যেষ্বনবগ্রহগ্রহা—যয়া দিশা ধাবতি বেধঃ স স্পৃহা।
তৃণেন বাত্যেব তয়ানুগম্যতে জনস্য চিত্তেন ভৃশা বশাত্মনা॥　নৈষধ।

অর্থাৎ অবাধ বায়ু যে দিক্ দিয়া প্রধাবিত হয়, তৃণাদি অবশ ভাবে সেই দিকে উড়িয়া যায়। তদ্রূপ বিধাতার স্পৃহা যে দিকে যায়, লোকের চিত্তও অবশ হইয়া সেই দিকে ধাবিত হয়। বিধাতার ইচ্ছা রুদ্ধ হয় না, এই জন্যই লোকে বলে, ভবিতব্যতার গতিরোধ মানুষের অসাধ্য। ভীমসেনের ভবিতব্য বহুদিন জীবন ধারণ করিয়া কুরুক্ষেত্রে ইতিহাসে ধর্ম্মযুদ্ধের প্রথম উপকরণ হওয়া। সুতরাং তাঁহার জীবন রক্ষা করা বিধাতার ইচ্ছা—আবার তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী দুর্যোধনের কর্ম্মফল বশতঃ পাণ্ডবগণের চিরশত্রু হইয়া কুরুক্ষেত্রে রণের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে, সেও ভগবানের ইচ্ছা অতএব

উভয়ের জীবনের সহিত সাময়িক ইতিহাসের বিশেষ সম্বন্ধ থাকায় বিধাতার ইচ্ছা উভয়ের প্রাণে বঁধিয়াছিলেন। দুর্য্যোধন ক্রমশঃই উত্তরোত্তর এই-রূপ অনিষ্ট সাধনের চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন এবং পাণ্ডবগণের বিরুদ্ধে নিদারুণ বৈরীতা হৃদয়ে পোষন করিতে লাগিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীমনোরঞ্জন সিংহ।

পঞ্চীকরণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতে পর।)

তথাহি। কৌর্ম্মং।

বেদবেদ্যোহি ভগবান্ বাসুদেবঃ সনাতনঃ।
সগীয়তে বরোদেবো যোবে দৈনং স বেদবিৎ॥
এতৎ পরতরং ব্রহ্ম জ্যোতিরানন্দমুত্তমং।
বেদবাক্যোদিতং তত্ত্বং বাসুদেবং পরং পদং॥
এষ সর্ব্বং সৃজত্যাদৌ পাতি হন্তি চ কেশবঃ।
ভূতান্তরাত্মা ভগবান্ নারায়ণ ইতি শ্রুতিঃ॥

বেদবেদ্য এক অদ্বিতীয় ভগবান বাসুদেব সনাতন পরব্রহ্ম, ইহাই সর্ব্ব বেদে উক্ত হইয়াছে। সেই বসুদেবাখ্য শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব যে জানে সেই বেদবিৎ। ইনিই পরাৎপর পরম তত্ত্ব পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ বাসুদেবাখ্য পরম তত্ত্ব বেদবাক্যে উক্ত করিয়াছেন, এই বাসুদেব যাঁহাকে শঙ্খ চক্রাব্জধারী নারায়ণ কহে, তিনিই এতৎ সকল বিশ্বকে সৃজন, পালন, সংহার করেন। তাঁহাকেই কেশিসূদন বলিয়া শাস্ত্রে ব্যক্ত করে, শ্রুতিতে সর্ব্ব ভূতান্তরাত্মা ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ নারায়ণ নামে আখ্যাত করিয়াছেন। যথা, নারায়ণোপনিষৎ।

একোহবৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা ন ঈশানো নাপোনাগ্নীষোমৌ ন ইমে দ্যাবা পৃথিবী নক্ষত্রাণি ন সূর্য্যঃ স একাকী ন রমেত॥ ইতি মহোপনিষৎ। একোহবৈ পুরুষো নারায়ণো কাময়ত প্রজা সৃজয়ে মিতি।

সকলের অগ্রে একপুরুষ নারায়ণ মাত্র ছিলেন, তৎকালে ব্রহ্মা, রুদ্র, জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী, স্বর্গ, কিছুমাত্র ছিল না।

সেই নারায়ণ একাকী থাকিতে সুখী না হইয়া প্রজা সৃষ্টি করিবার কামনা করিলেন। যথা, কৌর্ম্মে।

একাংশেন জগৎ কৃৎস্নং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ।
চতুর্দ্ধাবস্থিতো ব্যাপী সগুণো নির্গুণোপিবা॥

একাংশে সকল জগৎ ব্যাপিয়া নারায়ণ আছেন, তিনিই সৃষ্টির আদিতে নির্গুণ হইয়া ও সগুণরূপে সৃষ্টি করণার্থ চতুরংশে বিভাসিত হইলেন, তাহাতে তাঁহাকে অখণ্ড ব্যতীত খণ্ড বলিতে পারা যায় না। যথা, শ্রুতিঃ—"স একধা দ্বিধা ত্রিধা সপ্তধেত্যাদি;" যথা দীপইতে দীপোৎপত্তি বা জলশরাবস্থিত চন্দ্রবৎ। এই সকল বিশ্ব নারায়ণ হইতে উৎপন্ন, নারায়ণে সংস্থিত, নারায়ণে লয় হয়; যথা শ্রুতিঃ—"যত্তোবা ইমানি ভূতানি জাতানি প্রতিযন্তীতি;"—তথাচ শ্রুতিঃ—"সর্ব্বে নারায়ণাদুৎপদ্যন্তে সংস্থিতানি নারায়ণে প্রতিযন্তীতি;—তথাচ।

পরে চ পরমং ব্রহ্ম বাসুদেবঃ সনাতনঃ।
শেতে নারায়ণঃ শ্রীমান্ মায়য়া মোহয়ন্ জগৎ।
নারায়ণাদিদং জাতং তস্মিন্নেব ব্যবস্থিতং।
তমেবা ভ্যেতি কল্পান্তে স এব পরমাগতিঃ॥ কৌর্ম্মং ৪।৬ অঃ।

প্রলয়কালে বাসুদেবাখ্য পরমাত্মা নারায়ণ লক্ষ্মীর সহিত সমুদয় জগৎকে সংহার করতঃ শয়ন করেন, অতএব নারায়ণ হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়া নারায়ণেই অবস্থিতি করে, পুনঃ কল্পান্তে সেই সকল নানারূপ শরীরেই লয় পায়, অতএব নারায়ণই পরম কারণ, নারায়ণই পরমগতি। নারায়ন ব্যতীত মুক্তির অন্য উপায় নাই, যথা—মুক্তিঞ্চ কেশবাদিচ্ছেদিতি"—এবং এই কূর্ম্ম পুরাণের ২০।২২ অধ্যায়ে বিশ্বামিত্র জয়ধ্বজ সংবাদে উক্ত আছে যে, রাজা জয়ধ্বজ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, কাহাকে উপাসনা করিলে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। প্রশ্ন,—সেই ব্রহ্ম কে? উত্তর,—সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের এক কারণ ব্রহ্ম। প্রশ্ন,—কাহা হইতে হয়? উত্তর—বিশ্বামিত্র উবাচ।

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যস্মিন্ সর্ব্বং যতো জগৎ।
স বিষ্ণুঃ সর্ব্বভূতাত্মা তমাশ্রিত্য বিমুচ্যতে।
যমক্ষরাৎ পরতরাৎ পরং প্রাহুর্গুহাশয়াঃ।
আনন্দং পরমং ব্যোম সর্ব্বো নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥

ত্রিপাদমক্ষরং ব্রহ্ম তমাহুঃ ব্রহ্মবাদিনঃ।
বাসুদেবো মহাবাহু দৈবদেবো জগদ্‌গুরুঃ।
বভূব দেবকী পুত্রো দেবৈরভ্যার্থিতোহরিঃ॥ কৌর্ম্মং॥

বিশ্বমিত্র ঋষি রাজাকে উপদেশ দ্বারা কহিতেছেন, যাহা হইতে জীবের উৎপত্তি, যাহাতে স্থিতি, যাহাতে লয়, তিনিই বিষ্ণু, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, তাঁহার আশ্রয় লইলেই মুক্তি হয়। গিরিগহ্বরবাসী যোগীগণেরা সকলের পরাৎপর অক্ষর পরব্রহ্ম যাহাকে কহেন এবং ব্যোমরূপ ও অপর আনন্দরূপ হয়েন, বেদবাদিরা প্রণবরূপে যাঁহাকে ধ্যান করেন, সেই বাসুদেব পরমাত্মা নারায়ণ সর্ব্বময়, দেবগণের প্রার্থনায় দেবকী পুত্র হইলেন। এই সকল পুরাণের সহিত শ্রুতির ঐক্য থাকাতে কৃষ্ণকে ঈশ্বর না বলা কোন মতেই হইতে পারে না; যথা শ্রুতিঃ। "তস্মাৎ কৃষ্ণএব পরোদেবস্তং ধ্যায়েত্তং রসেত্তং যজেদিত্যোস্তৎসদিতি।" তবে নাস্তিক ও মূঢ় এবং উন্মত্তে অবাচ্য কি? ইহাতে পরদারা হরণ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে আপত্তি আনেন, তাহা শ্রুতি স্মৃতি পুরাণে স্পষ্টরূপে মীমাংসা করিয়াছেন, যথা।

সোহন্তর্যামী স পুরুষঃ স প্রাণঃ স মহেশ্বরঃ। স কালোগ্নিস্তমব্যক্তং স এদেব মিতিশ্রুতিঃ॥ কীর্ত্তিতঃ সর্ব্ব বেদেষু সর্ব্বাত্মা সর্ব্বতোমুখঃ। সর্ব্বকামাঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বগন্ধোজরামরঃ॥ ঈশ্বরগীতায়াং। ২ অঃ।

সর্ব্বান্তর্যামী পুরুষ তিনিই প্রাণ, তিনিই মহেশ্বর, কাল অগ্নি, তিনিই অব্যক্ত আত্মা, তাঁহা ব্যতীত অন্য নাই, ইহাই শ্রুতিতে কহিয়াছেন, এবং সর্ব্ববেদে তাঁহাকে সকলের অন্তরাত্মা সর্ব্বতোমুখ, অর্থাৎ বৈশ্বানরাগ্নি ও সর্ব্বকাম, সর্ব্বরস, সর্ব্বগন্ধ, অজ, অমর আখ্যাত করিয়াছেন; এতদর্থে ভাগবতে বার পঞ্চাধ্যায়ে গোপীগীতায় উক্ত হইয়াছে, যথা, "নখলু গোপিকা-নন্দনো ভবানখিল দেহিনাং মন্তরাত্মদৃক্।" ইতি—হে প্রভো! তুমি গোপিকা পুত্র নহ, অখিল অর্থাৎ সমস্ত দেহধারি ব্যক্তি মাত্রেরই আত্মা হও। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ সকলের আত্মা, তাঁহার পরদারাহরণ ভাক্ত, অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিক প্রপঞ্চ মাত্র, লোকে তাঁহার মনুষ্যবৎ কর্ম্ম দেখে; বস্তুতঃ তাঁহার কোন কর্ম্মই নহে।

সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতং। অভিন্নং ভিন্ন সংস্থানং শাশ্বতং ধ্রুবমব্যয়ং॥ অমায়ী মায়য়াবদ্ধঃ করোতি বিবিধাস্তনূঃ॥

ইন্দ্রিয়াতীত নিগুণ পরমেশ্বর সকল ইন্দ্রিয়ের অতীত হইয়াও সকল ইন্দ্রিয়ের আভাস গ্রহণ করেন, অর্থাৎ লোকে তাঁহাকে ইন্দ্রিয়বান্ অবলোকন করে। অমায়ী অর্থাৎ মায়া রহিত হইয়াও মায়া দ্বারা আপনার বিবিধ তনুকে বিস্তারিত করেন; তিনি সকল বস্তু হইতে ভিন্ন হইয়াও সকলে অভিন্ন আছেন। নিত্য সত্য ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাশক্তির অনুভব করিবার সাধ্য কি? শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব মায়ার অতীত, কিন্তু মায়িক মনুষ্যেরাই মায়াবৃত চক্ষু প্রযুক্ত তাঁহার ঐশ্বরতত্ত্ব অনুভব করিতে না পারিয়া প্রাকৃত মনুষ্যবৎ পরদারাদি দোষের আরোপ করে। যেহেতু তিনি সর্ব্ব শক্তিমান, তাঁহার নিরঙ্কুশ ক্রিয়া, তাহাতে ধর্ম্মাধর্ম্ম উভয়েরই স্পর্শ নাই। তিনি সকল কর্ম্মে লিপ্তবৎ থাকিয়াও লিপ্ত হয়েন না। ইহাতে শ্রুতি অনুশাসন করিয়াছেন,—যথা, কঠোপনিষৎ।

স্বর্য্যো যথা সর্ব্ব লোকৈক চক্ষুর্ন লিপ্যতে চক্ষুষৈ র্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোক দুঃখেন বাহ্য॥

সর্ব্বলোকের এক চক্ষু সূর্য্য, তিনি স্বকর বিস্তারে এতজ্জগতে পবিত্রাপবিত্র সকল বস্তুকেই স্পর্শ করেন, কিন্তু তিনি তৎস্পর্শ জন্য মনুষ্যবৎ অপবিত্র হয়েন না। তদ্রূপ সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা এক পরমেশ্বর শুভাশুভ তাবৎ কর্ম্মকে স্পর্শ করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হয়েন না, এতদর্থে রাস পঞ্চাধ্যায়ে পরীক্ষিত প্রশ্নে শুকোক্তি আছে; যথা,—

"ধর্ম্মো ব্যতিক্রমো যত্র ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসং।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥"

ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে আপত্তি করায় মূর্খতা প্রকাশ বই আর ইষ্টাপত্তি কি হইতে পারে? যদিও তিনি পরদারাদি কর্ম্ম যাজন করিয়া থাকেন, সে ভাক্ত; ফলিতার্থ তিনি কিছুতেই লিপ্ত ছিলেন না, তিনি মায়াতীত পরম পুরুষ, শুদ্ধ মায়িক মনুষ্যেরা মায়া-প্রভাবে অহঙ্কারবশে প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় তাঁহাকে মায়িক কহেন,—যথা,

ইমে নোবান্ধবা স্তাত ত্বাং মত্বা মানুষং বিভো।
পরিদেবন্তি করুণং সর্ব্বে মানুষবুদ্ধয়ঃ॥ মহাভারতং।

হে কৃষ্ণ! হে তাত! এই আমাদিগের বান্ধবেরা মানুষবুদ্ধি প্রযুক্ত, তোমাকে মানুষ জ্ঞান করিয়া করুণাযুক্ত বিলাপ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণকে

বলরাম পূর্ব্বে কহিয়াছিলেন, যাহাদিগের শুদ্ধ অহঙ্কারে বিমুগ্ধ আত্মা তাহারাই কৃষ্ণকে মায়ার বশ কহে; কিন্তু পরমাত্মাকৃষ্ণে মায়ার সম্বন্ধ নাই,—যথা।

যথা সংলক্ষ্যতে রক্তঃ কেবলং স্ফটিকোজনৈঃ।

রঞ্জি আদ্যুপধানেন তদ্বৎপরমপুরুষঃ॥ ঈশ্বরগীতায়াং॥

রক্তবর্ণ বস্তু সন্নিধানে লোকে নির্ম্মল স্ফটিককে যেমন আরক্ত দেখে, তদ্রূপ মায়িকেরা মায়া সন্নিধানে শ্রীকৃষ্ণকে মায়িক দেখে। যদিও পরমেশ্বর সর্ব্বকর্ম্মের অতীত তথাপি সকল কর্ম্ম তিনিই করেন। শুদ্ধ অহংকার বশে মনুষ্যেরা আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া জানে। কিন্তু সকলের কর্ত্তা যে পরমেশ্বর তাঁহাকে জানে না; যথা :—

অহংকর্ত্তা সুখী দুঃখী কৃশঃ স্থূলেতি যা মতিঃ।

সা চাহংকার কর্তৃত্বাদাত্মন্যারোপ্যতে জনৈঃ। ঈশ্বর গীতায়াং।

আমি কর্ত্তা, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি কৃশ, আমি স্থূল, এই যে বুদ্ধি, অহঙ্কার দ্বারা হয়, সেই বুদ্ধিতে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব না মানিয়া আপনাতে কর্তৃত্ব আরোপ করে। এতদর্থে ঈশ্বর হইতে যে শুভাশুভ সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে তাহার প্রমাণ হইল, সকল কর্ম্মই তাঁহাতে অবস্থিতি করে কিন্তু তিনি সকলের অন্তর, অর্থাৎ কোন কর্ম্মই তাঁহাতে লিপ্ত হয় না। ইহাতে সর্ব্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণ শুভাশুভ তাবৎ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি যে কোন কর্ম্মে লিপ্ত নহেন, ইহা অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে। নচেৎ উক্ত ঈশ্বরগীতার প্রমাণ অপ্রামাণ্য হয় এবং শ্রুতিতেও কহেন যে আত্মাতে সকল অধিবাস করে এবং আত্মাও সকলে বাস করেন কিন্তু পরমাত্মা সকল হইতে ভিন্ন। তদর্থে গীতায় অনুশাসন করিয়াছেন, যথা।

যদন্তরা সর্ব্বমেতদয়তো ভিন্নমিদং জগৎ।

স বাসুদেব আসীন স্তমীশং দদৃশুঃ কিল। ঈশ্বরগীতায়াং। ১অঃ।

এতৎ জগৎ যাহাতে অধিবাস করে এবং যিনি জগৎ হইতে ভিন্ন, সেই বাসুদেব বসিয়া আছেন, তোমরা এই পরমেশ্বরকে দর্শন কর। অতএব বিজ্ঞ মহানুভবেরা আলোচনা করুন, যদিও শ্রীকৃষ্ণে শুভাশুভ কর্ম্মভান দৃষ্ট হয়; কিন্তু তিনি যে তাহাতে অন্তর ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইল।

নচেৎ শ্রুতিস্মৃতি তাবৎ শাস্ত্রই রসাতলে যায়। শ্রীকৃষ্ণের মানবধর্ম্ম মনুষ্যবৎ ভানমাত্র। বাস্তবিক তিনি পরদারাদি কোন কর্ম্মই করেন নাই; অন্ধতম দৃষ্টি জীবেরাই মূঢ় স্বভাবে শ্রীকৃষ্ণকে কর্ম্মরূপে দেখে। তদর্থে অথর্ব্ববেদীয় গোপালতাপনী শ্রুতির উত্তরখণ্ডে সুন্দররূপ মীমাংসা করিয়াছেন, যথা।

একদাহি ব্রজস্ত্রিয়ঃ সকামাঃ শর্ব্বরী মুষিত্বা সর্ব্বেশ্বরং গোপালং কৃষ্ণং হি তা উচিরে। ১। উবাচ তাঃ কৃষ্ণঃ অমুকস্মৈ ব্রাহ্মণায় ভৈক্ষ্যাং দাতব্যং ভবতি দুর্ব্বাসস ইতি ॥ ২ ॥ তাপনীয় শ্রুতিঃ।

এক দিবস সকামা অর্থাৎ অভিলাষবিশিষ্টা ব্রজস্ত্রী সকল শ্রীকৃষ্ণ সমীপে রজনী বাস করতঃ প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভো নাথ! অদ্য আমরা কোন্ ব্রাহ্মণকে ভোজন দিব, যাঁহা হইতে আমাদিগের মনঃস্থিত সকল কামনা পূর্ণ হয়। এরূপ অভিলাষযুক্তা গোপিকাদিগের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ আজ্ঞা করিলেন, এই যমুনার পরপারে মহা তেজস্বী দুর্ব্বাসা ঋষি তপস্যা করিতেছেন, অভীষ্ট পূরণার্থে তাঁহাকে অন্ন প্রদান করহ।

কথং যাস্যামস্তীর্ত্বা জলং যমুনায়া যতঃ শ্রেয়োভবতি ॥ ৩ ॥ কৃষ্ণেতি ব্রহ্মচারীভুক্ত্বা মার্গং বোদাস্যতি ॥ ৪ ॥ যং মাং স্মৃত্বা অগাধা গাধাভবতি। যং মাং স্মৃত্বা অপূতঃ পুতোভবতি। যং মাং স্মৃত্বা অব্রতী ব্রতীভবতী। যং মাং স্মৃত্বা সকামো নিষ্কামোভবতি। যং মাং স্মৃত্বাশ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিয়ো ভবতি ॥ ৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণবাক্যে গোপিকারা বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, হে প্রভো! এই মহাস্রোতা মহোর্ম্মিমালিনী ঘোরাবর্ত্তজলা তরঙ্গিনী-ফেন-কলিলা অতি গভীরা, অগাধ সলিলা, কালিন্দীর পার হইয়া কি প্রকারে গমন করিব? যাহাতে আমাদিগের কুশল হয়। এতৎ সংশয়াপন্ন গোপীদিগকে আশ্বাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন, যে তোমরা যমুনা সমীপে এই বিজ্ঞাপন করিহ যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী আমাদিগকে তোমার পরিপারে যাইতে আজ্ঞা করিয়াছেন, তৎশ্রবণে অগাধা যমুনা গাধা হইয়া পদপী প্রদান করিবেন। আমাকে স্মরণ করিলে কোন কর্ম্ম অসাধ্য থাকে না, অপবিত্র ব্যক্তি আমাকে স্মরণ করিলে পবিত্র হয়, অব্রতী সমস্ত ব্রতফল পায়, সকাম ব্যক্তি নিষ্কাম হয়, অবেদজ্ঞ বেদজ্ঞ হয়। এতৎ কৃষ্ণোক্তির তাৎপর্য্য এই যে

গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে নন্দ নন্দন প্রাকৃত গোপ বালক রূপে জানেন, পরমেশ্বর বলিয়া কদাপিও মনে করেন না। শুদ্ধ প্রিয়তম স্বজন বলিয়া পরিচর্য্যা করেন, সেই অন্ধতমস নিবারণে আত্মস্বরূপতত্ত্ব উদ্বোধন জন্য শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী শব্দ আখ্যাত করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ শর্ম্মা।

সনাতন ধর্ম্ম।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এইরূপে সুদীর্ঘ শিক্ষার পর মানব বহির্যজ্ঞের অপেক্ষা অন্তর্যজ্ঞের সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারেন; বহিঃ সৌচ অপেক্ষা অন্তঃ সৌচের প্রাধান্য অনুভব করেন। তাহা বলিয়া বহিঃ সৌচ পরিত্যক্ত হয় না, কিন্তু অন্তঃসৌচের অভাব যে সাংঘাতিক তাহা বুঝিতে পারেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত আছে—

'যস্যৈতে চত্বারিংশত সংস্কারাঃ ন চাষ্টাবাত্মগুণাঃ ন স ব্রহ্মণঃ সাযুজ্যং সালোকং গচ্ছতি। যস্য তু খলু চত্বারিংশং সংস্কারাণাং একদেসোঽপ্যষ্টাবাত্মগুণা অথ স ব্রাহ্মণঃ সাযুজ্যং সালোক্যং-চ গচ্ছতি।" (গৌতম ধর্ম্মসূত্র ৮,২৪-২৫)

যাহার এই চত্বারিংশৎ সংস্কার হইয়াছে অথচ অষ্ট আত্মগুণ নাই, সে ব্রহ্ম সাযুজ্য বা সালোক্য লাভ করিতে পারে না। ২৪। কিন্তু যাঁহার চত্বারিংশৎ সংস্কারের সামান্য মাত্র আছে অথচ অষ্ট আত্মগুণ আছে তিনিই ব্রহ্ম সাযুজ্য ও সালোক্য লাভ করেন।"

পবিত্রতা লাভই যজ্ঞের প্রয়োজন, একথা শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন—

"যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্ম ফলপ্রদাং।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্য গতিং প্রতি॥

ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং তয়াপহৃত চেতসাং ।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥"　(গীতা ২।৪২-৪৪)

হে পার্থ একান্তভাবে করহ শ্রবণ ।
বেদবাদে রত সদা যাহাদের মন ॥
সেই বাদ বিনা অন্য তত্ত্ব কিছু নাই
এই কথা মনে যারা ভাবয়ে সদাই ॥
কামনায় মগ্ন যারা, স্বর্গ পরায়ণ ।
ফল আশা করে সদা সেই মূঢ়গণ ॥
জন্ম কর্ম্ম ফলপ্রদ ভোগের সাধন ।
বহু ক্রিয়াময় যত পুষ্পিত বচন ॥
সে বচনে অপহৃত চিত্ত যা সবার ।
ভোগৈশ্বর্য্যে মগ্ন চিত্ত নাহি পায় পার ॥
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি তাদের নিশ্চয় ।
যোগযুক্ত হতে তারা শুভ শক্ত নয় ॥"

অন্যত্র বলিয়াছেন :—

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞান যজ্ঞ পরন্তপঃ ।
নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্র সহ বিদ্যতে ॥

হে পরন্তপ, দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ****** এ জগতে জ্ঞানের সমান পবিত্র আর কিছুই নাই ।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ভীষ্মদেব সত্যপ্রসঙ্গে সত্যকে যজ্ঞ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

"অশ্বমেধ সহস্রং চ সত্যং চ তুলয়া ধৃতং ।
অশ্বমেধ সহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে ॥"
"সহস্রেক অশ্বমেধ ফল সত্য আর ।
তুলায় ধরিলে সত্য হন গুরুভার ॥"

অন্যত্র অনুশাসন পর্ব্বে তিনি বলিয়াছেন—

"সর্ব্ব যজ্ঞেষু বা দানং সর্ব্বতীর্থেষু চাপ্লুতং ।
সর্ব্ব দান ফলং চাপি নৈতত্তুল্যমহিংসয়া ।

অহিংস্রস্য তপোঽক্ষয্যমহিংস্রো যজতে সদা॥"

"সর্ব্ব যজ্ঞে দান আর সর্ব্বতীর্থে স্নান।
সর্ব্বদান ফল নহে অহিংসা সমান॥
অহিংস্রের তপ সদা জানিও অক্ষয়।
অহিংস্রের যজ্ঞ বিনা যজ্ঞ ফল হয়॥"

দ্বৈতজ্ঞানের নাশই যজ্ঞের চরম ফল। যজ্ঞফলে ব্রহ্ম ও পবিত্রতা সাযুজ্য লব্ধ হয়। ঋষিগণ সনাতনধর্ম্মানুবর্ত্তীকে এই পথে লইয়া গিয়াছেন।

এই অধ্যায়ে যে সমস্ত বিষয় আলোচিত হইল তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত তত্ত্বগুলি সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া রাখিবার উপযুক্ত—

১। যজ্ঞ হইতে বিশ্বের উৎপত্তি ও রক্ষা হইতেছে।

২। যজ্ঞ বলিলে প্রছর্দ্দন বা ত্যাগ বুঝায়।

৩। যজ্ঞই ক্রমবিকাশের মূল বিধি। ইহা নিম্নজগতে বিধিবদ্ধ; মানবের পক্ষে স্বেচ্ছাকৃত।

৪। মানব নিয়ন্ত্রিত হইয়া বৈদিক যজ্ঞ হইতে ক্রমে আত্মযজ্ঞে দীক্ষিত হন।

৫। দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। (ক্রমশঃ)

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দৃশ্য ও অদৃশ্য সপ্তলোক।

জীবাত্মার ক্রমবিকাশ আলোচনা করিতে করিতে আমরা তাহার ক্রমোন্নতির ও সম্বিৎবিকাশের তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছি। এইবার তাঁহার বিভিন্ন উপাধির বিষয় এবং তাঁহার সুদীর্ঘ প্রবাস কালে তাহাকে যে সমস্ত লোকে বাস করিতে হয় তাহার বিষয় আলোচনা করিব। উপাধিগুলি ঐ সমুদায় লোকের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। সেই উপাধি সমুদায়ের সাহায্যেই জীবাত্মা ঐ লোক সমূহে বিচরণ পূর্ব্বক বিবিধ কর্ম্ম দ্বারা আত্মোন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হন। জীবাত্মার এই অভীষ্ট সিদ্ধির জন্যই উপাধি সমূহের প্রয়োজন। তৎসাহায্যে বাসনাবশে জীবাত্মা, লৌকিক সুখ সম্ভোগ করেন।

জীবাত্মা যে বাসনাবশেই উপাধি গ্রহণ করেন একথা ছান্দোগ্য উপনিষদে স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে ; যথা—

"মঘবন্মর্ত্ত্যং বা ইদং শরীর মাত্তং মৃত্যুনা তদস্যামৃতস্যা শরীরস্যাত্মনোঽধিষ্ঠানম্।"

হে মঘবন্ এই দেহ নিশ্চয়ই মরণশীল ও মৃত্যু শাসিত "ইহা অশরীরি অমৃত আত্মার অধিষ্ঠান স্থল।" ভোগবাসনা হইতে, আত্মার ইন্দ্রিয়গণ উৎপন্ন হইয়াছে ; তাহাদের কার্য্য ভোগ্যপদার্থের গ্রহণ ও ত্যাগ। সকলেরই মূলে তাহার ইচ্ছা বর্ত্তমান। পদার্থ তাহার অভিলাষ পূরণ করে এবং তত্তৎ ইচ্ছা পূরণের উপযোগী ইন্দ্রিয়রূপে উৎপন্ন হইয়া প্রাণ শক্তির সাহায্যে ইচ্ছা পূর্ণ করে। বিজ্ঞানও আজকাল প্রমাণ করিতেছেন যে সমস্ত ইন্দ্রিয় জীবের প্রয়োজনের আধিক্য জন্য উৎপন্ন ও পুষ্ট হয়।

যো বেদেদং জিঘ্রাণীতি স আত্মাগন্ধায় ঘ্রাণম্।
অথ যো বেদেদমভিব্যাহরাণীতি স আত্মাভিব্যাহারায় বাগ।
অথ যো বেদেদং শৃণ্বানীতি স আত্মা শ্রবণায় শ্রোত্রং।
অথ যো বেদেদং মন্বানীতি স আত্মা মনোঽস্য দৈবং চক্ষুঃ।" (ছান্দোগ্য ৮।৪-৫)

যবে ইচ্ছা হলো　　ঘ্রাণ করিবার
ঘ্রাণের কারণ ঘ্রাণেন্দ্রিয় হ'ল।
কথনের ইচ্ছা　　হইল আত্মার
বাগীন্দ্রিয় তাই প্রকাশ করিল॥
শ্রবণের ইচ্ছা　　জাগিল যখন
শ্রবণ ইন্দ্রিয় করিলা গঠন।
আত্মার যখন　　চিন্তন বাসনা
হইল তখন দৈব চক্ষু মন॥

এই সূক্ষ্মতর ইন্দ্রিয় মন দ্বারা যে দর্শনানন্দ উপভোগ করে তাহা স্থূল ভৌতিক আবরণে অবরোধ করিতে সক্ষম নহে। শ্রুতি বলিতেছেন—

"স বা এষ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন রমত।"

সেই এই আত্মা এই দৈব চক্ষু মন দ্বারা, কামনার দ্রব্য সমূহ দর্শন ও উপভোগ করেন।" এইখানেই জীবাত্মার মনস্তত্ত্ব (Psychology) ও দেহতত্ত্ব (Physiology) অপূর্ব্ব রূপে সম্মিলিত হইয়াছে। জীবাত্মা

চৈতন্যময় সত্তা। সেই চৈতন্য বাহ্যবিষয় উপলব্ধি করিতে করিতে আপনাতে বাহ্যবিষয় গ্রহণের উপযোগী ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়শক্তির বিকাশ ও পুষ্টি সাধন করেন। সেই ইন্দ্রিয় সমুদায়ের মধ্যে মন, বাহ্যাভ্যন্তরের সেতু স্বরূপ। সেই সমুদয় ইন্দ্রিয় শক্তি ও তাহাদের গ্রাহ্য বিবিধ লোকের সহিত তাহাদের সম্বন্ধের বিষয়, আমরা এইবার আলোচনা করিব।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় এই কথা বলিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদত্বও নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥
শ্রোত্রং চক্ষু স্পর্শনং চ রসনং ঘ্রাণমেবচ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপাসেবতে॥"

এই জীব লোকে মম অংশ রূপ
জীবভূত সনাতন।
মন আদি ছয়ে প্রকৃতি আশ্রয়ে
সদা করে আকর্ষণ॥
শ্রোত্র চক্ষু আর স্পর্শনের দ্বার
রসনা নাসিকা আর।
মন এই ছয় করিয়া আশ্রয়
বিষয় সেবন তাঁর॥

জীবাত্মা ত্রিলোকমধ্যে জন্মমৃত্যু চক্রে আবদ্ধ হইয়া অনবরত আবর্ত্তিত হইতে থাকেন। সেই ত্রিলোক এই—ভূলোক, এই পরিদৃশ্যমান পৃথিবী; ভুবর্লোক, ভূলোকের অব্যবহিত পরবর্ত্তী লোক। ইহার উপাদান ভূলোকের উপাদান অপেক্ষা সূক্ষ্ম হইলেও এই দুই লোকের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট। তৃতীয় স্বর্লোক বা স্বর্গ। এই লোকত্রয়ের অতীত আরও চারিটী লোক আছে। জীবাত্মার উচ্চতর বিকাশ হইলে সেই সকল লোকে গতি হইতে পারে। সেই লোক চতুষ্টয় যথাক্রমে মহর্লোক, জনলোক, তপলোক ও সত্যলোক। ত্রিলোকী, ব্রহ্মার দিবাবসানে নষ্ট হয় ও পুনঃ দিবাগমে প্রকাশিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন প্রলয়োদ্যোগে মহর্লোকও বাসের অযোগ্য হয় এবং তত্রত্য

আধব্যুসীগণ জনলোক আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন। এই সপ্তলোকই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত। কেবল বৈকুণ্ঠ ও গোলোক তদতীত; কিন্তু জীবাত্মা সে পর্য্যন্ত গমন করিবার অধিকারী হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত ইন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক, পিতৃলোক প্রভৃতি, মহাদেশের অন্তর্গত দেশ সমূহের ন্যায়, ঐ সপ্তলোকেরই অন্তর্ভূক্ত।

এই সপ্তলেকে ব্যতীত সপ্ত তল আছে। তাহাদের উপাদানের পার্থিব উপাদানের অপেক্ষা স্থূলতর। ছাত্রগণের স্মরণ থাকিতে পারে সগর সন্তানগণ অপহৃত যজ্ঞাশ্বের অনুসন্ধানে রসাতলে গমন করিয়াছিলেন। সেই সমুদায় তলের নাম এই:—১। পাতাল ২। মহাতল, ৩। রসাতল, ৪। তলাতল, ৫। সুতল, ৬। বিতল, ৭। অতল। এইগুলি উর্দ্ধ লোক সমূহের প্রতিবিম্ব স্বরূপ।

এই লোক সমূহ জীবাত্মার চেতন বিকাশের ক্রম নির্দ্দেশ করিতেছে। শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর লোকের জ্ঞান হয় ও সেই সমুদয়ের সহিত তাহার সম্পর্ক বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সেই সেই অবস্থায় তৎ তৎ ভূত গঠিত উপাধি দ্বারা তত্তৎ লোক তাঁহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিতে থাকে। প্রত্যেক লোক ঈশ্বর চৈতন্যের এক এক স্তর। এবং প্রকৃতির একবিধ বিশেষ প্রকাশ। জীবাত্মা প্রকৃতিগত ঈশ্বরাংশ; সুতরাং তাঁহাতে এই সপ্তবিধ চৈতন্যের স্ফূরণ অসম্ভব নহে। ক্রমে ক্রমে এই সপ্তস্তরের এক একটীর সহিত সম্পর্কীত হইতে হইতেই তত্তৎ স্তরের উপ-যোগী দর্শনাদির স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। ব্রহ্মাণ্ড এই সপ্তলোকের সমষ্টি। সেই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যেই ব্রহ্মার সৃষ্টিকার্য্য সংঘটিত হয়। দেবী ভাগবতে লিখিত আছে;—

"পাতালাদ্ ব্রহ্মলোকান্তং ব্রহ্মাণ্ডং পরীকীর্ত্তিতং"।
তত উর্দ্ধঞ্চ বৈকুণ্ঠো ব্রহ্মাণ্ডবহিরেব সঃ।
তত উর্দ্ধং চ গোলোকঃ পঞ্চাশৎ কোটী যোজনঃ।
নিত্য সত্য স্বরূপশ্চ যথা কৃষ্ণ তথাপ্যয়ং" ॥
উর্দ্ধ ধরায়া ভূর্লোকো ভুবর্লোক স্ততঃ পরঃ ॥
"ততঃ পরশ্চ স্বর্লোকোজনলোকস্ততঃ পরঃ।

ততঃ পরস্তপোল্লোকঃ সত্য সত্যলোকস্ততঃ পরঃ ॥
ততঃ পরোব্রহ্মলোক স্তপ্তকাঞ্চনসন্নিভঃ।
এবং সর্ব্বং কৃত্রিমঞ্চ বাহ্যাভ্যন্তর মেব চ ॥
তদ্বিনাশে বিনাশশ্চ সর্ব্বেষামেব নারদ।
জলবুদ্বুদবৎ সর্ব্বং বিশ্বসঙ্ঘমনিত্যকং ॥
নিত্যৌ গোলোকবৈকুণ্ঠৌ প্রোক্তৌ শশ্বদকৃত্রিমৌ।

পাতাল হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ড নামে পরিকীর্ত্তিত হয়। তদূর্দ্ধে বৈকুণ্ঠ, তাহা ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত নহে। বৈকুণ্ঠের ঊর্দ্ধে গোলক। তাহার পরিমাণ পঞ্চাশৎ কোটী যোজন। ঐ লোক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় নিত্যঃসত্যস্বরূপ ও অব্যয়।

পৃথিবীর ভূর্লোক, তাহার উপর ভুবর্লোক, তাহার পর স্বর্লোক, তাহার পর জনলোক, তাহার পর তপোলোক; তাহার পর সত্যলোক, তাহার পর তপ্তকাঞ্চণ সন্নিভ ব্রহ্মলোক।

এই সমুদায় লোক একটীর মধ্যে আর একটী অবস্থিত। ইহারা নশ্বর। হে নারদ, এই সমষ্ঠি ব্রহ্মাণ্ড জলবুদ্বুদবৎ ক্ষণস্থায়ী, একটীর ধ্বংশে সকল গুলির নাশ হয়। কেবল গোলক এবং বৈকুণ্ঠ নিত্য ও অকৃত্রিম।

উপরে উদ্ধৃত অংশে পাতালকে সকল তলের আবরণ বলা হইয়াছে, এবং মহর্লোকের নাম নাই তৎপরিবর্ত্তে সত্যলোকের পর ব্রহ্মলোক সপ্তম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। এইবার এই তত্বটী একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা যাউক।

প্রথম তিনটী অর্থাৎ ভূঃ, ভুবঃ, ও স্বঃ জীবাত্মার ক্রমবিকাশাবর্ত্তন সময়ে আশ্রয়। জীবাত্মা যতদিন জন্মমরণ চক্রের অধীন ততদিন পর্য্যায়ক্রমে এই তিন লোকে বাস করেন। যথা বৃহদারণ্যক বলিতেছেন,—অথ ত্রয়ো বাবলোকা মনুষ্যলোকঃ পিতৃলোক, দেবলোক ইতি। তিন লোক মনুষ্য লোক, পিতৃলোক ও দেবলোক। এই তিনটী ত্রিলোকী নামে কথিত হইয়া থাকে।

একটীর পর আর একটী বর্ত্তমান। ইহারা ইহাদের উপাদান প্রকৃতিবশে

বিভিন্ন। ভূর্লোকে পৃথ্বীতত্ত্বের প্রাধান্য। প্রত্যেক ভূতেরই সাতটী অবস্থা আছে, কিন্তু উপাদানে অপতত্ত্বেরই আধিক্য বর্ত্তমান।

স্বর্লোকে অগ্নিতত্ত্ব বা তেজস্তত্ত্বের প্রাধান্য। তত্রত্য সমুদয় সত্ত্বেই তৈজসাণুর প্রাধান্য আছে। তত্রস্থ সমুদয় সত্ত্ব তেজোময় ও বিদ্যুৎবৎ। সেই জন্য তাঁহাদিগকে দেব বলা হয়। মহর্লোকেও অগ্নিতত্ত্বেরই প্রাধান্য। এইলোকে সমুদয় সত্ত্বই সূক্ষ্ম পঞ্চীকৃত তেজসাণু দ্বারা গঠিত।

জন—তপঃ ও সত্যলোক জীবাত্মার উচ্চতম বিকাশ না হইলে, গতি হয় না। জন ও তপোলোকে বায়ু তত্ত্বেরই প্রাধান্য; সুতরাং তত্রত্য সমুদায় সত্ত্বাদি অসুবিধা ব্যতীত পরস্পরে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে না। পৃথিবী যেমন বিবিধ বাষ্প পরস্পর মিলিত ও পৃথক হইতে, সেখানকার ভাব প্রায় সেইরূপ।

সত্যলোকে আকাশ তত্ত্বেরই প্রাধান্য। এইখানে জীবাত্মা শব্দ ব্রহ্মরাজ্যে প্রবেশ করেন। ইহা মুক্তিরদ্বার স্বরূপ। এই পর্য্যন্ত আসিলে জীবাত্মা ব্রহ্মাণ্ডের প্রান্তভাগে উপনীত হইলেন তৎপরে বৈকুণ্ঠ ও গোলোক, ইহা মহত্তত্ত্ব বা অনুৎপাদক তত্ত্ব ও আদিতত্ত্ব গঠিত।

এই সপ্তলোক জীবাত্মার সপ্তবিধ চেতনার দ্যোতক। মানবজীবনই চেতনাবস্থা; ইহা আত্মা হইতে উদ্ভূত। প্রশ্নোপনিষৎ বলিতেছেন—

"আত্মন এব প্রাণো জায়তে।" আত্মা হইতে প্রাণের উৎপত্তি।

এবং তস্মাদেতাঃ সপ্তর্চিষো ভবন্তি।"

তাহা হইতে সপ্তার্চির উৎপত্তি।

আবার মুণ্ডকোপনিষদে লিখিত আছে, সপ্তলোক সপ্তার্চির সহিত সম্বন্ধ যুক্ত। অর্চিঃগণ দেহ নাশের পর আত্মাকে স্বর্গাদিলোকে লইয়া যান।

দেবী ভাগবতে লিখিত আছে :—

"সপ্তপ্রাণার্চ্চিষো যস্মাৎ সমিধঃ সপ্ত এব চ।
হোমাঃসপ্ত তথা লোকাস্তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ॥"

সপ্ত প্রাণার্চির যাঁ হতে উদয়
　সপ্ত সমিধের সৃজন যাঁহায়।
সপ্ত হোম, লোক সপ্ত সৃষ্টি যাঁর
　সেই "সর্ব্বাত্মনে নমঃ" নমস্কার॥"

জীব দেহের সপ্তপ্রাণ, সেই পরমাত্মার সপ্তমহাপ্রাণের অনুরূপ। উহা মানেবের সপ্তবিধ চেতনার বিভাগমাত্র। ছান্দোগ্য উপনিষদে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে যে হৃদয়ের পঞ্চদ্বার আছে, তদ্বারা স্বর্গে গমন করা যায়। পঞ্চপ্রাণ এই পঞ্চদ্বার যোগে ভিন্ন ভিন্ন লোকে জীবকে লইয়া যান। যথা প্রাণ (প্রাণ পঞ্চের প্রথম ও প্রধান) জীবকে সূর্য্যলোকে লইয়া যান, তথা হইতে সর্ব্বোচ্চলোকে সত্যলোকে গতি হইয়া থাকে। ব্যান দক্ষিণগতিদ্বারা চন্দ্রলোকে লইয়া যান। চন্দ্রলোকের তমঃপূর্ণ অংশ. ভুবর্লোকের সহিত সম্পর্কিত। অপান অগ্নিলোক হইয়া মহর্লোকে ও সমান স্বর্লোকে লইয়া যান এবং উদান বায়ুলোকে লইয়া যান, যাহার মধ্যে জন ও তপোলোক অবস্থিত। মানবদেহস্থ প্রাণ সমূহ বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের মহাপ্রাণের অনুরূপ। কারণ মানব, ঈশ্বর ও ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিবিম্ব। মাণ্ডূক্য উপনিষদে লিখিত আছে আত্মার চতুর্ব্বিধ অবস্থা। প্রথম জাগ্রত এই অবস্থায় তিনি বৈশ্বানর; দ্বিতীয় স্বপ্ন, এই অবস্থায় তিনি তৈজস; তৃতীয় সুষুপ্তি এই অবস্থায় তিনি প্রাজ্ঞ এবং তুরীয় অবস্থায় তিনি ব্রহ্ম। এই অবস্থাগুলি সপ্তলোকান্তর্গত এই কথা দেহতত্ত্ব বিচার করিলে স্পষ্ট লক্ষ হইবেক। তাহাতেই এই অবস্থা সমূহের বিকাশ হইয়া থাকে। যখন তাহাদের বিভিন্ন আবরণে বিষয় আলোচনা করিব সেই সময় এই চেতনা সমূহের বিষয় বিশদ করিয়া আলোচনা করা যাইবে।

আত্মার তিনটী প্রধান দেহ বা উপাধি (১) স্থূল শরীর, ইহা দেহ ও ইন্দ্রিয় সমষ্টি। ইহা বৈশ্বানর চেতনার উপাধি। (২) সূক্ষ্ম শরীর, ইহা তৈজস চেতনার উপাধি। যথা—

প্রাজ্ঞস্তু কারণাত্মাস্যাৎ সূক্ষ্মদেহী তু তৈজসঃ।
স্থূল দেহী তু বিশ্বাস্ত্রিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
এবমীসোপি সংপ্রোক্ত ঈশ সূত্র বিরাট চ।
প্রথমে ব্যষ্টি রূপস্তু সমষ্ট্যাত্মা পরঃস্মৃতঃ॥
প্রাজ্ঞ নাম আত্মার, সে কারণ শরীরে।
সূক্ষ্ম দেহে বলে সবে তৈজস তাঁহারে॥
স্থূল দেহে বিশ্ববলি নাম যে তাঁহার।

'তিন দেহে তিন নামে আছেন প্রচার ॥
ঈশ, সূত্র, আরযে বিরাট নাম তাঁর।
তিন রূপে তিন নামে বিদিত সংসার ॥
জীবরূপে ব্যষ্টি তাঁর প্রথম আকার।
সমষ্টিতে পরম পুরুষ সর্ব্বাধার ॥

মানবে যেমন আমরা ত্রিবিধ উপাধি দ্বারা ত্রিবিধ চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি হয়। পরমপুরুষও সেইরূপ ত্রিবিধ দেহ, উপাধি ও চৈতন্যের ত্রিবিধ অবস্থা আছে। এই ত্রিবিধ মূর্ত্তি দেহ বা উপাধি যথাক্রমে ঈশ, সূত্র ও বিরাট নামে এবং ঐ ত্রিবিধ চৈতন্য প্রাজ্ঞ, তৈজস ও বৈশ্বানর নামে কথিত হয়েন।

(ক্রমশঃ)

চৈতন্যের অবস্থাভেদ।

(১) স্পন্দনাত্মিকা 'গতির' দ্বারাই আমাদের এক একটী ইন্দ্রিয়ানুভূতি নিষ্পন্ন হয়। এই 'গতির' পরিবর্ত্তন বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতির উপলব্ধি হইয়া থাকে।

(২) 'গতি' বলিতে স্বতঃই কোন গমনশীল বস্তুর কথা আমাদের মনে উদিত হয়। গতির অর্থ—যাহা কোন "পদার্থ" অর্থাৎ "জড় পদার্থকে" চালিত করে, তাহার নাম "গতি"।

(৩) যে কারণ বশতঃ গতির পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহাকে উহার "শক্তি" বা "বল" বলে।

"গতি", "পদার্থ" ও "বল",—এই তিনটীর মধ্যে কেবল একমাত্র "গতিরই" যে বাহ্য জগতে অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। আর অন্য দুইটীর যে প্রকৃত সত্তা নাই—ইহারা যে কেবল অপরিচ্ছিন্ন ভাববোধক মাত্র তাহা আমরা ক্রমে প্রদর্শন করিব। আমরা দেখিতে পাই যে, ইন্দ্রিয়ের সহিত যখন বাহ্য বিষয়ের স্পন্দনজনিত সম্পর্ক ঘটে, তখনই আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি সম্পন্ন হয়। এই যে অশেষ শোভাসৌন্দর্য্যের আধার বাহ্য জগৎ, ইহা যতদূর আমাদের কল্পনায় ধারণা করিতে পারি, ইহার সমস্ত 'পদার্থই' রূপগুণ

প্রকাশিকা স্পন্দনাত্মিকা 'গতি' সমূহের সমষ্টি মাত্র। কিন্তু আমরা অগ্রে গতিশীল পদার্থের বিষয় না ভাবিয়া কেবল 'গতির' অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারি না। এইজন্য আমাদিগকে এরূপ কিছু কল্পনা করিতে হয়, যাহা 'গতির' কোন প্রকার ভেদ নয় অথচ উহার 'বেগ' কিম্বা মধ্যবর্ত্তী অবস্থার তারতম্যের উপর নির্ভর না করিয়া নিয়ত অপরিবর্ত্তনীয়ভাবে স্বতন্ত্ররূপে অবস্থান করে। যাহাকে আমরা 'পদার্থ' অর্থাৎ 'জড়পদার্থ' বলি, তাহাই এই কল্পিত বস্তু। এই 'পদার্থের' সর্ব্বপ্রধান গুণের নাম "জড়ত্ব", অর্থাৎ 'পদার্থের' যে গুণ থকাতে উহা আপনা হইতে চলিতে পারে না এবং অন্য কর্ত্তৃক চালিত হইলেও আপনা হইতে স্থির হইতে পারে না তাহাকে 'জড়ত্ব' বলে। "জড়ত্ব" শব্দের অর্থ কেবল অভাব বোধক মাত্র অর্থাৎ 'গতি' ও 'পদার্থ' এতদুভয়ের সমাশ্রয় স্বরূপ কোন সাধারণ ভূমির অভাব জ্ঞাপক। পক্ষান্তরে প্রত্যেক বস্তুরই পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, প্রত্যেক বস্তুই প্রতিমুহূর্ত্তে রূপান্তরিত হইতেছে; এই জাগতিক পরিবর্ত্তন-ব্যাপার দ্বারাই আমাদের ভিন্ন ভিন্নরূপ ইন্দ্রিয়ানুভূতি সাধিত হইতেছে। কিন্তু এই সমস্ত পরিবর্ত্তনের কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই যে 'গতি' উহাদের কারণ নহে। যেহেতু 'গতি' নিজেই অন্য কারণাধীন হইয়া কার্য্যরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, এইজন্য 'গতির' কর্ত্তৃত্ব নাই। আর 'পদার্থ' জড়ত্বগুণ বিশিষ্ট হওয়ায় 'গতির' উপর ইহার কার্য্যকারিতা নাই, এইজন্য 'পদার্থও' কারণপদবাচ্য হইতে পারে না। এইরূপ "গতি" ও "পদার্থে" কারণের অনুসন্ধান না পাইয়া, আমরা "বল" নামক অন্য একটী বস্তুতে কারণের অস্তিত্ব উপলব্ধি করি।

এইরূপ আমরা দেখিতে পাই যে, 'গতি' ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিষয়রূপ ব্যক্ত হইয়া থাকে, আর আমাদের মন, 'পদার্থ' ও 'বল' নামক দুইটী অপরিচ্ছিন্ন ভাব উপলব্ধি করিয়া থাকে। এই বিষয়টী আমাদিগকে বিশেষ মনোযোগের সহিত ভাবিয়া দেখিতে হইবে। "পদার্থ" ও "বল"—এই দুইটী বিষয়ের ধারণামধ্যে একটীকে অন্যটীতে পরিবর্ত্তন করিতে যতই আমরা অক্ষম হই না কেন, উহারা কখনও দুইটী স্বতন্ত্র বস্তু নহে, উহারা অচ্ছেদ্য বৈন্দ্রভাবে সংযুক্ত; ও 'গতি' নামক সাধারণ সূত্রে অখণ্ডভাবে সম্বদ্ধ রহিয়াছে। এইরূপ

'গতি' দ্বারাই বাহ্যজগতে উহাদের ধারণা উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাড়িতের ন্যায় কোন এক অব্যক্ত বস্তুর "ধন" ও "ঋণ" কেন্দ্ররূপে এই উভয়কে গণ্য করা যাইতে পারে, আর কেবল 'গতি'রূপেই এই অব্যক্ত বস্তু আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে 'বল' দ্বারা 'গতি' নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে বলিয়া, 'বল'কে 'ধনকেন্দ্র' (+) স্বরূপ, আর 'গতি' দ্বারা 'পদার্থ' চালিত হইয়া থাকে বলিয়া, 'পদার্থকে' 'ঋণকেন্দ্র' (—) স্বরূপ, বলা যাইতে পারে। এইরূপে উপপত্তি হইল যে, 'বল' ও 'পদার্থ' স্বতন্ত্র নিরপেক্ষ সত্তা নাই; আর যে অদৃশ্য বস্তুর দুইদিক, 'বল' ও 'পদার্থ'রূপে আমাদের নিকট আভাসমান হয়, তাহা কেবল 'গতির' আকারেই আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যদি 'বল' ও 'পদার্থ' বাস্তবিক পৃথক্ পদার্থ না হয়, তবে উহাদিগের সম্বন্ধে আমাদের পৃথক্ পৃথক্ ধারণা কিরূপে উৎপন্ন হইল? তাহার উপর এই যে, যাহা-দিগকে আমরা সাধারণতঃ 'পদার্থ' ও 'বল' নামে লক্ষ্য করি, তাহারা প্রায়ই আমাদের অনুভূয়মান 'গতি' হইতে বিমুক্ত থাকে। তাহার কারণ এই যে, 'পদার্থে' উহার 'জড়ত্ব' বশতঃ কোন্ পরিবর্ত্তন আপনা হইতে ঘটিতে পারে না; আর 'বল' কারণরূপ থাকিয়া সমস্ত পরিবর্ত্তনের নিয়ামক হয় বলিয়া, ভিন্নজাতীয় প্রবল কারণান্তর দ্বারা ব্যাহত না হওয়া পর্য্যন্ত, অপরিবর্ত্তন অবস্থায়ই থাকে। আধুনিক বিজ্ঞান, "শক্তি" ও "পদার্থের" অনশ্বরত্ব প্রতিপাদন করিবার অভিপ্রায় "শক্তি-সংরক্ষণ" ও "পদার্থ—সংরক্ষণ" নামক যে সিদ্ধান্তদ্বয় নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা "শক্তি" ও "পদার্থের" পূর্ব্বোক্ত মৌলিক সত্তার জ্ঞাপকরূপে ধরিলে, ঐ দুইটী মতের মধ্যে একটী যে, অপরটীর পুনরুক্তিমাত্র তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হয়। আর যদি বৈজ্ঞানিক দিগের কল্পনামত "শক্তি" ও ই "ভারবিশিষ্ট দার্থ" নামে দুইটী সম্বন্ধবিহীন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করাও যায়, তাহা হইলেও দেখান যাইতে পারে যে, 'ভারবিশিষ্ট পদার্থ'—এই কল্পিত নামটী স্ববিরোধিতা দোষ দুষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু "ভার" জিনিষটা কি? পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে প্রত্যেক পদার্থ আকৃষ্ট হয়, তাহাতেই সেই পদার্থের 'গুরুত্ব' জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, সুতরাং আকর্ষণ শক্তি নিরপেক্ষ "পদার্থ" নিজে কোনরূপ 'ভারবিশিষ্ট' হইতে পারে,

না ; আর নির্দ্দিষ্ট 'ভারজ্ঞান' দ্বারাই আমরা নির্দ্দিষ্ট 'বলের' পরিমাণ বুঝিয়া থাকি। অতএব দেখা গেল যে, 'ভার-জ্ঞানের' ও 'শক্তির' নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। একখণ্ড তাম্র 'পদার্থ' অপেক্ষা তাপ অথবা তাড়িত 'শক্তির' স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে কিছুই বিশেষত্ব নাই। এক অখণ্ড বস্তুই যে, 'পদার্থ' ও 'শক্তি'রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে,—এই অকাট্য সিদ্ধান্ত দ্বারাই সমস্ত বিরোধের মীমাংসা হইয়া যায়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা 'বলের' ধারণার সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিপরীত ভাবাপন্ন 'পদার্থের' ধারণা না করিয়া থাকিতে পারেন না। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া "পদার্থ বিজ্ঞান" "গতি বিজ্ঞান" ও "বলবিজ্ঞানে" "দ্রব্য পরিমাণ" দ্বারা "পদার্থমান গ্রহণ করা হইয়া থাকে। আর মাধ্যাকর্ষণ" নামক "বল" বিশেষ দ্বারা "দ্রব্য পরিমাণ" নির্ণয় করা হইয়া থাকে। কিন্তু আকর্ষণ-শক্তির প্রয়োগ ব্যতীত 'পদার্থের' স্বতন্ত্রভাবে পরিমাণ' করা যাইতে পারে না। সুতরাং 'পরিমাণের' সম্পর্কে 'পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই ; আর প্রত্যেক গুণই যখন গতির বিশেষ প্রকাশ মাত্র তখন গুণের দিক দিয়া দেখিলেও "পদার্থের" স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই।

এরূপ হইলেও, ব্যবহারিকজ্ঞানে 'পদার্থ' ও 'শক্তি'—এই যে ভেদজ্ঞান আমাদের ধারণায় রহিয়াছে, তাহা চৈতন্যের প্রত্যেক অবস্থাই প্রযোজ্য হইতে পারে। যাহা হউক, কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তুকে এই ভাবে আমরা "পদার্থ" ও "বল"—এই দুইয়ের কোন একটীর শ্রেণীভুক্ত করিতে পারি। যেখানে দেখিব যে, "কোন বস্তু চালিত" বা "গতির শেষ পরিণতি" অবস্থাবোধক হয়, সে স্থানে সেই বস্তুকে "পদার্থ" বলিব ; আর যে স্থলে তাহার বিপরীত হইবে, তথায় তাহাকে "শক্তি" বলিব। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, "পদার্থ" ও "বলের" নিরপেক্ষ সত্তা নাই, কেবল গতিই আমাদের বোধগম্য হইয়া থাকে। জগতের আকার বিশিষ্ট পরিচ্ছিন্ন সমস্ত পদার্থই গতিদ্বারা চালিত হয়, কিন্তু জগতের কোন বস্তুই একবারে গতিশূন্য বা একবারে গতিশীল নহে, এক বস্তুর সহিত অন্যবস্তুর আপেক্ষিকভাবে স্থির ও গতি সম্বন্ধযুক্ত। সুতরাং প্রত্যেক বস্তুই আপেক্ষিক গতি ও আপেক্ষিক সম্বন্ধযুক্ত। এইরূপে 'গতির' প্রভাবেই 'পদার্থ' মৌলিক অবস্থা অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া সর্ব্বদা অবস্থান্তরিত হইতেছে। পক্ষান্তরে, আমরা চতুর্দ্দিকে যে বিভিন্ন বিচিত্রময় আকার সকল

অনুভব করি, তাহারা গতি ভিন্ন আর কিছুই নয়; এবং এই গতির চরমাবস্থাই পরমাণু, গতির প্রভাবে সেই অদৃশ্য পরমাণুপুঞ্জ তরঙ্গায়িত হইয়া এই ভবসমুদ্রের নামরূপময় দ্রব্যসমূহ উদ্ভব করে। পক্ষান্তরে এই সকল পরমাণু, "পদার্থবিজ্ঞান" ও "রসায়নশাস্ত্র" সম্মত গুণাবলী প্রকাশিকা গতিরূপে পরিণত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন অবয়ববিশিষ্ট হয়। তাহাকেই আমরা বহির্জগৎরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। আর দর্শনের প্রকার ভেদ অনুসারে প্রত্যেক সাকার দ্রব্য, হয় 'পদার্থ', না হয় 'শক্তি'রূপে পরিদৃশ্য হইয়া থাকে। অতএব ব্যক্তজগতে আপেক্ষিক ভিন্ন নিরপেক্ষ 'পদার্থ' বা 'শক্তির' অস্তিত্ব নাই।

এই মত যে কেবল জড়বিজ্ঞানের সংকীর্ণ অধিকারেই স্বীকার করা হয় তাহা নয়, পরন্তু প্রাচ্য দর্শনের জড়াতীত অনন্ত রাজ্যের নিয়মাবলীর দ্বারাও উহা স্বীকৃত হইয়াছে। দ্রষ্টার অবস্থান-ভেদে চৈতন্যের বিভিন্ন অবস্থা ব্যক্ত হয়, যে ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দ্রষ্টার এই অনুভূতি সম্পন্ন হয়, তাহাকে "লোক" বা "তল" বলে। 'চৈতন্যের' এই অবস্থাভেদ ও 'লোকের' এই প্রকার ভেদ আলোচনা করাই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা সেই অভিপ্রায়ের কেবল ভূমিকাস্বরূপ। এক অদ্বিতীয় চৈতন্য, স্বরূপতঃ অখণ্ড ও সমষ্টিগত, উহা নির্গুণ ও অব্যক্ত ভাবাপন্ন বলিয়া আমাদের নিকট অনন্তরূপে প্রতিভাত হয়। আলোক যেমন আলোকিত বস্তুতে প্রতিফলিত হইয়া আমাদের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয়, চৈতন্যও সেইরূপ অবয়ববিশিষ্ট 'পদার্থের' মধ্য দিয়া আমাদের ধারণার বিষয়ীভূত হয়; এই অবয়ববিশিষ্ট 'পদার্থ' দ্বারা সেই সমষ্টিচৈতন্য ব্যষ্টিভূত ও সীমাবিশিষ্ট হয়, আর সেই 'পদার্থের' প্রকৃতি দ্বারা আবদ্ধ হইয়া আমাদের নিকট নির্ব্বিশেষ 'চৈতন্য' বিশেষ অবস্থা রূপে প্রতিভাত হয়। দেখা গেল 'পদার্থের' প্রকৃতি দ্বারা 'চৈতন্য' নিয়মাবদ্ধ হয়, কিন্তু 'পদার্থ' নিজে 'গতির' চরম পরিণতির প্রসুপ্তাবস্থা। আবার, হিন্দু দার্শনিকের মতে এক অদ্বিতীয় 'প্রাণ', সমস্ত 'পদার্থের' অস্তিত্বরূপে সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত থাকিয়া প্রত্যেক 'পদার্থকে' বিশেষ ভাবে গঠন করিতেছেন। আর পূর্ব্বোক্ত 'চৈতন্য' ও এই 'প্রাণ' একই অভিন্ন বস্তু। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, 'পদার্থ' দ্বারা 'চৈতন্য' নিয়মিত

হয়; এখন বলিতেছি যে, 'প্রাণ' দ্বারা 'পদার্থ' নিয়মিত হয়, আর এই 'প্রাণ' ও 'চৈতন্য' দ্বারা 'পদার্থ' নিয়মিত হয়। ইহাতে কার্য্য একবার কারণরূপে, পরক্ষণে কারণ আবার কার্য্যরূপে স্বীকার করাতে "বীজাঙ্কুর ন্যায়েব" ন্যায়, "অন্যোন্যাশ্রয়" দোষ ঘটিল। 'গতিয়' সংজ্ঞা নির্দ্দেশ সে আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, "যাহা কোন 'পদার্থকে' চালিত করে, তাহার নাম গতি"—এই 'পদার্থ' যে 'গতিরই চরম রূপান্তরমাত্র, অর্থাৎ 'গতি' নিজেই, তাহাও বলা হইয়াছে; সুতরাং এস্থলেও সেই পূর্ব্বোক্ত দোষ ঘটিয়াছে। এক্ষণে দেখা যাউক, কিরূপে আমরা এই দোষ হইতে মুক্ত হইতে পারি। আমরা যখন 'পদার্থ' বা 'চৈতন্যের' বিষয় ভাবি, তখন তাহাদিগকে সম্বন্ধযুক্ত আপেক্ষিক ভাবে না দেখিয়া, স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ রূপে দেখিয়া থাকি; ইহারা যে একই অখণ্ড বস্তুর দুইটী বিভিন্ন দিক মাত্র কিন্তু দুইটী বিভিন্ন পদার্থ নহে, এ কথা আমরা বিস্মৃত হইয়া যাই। কোন নির্দ্দিষ্ট 'গতির' তুলনায় যাহা ঠিক 'পদার্থ' বলিয়া প্রতীয়মাণ হয়, তাহাই আবার তদপেক্ষা স্থূলতর 'পদার্থের' তুলনায় 'গতি' রূপে বিবেচিত হয়, সেইরূপ যাহা কোন নির্দ্দিষ্ট অবস্থাপন্ন 'চৈতন্যের' প্রাণরূপে প্রতীত হয়, ঠিক তাহাই আবার তদপেক্ষা নিকৃষ্টতর প্রাণীর তুলনায় 'চৈতন্য' বলিয়া গণ্য হয়। এইরূপে 'গতির' ন্যায় 'চৈতন্যের'ও প্রত্যেক উচ্চতর অবস্থা নিম্নতর অবস্থায় পরিণত হয়। ব্রহ্মাবিত্থার মতেও একমাত্র চৈতন্যময় জীবন আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত—এমন কি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণু পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। অতএব প্রত্যেক 'পদার্থের' মৌলিক সত্তা 'চৈতন্যকে' অবয়বাকারে সীমাবদ্ধ করিয়া নিজে আপেক্ষিকরূপে 'চৈতন্যের' নিম্নতর অবস্থায় অবস্থিতি করিতে পারে। যেমন চিন্তা আমাদের মস্তিষ্ককোষ দ্বারা এই স্থূলজগতে সসীম আকারে পরিণত হয়, কিন্তু কোন ইতর জীবের তুলনায় ঐ সকল কোষ আবার 'চৈতন্যরূপে' গণ্য হয়। আরও একটি স্থূল দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক, যেন একটী শৃঙ্খল আছে, তাহার প্রত্যেক আংটী সর্ব্বাংশে ঠিক একরূপ; কিন্তু ইহার প্রত্যেক আংটী তাহার উপরেরটীর সঙ্গে তুলনায় 'পদার্থ' ও নিম্নটীর সঙ্গে তুলনায় 'শক্তি', সর্ব্বোচ্চটী অন্যগুলিকে ধারণ করে বলিয়া উহাতে 'শক্তির' দিক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক

পরিমাণে বর্ত্তমান, সর্ব্বনিম্নটীতে 'পদার্থের' ভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিদ্যমান আছে।

এইরূপে লোকচক্ষুর অন্তরালে "শক্তি—পদার্থের" পরম্পরাগত অবস্থা দ্বারা বিন্যস্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন "লোক" নামে বিশ্বের "টানা" প্রস্তুত হয়; সেই "টানাতে" যে সমস্ত আকৃতি বয়ন করা হয়, তাহাই বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন "আয়তন' আর সেই 'টানা'স্থিত 'আয়তন' সকলের অভ্যন্তর দিয়া যে 'চৈতন্য' প্রকাশিত হয়, তাহাই 'চৈতন্যের প্রকারভেদ'। 'লোকে' 'আয়তন' ও 'চৈতন্যের' অবস্থাভেদ—ইহারা কোন একই শৃঙ্খলের তিনটী বিভাগ মাত্র। অবস্থা পরম্পরাগত হইলেও একত্র সম্বন্ধ, ইহারা রাত্রি ও দিবার ন্যায় একটির পর আর একটী অনুসরণ করিয়া থাকে, যখন ক্রমাগত কেবল 'পদার্থের' দিক বিকাশ প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করে, তখন ক্রমশঃ 'চৈতন্যের' দিক তমসাচ্ছন্ন হইতে থাকে।' কিরূপে আদি অব্যক্ত কারণ, নিজে অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া সমস্ত পরিবর্ত্তনময় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার একটী উপমা "ভারতীয় আধ্যাত্মিক দর্শন" নামক গ্রন্থে এইরূপ উক্ত হইয়াছে; মনে করা যাউক, এক কনিকা জ্বলন্ত অঙ্গার, একটী লৌহতারে আবদ্ধ করিয়া প্রবল বেগের সহিত ঘূর্ণায়মান করা হইল, আর তাহাতে একটী অগ্নিময় বৃত্তের উৎপত্তি হইল। সেই অঙ্গার কণিকা নিজে কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত না হইয়াও—নিজে কেবল একটী বিন্দুর আকারে অবস্থান করিয়াও একটী জ্বলন্ত বৃত্ত উৎপাদন করিল। তারপর সেই প্রথম বৃত্তটীকে ধরিয়া কোন নূতন কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে ঘুরাইলে আর একটী নূতন বৃহত্তর বৃত্ত উৎপন্ন হইবে। এইরূপে একটী অতি ক্ষুদ্র অঙ্গার কণিকা দ্বারা ক্রমশঃ বৃহত্তর বৃত্তের পর বৃহত্তর বৃত্ত উৎপাদন করিয়া অনন্ত দেশকে পরিব্যাপ্ত করিবে। বিশ্বজগতের সৃষ্টির কার্য্যও কিয়ৎ পরিমাণে এইরূপ। (ক্রমশঃ)

বিজ্ঞান প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

এসিয়াটিক সোসাইটীর গত বারের প্রদর্শনী সভায় অধ্যাপক সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ তির্ব্বত দেশীয় আলেখ্যে বুদ্ধদেবের জীবনের কতকগুলিন ঘটনা পরিচায়ক ছবি দেখাইয়াছিলেন। সোসাইটীর প্রদর্শনীতে দেখাইবার জন্য স্যার আরওল কর্ত্তৃক ইহা প্রেরিত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের গতবারের তিব্বত মিশন যাত্রা কালীন ইহা আনীত হইয়াছিল।

বুদ্ধের জীবনের বিভিন্ন অঙ্ক দেখাইবার জন্য, চারিখানি অতি বিস্তৃত চিত্রের মধ্যে ইহা একখানি চিত্র।

দক্ষিণ ধারের দেওয়ালের উপর এই ছবি রাখা হইয়াছিল। ইহা দীর্ঘে ৬ ফিট আট ইঞ্চি, প্রস্থে দুইফিট দশ ইঞ্চি ও চারিদিকে অতি সুন্দর কারুকার্য্য দ্বারা শোভিত।

ইহার উপরিভাগে বুদ্ধের অসীম জ্যোতিঃ বিশিষ্ট অমিতাভ মূর্ত্তি, এখানে তিনি পশ্চিম গগণে যথায় মরিচী মালী সূর্য্যদেব সহস্র রাগে রঞ্জিত হইয়া প্রতিদিন উদয় অস্ত গমন করিয়া থাকেন তথায় সুখবতী সামক স্বর্গে আনন্দ সত্তায় অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। মধ্যভাগে বুদ্ধ শাক্যসিংহ পদ্মাধারে যোগাসনে ধ্যান বিশিষ্ট। এই বৃহৎ কাগজে সন্নিবিষ্ট অন্যান্য মনোহর চিত্রগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত চিত্রগুলি বিশেষ বক্তব্য।

১ম—লোকপতি ব্রহ্মা বুদ্ধদেবকে জগতে ধর্ম্ম-শিক্ষা দিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

২য়—বুদ্ধদেবের বারানসী গমন কালীন পথে আজিবাক সম্প্রদায়ের দণ্ডী পরিব্রাজক উপাকের সহিত মিলন।

৩য়—বারানসীতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ যাঁহারা পূর্ব্বে বুদ্ধের কথায় কর্ণপাত করিতেন না ও তাহাকে কোন শ্রদ্ধা করিবেন না স্থির করিয়াছিলেন ও পরে তাঁহার শান্তিময়ী সৌম্য প্রকৃতির দ্বারায় পরাজিত হইয়া তাঁহার প্রতি আকর্ষিত হইয়াছিলেন এরূপ ব্যক্তি দিগকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট চারিটী সত্য যথা, দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের উচ্ছেদ ও পথ যাহাতে যাইলে দুঃখের উচ্ছেদ সাধন হয় শিক্ষা দিতেছেন।

৪র্থ—বুদ্ধ বারানসীতে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিয়া নৈতিক চক্র পরিচালিত করিতেছেন।

৫ম—বহু পারিষদ বর্গে বেষ্টিত রাজা শুদ্ধধন কপিলবাস্তু নগর সন্নিধানে রোহিত নদী তটে বুদ্ধের সাক্ষাৎ লাভ করিতে আসিতেছেন।

৬ষ্ঠ—কোশল দেশের রাজা প্রসেনজিতের সমক্ষে বুদ্ধ, বৃদ্ধ ও যুববদিগকে শিক্ষা দিতেছেন।

৭ম—শ্রাবস্তি দেশীয় ধনাঢ্য বণিক অনাথপিণ্ডদা, বুদ্ধ ও তাঁহার অনুবর্ত্তী জনদিগের ব্যবহারের জন্য জিতবন কুঞ্জ উৎসর্গ করিয়া দিতেছেন।

৮ম—খেয়া নৌকায় পার হইবার মূল্য দানে অসমর্থ প্রযুক্ত বুদ্ধ আকাশে উঠিয়া গঙ্গা পার হইতেছেন, তদ্দর্শনে মগধরাজ বিম্বিসার সাধু সন্ন্যাসী দিগের পারে যাইতে আর মাশুল লাগিবে না এই আইন লিপিবদ্ধ করিতেছেন।

৯ম—রাজগৃহ গ্রামের নিকটবর্ত্তী সীতাবন স্থানে যখন বুদ্ধ বিপদ সঙ্কুল ইষ্টকাচ্ছাদনের মধ্যে কঠোর তপস্যায় রত রহিয়াছেন, তখন শ্রোনাকটী ত্রৈমাণিক্যের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছেন।

১০ম—মগধরাজ বিম্বিসার বুদ্ধকে ভোজন সভায় আহ্বান করিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী প্রচারক বর্গের থাকিবার জন্য বেলুবন কুঞ্জ প্রদান করিতেছেন।

১১শ—সারিপুত্র মাওগালায়ন ভিক্ষুর ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বুদ্ধের দক্ষিণ ও বাম হস্তের স্বরূপ হইলেন।

১২শ—রাজ গৃহের নিকটবর্ত্তী গৃধ্র পর্ব্বতে বুদ্ধ শিক্ষা দিতেছেন॥

১৩শ—মহাবল নাগরাজ ইলাপত্র বৃক্ষ শোভিত মস্তক লইয়া বুদ্ধের ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতে আসিয়াছেন।

১০ ভাগ। } অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ সাল। { ৮ম সংখ্যা।

মহিম্ন স্তব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নমো নেদিষ্ঠায় প্রিয়দব দবিষ্ঠায় চ নমো,
নমঃ ক্ষোদিষ্ঠায় স্মরহর ! মহিষ্ঠায় চ নমঃ।
নমো বর্ষিষ্ঠায় ত্রিনয়ন ! যবিষ্ঠায় চ নমঃ
সর্ব্বস্মৈতে তদিদমতিসর্ব্বায় চ নমঃ ॥ ২৯ ॥

সম্প্রতি ঈশ্বরস্য সর্ব্বাত্মকত্বং সর্ব্বব্যাপিত্বঞ্চ ধ্যাত্বা নমস্করোতি।

নম ইতি। তত্র প্রথমতোঽনিত্যস্য সংসারস্য অসারতা দর্শনং, ততো বৈরাগ্যং ততশ্চানিয়তেশ্বর ধ্যানায় তপোবনাশ্রয়শ্চেতদবস্থাত্রয়ং ত্বদধীন-মেবেতি বোধনায় বিপরীতক্রমেণ প্রিয়দবেত্যাদিভি স্ত্রিভি বিশেষণৈঃ সংবোধনম্।

হে ত্রিনয়ন, ত্রিভিঃ সূর্য্যাচন্দ্রমোঽগ্নিরূপৈরাত্মানং নয়তি প্রাপয়তি বোধয়তীতি যদ্বা ত্রিভিঃ সূর্য্যাগ্নি চন্দ্রৈর্নীয়তে অনুমীয়তেঽসাবিতি যবা

ত্রীণি সূর্য্যচন্দ্রাগ্নিরূপাণি নয়নানি লৌকিক জ্ঞানসাধনানি যস্মিন্, স্তৎ সংবোধনম্। এতেন সংসারস্থানিত্যতা দর্শনং ত্বদধীনমেবেতি সূচিতম্। হে স্মরহর কামনাশন, স্মরঃ ভোগ্যবস্তুনো নিরন্তর স্মরণং হেতুভূতাভিলাষস্তত্ত্বির্ত্যর্থঃ তং হরতি নাশয়তি ইতি তৎসংবোধনং। এতেন বিষয় বৈরাগ্যং ত্বদধীনমেবেতি সূচিতম্। হে প্রিয়দব, প্রিয়ঃ দবোবনং তপোবনমিতি যাবৎ যস্য তৎসংবোধনং। সর্ব্বব্যাপিণোঽপি সর্ব্বত্র সমদর্শন স্যাপীশ্বরস্য শান্তিরসাস্পদে তপোবনে সান্নিধ্য লক্ষণং নিরন্তর গ্রামনগরাদি দর্শনালস মানসৈঃ সুখে নানুভাব্যমিত্যেতৎ প্রসিদ্ধম। তত্র চ লোকশিক্ষার্থৈ মহাযোগিরূপেণেশ্বরেণ ত্বয়ৈব যোগসাধনভূতং বনাশ্রয়ণং কৃতম অত স্ত্বচ্ছিক্ষাধীনমেব লোকানাং তপোবনাশ্রয়ণমিতি তৎসংবোধনম্। সর্ব্বাত্মকত্বং সর্ব্বব্যাপিত্বঞ্চ দর্শয়তি। নেদিষ্ঠায অন্তিকতমায় অন্তঃস্থায়েত্যর্থঃ তুভ্যং নমঃ। অন্তিক শব্দস্য নেদাদেশঃ। দবিষ্ঠায় দূরতমায় জ্ঞানাতীত প্রদেশস্থায় তুভ্যং নমঃ। দূরশব্দস্য দবাদেশঃ। তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদন্তিকে। তদু সর্ব্বস্য মধ্যেঽন্তঃ তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যত ইতি শ্রুতেঃ। ক্ষোধিষ্ঠায় ক্ষুদ্রতমায় অণোরপ্যনীয়স ইত্যর্থঃ তুভ্যং নমঃ। ক্ষুদ্র শব্দস্য ক্ষোদাদেশঃ মহিষ্ঠায় মহতোঽপি মহীয়সে অনন্তরূপায় ইত্যর্থঃ তুভ্যং নমঃ। মহৎ শব্দস্য মহাদেশঃ। অণোরণীয়ো মহতো মহত্তমমিতি শ্রুতেঃ। বর্ষিষ্ঠায় বৃদ্ধতমায় পিতৃণামপি পিত্রে সর্ব্বলোকপিতামহায় আদিভূতায়েত্যর্থঃ তুভ্যং নমঃ। বৃদ্ধ শব্দস্য বর্ষাদেশঃ। যবিষ্ঠায় যুবতমায় নিমিষকালদেপ্যল্যাকাল সম্ভূতায় তুভ্যং নমঃ। যুবন শব্দস্য যবাদেশঃ। যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রযন্ত্যভি সংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্মেতি শ্রুতেব্র্‌হ্মণঃ সর্ব্বভূতকারণত্বাদবৃদ্ধতমত্বং সর্ব্বভূতময়ত্বাচ্চ যবিষ্ঠত্বমিতি বোদ্ধব্যং তৎ অপ্রত্যক্ষমিত্যর্থঃ ইদং প্রত্যক্ষমিত্যর্থঃ ইতি এবং রূপায় পরস্পর বিরুদ্ধা বিরুদ্ধরূপায় প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষরূপায় সর্ব্বস্মৈ নিখিলরূপায় তুভ্যং নমঃ সর্ব্বতিব্যাপ্নোতি বিশ্বমিতি সর্ব্বস্তস্মৈ সর্ব্বায় বিশ্বং বাপ্নুবতে একস্মৈ বিষ্ণুরূপায়েত্যর্থঃ তুভ্যং নমঃ নমামীত্যর্থঃ। তদিতি ইদমিতি চাব্যয় যোগেচেতি প্রথমা তুভ্যমিতি সর্ব্বত্র নমঃ স্বস্তীত্যাদিনা চতুর্থী দীপক লঙ্কারঃ। ২৯।

তুমি সর্ব্বাপেক্ষা সমীপবর্ত্তী হইয়া আছ, তোমাকে নমস্কার। তুমি সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী হইয়া আছ, তোমাকে নমস্কার। তুমি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম হইয়া রহিয়াছ, তোমাকে নমস্কার। তুমি সর্ব্বাপেক্ষা মহত্তম হইয়া রহিয়াছ, তোমাকে নমস্কার। তুমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বয়স্ক, তোমাকে নমস্কার। তুমি সর্ব্বাপেক্ষা অল্পবয়স্ক, তোমাকে নমস্কার। এ, সে, প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ, যাহা কিছু সকলই তুমি, তোমাকে নমস্কার। বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থিত একমাত্র তুমি, তোমাকে নমস্কার।২৯।

বহুলরজসে-বিশ্বোৎপত্তৌ ভবায় নমো নমো,
জনসুখকৃতে সত্ত্বস্থিত্যৈ মৃড়ায় নমো নমঃ।
প্রবলতমসে তৎসংহারে হরায় নমো নমঃ
প্রমহসি পদে নিস্ত্রৈগুণ্যে শিবায় নমো নমঃ॥ ৩০

পুনরপি পরমেশ্বরস্য সগুণত্বং নির্গুণত্বঞ্চোক্ত্বা নমস্করোতি।

বহুলেতি। বিশ্বোৎপত্তৌ বিশ্বস্য উৎপত্তৌ বিশ্বরূপেণ বোৎপত্তৌ আবির্ভাব বিষয়ে বিশ্বোৎপাদন কার্য্যে ইত্যর্থঃ বহুলং সত্ত্বতমোভ্যামধিকং রজঃ রজোগুণো যস্মিন্ তথোক্তায় ভবতি বিশ্বরূপো ভবতীতি ভবত্যস্মাদিতিবা তস্মৈ ভবায় বিধাতৃরূপায় ব্রহ্মণে তুভ্যং নমো নমঃ পুনঃ পুনর্ণমামীতি দ্বিরুক্তিঃ। সত্ত্বস্য সত্ত্বগুণস্য উদ্রিক্তৌ রজস্তমোভ্যামাধিক্যেন সত্ত্বগুণ প্রকাশে, তেন চ সাত্ত্বিক গুণানাং দয়াদীনাং প্রদর্শন বিষয়ে ইতিভাবঃ, জনানাং সুখং করোতীতি জনসুখকৃৎ। কৃধাতো ক্বিপ্। তস্মৈ তথোক্তায় লোকহিতকরায় ইত্যর্থঃ মৃড়য়তি সুখয়তি লোকানিতি মৃড়স্তস্মৈ লোকপালকায় বিষ্ণুরূপায় তুভ্যমিতি শেষঃ নমো নমঃ। পূর্ব্ববদ্দ্বির্ভাবঃ। (পুনঃ) তস্য বিশ্বস্য সংহারে আত্মনি প্রত্যবহার বিষয়ে প্রবলং সত্ত্বরজোভ্যামধিকং তমঃ যস্মিংস্তথোক্তায় হরতি বিশ্বমাত্মনীতি হরস্তস্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ। প্রমহসি সর্ব্বশ্রেষ্ঠে মহধাতোরসুন্। পরাৎপরে যদুক্তং ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।

মনসশ্চ পরাবুদ্ধি বুদ্ধেরাত্মা মহাং স্তুতঃ॥
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরাকিঞ্চিৎ সাকাষ্ঠা সাপরাগতি॥ মনুসংহিতা।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।

মনসস্তু পরাবুদ্ধির্যোবুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥ ইতি

ভগবদ্গীতায়াং। মমূক্তে আত্মা অহঙ্কারঃ, মহান্ হিরণ্যগর্ভঃ। নিস্ত্রৈগুণো নাস্তিত্রয়াণাং গুণানাং সত্ত্বরজস্তমসাং ভাব আবির্ভাবঃ যস্মিন্ তথোক্তে। গুণাসামপ্রকাশাবস্থাহীশ্বরস্তু মূলাপ্রকৃতিঃ। তাদৃশয়া প্রকৃত্যা সমন্বিতং গুণাতীতঞ্চ পদংকন্তু ব্রহ্মশব্দেনোচ্যতে। তৎপদমেব পদং ত্রাণস্থানং মমুক্ষূণামাশ্রয় ইতি যাবৎ তস্মিন নিস্ত্রৈগুণো পদে মুমুক্ষেভ্য আশ্রয় দানে ইত্যর্থঃ শিবায় শিবনামকায় নিঃশ্রেয়সে তুভ্যং নমো নমঃ। পদং ব্যবসিততাণ।

সাধনা ও শিষ্যত্ব।

প্রকৃত সাধনা ও শিষ্যত্বে প্রভেদ কি, এ বিষয়ে অনেকেরই ধারণা নাই। শিষ্য হইতে গেলে যে ষট্সম্পত্তি বা ষড়গুণের অর্জ্জন সম্বন্ধে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, তৎসম্বন্ধে আমাদের ধারণা অনেক সময়ে ভ্রমাত্মক। এই ষট্সম্পত্তি ও বিবেক, বৈরাগ্য এবং মুমুক্ষত্ব লইয়াই সাধন চতুষ্টয়। কিন্তু ইহার মধ্যে প্রকাশ্যভাবে গুরুর স্থান নাই। গুরুর শরণাগত না হইলেও শাস্ত্র সাহায্যে ও আভ্যন্তরীণ আত্মজ্যোতির আলোকে সাধনমার্গে অগ্রসর হওয়া যায়। গীতায়-ভগবান বলিয়াছেন :—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

অনন্যশরণ হইয়া ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিলে তাঁহার জোতি হৃদয়ে প্রতিভাত হয়। ধ্রুব এবং প্রহ্লাদের চরিত্রে ভগবজ্জ্যোতির সাহায্যে মানবের অপবর্গ উক্ত হয়। এমন কি সাধকেরা বলেন যে জগৎ হইতে সমস্ত গুরুকুল লোপ পাইলেও মানব ক্রমশঃ ঈশ্বরের পথে উপনীত হয়। জীবচৈতন্যের আত্মপ্রসার বা ক্ষুদ্র ভেদাত্মক আমিত্বের পরিবর্ত্তে অভেদাত্মক "একমেবাদ্বিতীয়ম্" আমিত্বের স্থাপনাই প্রকৃত সাধনা। আত্মপ্রসারই সাধনা, বিশিষ্ট প্রক্রিয়া সাধনা নহে।

শিষ্যত্ব অর্থে গুরু নামক বিশিষ্ট শক্তির সাহায্যে সাধনা বুঝায়। যাহাদের হৃদয়ে ঈশ্বরজ্যোতির অসীমতা প্রকাশ পাইতে পারে না, যাহারা ভগবান বুদ্ধদেবের ন্যায় আপনার বলে উন্নত হইতে না পারেন, তাহাদিগের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরচৈতন্যের সহিত অভেদভাবে অবস্থান সত্ত্বেও ব্যক্তভাবে প্রকট নামরূপধারী গুরুকুলের আবশ্যক। প্রকৃত পক্ষে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ও ঈশ্বরে প্রভেদ নাই। মহাপুরুষ মাত্রেই বাস্তবিকপক্ষে ঈশ্বরের প্রকৃতি। "মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ" হে পার্থ! মহাপুরুষগণ আমার দৈবী বা মহাবিদ্যা প্রকৃতির অন্তর্গত। তবে যেরূপ ঘটাকাশ, পটাকাশ প্রভৃতি পরিচ্ছিন্ন উপাধি সাহায্যে প্রকাশিত আকাশের জ্ঞানলাভে উপাধি শূন্য আকাশের জ্ঞান লাভ হয়, তদ্রূপ ভেদাত্মক জীব আপাতঃপ্রতীয়মান পুরুষত্ব অবলম্বনে ক্রমোন্নতিবশে অভেদ-ব্রহ্মে উপস্থিত হয়। এক দিকে নামরূপ ব্যবস্থিত জগৎ, অপর দিকে পরিচ্ছিন্ন ও পরস্পর বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাম। তদুপরি সুদূরে নামরূপধ্বংসকারী একত্ব বিরাজমান। এই একত্বের প্রভাবেই ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ানুরাগ, কিন্তু ক্ষুদ্র মানব কিরূপে পরিচ্ছিন্ন ভেদভাবে অবস্থিত হইয়া সেই একত্ব উপলব্ধি করিতে পারে। পরিচ্ছিন্নের ভাষা একরূপ, একত্বের ভাষা অন্যরূপ। পরিচ্ছিন্ন কর্ম্মময়, একত্বে ক্রিয়ার লেশ নাই; সংসার নাই, লয়ও নাই। "নৈবমুক্তির্নমেহয়ং" বলিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্য ইঙ্গিত করিতেছেন। সেই নিজবোধরূপ ক্রিয়াশূন্য প্রয়াস ও প্রযত্নশূন্য সর্ব্বদা স্থির একত্বের সহিত বিশিষ্ট প্রক্রিয়া ও প্রযত্নযুক্ত ভেদাত্মক জীবভাবের যে কত প্রভেদ, তাহা কথায় বলা যায় না। অথচ শাস্ত্র জলদগম্ভীরস্বরে বলেন "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো!" তুমিই সেই আত্মপদার্থ। এই সমস্যা বুঝিতে পারা বড়ই দুরূহ এবং ইহার মর্ম্মোদ্‌ঘাটন হইয়া গেলেই মানবের দেবত্ব সিদ্ধ হইল।

এ বিষয়ে বেদান্ত শাস্ত্রে একটি সুন্দর গল্প বলা আছে। রাজার সন্তান রাজপ্রাসাদে সুকোমল শয্যায় স্বপ্ন দেখিতেছেন যেন একাকী অসহায় অবস্থায় বিজন অরণ্য মধ্যে ভীষণ ব্যাঘ্রের সম্মুখীন। স্বপ্নবশে চীৎকার করিতেছেন। বল দেখি ভাই' সুশাণিত অসি লইয়া স্বপ্নঘোরে মোহিত রাজ পুত্রের হস্তে দিলে কি তাহার ভয় ভাঙ্গিবে? না তাহাকে জাগাইয়া দেও; তাহাকে বল যে সে ঘুমাইতেছে, সে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিতেছে। আমরাও ঈশ্বরে সর্ব্ব-

ক্ষণই রহিয়াছি এবং আমাদের প্রকৃত আমিই তিনি। তবে যখন সংসার' ঘোরে মোহিত হইয়া নামরূপের প্রভাবে আপনাকে ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করি, তখন মোহের বশে কতই দুঃস্বপ্ন দেখি! এ স্বপ্ন কি প্রক্রিয়া বিশেষের সাহায্যে ভাঙ্গিবে? না। যখন এই সংসার স্বপ্ন-তত্ত্ববিৎ অথচ প্রকৃত আত্মভাবে আত্মস্থ, সুতরাং আত্মস্বরূপবিৎ মহাজন করুণা করিয়া আমাদের উপযোগী ভাবে আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীয় আত্মজ্ঞান সাহায্যে আমাদের লুপ্তপ্রায় আত্মজ্ঞান জাগ্রত করিয়া দেন, তখনই আমরা প্রপঞ্চ ত্যাগ করিয়া স্থির সত্য অনুধাবন করিতে অগ্রসর হই; তখনই আমাদের দৃষ্টি সেই জীবনের শুকতারা ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয়; প্রাণে আকুলতা জন্মে; সত্য পদার্থের প্রতি অনুরাগে জগতে মায়িক অনুরাগ হারাইয়া ফেলি; তখনই ব্যক্ত হইয়াও সেই পরম অব্যক্তের ভাষা একটু আধটু বুঝিতে পারি। কোন ভাষা না জানিলে যেমন সেই ভাষা এবং আমাদের ভাষাবিৎ একজন "দোভাষি" আবশ্যক, তদ্রূপ হৃদয়স্থ সর্ব্বত্র সমভাবে প্রকাশ আত্মচৈতন্যকে চিনিতে হইলে, মায়ার ভাষা এবং আত্মার ভাষা এই দুই ভাষাবিৎ মহাজনের আবশ্যক। গুরু মায়িক পরিচ্ছদে প্রকট না হইলে আমাদের মায়াবদ্ধ ক্ষুদ্র হৃদয় আকৃষ্ট করিতে পারেন না। মূর্ত্তি ধারণ না করিলে মূর্ত্ত জীবনের উদ্ধার হয় না। অথচ স্বরূপতঃ তিনি মায়ালেশহীন আত্মপদার্থ। তাহা না হইলে আবার আত্মজ্ঞান কিরূপে প্রদান করিবেন? তিনি প্রকৃত পক্ষে অমূর্ত্ত আত্মার মূর্ত্তি বা প্রকাশকেন্দ্র স্বরূপ। ব্যক্ত এবং অব্যক্ত দুই ভাব ধরে বলিয়াই ব্যক্ত বদ্ধ জীবকে অব্যক্ত পদার্থতে লইয়া যাইতে পারেন। মানব যেমন ক্ষুদ্র ব্যক্ত জীব বিশেষকে ভালবাসিয়া তন্মূর্ত্তির সাহায্যে প্রকটিত আনন্দ স্বরূপ আত্মার উপলব্ধি করিতে পারেন, তদ্রূপ আমাদের ন্যায় মহান্ধজীব পুরুষবেশধারী অথচ অব্যক্ত গুরুর সাহায্যেই অব্যক্তে পৌছিতে পারে। গুরুর সহিত এই সম্বন্ধের নামই শিষ্যত্ব এবং ইহাই সাধনার অক্ষর পরিচয়।

নমস্তে গুরুবে তস্মৈ ইষ্টদেবস্বরূপিণে।
যস্য বাক্যামৃতং হন্তি বিষম্ সংসারসজ্ঞিতং॥

এক্ষণে সাধন চতুষ্টয়ের সহিত ও শিষ্যত্বের সহিত সম্বন্ধ কি, দেখা যাউক। প্রতীচ্য খণ্ডে, এমন কি ভারতবর্ষেও অনেকের বিশ্বাস যে সাধন চতুষ্টয়ের

অন্তর্গত গুণগুলি পূর্ণমাত্রায় অর্জ্জিত না হইলে শিষ্যত্ব লাভ হয় না। কিন্তু শাস্ত্রমর্ম্ম গ্রহণে দেখা যায় যে, ঐ সকল গুণ প্রকৃত পক্ষে সাধকের আদর্শরূপে প্রদত্ত এবং কোন দিকে কি প্রকারে সাধকের চিন্তা ও ক্রিয়াশক্তি পরিচালিত হইলে আত্মজ্ঞানের প্রসার হইবে, তাহাই ইঙ্গিতে উপদিষ্ট হয়। ঐ দৈবী-সম্পৎগুলি প্রকৃত আত্মপ্রসারের স্তর বা ক্রম। কিন্তু আমরা এই কথাটী ভুলিয়া যাই এবং গুণগুলিকে আত্মার সম্পত্তি বা আত্মপ্রসারের লক্ষণ বলিয়া না ভাবিয়া আমাদের ভেদাত্মক "আমির"খাস দখলি সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করি। কোথায় গুণগুলির দ্বারা একত্ব দেখিতে শিখিব' তাহা নাকরিয়া তৎসাহায্যে অপর জীব হইতে বিশিষ্ট কোন জীবের, শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করি। কোথায় গুণগুলি একত্ব ব্যঞ্জনাশক্তি ভাবিব, তাহা না করিয়া ভেদ জ্ঞানের কষ্টিপাথররূপে প্রয়োগ করি। যেমন সাধারণ লোকে পার্থিব ধনসম্পত্তির কষ্টিপাথরের সাহায্যে অন্য মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বা নীচত্ব প্রতিপাদন করে, তদ্রূপ অনেক সাধকেরা এতৎ সাহায্যে ব্যক্তি বিশেষের গুরুত্ব বা লঘুত্ব প্রমাণ করেন। যেমন কেবল মাত্র কার্য্য বিচার করিতে গেলে ধর্ম্মযুদ্ধে শরীর পাত ও কাপুরুষের আত্মহত্যা একই পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া মনে হয়, তদ্রূপ একত্ব ভাব ব্যঞ্জনকারী গুণগুলিকে অবলম্বন করিয়া বিচার করিতে গেলে সাধকের অন্তর্হিত চৈতন্য সম্বন্ধে ভ্রমে পতিত হইব। সেই অভেদাত্মক আত্মচৈতন্যের বহিঃপ্রকাশ সাধারণতঃ এই সকল গুণরূপে প্রকট হইলেও সকল অবস্থায় তদ্দ্বারা অন্তর্হিত চৈতন্যের অবস্থা পরিমাণ করিতে যাওয়া নিরাপদ নহে। গুণগুলি অর্থে আমরা বিশিষ্ট ক্রিয়ামাত্র বুঝি; ভিতরের অবস্থা দেখিতে পাই না। যেমন ব্যবহারিক ও ক্ষণিক বংশ বা মর্য্যাদা জ্ঞানে প্রণোদিত হইয়া আমরা অনেক সময় অসৎকর্ম্ম হইতে বিরত হই, যেমন ভেদাত্মক কর্ত্তব্য জ্ঞানেও ভুরি ভুরি সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তদ্রূপ পরিচ্ছিন্ন অহংকার অবলম্বনেও শম' দম প্রভৃতির গুণের অর্জ্জন করা যায়। "আমি উচ্চ সাধক, অতএব আমার শমতা আবশ্যক," এই ক্ষুদ্র জ্ঞানেও অনেক সময় শমতা সাধিত হয়। কিন্তু এই শমতা প্রকাশ, এবং সর্ব্বভূতস্থ আত্মজ্ঞান দ্বারা লব্ধ শমতার প্রকাশ একই প্রকার' সুতরাং প্রকাশমাত্র অবলম্বন করিয়া অভ্যন্তরীণ অবস্থা বিচার করিতে গেলে আমাদের ভ্রমে পতিত হইতে হইবে। সেই

জন্যই শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"ন দানেন"

এই জন্যই, সাধারণ মানব এত ক্রিয়ার পক্ষপাতী বলিয়াই মহাত্মা কবীর বলিয়াছেন—

"তৃণ খানেসে হরি মিলে তো অজা গরু হোই
নিং নাইনে সে হরি মিলে তো হাঙর কুমীর হোই"

গুণ সকল অভেদাত্মক চৈতন্যের বিকাশের স্তর মাত্র। অন্তস্থিত চৈতন্যের লক্ষণারূপ ব্যতীত তাহাদের বিশেষত্ব নাই। ঐ চৈতন্য প্রকাশের জন্যই গুণের অর্জ্জন। কিন্তু লক্ষ লক্ষ গুণেও চৈতন্যকে নিঃশেষিত করিতে পারে না। উক্ত গুণ সমন্বিত হইয়াও যদি অহংকারের বশে থাকিতে হয়, তাহা হইলে ঐরূপ গুণের আবশ্যকতা নাই। এই জন্যই উপনিষদে আত্ম পদার্থকে "ধর্ম্মাৎ অন্যত্র অধর্ম্মাৎ অন্যত্র" বলিয়া বর্ণনা করা হয়। যন্ত্রী যেরূপ যন্ত্রের মোহে পতিত হয়, তদ্রূপ সাধকও এক অবস্থায় ধর্ম্মের মোহে পতিত হন। মোহান্ধ জীব স্বাভাবিক বহির্ম্মুখী। মৃগনাভিযুক্ত মৃগের ন্যায় আপন হইতে উদ্ভূত সুগন্ধ বাহিরে অন্বেষণ করিতেই ব্যস্ত। বিশিষ্ট বস্তু বা রূপ লইয়া উন্মত্ত জীব সাধনমার্গে গিয়াও গুণ, শক্তি, সিদ্ধি ও এমন কি ঈশ্বরের রূপ-কল্পনার মোহে আপনাকে হারাইয়া ফেলে। রূপ গ্রহণ না করিলে আমরা সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে পারি না সত্য বটে, কিন্তু তাই বলিয়া রূপের মোহ আসে কেন? ঈশ্বরে ভক্তি সাধকের প্রধান সম্বল, কিন্তু এমন কি ঈশ্বরেও আমাদের ক্ষুদ্র ভেদাত্মক ভক্তি প্রযোজিত হইলে, যে কত অনর্থের মূল হয়, তাহা ইতিহাস পাঠে জানা যায়। এই ভেদাত্মক ভক্তির বশেই খৃষ্টানেরা শত শত লোককে ভগবানের নামে নিষ্ঠুর ভাবে দগ্ধ করিয়া মারিয়াছেন। নবীন মুসলমান সম্প্রদায় এই মোহে কত পুরাতন সভ্যতা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। বোধ হয় এই জন্যই এই স্বাভাবিক মোহ হইতে জীবকে উদ্ধার করিবার মানসে শ্রীচৈতন্যদেব সাধনা বিষয়ে আমাদের দুইটী কষ্টীপাথর দিয়াছেন। সুধু "নামে রুচি" শিক্ষা দিয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু "জীবে দয়া" নামে আর একটি বিশিষ্ট গুণের আবশ্যকতা প্রমাণ করিয়াছেন। মহাপুরুষ খৃষ্টদেব বোধ হয় এই জন্যই এক সাধককে

বলেন, "যদি আপন ভ্রাতার প্রতি রাগ করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতে আইস, তাহা হইলে জানিও যে যতক্ষণ ভ্রাতার প্রতি তোমার ক্রোধ থাকিবে, ততক্ষণ তুমি ঈশ্বরের নাম লইবার যোগ্য নহ। ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদও এই জন্যই তৎকালীন মুনিগণের আধ্যাত্মিক অহংকার ও স্বার্থপরতার দিকে লক্ষ্য করিয়া জীবের প্রতি দয়াবশে প্লাবিত হইয়া বলেন—

নাথ যোনি যোনি সহস্রেষু. যেষু যেষু ব্রজামহং ইত্যাদি।

এই জন্যই বেদান্তে শুধু "সোহং" বা "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের উপলব্ধি করিলেই চলিত না। সাধককে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই মহাবাক্য সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করিতে হইত। যেমন গুণ থাকিলেই আত্ম প্রসার হয় না, সেইরূপ প্রসারিত চিত্ত আত্মস্থ সাধককেও অনেক সময়ে পূর্ব্ব জন্মকৃত সংসার-বশে অথবা ভগবানের নিমিত্তমাত্ররূপে লোকাচার বা শিষ্টাচারের বিরুদ্ধে সামান্য সামান্য কার্য্য করিতে দেখা যায়।

বুঝা গেল সাধনায় দুইটী বিভাগ আছে। এক অংশে সাধক আপনাতে ভগবানের বা সৎ পদার্থের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন। অপরাংশে, ক্ষুদ্র "আমিকে"ও হারাইয়া ফেলিয়া আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থ আত্মাতে অবস্থিত দেখেন। এই জন্য গীতা বলিয়াছেন:—

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।

এক্ষণে এই দুইটী ভাবকে বুঝিবার চেষ্টা করি। প্রথম ভাবের অর্থ কি? এক কথায় বলিতে গেলে সাধারণতঃ এই ভাবকেই সাধনা বলিয়া গণ্য করা হয়।

"ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।" গীতা। সাধক এই ভাবের সাধনা করিয়া ক্রমাভিব্যক্তি অনুসারে ভেদভাবাপন্ন বদ্ধ জীব জ্ঞানকে অল্পে অল্পে প্রসারিত করিয়া, আত্ম পদার্থের কেন্দ্রস্থ বা ঈশ্বর ভাব উপলব্ধি করেন। সাধক সর্ব্ব প্রথমে দেহ হইতে আপনাকে পৃথক্ বলিয়া দেখিতে শিখেন, ইহাকে সাংখ্যযোগ বলে। তৎপরে সেই পৃথক সত্তা বা আমিত্বের কর্ম্মাংশের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমিত্বকে নির্ম্মল ও বিষয়-সঙ্গ-রহিত করিবার জন্য কর্ম্মযোগ অবলম্বন করেন; এ কর্ম্মযোগে আমি আছি, ইন্দ্রিয়াধি-ষ্ঠাতা দেবতারা আছেন, জগৎ আছে ও ফলভোক্তা ঈশ্বরও আছেন, কিন্তু

এই কর্ম্মযোগে যোগীর মূল উদ্দেশ, কিসে কর্ম্মদ্বারা বিষয় ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সহিত প্রাক্তন সংযোগ অল্পে অল্পে বিচ্ছিন্ন করিয়া কেন্দ্রস্থ বৃহত্তর আমিত্বের উপলব্ধি করিতে পারা যায়। প্রবন্ধান্তরে এ বিষয় আলোচনা করা যাইবে। কিন্তু মূল কথা এই যে কি কর্ম্ম সন্ন্যাস, কি যজ্ঞাচরণ, কি যোগসাধনা—সর্ব্ব ভাবেই সাধক কেন্দ্রস্থ স্থির মহান্ আমিত্বের অনুসন্ধান করেন।

অপর ভাবটীর মূলমন্ত্র বাহিরের নানাত্ব মধ্যেও সেই আত্মার প্রকাশ জ্ঞান। এ ভাবে প্রকৃতি পুরুষ নাই, দেহ ও দেহী নাই, আছে কেবল পরম একত্ব। যাহাকে ক্ষণভঙ্গুর বলে, যাহাকে উপাধি বা কোষ বলা যায় এবং যাহা বিনাশশীল, সে সমস্ত এখন আর অনাত্ম বলিয়া দেখিলে চলিবে না। এই প্রকার আত্মদর্শন চেষ্টাই স্থূল জগতে স্থূল চৈতন্যের নিকট বিজ্ঞান নামে আভাহিত। এ ভাবে আমিত্বকে ও তাহার বিশেষত্ব বর্জ্জন করিয়া একত্ব অনুসন্ধান করাই প্রধান ভিত্তি।

সমং সর্ব্বেভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং।
বিনশ্যৎ স্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ গীতা

যিনি সকল ভূতে সমভাবে অবস্থিত, বিনাশশীল মধ্যেও অবিনাশী পরম তত্ত্বকে জানেন তিনি যথার্থ দেখেন। এভাবে উন্নতি নাই, অবনতি নাই; গতি নাই, স্পন্দন নাই, রূপ নাই, গুণ নাই, অথচ এ সমস্তই এক আত্মপদার্থে অবস্থিত বলিয়া দেখিতে হইবে। এ ভাবে শুধু কেন্দ্রস্থ আমিত্ব লইয়া ধ্যান ধারণা করিলে চলিবে না; বাহিবের আত্মাকে দেখিতে হইবে এবং অবশেষে বাহির ভিতর ও তদুপরিস্থিত ভাবেও আত্মপদার্থকে জানিতে হইবে। সাধক-দিগের উপাদেয় গ্রন্থ Light of the path এ এই অবস্থাগুলিকে সুন্দররূপে অথচ সংক্ষিপ্তভাবে সূত্রাকারে বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রথম অবস্থায় উপদিষ্ট আছে—"Seek out the way" অর্থাৎ ভেদাত্মক বিচারশক্তির সাহায্য নিত্যানিত্য, স্থির ও অস্থির, চল ও অচল এই দুই পদার্থ পরস্পর বিশ্লেষিত পূর্ব্বক পরিবর্ত্তনশীল ত্যাগ করিয়া অপরিণামী পদার্থের অনুসরণ কর। সাধারণতঃ সাধকেরা এই শ্রেণীভুক্ত; ভেদাত্মক আত্মজ্ঞান এই সাধনার সহায়। বিশ্লেষণ ও বিচার মূল অস্ত্র। ফল আমিত্বের স্থাপন বা সাংখ্যের পুরুষের অবস্থা প্রাপ্তি—দ্বিতীয় অবস্থায় সাধককে বলা হয় "Seek the way by

retreating within" অর্থাৎ পূর্ব্ব সাধনার দ্বারা স্থাপিত আমিত্বের ভিতর ডুব দেও, যতই ডুবিবে, ততই "প্রকৃত আমির" কেন্দ্রস্থ ভাব গভীররূপে উপলব্ধি করিতে পারিবে। ধ্যান কর, বিষয় ত্যাগ কর, তবে মহত্তর প্রজ্ঞা প্রকাশিত হইবে। ইহার পর সাধককে আর একটী বিষয় উপলব্ধি করিতে হইবে। এখন বুঝিতে হইবে যে আত্মা—

সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাষং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতং।
অশক্তং সর্ব্বভূতঞ্চৈব নিগুণং গুণভোক্তৃয়ঃ॥
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাদবীজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥

এখন শুধু ধ্যান করিলে চলিবে না; বাহিরে আসা চাই। ভেদ জ্ঞানের চক্ষে যাহাকে বস্তু বলিয়া মনে হইত তাহাও অপরিণামী আত্মা বলিয়া জানা চাই। বিবীক্তসেবী হইলে চলিবে না। সংসার ব্যাপিয়া অবস্থিত আত্মাকে দেখিতে পাইলে আর কর্ম্মসন্ন্যাস সাজে না। তাই মহাপ্রভু হৃদয় ক্ষেত্রে সর্ব্বদা নবীন পরমাত্মাভাবে আত্মাকে বুঝিতে পাইয়া, সর্ব্বজীবে সেই আত্মা উপলব্ধি করিবার জন্য জীবে প্রেম এই ধর্ম্ম প্রচার করেন। যতক্ষণ আত্মাকে কেবল হৃদয়স্থ বলিয়া জ্ঞান থাকিবে, ততক্ষণ কার্য্য ত্যাগ করিয়া শুধু উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু যিনি সর্ব্বভূতস্থ আত্মাকে দেখিতে পান, তিনিই প্রেমাবিষ্ট হইয়া অধিকার ও জ্ঞান নির্ব্বিশেষে প্রস্তরখণ্ড, তমালবৃক্ষ, পশু ও মানবকে সেই ভাবে আলিঙ্গন করিতে ছুটেন; ইহাই প্রকৃত প্রেম। এই প্রেমবশে অম্লানবদনে যীশুদেব জগৎ হিতার্থে আপনাকে বিসর্জ্জন করেন, এই মহামন্ত্রের উত্তেজনায় গৌতমদেব সংসার ত্যাগ করিয়াও পুনরায় ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন। যে কর্ম্ম-বন্ধন সাধারণ যোগীর নিকটে শৃঙ্খলের ন্যায় ক্লেশদায়ক বলিয়া বোধ হয়, সেই শৃঙ্খল এখন যোগীর পরম আদরের বস্তু।

সাধনার এ দুটী ভাবকে আমরা কেন্দ্রস্থ ও কর্ম্মজ বলিয়া নাম দিতে পারি। কেন্দ্রস্থভাবে জীব আত্মার অণুত্ব উপলব্ধি করে এবং কর্ম্মজ ভাবের সাহায্যে বিভুত্ব বা মহত্ত্ব উপলব্ধি হয়। কিন্তু এ কর্ম্মের গতি অন্য রূপ। এ কর্ম্মে আর ভেদাত্মক আমিত্বের স্থাপনা বা পরিপুষ্টি হয় না। "আমি ইহা

করিয়াছি", "আমি উহা করিব" ইত্যাকার জ্ঞানে আমাদের ভেদমূলক আমি স্থিরীকৃত হয়, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মের দ্বারা সে ফল ফলে না। কারণ তৎপূর্ব্বে কেন্দ্রস্থভাবের সাধনার দ্বারা অমিত্ব পদার্থেও আত্মার প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার "অহং" অর্থে এখন আর নাম রূপধারী ব্যক্তি বিশেষ বুঝায় না। তাঁহার "অহং" এখন "সঃ"। যেমন ভেদাত্মক ভাবে আমির দ্বারা প্রণোদিত কর্ম্ম সকল পুনরায় সেই ক্ষুদ্র আমিত্বকে ঘনীভূত করে, তদ্রূপ এই বিশ্বব্যাপী আমিত্বভাবে প্রণোদিত কর্ম্মের ফলে আত্ম-পদার্থই প্রকাশিত হয়। বেদান্ত শাস্ত্রের মহাবাক্যগুলির মধ্যে এইরূপ ক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। সাধককে সর্ব্বপ্রথমে "তত্ত্বমসি" তুমি সেই আত্মপদার্থ এই উপদেশ দেওয়া হয় এবং সাধক নাম রূপ বিবর্জ্জিত অথচ বিশ্বতোমুখ আত্মাকে আপনার আমিত্বের ভিতর দিয়া দেখিতে আরম্ভ করেন। যাহাকে অগ্রে বিশিষ্ট বস্তু বলিয়া মনে হইত, যে আমিকে অপামর সাধারণ লোকেও বুঝিতে পারি বলিয়া মনে করে, তখন সেই আমিত্বের ভিতরে ডুব দিয়া তাহার স্বরূপ ভাব উপলব্ধি করিতে হয়। কি আশ্চর্য্যের বিষয় যে সকলই 'আমিকে' লইয়া রহিয়াছে, অথচ সে আমি যে কি পদার্থ তাহা আমরা কেহই জানি না। মায়া অধ্যাসে বিশিষ্ট শরীরাদি ভাব আরোপ করিয়া আমার আমিকে বিশিষ্ট বস্তু বলিয়া দেখি, কিন্তু বাস্তবিক আমি পদার্থে বিশিষ্ট নাই। আমি পদার্থ বাস্তবিক পক্ষে ভাব সকলের প্রকাশ মাত্র এবং যেরূপ ঘটনা বা ভাব সমষ্টিকে প্রকাশিত করে, সেইরূপ ভাবে রঞ্জিত হইয়া প্রতীয়মান হয়। সাধারণতঃ স্মৃতির সাহায্য 'আমি অমুকের পুত্র' 'অমুক সালে জন্মিয়াছি' "এই এই কার্য্য করিয়াছি"। এবম্বিধ ভাব বা ঘটনা সমষ্টির দ্বারা আমরা মনে করি যেন আমিকে ধরিতে পারিয়াছি। কিন্তু স্মৃতির বিভ্রম হইলে অথবা পাগল হইয়া গেলেও আমিত্বের অপলাপ হয় না। পুরাতন স্মৃতি বিশৃঙ্খল বা বিলুপ্ত হইলে উন্মত্ত অবস্থার মধ্যেও "আমির" কেন্দ্রস্থ ভাব প্রতিবিম্বিত হয় এবং নূতন স্মৃতির শৃঙ্খলা বা বৃত্তের সাহায্যে বিশিষ্ট আমি জ্ঞান দেখা যায়। রাম শ্যামের পুত্র এবং তাহার আমি জ্ঞান এই সকল ভাবগুলিকে প্রকাশ করে, কিন্তু যখন রাম পাগল হইয়া গেল এবং তৎসঙ্গে তাহার স্মৃতিরও লোপ হইল,

তখন তাহার আমি জ্ঞানেরও লোপ হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা না হইয়া তাহার আমি উন্মত্ত অবস্থায় অনুভূত ঘটনাগুলিকে অনুস্যূত করিয়া নূতন কেন্দ্রস্থ বা ব্যক্তি ভাবে প্রকাশিত হয়। রাম মনে করে যেন সে নেপোলিয়ান বনোপার্ট এবং নেপোলিয়ান কৃত কার্য্যকলাপের ভিতর দিয়া তাহার আমিত্ব ভাব প্রকাশিত হইতে থাকে। ইহা হইতে বুঝা গেল যে প্রকৃত আমি যখন বিশিষ্ট বস্তু বা ভাব সমষ্টি প্রকাশিত করে, তখন তাহার কেন্দ্রস্থ বা ব্যক্তি ভাব প্রকট হয়। আকাশ পদার্থ অবিশেষ বা Universal, কিন্তু ঘট পট প্রভৃতি উপাধির সাহায্যে বিশিষ্ট ও কেন্দ্রীভূত হইয়া ঘটাকাশ ও পটাকাশ প্রভৃতির কেন্দ্রভূত ভাব ধারণ করে। তদ্রূপ আমি পদার্থও বাস্তবিক অবিশেষ এবং সবিশেষ ভাবের প্রকাশক, কিন্তু বিশিষ্ট ভাব সমষ্টির মধ্য দিয়া কেন্দ্রীভূত ভাবের প্রকাশ হইয়া "আমি দুঃখী" "আমি সুখী" 'আমি মনুষ্য" "আমি দেবতা" "আমি বদ্ধ" ও "আমি মুক্ত" ইত্যাকার ভাব প্রাপ্ত হয়।

এই দুইটী ভাবের অনুশীলন করিলে তৃতীয় ও সর্ব্বোপরিস্থ ভাব বুঝা যাইতে পারে। প্রথম ভাবটীর গতি অন্তর্মুখী ও এই ভাবের সাহায্যে বিশিষ্ট ইচ্ছা ক্রিয়া ও জ্ঞানের ঘটনাগুলি কেন্দ্রীভূত হয়। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে বোধ হয় বিষয়টী কতকটা স্পষ্ট হইতে পারে। রাম আপনাকে "আমি" বলিয়া জানে, এ আমির অর্থ কি? ইহার গতি কি? শাস্ত্রে ইহাকে শক্তি কহে ও এই শক্তিবলে চৈতন্য আপনাকে বিশেষ ও কেন্দ্রস্বরূপ বলিয়া দেখে। রামের বাল্যাবস্থা, যৌবনাবস্থা ও প্রৌঢ়াবস্থা এবং প্রত্যেক অবস্থায় সংঘটিত রাশি রাশি বিভিন্ন ঘটনাবলী এই কেন্দ্রীকরণ শক্তির সাহায্যেই একীকৃত হইয়া আছে। এই শক্তি না থাকিলে এক ক্ষণের ঘটনার সহিত অপর ক্ষণের ঘটনার সন্নিবেশ হইত না। এই শক্তিবলে চৈতন্য বিভিন্নতা ও ভেদমূলক অসীমতা ত্যাগ করিয়া এক প্রকার একত্ব স্থাপন করে। বহির্মুখী ভাব ত্যাগ করিয়া অন্তর্মুখী হইবার যে গতি দৃষ্ট হয়, তাহা এই শক্তিরই ক্রিয়া। এই ভাব বিভিন্নতা বা প্রকাশ ভাবের বিরোধী এবং এতদ্বারা বাহিরের বস্তুর এক দেশ মাত্র গ্রহণ করা হয়। রাম তাহার পুত্র পরিবারাদি সকলকেই আমার বলিয়া দেখে। কিন্তু এ "আমার"

জ্ঞান বাস্তবিক ভেদমূলক। রামের পুত্র শ্যাম বাস্তবিক যে কি পদার্থ এ ভাব গ্রহণ না করিয়া রামের অভ্যন্তরীণ পুত্র ভাব যে পরিমাণে শ্যামের দ্বারা প্রকাশিত হয়, সে পরিমাণেই রাম তাহাকে আপন পুত্র বলে। যদি শ্যামের ভাব তদ্বিরোধী হয়, যদি শ্যামের অস্তিত্ব রামের কেন্দ্রীকরণ শক্তির প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে শ্যাম রামের আর "আমার" হইল না। রাগ, দ্বেষরূপে ব্যবস্থিত হইয়া এই কেন্দ্রীকরণ শক্তি কার্য্য করে। সুতরাং বুঝা গেল এই কেন্দ্রশক্তির মূলে ভেদ জ্ঞান থাকা আবশ্যক এবং যে পরিমাণে আমার আমি বাহ্য বিষয় হইতে আপনাকে পৃথক বলিয়া জানিতে পারিব, সেই পরিমাণেই তাহার "আমিত্ব" সিদ্ধ হইবে। যে পরিমাণে জীব আপনাকে প্রকাশ কেন্দ্র ভাবিয়া আপনার বাহিরের স্থিত বিষয় ও ঘটনাগুলিতে আপনার আমিত্বভাব বা বীর্য্যক্ষেপণ পূর্ব্বক পুনরায় তৎসাহায্যে বিষয়গুলি আপনাতে পরিণত করিতে পারে, সেই পরিমাণে তাহার কেন্দ্রী ভাব সুসিদ্ধ হয়। কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব এবং সাংখ্যপুরুষের দ্রষ্টৃত্ব এই তিন ভাবই এই কেন্দ্র শক্তির ক্রিয়া দেখা যায়। বাহিরের বস্তু আমা হইতে পৃথক। এই জ্ঞানটী উপরোক্ত তিন অবস্থার মূলে বর্ত্তমান। তবে ভোক্তৃত্ব ভাবে আমার ক্রিয়ার অংশ কম। বাহিরের বস্তু আমাতে পরিণত করিতে পারিলেই আমার অস্তিত্ব সিদ্ধ হইল। বাহিরের বস্তুর স্বরূপ জ্ঞানের আবশ্যকতা নাই, শুধু আমার ভোজনের উপযোগী হইলেই হইল। কর্ত্তৃত্ব ভাবেও পৃথক সত্তা ভাব আছে। তবে ভোক্তৃত্ব ভাবে আমি ও জগৎ যেমন তমোগুণ সম্পর্কিত কর্ত্তৃত্ব জ্ঞানে রজোগুণের আধিক্য দৃষ্ট হয়। এই ভাবে আমাদের আমি স্বীয় কেন্দ্র ভাব ও পৃথকত্ব প্রতিপাদন চেষ্টায় শক্তি প্রয়োগ দ্বারায় বাহিরের নানাত্ব ও আমাদের ক্ষুদ্র পৃথক আত্মা প্রতিদ্বন্দী ভাবে ব্যবস্থিত বিষয় নিচয় আত্মস্মাৎ বা উদরস্মাৎ করিয়া ভেদাত্মক অস্তিত্বের প্রতিপাদন চেষ্টা করি, কিন্তু কর্ত্তৃত্ব জ্ঞানে শুধু গ্রহণ করিয়া ক্ষান্ত হই না। বিষয়ের উপরে আমাদের আমিত্বের মার্কা মারিতে চেষ্টা করি। ভোক্তৃত্ব জ্ঞানে বাহিরের বস্তুর ভিতরে অবস্থিত স্বতন্ত্র শক্তিনিচয় স্বীকার করিলেও তাহাদের প্রতিদ্বন্দীতা ভাব তত প্রবল নহে। ভোজ্যবস্তু আমার বাহিরের পদার্থ কিন্তু প্রতিকূল নহে। তদ্দারা আমার পরিপুষ্টি হয় এবং তাহাদের ভিতরের শক্তি কেবল আমার

পরিপুষ্টির জন্য এই জ্ঞান কেবল প্রবল থাকে। আমাদের দেশে সাধারণ মনুষ্য মাত্রেই এই অবস্থায় আছে। কি গার্হস্থ জীবনে, কি সামাজিক জীবনে, কি রাজনৈতিক জীবনে, আমাদের যজ্ঞভাগ পাইলেই আমরা সন্তুষ্ট। পুত্র কলত্র যদি আমার মনোগত হয়, তাহা হইলেই সংসারে সুখ। সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে যদি কিছু সত্য থাকে, তাহা হইলেই বিশেষ আনন্দ; এই ভোক্তৃত্ব ভাবকে আমরা কুম্ভকর্ণ বলিয়া দেখিলে ইহার স্বরূপ কতকটা অনুভব করিতে পারিব।

কর্তৃত্ব জ্ঞানের গতি অন্যরূপ। বস্তু সকল কুম্ভকর্ণের মত কুক্ষিগত করিলে আর চলে না। দেবতা বালবাদি ভোজন করিয়া কুম্ভকর্ণের তৃপ্তি। কিন্তু বারণ তাহাতে সন্তুষ্ট নহে; সসাগরা বসুন্ধরা এমন কি ত্রিলোকী পর্য্যন্ত আপনার বশীভূত না করিতে পারিলে সুখ নাই। দেবতা, মানব প্রভৃতি সমস্ত জীবের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিয়া আপনার কর্তৃত্ব স্থাপনই এ অবস্থার মূলমন্ত্র, বাহিরের বস্তু শুধু ভোজ্য হইলে চলিবে না। আমার কর্তৃত্বাভিমানের বশ হওয়া চাই। সুতরাং এ অবস্থায় বাহিরের বস্তুগুলিকে কবলিত করিয়া আত্মসাৎ করিলে আর কাহার উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিব? নির্বীর্য্য শক্তি-হীন অশ্ব বশ করিয়া যেমন অশ্বারোহীর সুখ হয় না, সেরূপ কর্তৃত্বাভিমানী বাহিরের বস্তুর স্বাতন্ত্র্য একটু স্বীকার না করিলে আনন্দ হয় না। অতএব বুঝা গেল যে মানব তমোগুণবিশিষ্ট ভোক্তৃত্ব অবস্থা হইতে রজোবিশিষ্ট কর্তৃত্বে উপনীত হইলে যেমন তাহার আমিত্ব পরিপুষ্ট হয়, তদ্রূপ তৎসঙ্গে জগৎ নামধেয় বাহিরের ভাবটীও অল্লাধিক পরিমাণে স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। সাংখ্যের দ্রষ্টাত্ব ভাব সত্বগুণমূলক। এ অবস্থায় জীবের আমিত্ব ক্রমোন্নতিবশে এতটা কেন্দ্রস্থ হইয়া যায় যে, আর বাহ্য জগৎকে ভোজনদ্বারা নিঃশেষিত বা কর্তৃত্বাভি-মানে বশীকৃত করিতে হয় না। সুধু একটু আড়নয়নে জগৎকে প্রকৃতি বা অনাত্ম বলিয়া কটাক্ষপাত করিতে পারিলেই আমিত্বের স্থাপনা হয়। এই দৃষ্টি বা দ্রষ্টার ভাবও ভেদমূলক। সমুদ্রতীরস্থিত উচ্চ পর্ব্বতোপরি ভবনে বসিয়া সমুদ্রবক্ষে প্রবল বাত্যাহত নাবিকগণকে বিপন্ন ও মৃত্যুমুখে পতিত প্রায় দেখিলে যেমন আমাদের নিরাপদ নির্ব্বিঘ্ন শান্তভাব স্পষ্টিকৃত ও ঘনীভূত হয়, তদ্রূপ সত্বগুণান্বিত অহংকারে আত্মজ্ঞান স্থাপনপূর্ব্বক ভেদ-

মূলক বিবেক শক্তির সাহায্যে প্রকৃতি দ্রষ্টা হইয়া অবস্থান করিতে পারিলে, বড়ই আনন্দ হয়; প্রকৃতি বেচারির বিরুদ্ধধর্ম্ম মুকুরবৎ আমাদের শান্ত অস্তিত্ব ভাব প্রকাশ করে। ক্রিয়া ক্ষণভঙ্গুর কর্ম্ম থাকিলেই পরিণতি হইবে অতএব ঐ বিপদশঙ্কুল ভাবটীকে মানে মানে প্রকৃতিতে বিলাইয়া দেওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। সুখ ও দুঃখ মাত্রেই আত্মজ্ঞানকে ডুবাইয়া দেয়, অতএব ঐ সর্ব্বনেশে জিনিস দুটী ত্যাগ করাই ভাল। ভগবান বল আর যাই বল আমার আমির চেয়ে কেহ বড় নয়, অতএব আমিটীকে ভগবানে হারাইয়া ফেলা অপেক্ষা ভগবৎ সেবার দোহাই দিয়া, প্রেমের দোহাই দিয়া, সাধের আমিটীকে রাখিতে পারাই ভক্ত বুদ্ধিমান ও পণ্ডিতের কার্য্য।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশিশিরকুমার ঘোষাল।

হিন্দু দর্শন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(চার্ব্বাক দর্শন)

শ্রীমাধবাচার্য্য বিরচিত সংস্কৃত সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ নামক গ্রন্থে সর্ব্ব প্রথমে "চার্ব্বাক দর্শন" ও তৎপরে বৌদ্ধ দর্শন আলোচিত হইয়াছে। আমরাও এই পন্থাই অনুসরণ করিলাম। দর্শন শাস্ত্রের সম্যক্ মর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে হইলে সাধারণ দার্শনিক যুক্তির জ্ঞান থাকা আবশ্যক, তজ্জন্য আনুসঙ্গিক ভাবে সর্ব্বদর্শনের মূল তত্ত্বই আলোচিত হইবে।

বৃহস্পতির মতানুসারী, নাস্তিক শিরোমণি চার্ব্বাকের দুঃখোচ্ছেদ ও সুখোপায় চেষ্টা করাই মূলমন্ত্র। তাঁহার মতে—

যাবজ্জীবং সুখং জীবেন্নাস্তি মৃত্যোরগোচরঃ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥

পুরুষ যতকাল জীবিত থাকিবে, কেবল সুখোপায়ই চেষ্টা করিবে। কেহই মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবেন না। মৃত্যুর পর দেহ ভস্মীভূত হইলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না ও মানুষের পুনর্জ্জন্মও হয় না।

পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু এই চারি তত্ত্ব বা ভূত হইতে মানুষ দেহাকারে

পরিণত হয়। এই ভূত সকল একত্র মিলিত হইয়া দেহাকারে পরিণত হইলে তাহাতে চৈতন্য জন্মে। হরিদ্রা, পীতবর্ণ ও চূর্ণ শুক্লবর্ণ, উভয়ের রাসায়নিক সংযোগে রক্তিমার উৎপত্তি হয়। গুড় ও তণ্ডুল মাদক নহে, কিন্তু উভয়ের রাসায়নিক সংযোগে মদ্য প্রস্তুত হইলে তাহাতে মাদকতা জন্মে। সেইরূপ উক্ত চারিভূত একত্র মিলিত হইলে রাসায়নিক সংযোগে চৈতন্যগুণ জন্মে। সচেতন দেহই আত্মা, তদতিরিক্ত কোন স্বতন্ত্র আত্মা নাই। প্রত্যক্ষ প্রমাণই একমাত্র প্রমাণ, অনুমানাদি ও বেদ বা শব্দ প্রমাণ নহে। ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও রাক্ষস এই ত্রিবিধ লোক একত্র হইয়া বেদ রচনা করিয়াছে।

বৃহস্পতি কহিয়াছেন বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্র, দণ্ডধারণ, ভস্মগুণ্ঠন, এই সমস্ত বুদ্ধিপৌরুষহীন ব্যক্তিদিগের উপজীবিকা মাত্র।

ধূর্ত্তেরা বলিয়া থাকে জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে জীবকে বলি দিলে, সেই জীব স্বর্গলোকে গমন করে। যদি ঐ ধূর্ত্তদিগের ইহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে তাহারা যজ্ঞ করিয়া আপন আপন পিতা মাতা প্রভৃতির মস্তকচ্ছেদন করিয়া তাহাদিগকে স্বর্গে পাঠায় না কেন?

চার্ব্বাক বলেন স্রক্-চন্দন-বনিতাদি উপভোগ দ্বারা সুখ সমুৎপন্ন হয় এবং এই সুখই পরম পুরুষার্থ। সুখ আস্বাদন করিতে হইলে তৎসঙ্গে দুঃখও অপরিহার্য্য, তথাপি দুঃখের ভয়ে সুখ অর্জ্জনে ও সম্ভোগে অনাস্থা প্রদর্শন করা উচিত নহে। মৎস্যে কণ্টক আছে, মৎস্য শীকারে কষ্ট আছে, তজ্জন্য কি কেহ মৎস্য ভক্ষণে পরাঙ্মুখ হয়? ভিক্ষুক দ্বারা বিরক্ত হইবার ভয়ে কি কেহ অন্নাদি পাক করিয়া ভোজন করে না? চোর দস্যুর ভয়ে কি কেহ মনোহর বসনভূষণ পরিধানে ও সুন্দরী ভার্য্যা প্রতিপালনে বিরত হয়? অথবা চোরের ভয়ে সুবর্ণের ও রৌপ্যের বাসন ত্যাগ করিয়া মৃণ্ময় পাত্রে ভোজন করে? অবশ্যই না। সুখের আনুসঙ্গী দুঃখের ভয়ে সুখভোগে বিরত হওয়া অতি মূঢ়তার কর্ম্ম। সুখকর দ্রব্য উপভোগ করিলে পীড়া জন্মিতে পারে, তজ্জন্য পীড়ার চিকিৎসা করা উচিত, তাই বলিয়া সুখভোগ ত্যাগ করা বিধেয় নহে।

যদি বল অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ বহু ধন ব্যয় ও আয়াস স্বীকার করিয়া পারলৌকিক সুখের আশায় বেদ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের অনুষ্ঠান

করেন কেন ও সংসারিক সুখকে তৃণবৎ জ্ঞান করেন কেন? ইহাদ্বারা পরলোকের কোন প্রমাণ হয় না। কতিপয় প্রতারক ধূর্ত্তেরা বেদ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে স্বর্গ নরকাদি নানা প্রকার অলৌকিক পদার্থ প্রদর্শন করতঃ সকলকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহারা ঐ সকল বেদবিধির অনুষ্ঠান করিয়া জন সাধারণের ও রাজাদিগের যাগাদিতে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া বিপুল অর্থ অর্জ্জন করতঃ পরম সুখে কালযাপন করিতেছে। উত্তর কালীন লোক সকল এই সমস্ত বেদোক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করায় বহুকালাবধি এই মূঢ়তা জন সমাজে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। বুদ্ধিমান লোকেরাও তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছেন না। অনেকে আবার স্বীয় ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব প্রদর্শনার্থ আমি "পরলোকে স্বর্গে যাইব, আমি ইহলোকে বড়লোক, পরলোকেও বড় লোক হইব" এই অলীক গর্ব্ব প্রদর্শনার্থ নিজের কষ্টোপার্জ্জিত ধন দ্বারা ঐ সকল ধূর্ত্তদিগের তুষ্টি সম্পাদন করেন। ইহা মূর্খতা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥
যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদেস বিনির্গতঃ।
কর্ম্মাদ্ভূয়ো ন চায়াতি বন্ধুস্নেহ সমাকুলঃ॥
ততশ্চ জীবনোপায়ো ব্রাহ্মণৈর্বিহিতস্ত্বিহ।
মৃতানাং প্রেত কার্য্যানি ন ত্বন্যদ্বিদ্যতে কচিৎ॥

যতকাল জীবন ধারণ করিতে হয়, ততকাল সুখে জীবন যাপন করাই বিধেয়; এমন কি ঋণ করিয়াও ঘৃত ভোজন করা কর্ত্তব্য। এই দেহ ভস্মীভূত হইলে কেহ আর পুনরায় ফিরিয়া আসে না।

যদি বল পরলোক আছে ও পরলোক হইতে জীবগণ পুনরায় আগমন করে, তাহা হইলে জীব দেহ হইতে একবার বিনির্গত হইয়া গেলে তাহার স্ত্রী, পুত্র কন্যা, বন্ধু, বান্ধবগণ বক্ষঃবিদারণ করিয়া ক্রন্দন করিলেও জীব পুনরায় ফিরিয়া আসে না কেন?

এই সংসারে মৃত ব্যক্তিদিগের কোনরূপ শ্রাদ্ধ কার্য্যাদি নাই, এবং মৃত ব্যক্তির জন্য শ্রাদ্ধাদি করিলেও তাহা মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছায় না। ধূর্ত্ত

ব্রাহ্মণগণ স্বীয় জীবনোপায় বিধানার্থ এই সমস্ত শ্রাদ্ধাদির বিধান করিয়াছেন।

"ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ড ধূর্ত্ত নিশাচরাঃ।"

ভণ্ড, ধূর্ত্ত এবং রাক্ষস প্রকৃতির লোকেরাই বেদ সৃষ্টি করিয়াছে। বেদ ভণ্ডের সৃষ্টি কেন? "অশ্বস্যাত্র হি শিশ্নন্তু পত্নীগ্রাহ্যং প্রকীর্ত্তিতং।" অশ্বমেধ যজ্ঞে যজমান পত্নী অশ্ব শিশ্ন গ্রহণ করিবেন, এইরূপ বৈদিক বিধান ভণ্ড ভিন্ন আর কে করিতে পারে?

বেদ ধূর্ত্তের সৃষ্টি কেন? ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণগণ নিজের জীবনোপায় অর্জ্জনের জন্য স্বর্গ নরকাদির বিষয় লিখিয়া সরল মানবগণকে ভয় প্রদর্শন করিয়া তাহাদের দ্বারা শ্রাদ্ধ, যজ্ঞ, দানসাগর প্রভৃতি করাইয়া অর্থোপার্জ্জন করে। বেদ রাক্ষসের সৃষ্টি কেন? "মাংসানাং খাদনং তদ্বন্নিশাচর সমিরিত মিতি।"

বেদের যে অংশে মদ্য মাংস নিসেবনাদির বিধি আছে, তাহা নিশাচরের কল্পিত।

বেদে লিখিত আছে—পুত্রেষ্টিযাগ করিলে পুত্র জন্মে, কারীরী যাগ করিলে বৃষ্টি হয়, শ্যেন যাগ করিলে শত্রু নাশ হয়। তদনুসারে অনেকেই বহ্বায়ামলব্ধ অর্থাদি অপব্যয় করিয়াও ধূর্ত্ত ভণ্ডদিগের সুবিধার্থ ঐ সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন; কিন্তু কোন ফলই দৃষ্ট হয় না। বেদের এক স্থানে বিধি আছে—সূর্য্যোদয় হইলে অগ্নিহোত্র যাগ করিবে, অন্য স্থানে আছে—সূর্য্যোদয়ে হোম করিবে না। যে ব্যক্তি সূর্য্যোদয়ে হোম করে তাহার প্রদত্ত আহুতি রাক্ষসের ভোগ্য হয়। বেদে এই প্রকার অনেক নিরর্থক বাক্য ও প্রলাপোক্তি দেখা যায়। সুতরাং বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার করা যায় না।

এক কথায়, চার্ব্বাক দর্শন ইহ-সর্ব্বস্ববাদী ও দেহাত্মবাদী। মীমাংসা দর্শনে, ন্যায় দর্শনে ও অন্যান্য দর্শনে চার্ব্বাকের মত খণ্ডন করা হইয়াছে। দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব তত্ত্ববাদিগণ বিশদরূপে সপ্রমাণিত করিয়াছেন, তাহা ক্রমে কথিত হইবে। বেদান্তিগণ আত্মার পঞ্চকোষ ও সূক্ষ্মশরীর এবং কারণ শরীর বিশদ্ভাবে সপ্রমাণিত করিয়াছেন।

কেহ যেন এমত মনে না করেন যে, বৃহস্পতির মতানুসারী চার্ব্বাকের মত অতি সহজেই উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। মীমাংসা দর্শন বহু যুক্তিবলে

বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য সংস্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধ দর্শন ও পাশ্চাত্য দর্শন সমূহ কেহই বেদের স্বতঃপ্রমাণ্য স্বীকার করেন না। চার্ব্বাকদর্শন দেহকেই আত্মা বলেন, দেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। বর্ত্তমান যুগের জড়বাদীগণ ও বৈজ্ঞানিকগণও স্বতন্ত্র আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। এই পাশ্চাত্য জড়বাদী বৈজ্ঞানিকদিগের যুক্তি খণ্ডন করিবার জন্য দর্শন শাস্ত্র কত চেষ্টাই না করিতেছেন! বেদান্ত-দর্শন আত্মার পঞ্চকোষ ও স্থূলদেহ, সূক্ষ্মশরীর এবং কারণ শরীরের বিষয়ে হৃদ্‌বোধ জন্মাইবার জন্য অনন্য সাধারণ চেষ্টা করিয়াছেন, তৎক্রম নিম্নে প্রদর্শিত হইল। চার্ব্বাকগণ পুনর্জন্ম স্বীকার করেন না, অধুনাতন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের অনেকেই পুনর্জন্ম মানেন না। দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে এবং জীব এই স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া কোথায় কি ভাবে অবস্থান করে তাহা প্রদর্শন করিতে থিয়সফী সম্প্রদায়ের মনীষিগণ বিপুল চেষ্টা করিতেছেন। আত্মা কি পদার্থ ইহা অর্জ্জুনকে বুঝাইতে শ্রীকৃষ্ণ বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই জন্যই বলিতেছিলাম চার্ব্বাকের মত এক কথা উড়াইয়া দিবার নহে।

আত্মার পঞ্চকোষ।

"অন্নং প্রাণো মনো বুদ্ধিরানন্দশ্চেতি পঞ্চতে।
কোষাস্তৈরাবৃতঃ স্বাত্মা বিস্মৃত্যা সংসৃতি ব্রজেৎ॥"
"স্যাৎ পঞ্চীকৃতভূতাত্মো দেহঃ স্থূলোঽন্নসংজ্ঞকঃ।
লিঙ্গে তু রাজসৈঃ প্রাণৈঃ প্রাণঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহ॥"
"সাত্ত্বিকৈর্ধীন্দ্রিয়ৈঃ শাকং বিমর্ষাত্মা মনোময়ঃ।
তৈরেব শাকং বিজ্ঞানময়োধীর্নিশ্চয়াত্মিকা॥"
"কারণে সত্ত্বমানন্দময়ামোদাদিবৃত্তিভিঃ।
তত্তৎ কোষৈস্তু তাদাত্ম্যাদাত্মা তত্তন্ময়ো ভবেৎ॥"। পঞ্চদশী।

অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ, আনন্দ-ময় কোষ এই পাঁচটী আত্মার পঞ্চকোষ বা আচ্ছাদন। আত্মা এই পঞ্চ-কোষে আবৃত হইয়া নিজের স্বরূপ বিস্মরণপূর্ব্বক সুখ-দুঃখময় সংসারে ভ্রমণ করেন।

পঞ্চীকৃত—মহাভূত হইতে যে পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম অন্নময়কোষ। লিঙ্গশরীরের বা সূক্ষ্ম শরীরের অভ্যন্তরস্থ পঞ্চভূতের রজোগুণ হইতে উৎপন্ন পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ) সহিত বর্ত্তমান পঞ্চপ্রাণকে (প্রাণ, ব্যান, সমান, উদান, অপান) প্রাণময় কোষ বলে।

পঞ্চ মহাভূতের সত্ত্বগুণ হইতে উৎপন্ন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্) সহিত বর্ত্তমান সংশয়াত্মক মনকে মনোময় কোষ বলে এবং ঐ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বর্ত্তমান নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকে বিজ্ঞানময় কোষ বলে।

কারণ শরীরের অভ্যন্তরস্থ প্রমোদ, আমোদ, প্রীতি, হর্ষ, আহ্লাদ, আনন্দ প্রভৃতি বৃত্তিযুক্ত মলিন সত্ত্বগুণ বা অবিদ্যাকে আনন্দময় কোষ বলে। "অবিদ্যাই" কারণ শরীর। মায়া বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণাত্মিকা, অবিদ্যা মলিন সত্ত্বগুণাত্মিকা। অবিদ্যা মায়ার কণা, মায়া একা, সুতরাং ঈশ্বর এক। অবিদ্যা বহুল, সুতরাং জীব বহুল।

আত্মা যখন যে কোষে থাকেন তখন সেই কোষের অভিমান করেন, অর্থাৎ নিজের স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া নিজেকে সেই সেই কোষ হইতে অভিন্ন জ্ঞান করেন। এই জন্যই বলা যায়, অন্নময়কোষই আত্মা, প্রাণময় কোষই আত্মা, মনোময় কোষই আত্মা, বিজ্ঞানময় কোষই আত্মা, আনন্দময় কোষই আত্মা। এই পঞ্চকোষের পঞ্চব্যূহ ভেদ করিয়া আত্মা স্বরূপাবস্থা প্রাপ্ত হইলে অবিদ্যা নাশ পায়। আত্মা মুক্ত হয়েন।

পঞ্চীকৃত মহাভূত কাহাকে বলে? বিশুদ্ধ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম পাওয়া যায় না, ইহাদের পঞ্চীকরণ হইয়া যে অবস্থা হয়, তাহাকেই পঞ্চীকৃত মহাভূত কহে। পঞ্চীকরণের নিয়ম এইরূপ:—প্রথমে পঞ্চভূতের প্রত্যেককে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হয়; তৎপরে এই দুই ভাগের এক ভাগ ত্যাগ করিয়া অপর ভাগকে চারিভাগে বিভক্ত করিতে হয়। প্রত্যেক ভূতের প্রথমোক্ত অর্দ্ধাংশ ও অপর চারিভূতের শেষোক্ত অর্দ্ধাংশের চতুর্থাংশ অর্থাৎ দুই আনা অংশ একত্র মিশ্রিত করিলে এক এক পঞ্চীকৃত মহাভূত জন্মে।

অবিদ্যাই কারণ শরীর এবং অন্নময় কোষই স্থূল শরীর। সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ শরীর কাহাকে বলে? প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ মিলিত হইয়া সূক্ষ্ম শরীর গঠিত করে।

"বুদ্ধি কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রাণপঞ্চকৈর্ম্মনসা ধিয়া।
শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে ॥" পঞ্চদশী।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, এবং মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়ব সমষ্টির নাম সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গদেহ।

ব্রহ্মের একটী অঘটন-ঘটন-পটিয়সী শক্তি বা সৃষ্টিপ্রসবকারিণী মহাশক্তি আছে, তাহার নাম মায়া। মায়া সত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণাত্মিকা। সত্বগুণের কার্য্য প্রকাশ হওয়া, রজগুণের কার্য্য ক্রিয়ার প্রবৃত্তি, তমোগুণের কার্য্য নিষ্ক্রিয় অবস্থায় অবস্থান। ব্রহ্ম প্রকটিত হইবার সঙ্কল্প করিয়া রজগুণ প্রভাবে মহামানসাকারে বিবর্ত্তিত হইলেন। তাহা বিশ্লিষ্ট হইয়া পৃথক্ পৃথক্ চৈতন্যসত্বা বা মহামানসানু হইলেন। রজগুণ ও তমোগুণ প্রভাবে পৃথক পৃথক চৈতন্য সত্বার "অহং" তত্ব জন্মিল। ঐ অহং তত্বই অবিদ্যা বা কারণ শরীর। এই চৈতন্য সত্বা চিন্তাকারী সত্বা। প্রথমে মহত্তত্ব উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে সাত্বিক (বৈকারিক,) রাজসিক (তৈজস) ও তামসিক (ভৌতিক) অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। তামসিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ) উৎপন্ন হয়। পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) উৎপন্ন হয়। পঞ্চমহাভূত পঞ্চীকৃত হইয়া স্থূল দেহ উৎপন্ন হয়। রাজসিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। সাত্বিক অহঙ্কার হইতে মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়ের অধিষ্টাতৃদেবগণ উৎপন্ন হয়েন। পঞ্চভূতের সত্বগুণ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় জন্মে এবং তাহার সমষ্টি সত্বগুণ হইতে অন্তঃকরণ (মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার) বিকাশিত হয়। পঞ্চভূতের রজগুণ হইতে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় জন্মে এবং তাহার সমষ্টি রজগুণ হইতে পঞ্চপ্রাণ বিকাশিত হয়।

জীবের কারণ শরীর গঠিত না হইলে সূক্ষ্ম শরীর নির্ম্মিত হইতে পারে না, সূক্ষ্ম শরীর গঠিত না হইলে স্থূল শরীর গঠিত হইতে পারে না; কারণ শরীর

সূক্ষ্ম দেহের আত্মাস্বরূপ এবং সূক্ষ্মদেহ স্থূল শরীরের আত্মাস্বরূপ। সূক্ষ্মদেহ স্থূলদেহ হইতে বিচ্যুত হইলেই জীবের মৃত্যু হয়। জীবের স্থূলদেহ পাঞ্চভৌতিক, পঞ্চীকৃত ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম সমষ্টি। ক্ষিতি জাতীয় (solid) চর্ম্ম, মাংস, অস্থি। অপ্ জাতীয় (Liquid) রক্ত, রস, শুক্র। তেজ জাতীয় (heat) পিত্ত, জঠরাগ্নি। মরুৎ জাতীয় (Gaseous) শরীরাভ্যন্তরস্থ বায়ুর চলাচল, গতি-ক্রিয়া, ফুস্‌ফুসের ক্রিয়া, শিরাধমনী দিয়া রক্তের চলাচল, স্নায়ুর গতি, পরিপাক শক্তি, শুক্র ও মলমূত্রাদির গতি। ব্যোম জাতীয় (Ethereal Fluid) শরীরের মধ্যে শূন্য গহ্বরে শব্দ গুণ। পঞ্চ মহাভূতের মধ্য দিয়া প্রকাশ বিশেষে আত্মাকে ভূতাত্মা (Elemental Soul,) মহৎ (Intellectual Thinking Soul,) ক্ষেত্রজ্ঞ (Spiritual Soul) আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। একই আত্মার ভিতর সমস্ত গুণ নিহিত আছে, তবে কোন অবস্থায় অব্যক্ত, কোন অবস্থায় ব্যক্ত। জড় পদার্থেরও আত্মা আছে, তাহার একপ্রকার অনুভূতিও আছে, কিন্তু তাহা অস্পষ্ট। জড় পদার্থের মাধ্যাকর্ষণ, যোগাকর্ষণ, চুম্বকাকর্ষণ প্রভৃতি শক্তি আছে। জড়াত্মা ও মানসাত্মার মধ্যস্থলে সংযোগকারী প্রাণময় কোষ। এই প্রাণন ক্রিয়াই জড় ও মনকে সংযুক্ত করিয়া দেয়। প্রাণন ক্রিয়া করিতে হইলেই দেহে এক প্রকার যন্ত্র (organism) প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। জড়ে এই "অর্গ্যান্" বা দেহযন্ত্র নির্ম্মিত হয় না, উদ্ভিদে দেহযন্ত্র প্রথমতঃ নির্ম্মিত হয়। জড়ের ভিতর মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি শক্তি থাকিলেও উদ্ভিদের ভিতরই প্রথমতঃ যান্ত্রিক ক্রিয়ার বিকাশ হয়।

এই যান্ত্রিক ক্রিয়াময় কোষের নামই প্রাণময় কোষ। মানসাত্মা বা মহদাত্মার দুইটী স্তর আছে, যথা, (১) মনোময় কোষ (২) বিজ্ঞানময় কোষ। উপনিষদে মনকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, (১) অশুদ্ধ মন বা কাম, (২) বিশুদ্ধ মন বা বুদ্ধি। এই বিভাগ ক্রমে একই মানসাত্মা, মনোময় ও বিজ্ঞানময় (বুদ্ধি) কোষে বিভক্ত হইয়াছে। মনোময় কোষের কার্য্য ইচ্ছা বা কামনার উদ্রেক করা, এবং বিজ্ঞানময় কোষের কার্য্য জ্ঞান বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির উদ্রেক করা। জড়ের আকর্ষণী শক্তি, উদ্ভিদের যান্ত্রিক ক্রিয়োদ্দীপনী শক্তি, জীবের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির উদ্দীপনী শক্তি এবং মানবের

ইচ্ছার, সদিচ্ছা অসদিচ্ছা অনুসারে ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার শক্তি—আত্মার একই শক্তি। কোন বৃক্ষের প্রতি বা মানবদেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় সমস্ত বৃক্ষ বা মানবদেহই জীবিত। এই জীবন কি! এই জীবন অন্নময় কোষের বা স্থূল দেহেরই সারসংগ্রহ বা নির্য্যাস। সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া যে সূক্ষ্ম, স্বচ্ছ, সূত্রবৎ জীবানুর স্রোত নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে, তাহাই প্রাণময় কোষ। মানবের মস্তিষ্ক হইতে মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া যে সূক্ষ্ম, স্বচ্ছ, সূত্রবৎ স্নায়ুধারা প্রবাহিত হইতেছে এবং যাহা হইতে অসংখ্য সূত্রবৎ স্নায়ু উৎপন্ন হইয়া সমস্ত দেহকে পরিব্যাপ্ত করিয়াছে, তাহাই প্রাণময় কোষ। মানবের মস্তিষ্কই মনের আধার স্থান। মনের চিন্তা করিবার শক্তির জন্য মস্তিষ্করূপ "অর্গ্যান্" বা যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। মস্তিষ্ক-যন্ত্র হইতে মস্তিষ্কের ঊর্দ্ধভাগস্থ কোষ সমূহ (Cells) ও অধোভাগস্থ কোষ সমূহ (Cells) হইতে অসংখ্য সূত্রবৎ স্নায়ু সর্ব্ব শরীর ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে, তাহাই প্রাণশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির উপাধি। মস্তিষ্কের সহিত শরীরের অপর অংশের কোন স্নায়ুর সংযোগে বিচ্ছিন্ন করিলে, সেই অংশ অসাড় হয়, তাহার কোন অনুভূতি থাকে না। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রকার অনুভূতি বা বোধশক্তি আছে, এই বোধ প্রকাশক শক্তিকেই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা কহে। মস্তিষ্কই অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণের আবাসস্থল। উপনিষদে আছে ব্রহ্মার মানস-পুত্রগণ অথবা মানবের ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবগণ পশুদিগের শরীর বা ইন্দ্রিয়কে কুৎসিৎ (বিকাশের অনুপযুক্ত) দেখিয়া তাহাতে অধিষ্ঠান করিতে অসম্মত হন, তৎপর মানবদেহ বা ইন্দ্রিয় নির্ম্মিত হইলে তাঁহার অধিষ্ঠাতৃদেব হয়েন। ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবগণের আবশ্যকতা কি? বাহ্যপদার্থ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ দ্বারা জ্ঞাত হয়, ইহারা গ্রাহ্য। ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া ঐ রূপ রসাদি প্রবেশ করিলে পদার্থ জ্ঞাত হয়, ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানগ্রহণ শক্তি। ইন্দ্রিয়া-ধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ জ্ঞান-গ্রহণ-শক্তি বা গৃহীতা গ্রহণ, গ্রাহ্য ও গৃহীতা ভিন্ন কোন জ্ঞান জন্মে না। আত্মাই জ্ঞান গৃহীতা। গ্রাহ্য, গ্রহণশক্তি ও গৃহীতা ভিন্ন কোন জ্ঞান সম্ভবে না। জ্ঞানগ্রহণ শক্তির দ্বারা গ্রাহ্য ও গৃহীতার সংমিলনে যে সম্বন্ধ জন্মে তাহাই জ্ঞান। ইহা পরে স্পষ্টীকৃত হইতেছে।

চার্ব্বাক দর্শনের পরেই বৌদ্ধদর্শন ও শাঙ্কর দর্শনের বিষয় কথিত হইতেছে।

চার্ব্বাক দর্শন বেদ মানেন না বলিয়া নাস্তিক, বৌদ্ধদর্শনও বেদ মানেন না। শঙ্করাচার্য্য বুদ্ধদেবের অবতার এবং বৌদ্ধদর্শন ও শাঙ্করদর্শন প্রায় ঐক্যমত, এই জন্যই বৌদ্ধদর্শন ও শাঙ্করদর্শন একত্র কথিত হইতেছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীজানকীনাথ পাল শাস্ত্রী।

কস্তূরী প্রকরণম্।

কস্তূরী প্রকরঃ কৃপাকমল দৃগ্ গণ্ডস্থলে ষট্পদ,
ব্রাতঃ শাতসরোজ সুন্দররসে খড়্গাঃ স্মরধ্বংসনে।
কল্যাণদ্রুমসেচনে ঘনচয়ো লাবণ্য বল্ল্যঙ্কুরঃ,
কেশানাং নিচয়ঃ পুনাতু ভুবনং শ্রীনাভিসূনোর্লসন্।১॥

কৃপাকমল দৃগ্ গণ্ডস্থলে (কৃপা দয়ৈব, কমলদৃক্ পদ্মাক্ষী স্ত্রীত্যর্থঃ, তস্যা, গণ্ডস্থলে কপোল ফলকে) কস্তূরী প্রকরঃ (কস্তূর্য্যাঃ মৃগনাভিসম্ভূত গন্ধ দ্রব্য বিশেষাঃ, তাসাং প্রকরঃ সমূহঃ) শাতসরোজ সুন্দররসে (শাতং সুখং, তদেব, সরোজং পদ্মং, তস্য সুন্দর রসে, মনোহর মকরন্দে) ষট্পদব্রাতঃ (ভ্রমর সমূহঃ) স্মরধ্বংসনে (কামবিনাশনে) খড়্গাঃ (অসি) কল্যাণদ্রুমসেচনে (কল্যাণং মঙ্গলমেব, দ্রুমঃ বৃক্ষঃ, তস্য সেচনে, জলসেকে) ঘনচয়ঃ (মেঘসমূহঃ) লাবণ্যবল্ল্যঙ্কুরঃ (লাবণ্য বল্ল্যাঃ কান্তিলতায়াঃ, অঙ্কুরঃ প্ররোহঃ) শ্রীনাভিসূনোঃ (আদ্যতীর্থঙ্করস্য শ্রীমদৃষভ দেবস্য) এতাদৃক্, কেশানাং (মূর্দ্ধজানাং) নিচয়ঃ (সমূহঃ) লসন্ (দীপ্যমানঃ সন্) ভুবনং (জগৎ) পুনাতু (পবিত্রং করোতু) ।১॥

যাহা কৃপারূপ সুন্দরী কামিনীর গণ্ডস্থলে কস্তূরীতুল্য, সুখরূপ কমলের মনোহররসে ভ্রমরবৃন্দসদৃশ, কাম বিনাশনে অসিতুল্য, কল্যাণরূপ বৃক্ষের জলসেকে মেঘনিচয়সন্নিভ এবং কান্তিলতার অঙ্কুরস্বরূপ, ঋষভ দেবের সেই কেশসমূহ দীপ্যমান হইয়া জগৎ পবিত্র করুন।১॥

বাগ্দেবীবর বিত্ত বিত্তপতয়ঃ কারুণ্য পণ্যাপণ,
প্রাবীণ্য প্রসিতাঃ প্রসত্তি পটব স্তে সন্তু সন্তোময়ি।
আমোদঃ সরসীরুহামিব মরুৎপূরৈঃ প্রথাং প্রাপ্যতে,
যাচাং বিশ্বসভাসু যৈর্জড় ভুবামপ্যুল্লসদ্ভিগুণঃ।২॥

মরুৎপূরৈঃ (বায়ু প্রবাহৈঃ) সরসীরুহাং (পদ্মানাং) আমোদঃ (গন্ধঃ) ইব (যথা) প্রথাং (বিস্তৃতিং) প্রাপ্যতে (যায়তে) তথা, উল্লসদ্ভিঃ (দীপ্যমানৈঃ) যৈঃ সদ্ভিঃ জড়ভুবাং (জড়ঃ মূর্খ এব ভূঃ উৎপত্তি স্থানং যাসাং তাসাং মূর্খজন বিরচিতানামিত্যর্থঃ, অপি বাচাং গিরাং) গুণঃ (উৎকর্ষঃ) বিশ্বসভাসু (ভুবন সমাজেষু) প্রথাং (বিস্তৃতিং) প্রাপ্যতে (লভ্যতে) তে, বাগ্‌দেবীবর বিত্ত বিত্ত-পতয়ঃ (বাগ্‌দেব্যাঃ সরস্বত্যাঃ বর এব বিত্তং যেষাং তেষাং পূর্ব্বতন পণ্ডিতানাং কালিদাস প্রভৃতি নামিত্যর্থঃ বিত্তপতয়ঃ ধনাধিকারিণঃ) তথা কারুণ্যপণ্যাপণ প্রাবীণ্য প্রসিতাঃ (কারুণ্যং কৃপা তদেব পণ্যং বিক্রেয় বস্তু তস্যাপণং বিপণিঃ তত্র প্রাবীণ্যং প্রবীণত্বং তস্মিন্ প্রসিতাঃ আসক্তাঃ) সন্তঃ (সৎপুরুষাঃ) ময়ি (মাং প্রতি) প্রসত্তি পটবঃ (প্রসন্নাঃ) সন্তু (ভবন্তু) প্রসন্নাঃ সন্তঃ মদ্বচনানাং গুণান্ প্রখ্যাপয়ন্তু ইত্যাশয়ঃ।২॥

বায়ু প্রবাহ যেরূপ পদ্মের গন্ধ বিস্তার করে, সেইরূপ যাহারা বিশ্বসমাজে মূর্খ বিরচিত বাক্যেরও গুণ বিস্তার করিয়া থাকেন; সেই সকল সরস্বতীর বররূপ ধনের অধিকারী কালিদাস প্রভৃতি পণ্ডিতদিগের ধনে উত্তরাধিকারী আধুনিক পণ্ডিতগণ দয়াবিপণির প্রাধান্যভাগী সৎপুরুষগণ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥২॥

অমৃতমব্ধিসুতা চ দৃশোঃ সতাং বসতি চেতসি নিশ্চয় এষ নঃ।
বিবুধতা পুরুষোত্তমতাপি যৎ, স্থিতিমুপৈতি নরে তদূরীকৃতে ॥৩॥

সতাং (সৎপুরুষাণাং) দৃশোঃ (চক্ষুষোঃ) অমৃতং (সুধা) বসতি (অবতিষ্ঠতে) তথা, সতাং চেতসি (মানসে) অব্ধিসুতা (লক্ষ্মী) বসতীতি শেষঃ। এষঃ (অয়ং) নঃ (অস্মাকং) নিশ্চয়ঃ (স্থিরসিদ্ধান্তঃ) যৎ, যস্মাৎ, বিবুধতা (পাণ্ডিত্যং) পুরুষোত্তমতা (শ্রেষ্ঠ পুরুষত্বং) তদূরীকৃতে (তৈঃ সাধুভিঃ অঙ্গীকৃতে) নরে (পুরুষে) স্থিতিং (অবস্থানং) উপৈতি (গচ্ছতি)। সন্তঃ পাণ্ডিত্যং পুরুষোত্তম-ত্বঞ্চ লভন্তে ইতি ভাবঃ।৩॥

সৎপুরুষদিগের চক্ষুতে অমৃত এবং চিত্তে লক্ষ্মী বাস করেন, এই আমাদের নিশ্চয়; কারণ যাঁহারা তাঁহাদের সহবাসে থাকেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের হৃদয়স্থ লক্ষ্মী প্রেরিত সুধাসিক্ত দর্শনেই তৎক্ষণাৎ পাণ্ডিত্য (দেবভাব) ও পুরুষোত্তমত্ব (শ্রীকৃষ্ণত্ব) লাভ করেন ॥৩॥

সৌরভ্যাদিব সূন মোদনমিব স্বাদ,প্রসাদাদিহ,
স্নিগ্ধত্বাদিব গোরসং পিকযুবা সোৎকণ্ঠ কণ্ঠাদিব।
বাজিরাজি জবাদিবৌষধরসো দুর্ব্ব্যাধিরোধাদিব,
শ্লাঘামেতি জনো জনেষু নিতরাং পুণ্য প্রভাবোদয়াৎ ॥৪॥

ইহ (জগতি) সূনং (কুসুমং) সৌরভ্যাৎ (সুগন্ধিত্বাৎ) ইব, তথা ওদনং (অন্নং) স্বাদ প্রসাদাৎ (আস্বাদ সামর্থ্যাৎ) ইব, তথা গোরসং (দুগ্ধং) স্নিগ্ধত্বাৎ (রসবত্ত্বাৎ) ইব, তথা পিকযুবা (প্রৌঢ় কোকিলঃ) সোৎকণ্ঠ কণ্ঠাৎ (মধুর কণ্ঠস্বরাৎ) ইব, তথা বাজিরাজি (অশ্বসমূহঃ) জবাৎ (বেগবত্ত্বাৎ) ঔষধরসঃ (ভৈষজ্যং) দুর্ব্যাধিরোধাৎ (উৎকট পীড়া নিবারণাৎ) ইব, সর্ব্বত্র উপমার্থে ইব শব্দ প্রয়োগঃ। জনেষু (মানবসমাজেষু) জনঃ (নরঃ) পুণ্য-প্রভাবোদয়াৎ (ধর্ম্মপ্রভাব প্রকাশনাৎ) নিতরাং (অতিশয়েন) শ্লাঘাং (খ্যাতিং) এতি (প্রাপ্নোতি) ইহ জগতি যথা সৌরভ্যাদিভিঃ কুসুমাদয় খ্যাতিং লভন্তে তথা জনোঽপি পুণ্যপ্রভাবাৎ খ্যাতিং লভতে ইত্যাশয়ঃ ॥৪॥

এ জগতে যেমন সুগন্ধ হেতু কুসুম, সুস্বাদ হেতু অন্ন, স্নিগ্ধতা হেতু দুগ্ধ, মধুর কণ্ঠ হেতু কোকিল, বেগহেতু অশ্বনিচয় এবং উৎকট রোগ নিবারণ হেতু ঔষধ খ্যাতি লাভ করে ; সেইরূপ জনসমাজে পুরুষপুঙ্গব পুণ্য প্রভাবে খ্যাতি লাভ করিয়া থাকেন ॥৪॥

তোয়ৈরেব পয়োমুচাং ভবতি যন্নীরন্ধ্র নীরংসরঃ,
পাদৈরেব নভোমণের্ভবতি যল্লোকঃ সদালোকবান্।
তৈলৈরেব ভবেদভঙ্গুরতর জ্যোতির্ম্মণিঃ সদ্মনঃ,
পুণ্যৈরেব ভবেদভঙ্গবিভব ভ্রাজিষ্ণুরাত্মাত্র তৎ ॥৫॥

অত্র (জগতি) পয়োমুচাং (মেঘানাং) তোয়ৈঃ (জলৈঃ) এব সরঃ (সরসী) যৎ (যথা) নীরন্ধ্রনীরং (সম্পূর্ণ সলিলং) ভবতি, নভোমণেঃ (সূর্য্যস্য) পাদৈঃ (কিরণৈঃ) এব লোকঃ (ভুবনং) যৎ (যথা) সদা (সর্ব্বস্মিন্ কালে) আলোকবান (দীপ্তিমান্) ভবতি, তৈলৈঃ (তিলাদি সম্ভব স্নেহৈঃ) এব যথা সদ্মনঃ মণিঃ (গৃহস্থ মণিঃ প্রদীপ ইত্যর্থঃ) অভঙ্গুরতর জ্যোতিঃ (স্থির কান্তিঃ) ভবেৎ (স্যাৎ) তৎ (তথা) পুণ্যৈঃ (ধর্ম্মৈঃ) এব আত্মা (জীবঃ) অভঙ্গ বিভব

ভ্রাজিষ্ণুঃ (অভঙ্গঃ অক্ষতঃ বিভবঃ সম্পৎ, তেন ভ্রাজিষ্ণুঃ দীপ্তিমান্) ভবেৎ। মেঘ জলাদিভিস্তড়াগাদয় ইব পুণ্যৈরাত্মা বিরাজতে ইত্যাশয়ঃ ॥৫॥

এ জগতে মেঘের জলে সরসী যেমন সম্পূর্ণ সলিলা হয়, সূর্য্যে কিরণে যেমন জগৎ আলোকিত হয়, প্রদীপের দীপ্তি যেমন তৈল সম্পর্কে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেইরূপ পুণ্যপ্রভাবে জীবাত্মা অক্ষুণ্ণ বিভবে বিরাজমান থাকে ॥৫॥

ন বহু ধর্ম্ম বিনির্ম্মিতি কর্ম্মঠে মনুজ জন্মনি যৈঃ সুকৃতং কৃতং,
গৃহমুপেয়ুষি তৈরধনৈঃ স্থিতং ত্রিদশশাখিনি বাঞ্ছিতদায়িনি ॥৬॥

যৈঃ জনৈঃ বহুধর্ম্ম বিনির্ম্মিতি কর্ম্মঠে (বহু ধর্ম্মার্জ্জন সমর্থে) মনুজ জন্মনি (মনুষ্য যোনৌ) সতি সুকৃতং (পুণ্যং) ন কৃতং (ন সঞ্চিতং) তৈঃ, বাঞ্ছিত দায়িনি (স্বাভীষ্টফলপ্রদে) ত্রিদশ শাখিনি (সুরদ্রুমে কল্পবৃক্ষে ইত্যর্থঃ) গৃহং (স্বভবনং) উপেয়ুষি (সঙ্গতে) সত্যপি অধনৈঃ (নির্দ্ধনৈঃ) স্থিতং (অবস্থিতং) মনুষ্যজন্মলব্ধাপি সুকৃতানাদানং কল্পবৃক্ষং প্রাপ্য ধনাগ্রহণতুল্যমিত্যভিপ্রায়ঃ॥৬॥

যাঁহারা ধর্ম্মোপার্জ্জনক্ষম মনুষ্য জন্মলাভ করিয়াও ধর্ম্ম সঞ্চয় করেন না, তাঁহারা বাঞ্ছিত ফলদায়ক কল্পবৃক্ষ গৃহে পাইয়াও নির্দ্ধনাবস্থায় অবস্থিতি করেন। মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও ধর্ম্ম সঞ্চয় না করা আর কল্প বৃক্ষ প্রাপ্ত হইয়া ধন গ্রহণ না করা একই কথা ॥৬॥

ভোজ্যে নির্জ্জর রাজভোজ্য মধুরে হলাহলোঽক্ষেপি তৈ-
র্দুগ্ধে স্নিগ্ধরসে রসেন নিদধে তৈরালনালং জলং।
ক্ষিপ্তোচ্চৈঃ শিশিরে চ চন্দনরসে তৈরাত্ম গুপ্তা জড়ৈ-
র্যৈ ধর্ম্মেঽনবধানতা প্রবিদধে স্বর্গাপবর্গপ্রদে ॥৭॥

যৈঃ (জনৈঃ) স্বর্গাবপবর্গপ্রদে (স্বর্গ মোক্ষ প্রদায়কে) ধর্ম্মে অনবধানতা (প্রমাদঃ) প্রবিদধে (চক্রে) তৈঃ জড়ৈঃ (মূর্খৈঃ) নির্জ্জর রাজ ভোজ্যমধুরে (নির্জ্জরানাং দেবানাং রাজা অধিপতিঃ, দেবরাজ ইন্দ্র ইত্যর্থঃ তস্য ভোজ্যং সেব্যং তদ্বৎ মধুরে মিষ্টে, সুধাতুল্যে) ভোজ্যে (খাদ্যদ্রব্যে) হলাহলঃ (বিষং) অক্ষেপি (ক্ষিপ্তঃ) তথা রসেন (স্বাদেন) স্নিগ্ধরসে (সুরসে স্বাদুনি ইত্যর্থ) দুগ্ধে (পয়সি) আলনালং (হরিতালং) জলং (নীরং) নিদধে (বিক্ষিপে) তথা উচ্চৈঃ (অত্যন্তং) শিশিরে (শীতলে) চন্দনরসে (মলয়জে) আত্মগুপ্তা (দাহজনিকা

কাচিল্লতা) ক্ষিপ্তা (নিহিতা) স্বর্গ মোক্ষপ্রদে ধর্ম্মে অনবধানতা বিধানং অমৃত-তুল্য ভোজ্যাদৌ বিষাদি প্রক্ষেপ তুল্যমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৭॥

যে সকল মূর্খ স্বর্গাপবর্গপ্রদায়ক ধর্ম্মে অনবধান থাকে, তাহারা সুধা-সদৃশ মধুর ভক্ষ্য বস্তুতে বিষ প্রদান করে, স্নিগ্ধরস দুগ্ধে হরিতালাক্ত জল নিক্ষেপ করে, সুশীতল চন্দনরসে দাহজনক আত্মগুপ্তা * নামক বিষলতার রস নিক্ষেপ করিয়া থাকে। স্বর্গাপবর্গ প্রদায়ক ধর্ম্মে অনবধান থাকা, সুধাতুল্য খাদ্যে বিষাদি প্রক্ষেপ তুল্য ॥ ৭ ॥

শালং স্বর্গসদাং ছিনত্তি সমিধে চূর্ণায় চিন্তামণিং,
বহ্নৌ প্রক্ষিপতি ক্ষিণোতি তরণীমেকস্য শঙ্কোঃকৃতে।
দত্তে দেবগবীং স গর্দ্দভবধূগ্রাহায় গর্হাগৃহং,
যঃ সংসার সুখায় সূত্রিত শিবং ধর্ম্মাপুমাপুজ্ঝতি ॥ ৮ ॥

যঃ পুমান্ (পুরুষঃ) সংসার সুখায় (সাংসারিক সুখহেতবে) সূত্রিত শিবং (গ্রথিত কল্যাণ পরম্পরাকং), ধর্ম্মং, উজ্ঝতি (ত্যজতি) সঃ গর্হাগৃহং (নিন্দা-নিলয়ঃ) পুমান্ সমিধে (কাষ্ঠহেতবে) স্বর্গসদাং (দেবানাং) শালং (কল্পবৃক্ষং) ছিনত্তি (কৃন্ততি) তথা, চূর্ণায়-(তাম্বুলোপযোগিনে বস্তু বিশেষায়) চিন্তামণিং (রত্নশ্রেষ্ঠং) বহ্নৌ (অগ্নৌ) প্রক্ষিপতি (দদাতি) তথা, একস্য শঙ্কোঃ (কীলকস্য) কৃতে কীলকৈক নির্ম্মাণার্থং ইত্যর্থঃ। তরণীং (নাবং) ক্ষিণোতি (বিদীর্ণীকরোতি) গর্দ্দভ বধূগ্রাহায় (খরস্ত্রী গ্রহণায়) দেবগবীং (সুরভীং) দত্তে (দদাতি)। সংসার সুখায় ধর্ম্মত্যাগঃ কাষ্ঠাদি হেতবে কল্পবৃক্ষচ্ছেদনাদি সদৃশ ইত্যাশয়ঃ ॥ ৮ ॥

যে পুরুষ সংসার সুখের জন্য কল্যাণপরম্পরা অনুস্যূত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে, সেই নিন্দনীয় পুরুষাধম কাষ্ঠের জন্য কল্পবৃক্ষ ছেদন করে, চুণের নিমিত্ত অগ্নিতে চিন্তামণি নিক্ষেপ করে, একটী খিল নির্ম্মাণের জন্য একখানি নৌকা খণ্ড খণ্ড করে এবং গর্দ্দভীর জন্য সুরভী প্রদান করে। সংসার সুখের জন্য ধর্ম্মত্যাগ এবং কাষ্ঠাদির জন্য কল্পবৃক্ষ ছেদন করা সমান কথা ॥ ৮ ॥

ভূয়াংসঃ প্রমদা কটাক্ষ বিশিখৈর্বিদ্ধা স্মরা সঙ্গিনঃ,
সন্ত্যেকে চ সহস্রশঃ শ্রিতধনাঃ সক্ষোভ লোভাকুলাঃ।

---

* আত্মগুপ্তা বঙ্গদেশে বিছুটী নামে পরিচিত।

এতদ্দান নিদানমত্র সুকৃতং মত্বা সৃজন্তি ত্রিধা,

যেঽত্যর্থং পুরুষার্থ মন্যমনিশং তে কেঽপ্যনলেপতরাঃ ॥ ৯ ॥

অত্র (জগতি) প্রমদা কটাক্ষ বিশিখৈঃ (প্রমদানায় স্ত্রীণাং কটাক্ষাঃ অপাঙ্গাব লোচনানি ত এব বিশিখাঃ বাণাঃ তৈঃ) বিদ্ধা (পীড়িতাঃ) অতএব স্মরাসঙ্গিনঃ (কামাশ্রিতাঃ) ভূয়াংসঃ (বহবঃ) জনা ইতি শেষঃ; সন্তি (ভবন্তি) একে (অপরে) শ্রিতধনাঃ (শ্রিতং আশ্রিতং ধনং যস্ম যৈ স্তে ধনিন ইত্যর্থঃ)। সহস্রসঃ (সহস্র শব্দাদ্ বহ্বর্থে "শস্‌প্রত্যয়") সক্ষোভলোভাকুলাঃ (ক্ষোভেন সহ বর্ত্তমানো যঃ লোভঃ তেনাকুলাঃ) সন্তীতি ক্রিয়য়াম্বয়ঃ। ধনবন্তোঽপি ধনান্বেষণায়ৈ লোভপরতন্ত্রা ইত্যর্থঃ। কিন্তু যে দান নিদানং (দানমেব নিদানং কারণং যস্ত তৎ) এতৎ সুকৃতং পুণ্যং, তয়ো কামার্থয়োঃ উৎপাদক পুণ্যস্ত একমাত্রং দানমেব কারণমিত্যে তৎ শব্দেন সূচিতং। ইতি মত্বা (জ্ঞাত্বা) অনিশং (অজস্রং) অত্যর্থং (ভূয়ঃ) অন্যং (অপরং) ত্রিধা (কায়েন বাচা মনসাপি ধর্ম্মরূপং পুরুষার্থং) সৃজন্তি (সম্পাদয়ন্তি) তে তাদৃশা জনা ইতি শেষঃ। কেঽপি অনলেপতরাঃ (অত্যল্প সংখ্যকাঃ) সন্তি। ইহ জগতি অর্থ-কামোন্মত্তা বহবঃ পুরুষাঃ সন্তি ধর্ম্মৈক তৎপরাস্তু দুর্লভা ইতি ভাবঃ॥ ৯॥

প্রমদা দিগের কটাক্ষ বিশিখ দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া যাহারা কামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, এ জগতে তাহাদের সংখ্যা অনেক, ধনী হইয়াও ধনের নিমিত্ত পরশ্রীকাতরতা ও লোভে একান্ত অধীর হইয়া পড়িয়াছে, এরূপ লোকের সংখ্যাও জগতে অত্যধিক। যাহারা সেই ধর্ম্ম ও কাম যাহা হইতে উৎপন্ন সেই পুণ্যের দানই একমাত্র কারণ মনে করিয়া অনবরত তিনপ্রকারে (বাক্মনকায় দ্বারা) ধর্ম্মরূপ শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থের সেবা করিয়া থাকেন, এ জগতে তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প ॥ ৯ ॥

মণিরিব রজঃপুঞ্জে কুঞ্জে বনে চর গহ্বরে,

পুরমিব তরুচ্ছায়া নচ্ছায়য়া বিব নিস্তরৌ।

জড়িম কুসুমারামে গ্রামে সভেব বচস্বিনাং,

কথমপি ভাবে ক্লেশাবেশে মতিঃ শুচিরাপ্যতে॥ ১০ ॥

রজঃ পুঞ্জে (ধূলিপটলে) মণিঃ (রত্নং) ইব, বনেচর গহ্বরে (অরণ্যবাসিভিঃ পশ্বাদিভিঃ সেবিত ইতি শেষঃ, গহ্বরঃ গুহা যত্র তস্মিন্) কুঞ্জে (লতাবৃক্ষসঙ্কুল

কাননে) পুরঃ (নগরং) ইব, নিস্তরৌ (বৃক্ষরহিতে) মরৌ (মরুভূমৌ) অনচ্ছা (অনির্ম্মলা কৃষ্ণেত্যর্থঃ) ছায়া (অনাতপস্থানং) ইব, জড়িম কুসুমারামে (জড়িম জাড্যং তদেব কুসুমং পুষ্পং তস্যারামঃ উপবনং তাদৃশোপবনস্বরূপে জড়জন সেবিতে ইত্যর্থঃ) গ্রামে (পল্ল্যাং) বচস্বিনাং (বাগ্মিনাং) সভা (সমিতিঃ) ইব, সর্ব্বত্র সাদৃশ্যে ইব শব্দঃ। ক্লেশাবেশে (ক্লেশসঙ্কীর্ণে) ভবে (সংসারে) শুচিঃ (শুদ্ধা) মতিঃ (বুদ্ধিঃ) কথমপি (কৃচ্ছ্রাদেব, ন তু অনায়াসেনেত্যর্থঃ) আপ্যতে (লভ্যতে) ক্লেশাকুলে সংসারে শুদ্ধামতি দুর্লভা ইতি ভাবঃ ॥১০॥

ধূলীপটলে মণি, সিংহ প্রভৃতি বনচরদিগের বাসোপযোগী গহ্বরবিশিষ্ট কুঞ্জে নগর, তরুহীন মরুভূমিতে তরুচ্ছায়া এবং মূর্খতা পুষ্পের উপবন স্বরূপ গ্রামে বাগ্মীর সভা যেমন দুর্লভ, সেইরূপ দুঃখ-শোক-সঙ্কীর্ণ সংসারে বিমলমতি ব্যক্তিও দুর্লভ॥ ১০ ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীক্ষেত্রনাথ সেন।

---

* বঙ্গদেশে জৈনধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের অসদ্ভাব নাই, অথচ জৈনধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক একখানিও নাই। হেম বিজয় গনি নামধেয় জনৈক জৈন সাধক প্রণীত "কস্তুরী প্রকরণং" নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ কোন প্রকারে আমার হস্তগত হইয়াছে। ১৮২টী শ্লোকে এই পুস্তকখানি সম্পূর্ণ। রংপুর প্রবাসী শ্রীযুক্ত ফুসরাজ চোপড়া নামক আমার একটী বিদ্যোৎসাহী জৈন বন্ধু তত্রস্থ তাজহাট ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংস্কৃত শিক্ষক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গোস্বামী ব্যাকরণ ও পুরাণতীর্থ মহাশয়ের দ্বারায় পুস্তকখানি অনুদিত করাইয়াছেন এবং প্রসিদ্ধ পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক টীকা ও অনুবাদ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। তবে বিশেষ প্রয়োজন বোধে স্থানে স্থানে অনুবাদ পরিবর্ত্তিত হইয়া মাত্র।

গ্রন্থকর্ত্তা ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় সম্রাট সর্ব্বজনপ্রিয় প্রজাহিতৈষী আকবরের সমসাময়িক। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার যেমন অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ও পাণ্ডিত্য, দর্শন শাস্ত্রেও তদ্রূপ অধিকার ছিল। গ্রন্থখানিতে ভাষার সৌন্দর্য্য ও ভাবের প্রগাঢ়তা দেখিলে সহজেই তাহা অনুমিত হয়। নীরস নীতি ও দর্শনের আলোচনা করিতে গিয়া তিনি যে মাধুর্য্যের সমাবেশ করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই অতি সুন্দর, আর একটু বিশেষত্ব এই যে সাম্প্রদায়িকতা নাই ; সুতরাং সকলেরই আদরণীয়।

পঞ্চীকরণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

শ্রুত্বা তদ্বাচং হি বৈ রৌদ্রং স্মৃত্বা তদ্বাক্যেনতীর্ত্বা তৎ সৌর্য্যাং হি বৈ গত্বাশ্রমং পুণ্যতমং হি বৈ নত্বা মুনিং শ্রেষ্ঠতমং হি বৈ রৌদ্রং চেতি। ৬।

সামর্থ্যবোধক কৃষ্ণবাক্য শ্রবণে নিশ্চিতরূপে জানিয়া গোপীসকলে দুর্ব্বাসাকে স্মরণ করিয়া গমন করিলেন এবং কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী বলিয়া যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া, রৌদ্রাশ্রম, অর্থাৎ পুণ্যতম দুর্ব্বাসাশ্রম প্রাপ্তা হইলেন; মুনি কীদৃশ, না রৌদ্র, অর্থাৎ রুদ্রাংশ সম্ভূত শ্রেষ্ঠতম মুনিকে প্রণাম করিলেন।

দত্ত্বা অস্মৈ ব্রাহ্মণায় ক্ষীরময়ং ঘৃতময়ং মিষ্টতমং হি বৈ॥ ৭॥ মিষ্টতমং স হি বৈ তুষ্টঃ সন্বো ভুক্ত্বাতিত্বাশিষং প্রয়োজ্যাম্বাজ্ঞাং ত্বদাৎকথং যাস্যাম স্তীর্ত্বা সৌর্য্যাং। ৮। সহোবাচ মুনিং দুর্ব্বাসিনং মাং স্মৃত্বা বোদাসন্তীতিমার্গং॥৯॥

অনন্তর গোপীগণেরা ঐ দুর্ব্বাসাকে মিষ্টতম ক্ষীরময়, ঘৃতময়, আহারীয় দ্রব্য ভোজন করাইলেন। সুস্বাদু মিষ্টতম দ্রব্য ভোজন করত পরম তুষ্ট হইয়া মুনি আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং গমনেরও আজ্ঞা দিলেন। গোপিকারা কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক কহিলেন, হে প্রভো! গম্ভীর জলা যমুনা পার কি প্রকারে হইব, মুনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আগমন কালে কিরূপে পার হইয়াছ, গোপীরা কহিলেন যে কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, এই উক্তি করাতে যমুনা পথ দিয়াছিলেন; তচ্ছ্রবনে মুনি কহিলেন, এইক্ষণে তোমরা যমুনাতীরে গিয়া কহ, যে নিরাহারী দুর্ব্বাসা মুনি আমাদিগকে পাঠাইলেন, এতৎ শ্রবণে যমুনা তোমাদিগকে মার্গ দিবেন।

তাসাং মধ্যে হি শ্রেষ্ঠা গান্ধর্ব্বীহ্যুবাচ তং হি বৈতাভিরেবং বিচার্য্য॥ ১০॥ কথং কৃষ্ণো ব্রহ্মচারী কথং দুর্ব্বাসিনোমুনিঃ॥ ১১॥ তাং হি মুখ্যাং বিধায় পূর্ব্ব মনুকৃত্বা তুষ্ণীমাসুঃ॥ ১২॥

সকল গোপীকা মধ্যে গান্ধর্ব্বী নামে কোন শ্রেষ্ঠা গোপী, সকল গোপীর সহিত বিচার করিলেন যে, দুর্ব্বাসাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ও দুর্ব্বাসাই বা নিরাহারী কি প্রকারে হইলেন। দুর্ব্বাসা প্রতি শঙ্কাযুক্ত হইয়া কহিলেন যে, দুর্ব্বাসাকে কি প্রকারে জিজ্ঞাসা করা যায়; এতৎ বিচার করত

গান্ধর্ব্বীকে অগ্রে করিয়া অন্যান্য গোপীসকল পশ্চাৎ রহিলেন এবং দুর্ব্বাসাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী আর আপনিই বা নিরাহারী কি প্রকারে হইলেন? এই পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসু হওয়াতে মুনি উত্তর করিলেন, গোপীদিগের অভিপ্রায় এই যে, আমাদিগের দত্ত ক্ষীরান্ন সাক্ষাৎ ভোজন করিয়া দুর্ব্বাসা অভোক্তা কিরূপে হইলেন, এবং সহস্র সহস্র গোপী সঙ্গ করিয়াই বা কৃষ্ণ কি প্রকারে জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী হইলেন? কিন্তু মিথ্যাও কহিতে পারি না, যেহেতু অগাধা যমুনা সরণী প্রদান করিয়াছেন, এতৎ সংশয় নিবারণার্থে মুনি কহিতেছেন, যথা।—

শব্দ বানাকাশঃ। ১৩॥ শব্দাকাশাভ্যাং ভিন্নস্তাস্মিন্নকাশে তিষ্ঠতি আকাশ স্তং ন বেদ স হি আত্মাহং কথং ভোক্তা ভবামি॥

আত্মনিষ্ঠ দুর্ব্বাসা মুনি, অর্থাৎ ভূত ভৌতিকাদির অন্তর্যামী পরমাত্মারূপ কৃষ্ণের অক্রিয়ত্ব জানিয়া এবং আপনাকে তন্নিষ্ঠ বোধে কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ও দুর্ব্বাসা অভোক্তা গোপীগণের নিকট ঈশ্বরকে লক্ষীকৃত করত কহিতেছেন। যেমন শব্দবান আকাশ অর্থাৎ শব্দগুণযুক্ত আকাশ, আকাশ ও শব্দ, এতদুভয় হইতে বিলক্ষণ প্রত্যগাত্মস্বরূপ, অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর ঐ শব্দবান আকাশে অবস্থিতি করিতেছেন, কিন্তু আকাশ তাঁহাকে জানে না, সকলের সাক্ষীভূত সেই পরমাত্মে অভেদ হইয়া আমি কিরূপে ভোক্তা হইব, এতদভিপ্রায়, তন্নিষ্ঠ অভেদজ্ঞ হইলে ইন্দ্রিয়াদি গুণে লিপ্ত হয় না, তাহাতে স্বয়ং কৃষ্ণে কি প্রকারে ইন্দ্রিয় গুণ বর্ত্তিতে পারে, সুতরাং কৃষ্ণে ব্রহ্মচারী শব্দ দোষাবহ হয় না, তবে গোপীসঙ্গ জন্য চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়বান্ বলিয়া গোপীদিগের অবশ্য ভ্রম হইতে পারে, তাহাতে এই শ্রুতিতে এবং অন্যান্য ভূরি ভূরি শ্রুতিতেও সংশয়চ্ছেদ করিয়াছেন; যখন শব্দবান্ আকাশে অধিষ্ঠিত পরমাত্মাকে আকাশ জানিতে পারে না, তখন নিতান্ত সকলের বিলক্ষণ যে শ্রীকৃষ্ণ তৎসহবাসিনী সকামা, অভিলাষবতী অর্থাৎ ভোগেচ্ছুকা মুগ্ধা গোপিকারা তাঁহার স্বরূপ কিরূপে জানিতে পারেন, পুনরপি তদনুশাসন করিয়াছেন।

স্পর্শবান্ বায়ু স্পর্শ বায়ুভ্যাং ভিন্ন স্তস্মিন্ বায়ৌ তিষ্ঠতি
বায়ু র্নবেত্তস্তং সহ্যাত্মাহং কথং ভোক্তা ভবামি॥ তাপনীয়ং।

স্পর্শগুণ বিশিষ্ট বায়ুঃ—স্পর্শ ও বায়ু হইতে ভিন্ন যে পরমাত্মা, তিনি বায়ুতে এবং স্পর্শেতে অধিষ্ঠান করিতেছেন, কিন্তু বায়ু তাঁহাকে জানিতে পারেন না, সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ যদ্যপিও গোপীদিগের সহিত বাস করিতেছেন, কিন্তু গোপীরা তাঁহাকে জানিতে পারেন না, অতএব সেই আত্মাতে তন্ময় হইয়া আমি কিরূপে ভোক্তা হইলাম।

রূপবদিদং হি 'তেজঃ রূপাগ্নিভ্যাং ভিন্নস্তাস্মিন্নগ্নৌ তিষ্ঠতি অগ্নি র্নবেদস্তং হি সহাত্মা কথং ভোক্তা ভবামি॥

রূপ গুণ বিশিষ্ট অগ্নিঃ—অগ্নি ও রূপ হইতে ভিন্ন যে আত্মা অগ্নিতে অধিষ্ঠান করিতেছেন, অগ্নি তাঁহাকে জানেন না, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকারে তোমাদিগের জ্ঞেয় হইবেন এবং তন্নিষ্ঠ ও তন্ময়তা প্রযুক্ত আমিই বা কিরূপে ভোক্তা হইলাম।

রসবত্য আপঃ রসাম্ভসো ভিন্নস্ত্বপ্সু ভি তিষ্ঠতি তং,
হ্যাপোনবিদুঃ সহাত্মাহং কথং ভোক্তা ভবামি॥

রস গুণ বিশিষ্ট জলঃ—রস ও জল হইতে ভিন্ন যে আত্মা জলে অধিষ্ঠান করেন, জল তাঁহাকে জানেন না, ইহাতে গোপী সহচারক কৃষ্ণকে গোপীরা কিরূপে জানিতে পারেন, সুতরাং তন্নিষ্ঠ তৎপরায়ণ এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞ ও তন্ময় হইয়া আমি কি প্রকারে ভোজন করিলাম।

গন্ধবতীয়ং ভূমির্গন্ধভূমিভ্যাং ভিন্নস্তস্যাং ভূমৌ তিষ্ঠতি,
ভূমির্নবেদস্তং হি সহাত্মা কথং ভোক্তা ভবামি॥ ১৪॥

গন্ধ গুণ বিশিষ্টা ভূমিঃ—ভূমি ও গন্ধ হইতে ভিন্ন যে আত্মা ভূমিতে এবং গন্ধেতে অধিষ্ঠান করেন, ভূমি তাঁহাকে জানেন না, ইহাতে সর্ব্ব সাক্ষীভূত আত্মা যে শ্রীকৃষ্ণ' তাঁহাকে গোপীরা কিরূপে জানিতে পারেন এবং তদাত্মনিষ্ঠ অভেদজ্ঞ হইয়া আমিই বা কিরূপে ভোক্তা হইব। এস্থলে দুর্ব্বাসা এই অভিপ্রায়ে কহিয়াছিলেন, যে জগদীশ্বর হইতে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে, অথচ তিনি কর্ম্মী নহেন, ইহা স্বরূপতঃ না জানিয়া যাঁহারা আমি কর্ত্তা, আমি সুখ দুঃখ ভোক্তা অভিমান করেন, তাঁহারাই তৎকর্ম্ম ভোক্তা হয়েন; যে সাধকেরা ঈশ্বরৈকনিষ্ঠ অভেদজ্ঞ এবং তৎকর্তৃত্ব প্রতি নির্ভর করিয়াছেন, তাঁহারা শুভাশুভ কোন কর্ম্মেই ভোক্তা নহেন।

ইদং হি মনন্তেষেবং হি মনুতে॥ ১৫॥ তানিদং হি গৃহ্লাতি॥ ১৬॥ যত্র সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তত্র বা কুত্রমনুতে ক বা গচ্ছতীতি সহাত্মাহং কথং ভোক্তা ভবামি॥ ১৭॥

আমি কর্ত্তা, আমি সুখী, আমি দুঃখী ইত্যাদি প্রত্যয়, শুদ্ধ অহঙ্কার বশে হয়, অর্থাৎ মায়াভিভূত হইয়া মনের এই প্রতীতি হয়, যখন চিৎ সন্নিধানে গতি হয় অর্থাৎ অদ্বৈত জ্ঞানের উদয় হয়, তখন ভোক্তেতর বলিয়া আপনাকে জানে, সুতরাং আপনাতে ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি দ্বারা আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিলে কর্ম্মজন্য শুভাশুভ ফলে লিপ্ত হয় না; যেহেতু শব্দাদি প্রত্যয় শুদ্ধ মনের ধর্ম্ম, জ্ঞান সন্নিধানে ভেদ প্রতীতির বিচ্ছেদ প্রযুক্ত সোহং জ্ঞানে তন্ময় হইয়া যায়, তত্ত্বমস্যাদি লক্ষণে সকল পদার্থকেই ব্রহ্ম দেখে; অতএব আমি কিরূপে ভোজন করিলাম, এবং সাক্ষাৎ পরমাত্মা কৃষ্ণইবা তোমাদিগের সহিত কিরূপে ক্রীড়া করিলেন? তবে শ্রীকৃষ্ণের সক্রিয়ত্ব এবং অক্রিয়ত্ব উভয় দর্শন, জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর পক্ষে কহিয়াছেন, অনাত্মজ্ঞানিরা কৃষ্ণের মনুষ্য স্বভাব দর্শনে মনুষ্য বলিয়া উহা করে, কিন্তু আত্মতত্ত্বজ্ঞান দশায় সাধকেরা কৃষ্ণের নিষ্ক্রিয়ত্ব দৃষ্টে ব্রহ্মরূপ দর্শন করেন, এ কারণে ভেদ প্রত্যয় নিবারণার্থে, অভেদ প্রত্যয় জন্মিবার নিমিত্তে কৃষ্ণের রূপদ্বয়ের কারণ শ্রুতিতে কহিয়াছেন।

আত্মজ্ঞানদশাতে ভ্রমাত্মক সংসারে কদাপি জীব ভ্রাম্যমান হয় না, যাবৎ দৃষ্টিদোষ থাকে, তাবৎ রজতে শুক্তিভ্রম, রজ্জুতেঃ সর্পভ্রম হয়; সংসার বিষয়ক ভেদ প্রত্যয় শুদ্ধ অজ্ঞান দ্বারা প্রবৃত্ত হয়, অনিবৃত্তিও প্রত্যাশায় আত্মাতে ভোক্তৃত্ব অধ্যাসের বিচ্ছেদ জন্মে না, কার্য্য কারণ সাক্ষীভূত নিবৃত্তাভিমান আত্মা, আপনাকে জানিলে সর্ব্বাভিমানের বিরাম হয়, সুতরাং আমি কি প্রকারে ভোজন করিলাম, "জ্ঞানিত্বাদভোক্তৃত্বমিতি"—দুর্ব্বাসা জ্ঞানী, এতদর্থে তাঁহার অনাহারিত্ব সিদ্ধ হইল; "কৃষ্ণোপিকিং তথৈবেত্যাশঙ্ক্য তস্য তু সর্ব্বাধিষ্ঠান ভূতত্বান্নভোক্তৃত্ব মিত্যত আহ অয়ংহীতি"। তবে শ্রীকৃষ্ণও কি তদ্রূপ দুর্ব্বাসার ন্যায় জ্ঞানী, তদর্থে গোপী সঙ্গ করিয়াও অভোক্তারূপে ব্রহ্মচারী উক্তি করিয়াছিলেন, এতদাশঙ্কা নিবারণার্থে, তাঁহার সর্ব্বাধিষ্ঠান ভূতত্ব প্রযুক্ত ঈশ্বর বলিয়া অভোক্তৃত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যথা :—

অয়ং হি কৃষ্ণো যো বো হি প্রেষ্ঠঃ শরীরদ্বয় কারণং ভবতি॥১৮॥ তাপনীয়ং।

দুর্ব্বাসা গোপীদিগকে কহিতেছেন, যে এই শ্রীকৃষ্ণ যিনি তোমাদিগের প্রিয়, যাঁহাকে তোমরা প্রিয়তম স্বজন বলিয়া জান, ইনিই পরমাত্মা, পরম কারুণিক, নিত্য সত্য মুক্তস্বভাব পরমেশ্বর, শরীরদ্বয় কারণ, অতএব ইঁহাতে শুভাশুভ কোন কর্ম্মই লিপ্ত হয় না, তবে যে ইঁহাকে ভোক্তারূপে দেখিতেছ, সে ভ্রান্ত, মায়াবৃত চক্ষু প্রযুক্ত তোমাদিগের ভ্রম মাত্র, যথা।

দ্বৌ সুপর্ণৌ ভবতো ব্রহ্মণোহংশভূতস্তথেতরো ভোক্তা ভবতি অন্যোহি সাক্ষী ভবতীতি ॥ ১৯ ॥

অন্তর্য্যামিরূপে সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠান প্রযুক্ত ভোক্তা কৃষ্ণ, যেহেতু এতৎ সংসারে ব্রহ্মরূপদ্বয় অঙ্গীকার করিয়াছেন; ইহা অধ্যাত্ম বিষয়ে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে, জীব ও ঈশ্বর পক্ষিধর্ম্মিরূপে সহচারী, অর্থাৎ সখাভাবে বর্ত্তিত, কিন্তু জীবভূত ব্রহ্মাংশ ভোক্তা, তদিতর ঈশ্বর সাক্ষীভূত, কেবল ঈক্ষণ মাত্র করেন, বস্তুতঃ তিনিই শ্রীকৃষ্ণ, কোন রূপেই ভোক্তা নহেন, তথাহি।

বৃক্ষধর্ম্মৌ তৌ তিষ্ঠতঃ অতো ভোক্তা ভোক্তারৌ ॥ ২০ ॥ পূর্ব্বোহি ভোক্তা ভবতি তথেতরোঽভোক্তা কৃষ্ণো ভবতীতি ॥ ২১ ॥

যদি এমত আশঙ্কা কর যে, ঈশ্বরের পক্ষিত্ব এবং বৃক্ষধর্ম্মত্ব কি প্রকারে সম্ভব হয়, তন্নিরাস করিয়া শ্রুতি কহিয়াছেন, নিত্য বিনাশি সংসারকে অশ্বত্থ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, (নিত্য বিনাশির এই অর্থ, "নশ্বঃস্থাস্যতীতি অশ্বত্থ" থাকে না কল্য যে পদার্থ, তাহাকে অশ্বত্থ কহে; অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ড দৈনন্দিন প্রলয়ে ব্রহ্মার প্রতি দিবস বিনাশ হয়, এ কারণ নিত্য বিনাশী কহে,) সেই অশ্বত্থাখ্য সংসার বৃক্ষে পক্ষিধর্ম্মী পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়ে অধিষ্ঠান করিতেছেন, এ কারণ অনীশ্বর প্রসঙ্গ জন্য ঈশ্বরকে ভোক্তা বলে, বস্তুত তিনি কোন বিষয়েই ভুক্ত নহেন।

তথাহি পূর্ব্বোহি ভোক্তা ভবতি তথেতরোঽভোক্তা কৃষ্ণো ভবতীতি ॥২২॥

জীব ভোক্তা হয়েন, তাঁহা হইতে ভিন্ন বিলক্ষণ পরমাত্মা ভোক্তা নহেন, ইহাতে জীব যে আত্মা নহেন, এমত আশঙ্কা করিও না, "জল শরাবস্থিতং চন্দ্রমিব" এক ঈশ্বর মায়াতে প্রতিবিম্বিত হয়েন, যদ্রূপ জলশরাবে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র জলকম্পে কম্পিত হয়, বস্তুত চন্দ্রের কম্পত্ব নাই, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের ক্রিয়াকারকত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে, ফলতঃ কৃষ্ণের নিষ্ক্রিয়ত্ব সর্ব্ব শাস্ত্রেই কহি-

য়াছেন, পূর্ব্বে ইহার অনেক প্রমাণ দিয়াছি, তথাহি,

অত্র বিদ্যা বিদ্যেন বিদামোবিদ্যা বিদ্যাভ্যাং ভিন্নঃ বিদ্যাময়োহি যঃ স কথং বিষয়ী ভবতীতি ॥২৩॥

ঈশ্বরের অভোক্তৃত্ব বিষয়ের কারণ এই যে, অবিদ্যা বিষয়ক ভোক্তৃত্ব রহিত জন্য কৃষ্ণের অভোক্তৃত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে, বিদ্যাময় ঈশ্বর, অর্থাৎ যে পরমেশ্বর হইতে বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ের উৎপত্তি, সেপরমেশ্বরে কি প্রকারে অবিদ্যা প্রভাব সম্ভব হয়, অতএব বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয় হইতে ভিন্ন পরমেশ্বর; যথা মৃত্তিকা ও মৃত্তিকার ঘটাদিবৎ বিষয়ী নহেন, বাহ্য ভেদদৃষ্টি বিষয়ক অবিদ্যা, অন্তঃকরণ বৃত্তি বিষয়ক বিদ্যা, এতদুভয় প্রকাশক ঈশ্বরকে বিদ্যাময় কহে, অতএব এতদ্রূপ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে কি প্রকারে সংসারধর্ম্মী জ্ঞান করিতেছ, সর্ব্ব কামদ পরমেশ্বর ভক্তানুকম্পী সাধকের অভিলাষ পূরণার্থে স্বয়ং অকামী হইয়াও কামীর ন্যায় কামুকের কামনা পূরণ করেন, তদর্থে শ্রুতি কহিয়াছেন।

যে ব্যক্তি আত্ম সুখাভিলাষে বিষয় গ্রহণ করেন, তাঁহাকে কামী অর্থাৎ বিষয়ী বলা যায়; অকামত (অনিচ্ছা পূর্ব্বক) বিষয় গ্রহণে তাঁহাকে অকামী বলিয়া স্বীকার করে, তাহাতে সর্ব্বকামদ ঈশ্বর স্বাশ্রিত ব্যক্তি অর্থাৎ যাহারা পূর্ব্ব তপস্যায় বশীকৃত করিয়াছে তাহাদিগের কামনা পূরণার্থে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ীর ন্যায় সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন, ইহা বহুতর শ্রুতিতেও অনুশাসন করিয়াছেন। যথা, "একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান" ইতি। তিনি এক কিন্তু বহুলোকের কর্ম্মানুরূপ বহুফলের বিধান করেন এতদর্থে ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে যে তিনি ভক্তবৎসল, সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম স্বরূপী তাঁহার সুখ দুঃখ নাই, কেবল ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য এই মর্ত্তালীলা প্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাতে মনুষ্যবৎ শুভাশুভ কর্ম্ম লিপ্ত হইতে পারে না।

জন্ম জরাভ্যাং ভিন্নঃ স্থানুরয় মৃচ্ছেদ্যোয়ং যোসৌ সৌর্য্যে তিষ্ঠতি। যোসৌ গোষু-তিষ্ঠতি। যোসৌ গোপালঃ গাঃ পালয়তি। যোসৌ গোপেষু তিষ্ঠতি। যোসৌ সর্ব্বেষু বেদেষু তিষ্ঠতি। যোসৌ সর্ব্বৈ বেদৈর্গীয়তে। যোসৌ সর্ব্বেষু ভূতেষ্বাদিশ্য ভূতানি বিদধাতি। সবো স্বামী ভবতি ॥২৪॥

সর্ব্ব বিকার শূন্য শ্রীকৃষ্ণ ভাব অর্থাৎ রূপদ্বয় দ্বারা জগদ্ব্যাপ্তময় হইয়াছেন,

তিনি অচ্ছেদ্য অদাহ্য অশোষ্য, অপচ্য, স্থাণুবৎ নিত্যস্থায়ী, জন্মজরাদিতে ভিন্ন, অপক্ষয় অর্থাৎ বিনাশ শূন্য আত্মা কৃষ্ণরূপ, স্থাণু শব্দে উক্ত হইয়াছে, এবং গোবিন্দ ও গোপালাদি নামে শ্রীকৃষ্ণ এবং তিনিই আত্মারূপে জগদ্ব্যাপ্ত, যথা সৌম্যে অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলে যিনি বিদ্যমান আছেন তাঁহাকে গোবিন্দ কহি, গো শব্দে ধেনু, তাহাতে বিদ্যমান. এজন্য গোবিন্দ শব্দ আখ্যাত হয় ; পুনরপি গোপশরীরে বিদ্যমান নিমিত্ত গোবিন্দ শব্দ বাচ্য হয় ; গো শব্দে বেদ, তদধিষ্ঠাতা, এতদর্থে গোবিন্দ বিখ্যাত হয় ; গো শব্দার্থে বেদ, তৎকর্তৃক বেদ্য অর্থাৎ সকল বেদেই যাঁহাকে গান করেন, তিনি গোবিন্দ ; গো শব্দে নিধন, যিনি স্থাবর জঙ্গমাদি সর্ব্বভূতে মৃত্যুরূপে আবিষ্ট হইয়া সর্ব্বভূতের মৃত্যু বিধান করিতেছেন তাঁহাকে গোবিন্দ কহে ; যে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বভূতে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা নানারূপে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগের কামনানুসারে স্বামী হইয়াছেন, অতএব তোমরা কৃষ্ণভোক্তা বলিয়া বৃথা আশঙ্কা করিতেছ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅপূর্ব্ব কৃষ্ণ শর্ম্মা।

বিজ্ঞান—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

কয়েক বৎসর অতীত হইল, "ম্যাঞ্চেষ্টার একজামিনার" (The Manchester Examiner) নামক পত্রিকায় "দিব্যদণ্ড" (The Divining Rod) পরিচালনা দ্বারা পার্ব্বত্য প্রদেশের ভূগর্ভস্থ জল নির্ণয়ের সফলতা সম্বন্ধে একটী সংবাদ বাহির হয়। সেই সংবাদটীর মর্ম্ম এই যে, মিড্‌ল্যাণ্ড রেলওয়ে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের "স্লেলটন্ ওয়াগন ওয়ার্কস্" নামক কারখানায় স্থায়ী জল-সরবরাহ করিতে যাইয়া "দিব্যদণ্ডের" প্রয়োগ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। উক্ত কারখানায় প্রতিদিন ৫।৬ শত গ্যালন জলের প্রয়োজন হইত ; কিন্তু কারখানার প্রাঙ্গণভূমিতে যে একটী প্রাচীন বৃহৎ কূপ ছিল, তাহা হইতে প্রতিদিন উহার অর্দ্ধেক পরিমাণ মাত্র জল পাওয়া যাইত। এই অবশিষ্ট জলের সরবরাহ নিমিত্ত কর্তৃপক্ষগণকে হয় আরও কয়েকটী কূপ খনন করিতে হইত, কিম্বা পিটার-বার্গ নামক দূরবর্ত্তী স্থান হইতে বহু ব্যয়সাধ্য কল বসাইয়া জল আনিতে হইত। প্রথম উপায়টী অপেক্ষাকৃত সহজবোধে গৃহীত হওয়ায়, প্রাঙ্গণের দুই বিভিন্ন স্থানে অনেক অর্থব্যয়ে আরও দুইটী নূতন কূপ খনন করা হইল, কিন্তু এই দুয়ের একটীতেও জল উঠিল না। তখন

কর্ত্তৃপক্ষগণ এইরূপ অযথা অর্থব্যয়ে অনিচ্ছুক হইয়া স্থানীয় প্রসিদ্ধ "দিব্যদণ্ডীকে" আহ্বান করিলেন। অগ্রভাগে দুইটী অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশাখা-সমন্বিত, হ্যাজেল বৃক্ষের একটী ছোট শাখাই এই দণ্ড। এই প্রশাখা দুইটী দুই হস্তে ধারণপূর্ব্বক সমস্ত শাখাটীকে উর্দ্ধদিকে লম্বভাবে উত্তোলন করিয়া সেই দণ্ডী উক্ত প্রাঙ্গণে চলিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরিক্রমণের পর দেখা গেল যে, উর্দ্ধস্থিত শাখাগ্রভাগটী হটাৎ প্রবলবেগে আপনা হইতে নিম্নাভিমুখে মৃত্তিকার দিকে অবনত হইতে আরম্ভ করিল। তখন দণ্ডী অতি দৃঢ়তার সহিত বলিলেন এই চিহ্নিত স্থানে অবশ্যই প্রচুর পরিমাণে জল সঞ্চিত আছে। এইরূপে আঙ্গিনার আরও একাংশে উক্ত দণ্ড প্রয়োগ দ্বারা ঠিক পূর্ব্বোক্তরূপে জল-স্থান নিরূপিত হইল। উভয় স্থানই খনন করিয়া দেখা গেল দণ্ডীর কথা সর্ব্বাংশে সত্য। উভয় স্থানেই প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত জলের দুইটী বৃহৎ কূপ নির্ম্মিত হইল। এই অপূর্ব্ব ব্যাপার অবলোকন করিয়া সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্য হইতে অনেকেই ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য উক্ত দণ্ড নিজ নিজ হাতে ধারণপূর্ব্বক আঙ্গিনায় পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহাদের হাতে এই দণ্ডটী কিছুমাত্রও বিচলিত হইল না; সকলকেই বিফলমনোরথ হইয়া নিরস্ত হইতে হইল।

সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ বরাহমিহির প্রণীত "বৃহৎসংহিতা" নামক গ্রন্থে এতাদৃশ বহুল উপাদেয় বিষয় বর্ণিত আছে। উহাতে নভোমণ্ডলস্থ মেঘমালার প্রকৃতি, গতি ইত্যাদির সম্বন্ধে বর্ণনা হইতে ভূগর্ভস্থ স্তর-নিহিত দ্রব্য সমূহের তথ্য নিরূপণ পর্য্যন্ত সমস্তই ধারাবাহিকরূপে উক্ত হইয়াছে।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, (১) উক্ত দণ্ডের সঙ্গে ভূমধ্যস্থ স্তরনিহিত জলের কি সম্বন্ধ হইতে পারে? (২) যদি দণ্ডের সঙ্গে বাস্তবিকই জলের কোন নিগূঢ় সম্বন্ধ থাকিয়া থাকে, তবে তাহা অন্য ব্যক্তির হাতে সফল হয় না কেন? (৩) যে সকল ব্যক্তি সচরাচর এইরূপ দণ্ড পরিচালন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে কখনই আধ্যাত্মিক জ্ঞানে চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী লোক অপেক্ষা খুব উন্নত বোধ হয় না, সুতরাং তাঁহারা কিরূপে এই অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন? আমরা অতি সংক্ষেপে এই তিনটী প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে চেষ্টা করিব। (১) আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়া থাকেন যে, এই সৌরজগতের (Solar system) অভিব্যক্তির পূর্ব্বে সমস্ত পদার্থই একমাত্র সৌর শক্তিতে অন্তর্নিহিত ছিল, কালে তাহা ভিন্ন ভিন্ন গ্রহ ও তদন্তর্গত অসংখ্য পদার্থরূপে বিভক্ত হইয়া জগতের বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতেছে, যাহা এক সময় কেবল নীহারিকাগত (Nebular) ছিল, তাহাই কালক্রমে বিভিন্ন, স্থূলবস্তু রূপে ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহা হইলে, জড় বিজ্ঞানেও দেখা গেল যে, সমস্ত নামরূপগত পদার্থের বিশেষ বিশেষ শক্তির সহিত একটী নির্ব্বিশেষ শক্তির নিগূঢ় সাধারণ সম্পর্ক রহিয়াছে। এই কারণ-শক্তিতে সমস্ত পদার্থই স্ব স্ব "তান্মাত্রিক" ও "তাত্ত্বিক" ভেদ হইতে মুক্ত হইয়া এক অখণ্ড বিশুদ্ধ সাম্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে। উন্নত মহাপুরুষেরা এই বিশুদ্ধ সর্ব্বগত নির্ব্বিশেষ অচিন্ত্য প্রাণ শক্তিতে নিত্যযুক্ত হইয়া সমস্ত জগতের সাধারণ সম্পর্ক

পর্য্যবেক্ষণ, আয়ত্বাধীন ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। এই মহা-পুরুষদেরই কৃপায় তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত প্রণালীতে বিধিপূর্ব্বক যুক্ত হইয়া অন্যান্য উপযুক্ত সাধারণ লোকেও এইরূপ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। এই ঘটনায় জলের কারণ-ভূমিতে যুক্ত হইয়া উহার অতি সূক্ষ্ম তান্মাত্রিক স্পন্দনে দণ্ডী নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। তাহাতে তাঁহার সঙ্গে যুক্ত হইবার জন্য ভূপঞ্জরাভ্যন্তরবর্ত্তী জলের প্রবল সংসক্তি জন্মিয়া থাকে। প্রাণের যে প্রবল সংসক্তিধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া মাতৃহারা বৎস গোচারণ মাঠের সহস্র সহস্র গাভীর মধ্য হইতে নিজ জননীর সঙ্গলাভ করিয়া থাকে, প্রাণের সেই সংসক্তি ধর্ম্ম বশতঃই ভূগর্ভস্থ জল তাদাত্ম্যগত দণ্ডীকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। (২) যদিও এইরূপ দণ্ড, প্রাণশক্তির সুপরিচালক করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ প্রণালীতে শোধন করিয়া নির্ম্মাণ করিতে হয়, তথাপি দণ্ডের নিজের কোন বিশেষ শক্তি নাই। উহা কেবল তদবস্থাপন্ন দণ্ডীর সহিত যুক্ত থাকিবার কালেই ঘটিকাযন্ত্রের কাঁটার ন্যায় অবস্থা বিশেষ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে মাত্র; সুতরাং বিশেষ অবস্থাপন্ন দণ্ডী হইতে বিযুক্ত হইয়া অন্য সাধারণের হস্তে অর্পিত হইলে, তখন উহার ফল নির্দ্দেশ করিবার শক্তি থাকিতে পারে না। (৩) এই দণ্ডীর ন্যায় ব্যক্তিরা প্রায়ই কোন না কোন সম্যকদর্শী মহাপুরুষের বা তাঁহার কোন শিষ্যের প্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। সেই মহাপুরুষ তাঁহার আয়ত্ব অখণ্ড জ্ঞানের একাংশ মাত্র লোকহিতের জন্য কোন কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রয়োগ সহিত প্রদান করিয়া থাকেন। ইঁহাদিগকে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম মাত্র পালন করিয়া, বিশুদ্ধ প্রাণশক্তির উপযুক্ত পরিচালক হইবার জন্য সযত্নে অবস্থান করিতে হয়। ইঁহারা অখণ্ড সম্যকজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়াই, আধ্যাত্মিক উন্নত জ্ঞানে অধিকারী হইতে সক্ষম হন না। পক্ষান্তরে তাঁহারা সেই আংশিক জ্ঞানমাত্র লাভ করিয়া তাহা যথোপযুক্ত নিষ্ঠার সহিত প্রয়োগ করেন বলিয়াই, কেবল সেই সেই খণ্ড জ্ঞানে সুন্দর ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া থাকেন। যেমন কোন ঘড়ি মেরামতকারী পরিদোলকের উচ্চ গণিততত্ত্ব (Pendulum theory) বিষয়ে কিম্বা কোন ধাত্রী (Mid-wife) শরীরতত্ত্ব (Physiology) বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হইয়াও, অভিজ্ঞের নিকট হইতে তত্তৎ বিষয়ের অংশ মাত্র শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া, কেবল সমগ্র বিষয়টীর সঙ্গে পরিজ্ঞাত অংশের সামঞ্জস্য রক্ষার নিয়ম পালন পূর্ব্বক, নিজ নিজ ব্যবসায়ে দক্ষতা লাভ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই দণ্ডীর ন্যায় লোকেরাও প্রাণ-শক্তির সাধর্ম্ম্য প্রতিপাদক অখণ্ড জ্ঞানের সঙ্গে ঐক্য রাখিবার নিয়মাবলী মাত্র পালন করিয়া এইরূপ খণ্ডজ্ঞান প্রয়োগ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত হইয়া থাকেন।
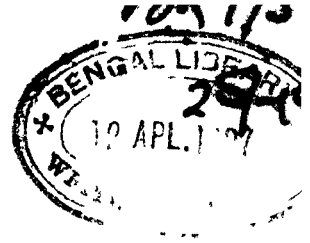
১০ম ভাগ। } পৌষ, ১৩১৩ সাল। { ৯ম সংখ্যা।

চৈতন্য কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

শাঙ্কর ভাষ্য ও রামানুজ ভাষ্যের সামঞ্জস্য
এবং
চৈতন্যদেব কথিত সূত্রের প্রকৃত অর্থ।

রামানুজ স্বামী একবার প্রাচীন বৃত্তির দোহাই দিয়া শঙ্করাচার্য্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলে, ভেদ, ভেদাভেদ ও অভেদ লইয়া হুলস্থূল পড়িয়া গেল। স্বামী মধ্বাচার্য্য দ্বৈতবাদ মতে সূত্রের ভাষ্য করিলেন।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ঈশ্বরপুরীর শিষ্য। ঈশ্বরপুরী মধ্বাচার্য্যের শিষ্য প্রণালীর মধ্যে। এই জন্য অনেকে চৈতন্যদেবকে মধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায়ভুক্ত বলেন। এটী এক ভুল সংস্কার। কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে শঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায়ভুক্ত বলিলেও চলে। পুরী সম্প্রদায়ও শঙ্করাচার্য্য প্রবর্ত্তিত "দশনাম" সন্ন্যাসীর মধ্যে। বাস্তবিক চৈতন্য-

দেবের শিক্ষা স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র না হইলে, তাঁহার আবির্ভাবের কোন প্রয়োজন ছিল না।

উদিপি নগরে মধ্বাচার্য্যের প্রধান স্থানে মধ্ব-সম্প্রদায়ী আচার্য্যের সহিত মহাপ্রভু বিচার করিয়াছিলেন।

মুক্তি, কর্ম্ম দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ,
সেই দুই স্থাপ তুমি সাধ্য সাধন।
সন্ন্যাসী দেখিয়া মোরে করহ বঞ্চন,
না কহিলা তেঞি সাধ্য সাধন লক্ষণ।
শুনি তত্ত্বাচার্য্য হৈলা অন্তরে লজ্জিত,
প্রভুর বৈষ্ণবতা দেখি হইলা বিস্মিত।
আচার্য্য কহে তুমি যে কহ সেই সত্য হয়,
সর্ব্বশাস্ত্রে বৈষ্ণবের এই সুনিশ্চয়।
তথাপি মধ্বাচার্য্য যৈছে করিয়াছে নির্ব্বন্ধ,
সেই আচরিয়ে সবে সম্প্রদায় সম্বন্ধ।
প্রভু কহে কর্ম্মী জ্ঞানী দুই ভক্তি হীন,
তোমার সম্প্রদায়ে দেখি সেই দুই চিন।
সবে এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়ে,
সত্য বিগ্রহ ঈশ্বর করহ নিশ্চয়ে। চৈ, চ, মধ্যলীলা ৯ পঃ।

এইত মহাপ্রভুর মধ্বাচার্য্যের সহিত সম্বন্ধ। বাস্তবিক, দ্বৈতবাদ মহাপ্রভুর অভিপ্রেত নহে। সেইজন্য দ্বৈত ভাষ্য বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। প্রকাশানন্দ স্বামীর সহিত বিচার করিতে মহাপ্রভু তাঁহার অভিপ্রেত সূত্রার্থের সূচনা করিয়াছিলেন।

"ব্রহ্ম" শব্দ মুখ্য অর্থে কহে "ভগবান্"
চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ সমান।
তাঁহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার।
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া কহে নিরাকার।
চিদানন্দ দেহ তাঁর স্থান পরিবার
তাঁরে কহে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার।

তাঁর দোষ নাহি তিঁহ আজ্ঞাকারী দাস
আর যেই শুনে তার হয় সর্ব্বনাশ।
বিষ্ণু নিন্দা আর নাহি ইহার উপর
প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর।
ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জ্বলিত জ্বলন
জীবের স্বরূপ যেন স্ফুলিঙ্গের বাণ।
জীবতত্ত্ব হৈতে কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান
গীতা বিষ্ণু পুরাণাদি ইহাতে প্রমাণ।

"অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা"—এই সূত্রে ব্রহ্মের অর্থ নির্গুণ ব্রহ্ম নহে। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ ভগবান। এই সম্বন্ধে রামানুজ ও চৈতন্যদেবের মত এক। কিন্তু ভগবানের বর্ণনা সম্বন্ধে দুয়ের মত ভিন্ন। চৈতন্যদেবের মতে ভগবানের এক নির্ব্বিশেষ আর এক সবিশেষ ভাগ, প্রকার বা অংশ। নির্ব্বিশেষ ভাগ, শঙ্করাচার্য্যের নির্গুণ ব্রহ্ম। সবিশেষ ভাগ চিদানন্দময় ব্রহ্মের দেহ। এই দেহের পরিণাম প্রকৃতি। কিন্তু ভগবানের দেহ প্রাকৃতিক নহে। প্রাকৃতিক মায়া গুণময়ী। ভগবানের দেহ গুণাতীত। তবে সে দেহ কি? সৎ, চিৎ, আনন্দ রূপ অথবা শুদ্ধ সত্ত্ব। এই শুদ্ধসত্ত্ব প্রাকৃতিক সত্ত্ব নহে। প্রাকৃতিক সত্ত্ব রজোগুণবিদ্ধ ও তমোগুণবিদ্ধ। গুণের তারতম্য অনুসারে প্রাকৃতিক সত্ত্বের বিকার হয়। ভগবানের দেহ গুণাতীত শুদ্ধ সত্ত্বে নির্ম্মিত।

দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মমমায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

গুণময়ী প্রাকৃতিক মায়াকে অতিক্রম করিয়া যাহারা ভগবান্‌কে আশ্রয় করে তাহারা শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত হয়। "তাঁহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার"—অর্থাৎ ভগবানের সচ্চিদানন্দ রূপ দেহ। "চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া কহে নিরাকার"—অর্থাৎ চিদ্বিভূতিময় দেহ স্বীকার না করিয়া ভগবান্‌কে নিরাকার বলে।

চিদানন্দ দেহ তাঁর স্থান পরিবার
তাঁরে কহে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার।"

ভগবানের দেহ, ভগবানের স্থান বা বৈকুণ্ঠ ভগবানের পরিবার, এ সকল

চিদানন্দময়। শঙ্করাচার্য্য যে ঈশ্বরের দেহকে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার কহেন এবং ঈশ্বরকে প্রাকৃতিক মায়া উপহিত কহেন সে নিতান্ত ভুল। "বিষ্ণু কলেবর" প্রাকৃত নহে।

জীবতত্ত্ব ঈশ্বরতত্ত্ব হইতে স্বতন্ত্র নহে। ঈশ্বরতত্ত্ব যেন জ্বলিত অগ্নি। জীব সেই অগ্নির স্ফুলিঙ্গ। অগ্নি ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গে যে ভেদ, ঈশ্বর ও জীবে সেই ভেদ।

শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।

রামানুজ ও চৈতন্যদেব উভয়ের মতে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান্ একই তত্ত্ব।

রামানুজের মতে ব্রহ্ম চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বররূপে ত্রিধা। চৈতন্যদেবের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ, সগুণ, নির্ব্বিশেষ, সবিশেষ রূপে দ্বিধা। শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্ম কেবল মাত্র নির্গুণ অতএব অসম্পূর্ণ।

বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান্
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য পূর্ণ পরতত্ত্ব ধাম।
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য তাঁর নাহি মায়াগন্ধ
সকল বেদের ভগবান্ সে সম্বন্ধ।
তাঁরে নির্ব্বিরোধ কহি চিচ্ছক্তি না মানি
অর্দ্ধ স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি।

ব্রহ্মের এই স্বরূপ বর্ণনা উপনিষদ্ ও গীতার সহিত সঙ্গত এবং শঙ্করাচার্য্যের বর্ণনার সহিত একেবারে বিরুদ্ধ নয়। অর্দ্ধ স্বরূপ ত্যাগ করিয়া শঙ্করাচার্য্যকে ঐন্দ্রজালিক মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

রামানুজের ব্রহ্মে নির্গুণতার স্থান নাই। এই জন্য তাঁহার ব্রহ্ম ও শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্ম অত্যন্ত বিরুদ্ধ; রামানুজের মতে জীব ও ব্রহ্মের প্রকার ভেদ অনাদি এবং তাহাদের সাযুজ্য সম্ভবপর নহে। চৈতন্যদেবের মতে ভেদ কেবল অংশ অংশীর ভেদ, এবং সাযুজ্য বা একত্ব সম্ভবপর বটে কিন্তু প্রার্থনীয় নয়। ভাগবতেও একত্বের কথা আছে। তবে এই যে সাযুজ্য মুক্তি, ইহার স্থান নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, সবিশেষ ব্রহ্ম নহে।

সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য প্রকার
চারি মুক্তি দিয়া করে জীবের নিস্তার।

ব্রহ্ম সাযুজ্য মুক্তের তাঁহা নাহি, গতি
বৈকুণ্ঠ বাহিরে তা সবার হয় স্থিতি।
বৈকুণ্ঠ বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল
কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভায় পরম উজ্জ্বল।
সিদ্ধ লোক নাম তার প্রকৃতির পার
চিৎস্বরূপ তাঁহা নাহি চিচ্ছক্তি বিকার।
সূর্য্যমণ্ডল যেন বাহিরে নির্ব্বিশেষ
ভিতরে সূর্য্যের রথ আদি সবিশেষ।

জীব ও ব্রহ্মের কল্পিত ভেদ গীতার সম্মত নহে, অংশগত ভেদ গীতার সম্মত। তথাপি "একত্ব" "সাযুজ্য" বা "নির্ব্বাণমুক্তি" দুই পক্ষেই সম্ভব পর। ভাগবতের মতে, চৈতন্যদেবের মতে সেবার জন্য, ভক্তির জন্য মুক্তি প্রার্থনীয় নয়।

পরিণাম বাদ সম্বন্ধে রামানুজ ও চৈতন্য একমত।

ব্যাসের সূত্রেতে কহে পরিণাম বাদ।
ব্যাস ভ্রান্ত বলি তাহা উঠাইল বিবাদ।
পরিণাম বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী
এত কহি বিবর্ত্তবাদ স্থাপনা যে করি।
বস্তুত পরিণাম বাদ সেই ত প্রমাণ।
দেহে আত্ম বুদ্ধি এই বিবর্ত্তের স্থান।

আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন। প্রতি জন্মে আত্মার দেহ পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু আমরা ভ্রম বশতঃ দেহে আত্ম বুদ্ধি করি। এই ভ্রম জ্ঞান বিবর্ত্ত বশতঃ। কিন্তু রজ্জুতে সর্পের ন্যায় ব্রহ্মে জগৎ বিবর্ত্ত নহে। তবে কি ব্রহ্ম বিকারী। চৈতন্যদেব বলেন—

অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্
ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম।
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি।
নানারত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে

তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ্ অবিকৃতে।
প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্য শক্তি হয়
ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তি ইথে কি বিস্ময় ?

চিদ্বিভূতি রূপ ঈশ্বরের যে দেহ, সেই দেহে জ্ঞান শক্তি, ইচ্ছা শক্তি, ক্রিয়া শক্তি এই তিন মূর্ত্য শক্তি বিরাজ করিতেছে। যখন 'একোহহং নানা স্যাম' ঈশ্বরের এই ইচ্ছা হয়, তখনই তাঁহার অনন্ত জ্ঞানে বিশ্বের ছায়া উদ্ভূত হয় এবং তাঁহারই ক্রিয়া শক্তি বলে চিদ্বিভূতির একাংশের পরিমাণ হইয়া জগতের সৃষ্টি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঈশ্বরের দুই প্রকার; নির্ব্বিশেষ or spirit aspect এবং সবিশেষ or matter aspect : এই সবিশেষ or matter aspect কে চৈতন্যদেব চিদ্বিভূতি বা শুদ্ধ সত্ব বলেন। পরিণাম চিদ্বিভূতেতে হয়। কিন্তু সে পরিণাম প্রাকৃতিক বিকার নহে। সে পরিমাণ চিদ্বিভূতি অবলম্বন করিয়া ইচ্ছায় জগতের আবির্ভাব। জগতের জ্ঞান হইতেই জগতের সৃষ্টি। ইহাকে Pure Idealism বলা চলে। ইচ্ছায় জগতের জ্ঞান, জ্ঞান হইতে বিচিত্র Idea, Idea হইতে ক্রিয়া শক্তিবলে সৃষ্টি।

এই সবিশেষ নির্ব্বিশেষ ভাগ দ্বারা ব্রহ্ম দুই নহেন। তিনি একমেবা দ্বিতীয়ম্। এই দুই ভাগ তাঁহার প্রকার or aspect মাত্র। নির্ব্বিশেষ aspect নির্গুণ; তাহাতে কোন বিশেষ বা ভেদ নাই। এই aspect কেবল abstraction মাত্র। সেই abstraction সমভাবে সকল পদার্থেই আছে অথচ কোন পদার্থ দ্বারা লিপ্ত নহে। শঙ্করাচার্য্য এই নির্গুণ aspectসম্বন্ধে যথেষ্ট বলিয়াছেন। চৈতন্যদেবকে সে সম্বন্ধে কিছু বলিতে হয় নাই। কিন্তু সবিশেষ সগুণ aspect সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা একরূপ নূতন। নূতন হইলেও গীতা ভাগবতে তাহার যথেষ্ট সূচনা রহিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

পরলোকের কথা।

আজকাল শিক্ষিত সমাজের অনেকেই পরলোক বিষয়ে অল্পাধিক পরিমাণে আলোচনা করিতেছেন। আত্মা বা চৈতন্য এই স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়া কোথায় প্রস্থান করে অর্থাৎ মৃত্যুর পর আমাদের আত্মা কি ভাবে কোথায় কোন্ রাজ্যে বিচরণ করে, তথায়, কি আকার ধারণ করে এবং কি প্রকারে কত দিনই বা ঘুরিয়া বেড়ায়— তাহা জানিতে বা শুনিতে প্রত্যেক ব্যক্তিরই কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ সম্বন্ধে চাক্ষুষ প্রমাণ কেহই দিতে পারেন না। আমাদের পূর্ব্বতন মুনি ঋষিগণ যোগাশ্রয়ে এই পরলোকের নানা রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া গিয়াছেন। পাতঞ্জল যোগ শাস্ত্রে এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন হিন্দু মুনিঋষিগণের গবেষণার বিষয় এস্থলে উল্লেখ করা আমার উদ্দেশ্য নাই, বর্ত্তমান কালের দুই একটী কথা বলাই আমার আকাঙ্ক্ষা।

সভ্য জগতের মধ্যে আমেরিকাই পরলোক তত্ত্ব বিষয়ে অধিক অগ্রসর হইয়াছে। তথায় নানাস্থানে psychical Research Society বা ঐরূপ অন্য কোন নামে অভিহিত বহুতর পরলোকতত্ত্বান্বেষী সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আমেরিকার রোচেষ্টার (Rochester) নগরে কেবল এই বিষয়েরই একটী বিশ্ব-বিদ্যালয় (Uneiversity) স্থাপিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধ লেখক উক্ত বিশ্ব বিদ্যালয়ের Junior correspondence Course এর একজন ছাত্র। আমি উক্ত বিশ্ব বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের প্রেরিত পুস্তক ও বক্তৃতাদি পাঠ করিতেছি। পরলোক সম্বন্ধীয় নানা তত্ত্ব তাঁহারা লিখিয়া পাঠাইতেছেন। দুই বৎসর পর আমায় পরীক্ষা দিতে হইবে। সেকথা যাক্ পাশ্চাত্য দেশে পরলোক বিষয়ক বহুতর পত্রিকাও আছে, তাহা হইতে নানা অদ্ভুত রহস্য অবগত হওয়া যায়। আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে এ বিষয়ের তেমন কিছু আলোচনা হয় নাই বা হইতেছেনা। তবে কলিকাতার থিওসফিকাল সোসাইটী ঠিক এই বিষয় না হোক্, এই ধরণের আলোচনা করিতেছেন।

সম্প্রতি অমৃতবাজার পত্রিকার সুবিখ্যাত সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় 'The Hindu spiritual Magazine' নাম দিয়া গত মার্চ্চ মাস হইতে ইংরাজিতে হিন্দু পরলোক তত্ত্ব বিষয়ক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শিশির বাবুর এ উদ্যম এদেশে সম্পূর্ণ অভিনব; আমরা অতি আগ্রহের সহিত উহার প্রথম সংখ্যা খানি পাঠ করিয়াছি এবং বলা বাহুল্য পড়িয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। আলোচ্য সংখ্যায় ছোট বড় নয়টি প্রবন্ধ আছে। শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল সরকার মহাশয় ইহাতে পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন। আমরা উহা হইতে এবার মিঃ Steadএর গল্পটি 'পন্থার' পাঠক বর্গকে উপহার দিতেছি, ভরসা করি ইহা তাঁহাদের অপ্রীতিকর হইবে না।

মিঃ ষ্টেড্ বর্ণিত একটী গল্প।

জানুয়ারী মাসের এক বৃহস্পতিবারের অপরাহ্নে লাঞ্চের (আহার বিশেষ) পর বাহির হইতেই সিঁড়ির পাদদেশে একটী যুবককে দেখিতে পাইলাম। মিঃ ষ্টেড্ এখন কার্য্যালয়ে আসেন কি না, তাহাই সেই আগন্তুক যুবা, বালক-ভৃত্যকে সতেজে জিজ্ঞাসা করিতেছিল।

আমি বলিলাম—"আপনার কি প্রয়োজন? আমিই মিঃ ষ্টেড্।"

'বটে!—আপনার সহিত কোন কথা কহিতে পারি?'

আমি বলিলাম—'স্বচ্ছন্দে'। তৎপর তিনি আমার আপিসে আমার পশ্চাৎ প্রবেশ করিলেন। এক্ষেত্রে কার্ড দেওয়ার প্রয়োজন হইল না। সুতরাং আগন্তুকের নাম ও কোথা হইতে আসিতেছেন, তাহার কিছুই জানিতে পারিলাম না। আমি এইমাত্র জানিলাম তিনি বৃটীশ সৈন্য-বিভাগে কার্য্য করেন এবং কয়েকমাস হইতে পীড়িত-বিদায় (Sick leave) লইয়াছেন।

আগন্তুক আমায় বলিলেন যে, "আপনি পরতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করিয়া থাকেন বলিয়া তদ্বিষয়ক কতিপয় আশ্চর্য্যজনক বিষয় আপনাকে বলিতে আসিয়াছি। ইহাতে আপনার কৌতূহলও চরিতার্থ হইবে এবং আমিও কিছু উপদেশ পাইতে পারি।

কিয়দ্দিবস পরীক্ষার পর আগন্তুক বিনা যত্নে প্রচুর লিখিবার (automatic

writing) ক্ষমতা সঞ্চয় করিয়াছেন। তিনি কলম ধরিলেই মিনিট পাঁচেক অতিবাহিত না হইতেই আপনা হইতে তাহার হাত দিয়া লেখা খরবেগে বহির্গত হইতে থাকে। এই অসাধারণ ক্ষমতা লাভের পর হইতে তিনি তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্মে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে থাকেন; সমস্ত বিষয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই অদ্ভুত লেখনী সঞ্চালনে অতিবাহিত হয়। সময় সময় একস্থানে বসিয়া ৮।৯ ঘণ্টা কাল লেখনী চালনা করিলেও তাহার বিরাম-স্থল উপস্থিত হয় না। এইরূপ লেখা তাহার যেন এক নেশা হইয়া উঠিল। ইহার কিয়দ্দিবস পর তিনি দেখিলেন যে, তাহার আর লেখনী স্পর্শ করিবারও প্রয়োজন হয় না; তাহার হস্ত আপনা হইতেই শূন্যে অক্ষর প্রসব করিয়া থাকে; এবং অক্লেশে তিনি তাহা পাঠ করিতে পারেন। অতঃপর তাহার আর একটী উপসর্গ প্রকাশ পাইল, তিনি সময় সময় সম্পূর্ণ বা অর্দ্ধ মোহিত ও আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। এই সময় তাহার নিজের উপর আর কোনরূপ প্রভুত্ব থাকিত না। এইরূপে ক্রমশঃ তাহার মানস শক্তির ক্ষমতা সম্পূর্ণ হরণ করিয়া সেই 'অদৃশ্য শক্তি' তাহার উপর বিপুল আধিপত্য বিস্তার করে। তদ্ধেতু তিনি সময় সময় বলিতেন,—"আমি আমাকে আর আমার বলিয়া বোধ করিতে পারি না। সেই অদৃশ্য শক্তির ইচ্ছানুসারেই আমি চালিত হই; জানি না ইহার শেষ ফল কি হইবে!"

একজন প্রবল শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ শক্তিশালী ব্যক্তি আত্মরক্ষার নিমিত্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও যখন বিফল মনোরথ হয় এবং পরিশ্রান্ত ও পরাজিত হইয়া যখন প্রবলের ক্রীড়া সূত্রের ন্যায় চালিত হয়, তখন তাহার মনোভাব যেমন হইয়া থাকে, সেইভাবে আগন্তুক আমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। আমি তাহাকে বলিলাম যে, প্রকৃতই আপনি নিতান্ত হতভাগ্য! এই অদৃশ্য শক্তির কবল হইতে নিরাপদ হইবার একটী প্রধান উপায়—নিজের উপর প্রভুত্ব অটুট রাখা; এবং যে শক্তির বশীভূতই হন্ না কেন, তাহার শাসন-দণ্ড ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন।

আগন্তুক বিষাদিতভাবে হাসিয়া বলিলেন,—"তাকে ত্যাগ করার পরামর্শ দেওয়া তো সহজ, কিন্তু সে যে আমায় ছাড়ে না।"

"আচ্ছা, লেখনী সঞ্চালন বিষয়ে আপনি যে অতিরিক্ত প্রশ্রয় পাইয়াছিলেন, তাহার ফল যে বিষময়, তদ্বিষয়ে ঐ শক্তি কি কিছু আপনাকে জানাইয়াছিল?"

"হা ভগবান! সে কি সৎ আত্মা (Good spirit)? যে আত্মা আমাকে আশ্রয় করিয়াছে, সে অত্যন্ত বদ্,—সে আমার ক্ষতি ভিন্ন ভাল করিবে না! আমিও তাহাকে তাড়াইতে পারিতেছি না।"

"নির্ব্বোধ! উহা কেবল ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভর করে।"

"হাঁ, তা হ'তে পারে; কিন্তু সে আমার ইচ্ছা শক্তি আয়ত্ত করিয়াছে। আমি তাহার অমতে দাঁড়াইতে পারি না। এবং সে আমায় বলিয়াছে যে, সে আমাকে সম্পূর্ণ নিজ আয়ত্তে আনয়ন করিয়াছে এবং আমার বিনাশ না করা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবে না।"

"এটা আপনার পাগ্‌লামি। সে হাজারবার এ কথা বলিতে পারে, তাহার কারণ আপনি তাহাতেই আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।"

"কিন্তু ইহার প্রতিবিধান কি রকমে করা যায়? সে ইচ্ছানুসারে আমাতে ভর করে, এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে আমার মস্তক সাঞ্চলন করে; অথবা তাহার ইচ্ছামত কোন্ স্থানে আমাকে যাইতে বাধ্য করে। আমার চৈতন্য একেবারে বিলুপ্ত করিয়া স্বেচ্ছামত আমায় তাড়াইয়া থাকে এবং ঠিক যেন তাহার নিজের দেহ—এই ভাবে আমার দেহ লইয়া ব্যবহার করে।"

"আপনি বলিতে চান যে, তাহাকে আপনি থামাইতে পারেন না?"

"না! আমার উপর তাহার অতিরিক্ত প্রভুত্ব জন্মিয়াছে; সে আমাকে এই ভাবে চালাইয়া থাকে যে, এই দেহই যেন তাহার নিজস্ব—ইহাতে আমার কোনও স্বত্ব নাই।"

"কিন্তু আপনাকে ইহার গতিরোধ করিতে হইবে, নতুবা আর আপনার আশা নাই!"

আগন্তুক দুঃখিতান্তকরণে বলিলেন,—সত্য! আমার আশঙ্কা হয় যে আমি নিধন প্রাপ্ত হইব, অন্ততঃ সে এইরূপই বলিয়া থাকে। সে বলিয়া থাকে যে, যতদিন আমি জীবিত থাকিব, ততদিন সে আমায় নানাপ্রকার

অনিষ্ট করিয়ে। তাহার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে হইলেই আমার আয়ু শেষ হইবে। মহাশয়! আপনি কি তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন?"

"নিশ্চয়ই! সে কি এখন আপনাতে ভর করিবে?"

"যে সে সময়েই করিয়া থাকে!"

অতঃপর আমি একটু চিন্তা করিলাম। ভাবিলাম এই দুষ্ট আত্মা যখন তখন যেমন নিজ ইচ্ছাক্রমে এবং মিডিয়মের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাতে আবির্ভূত হয়, তখন তাহাকে একটু চেতাইয়া দিলেই আমাদের অভিষ্ট সিদ্ধ হইবে' অর্থাৎ এখনই তাহার আবির্ভাব হইবে। এই স্থির করিয়া আমি বলিলাম,—"সে যদি আমার সঙ্গে কথা বলে তবে এখন আসিতে পারে।"

আগন্তুক নিঃশব্দে আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়া একখানি কেদেরায় উপবেশন করিলেন। পর মুহূর্ত্তেই তাহার অঙ্গ খেচন আরম্ভ হইল, চক্ষু নিমিলিত হইল এবং কৌচের উপর মস্তক রাখিয়া পশ্চাতে হেলিয়া পড়িলেন। তাহার বক্ষঃদেশ ফুলিতে লাগিল—একবার স্ফীত হয় আবার নামিয়া যায়, এবং খেচনের সঙ্গে তাহাব দেহ কোঁকড়াইতে লাগিল। এ পর্য্যন্ত একটী কথাও বলা হয় নাই। আমি নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া এই ব্যাপার দেখিতে লাগিলাম; খিচুনি যখন খুব বেশী হয়, সেই সময় অস্পষ্ট গোঁ গোঁ শব্দ তাহার মুখ হইতে নির্গত হয়। তদ্ব্যতীত অন্য কোনও শব্দ বা কথা তিনি উচ্চারণ করিলেন না। দুই তিন মিনিট এই ভাবে অতিবাহিত হইলে আমি বলিলাম,—"শুনুন্?"

এই কথার পরই একবার বিচিত্রভাবে অঙ্গ মোচড়াইয়া অদ্ভুত শব্দ করিল। তৎপর সম্পূর্ণ নূতন স্বরে (এ স্বর আগন্তুকের অর্থাৎ ভূতাবিষ্ট ব্যক্তির নহে) আমায় বলিল,—

"বেশ! অ—ভারি বেয়াড়া লোক! তাই না?"

আমি বলিলাম,—"আপনি কে?"

'আপনাকে বলিতেছি। এই কথা কয়টী বলিবার সময় তাহার দেহ ভয়ানক সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। এই ভাবেই বলিল,—'আপনাকে বলিতেছি। আমি এক বালিকার পিতামহ,—সে পুবাতন—আবার খিচুনা আরম্ভ হওয়ায় তাহার কণ্ঠরোধ হইল।

আমি তীব্রস্বরে বলিলাম,—আপনি কি ভদ্রভাবে কথা বলিতে পারেন না? আমায় বলুন—আপনি কে এবং আপনার প্রয়োজন কি? আপনি এ কথার উত্তর দিবেন কি?'

"দিব!" তারপর অকস্মাৎ এক খিচুনীতে তিনি চেয়ারের উপর উঠিয়া বলিলেন,—"হাঁ, আমি আপনাকে সব বলিব, আমি একটী বালিকার পিতামহ, সে অত্যন্ত—সুশ্রী বালিকা, তাহাকে এই—পাপিষ্ঠ, আঃ— !'"

আবার খিচুনী আরম্ভ হইল, তিনি কোচের উপর মস্তক রাখিয়া পড়িয়া গেলেন। তাহার দেহ আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতে লাগিল এবং যন্ত্রণাদায়ক গোঁ গোঁ শব্দ তাহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইতে লাগিল।

'থামুন, থামুন! আপনি এ ভাবে ছেলেমি করিতেছেন কেন? ভাল হইয়া উপবেশন করুন এবং ভদ্রলোকের ন্যায় কথাবার্ত্তা বলুন।'—এই ভাবে আমি বলিলাম।

যাহোক্ তিনি পূর্ব্বোক্ত ভাবে পড়িয়া থাকিয়াই বলিতে লাগিলেন,—"সসম্ভ্রমে আপনার সহিত কথা বলিব? ভদ্রলোকের ন্যায় আপনার সহিত কথা বলিব এবং এই—পাপাত্মা—।" পশ্চাৎ দিকে চেয়ারের উপর মস্তক সজোরে আঘাত করিতে লাগিল। তৎপর তিনি এক মুহূর্ত্ত নীরব রহিলেন, বোধ হইল কি যেন স্মরণ করিতেছেন। তৎপর বলিলেন—"আমি ইহাই করিতে ভালবাসি; ইহাতে ইহার কষ্ট হয়। সত্যই কি তাহা নহে? হা হাঃ। পরে নিজেই সবেগে বক্ষঃস্থলের উপর এক ভীষণ আঘাত করিলেন। যন্ত্রণায় তাহার মুখ মলিন হইয়া উঠিল। আবার বলিলেন,—'ইহাতে কি ইনি কষ্ট পান না? এইরূপ কষ্ট দিতেই আমার ইচ্ছা হয়! আমি ইহাকে হত্যা করিব—বধ করিব; নিশ্চয়ই বধ করিব। ইহাকে ব—, ইহাকে ব —॥"

আমি বলিলাম,—'নির্ব্বোধ! আপনি ইহাকে বধ করিতে পারিবেন না, অথবা ঐ প্রকার কোনও অনিষ্ট করিতে পারিবেন না!'

'পারিব না? আপনি দেখিবেন, পারি কি না? ইনি জানেন আমি কণ্ঠে ক্ষুর বসাইব, ভয়ে ইনি ক্ষৌরকার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। হো হোঃ! আমি ইহাকে আয়ত্ত করিয়াছি,—আয়ত্ত করিয়াছি।'

'আপনার এরূপ বলিবার তাৎপর্য্য কি? আপনি কে? আপনি

ইহাতে কেন আবিষ্ট হইয়াছেন? ইহা দ্বারা আপনার কোন্ কার্য্য সম্পাদিত হইবে? আপনি কি সোজা কথা বলিতে পারেন না?"

"আপনার কি সন্তান সন্ততি আছে? যদি থাকে তবে বুঝিতে পারিবেন, আমি এই পশুটাকে কেমন ভাবি। হো হোঃ! আমি ইহাকে স্পর্শ করিতেও ঘৃণা বোধ করি। কেবল ক্লেশ উৎপাদনের নিমিত্তই এইরূপ করিতেছি। ভাল, আপনি আমার পৌত্রীকে চিনেন্।

'আপনার পৌত্রীর কি হইয়াছে?'

'সুন্দর বালিকা,—অতি সুশ্রী বালিকা। এই পশু—'আবার খিচুনী আরম্ভ হইল।

'পৌত্রীর কথা কি বলিতেছেন? কি হইয়াছে?'

'ইনি চারি মাস ধরিয়া তাহাকে ভালবাসেন। চারি মাস সে আনাগোনা করে; দূর হ—। এবং চারি মাস হইল ইহাকে ভর করিয়াছি; দিন রাত্রি যন্ত্রণা দিতেছি। আরও চারি মাস আমি ইহার জীবন শোচনীয় করিব। আমি ইহার কণ্ঠছেদ করিব,—আমি এবং ইনি উভয়েই চিরদিনের তরে শীতল হইব। ইহাই তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত।'

'আপনি কি সাহসে এইরূপ কথা বলিতেছেন? আপনি কেবল নিজের যাতনাই বর্দ্ধিত করিতেছেন!'

"আমি তা গ্রাহ্য করি না। ইহাকে শাস্তি দিয়া যে আনন্দ, তাহা উপভোগ করার পর, আমি স্বেচ্ছায় অনন্তকাল যাতনা ভোগ করিতে রাজি আছি।"

"কিন্তু তদ্রূপ করিবার আপনার কি অধিকার আছে?"

"অধিকার? 'তবে শুনুন্! আমার পৌত্রী যুবতী, উচ্চবংশজাতা। এই পা—তাহার নিকট আনাগোনা করিত, তাহাকে ভালবাসার কথা বলিত, ইনি এমনি সুন্দর যুবক! পা—নির্ব্বোধ! তুমি কি জান,—সর্ব্বদাই বলিত 'তুমি কি জান, কত ভাল—'; একলাই আসিত এবং তাহাকে ভালবাসা জানাইত।"

'ইনি কি তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন?'

'বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল। এখন যদি সে সুযোগ উপস্থিত হয় তবে

সে করে ; কিন্তু সে সুযোগ উপস্থিত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। পুনরায় তাহার সহিত ইহার আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। পুনরায় তাহার সহিত ইহার আর সাক্ষাৎ হইবে না। জানেন, তারপর কি হইল? পা—শূকর! ঠিক যেন মূর্ত্তিমান পাপাবতার! নির্ঘৃণ্য! তথাপি সেই বালিকা এমনি হাবা মেয়ে যে, পুনরায় সে যদি ইহার দেখা পায়, তবে যে কি করে তাহা আমি বলিতে পারি না! তবে ইহারা উভয়ে আর কখনও একত্রিত হইবে না। কখনই না! কখনই না! আমি তাহার দায়িক।'

'ব্যাপারখানা কি? ইনি সেই বালিকাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, তাহাকে ভালবাসা জানাইয়াছিলেন। ইহার ভিতর অন্যায় তো কিছু দেখি না; আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ইনি কি সর্ব্বনাশ—?'

"বালিকার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তাহাকে প্রলুব্ধা করিয়াছে। কেহই জানে না—সকলের অজ্ঞাতে তাহার সহিত চারি মাস বাস করিয়াছে। তারপর বালিকা ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া ইহাকে তাড়িয়া দিয়াছে। বিদায়ের কালে বালিকা বলিয়াছিল,—'তুমি আমাকে পশুতে পরিণত করিয়াছ! তোমার সহিত আমার আর কোন সম্বন্ধ নাই।' তারপর এই পাপিষ্ঠ, এই পশু চলিয়া আসিয়াছে।"

পুনরায় খিচুনী আরম্ভ হইল; বক্ষঃস্থল স্ফীত হইয়া উঠিল এবং পুনরায় বুকের উপর এক ভীষণ চপেটাঘাত করিয়া বলিল,—"আমি এখন ইহাকে যাহা ইচ্ছা করিতে পারি। আমার যা ইচ্ছা—এ সম্পূর্ণ আমার করতলগত। আমার যথা ইচ্ছা তথা লইয়া যাইতে পারি, আমার যাহা তাহাই বলাইতে পারি এবং রাত্রি দিন কষ্ট দিতে পারি। বাঁচাইয়া রাখিব, চারি মাস বাঁচাইয়া রাখিব, তাহার পর কণ্ঠচ্ছেদ করিব।" এই কথা বলা শেষ হইবামাত্র, তিনি হস্ত বেষ্টন করিয়া স্কন্ধ ধরিলেন এবং একটী ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাদায়ক চীৎকার করিলেন।

তিনি বলিলেন,—"কেহই ইহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না; কেহই না!"

"এটা আপনার সম্পূর্ণ ভ্রম! ইনি যতই কেন গর্হিত কার্য্য করিয়া থাকুন,

তাহাকে এ ভাব কষ্ট দেওয়া আপনার উচিত নহে। ইনি আপনাকে শীঘ্রই বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন।”

“আমায় বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন? হো—হোঃ। সেদিন ইনি ভগবানের নিকট করুণা প্রার্থনা করিতেছিলেন। আমি কি তাহাতে উপহাস করি নাই? ভগবানের নিকট প্রার্থনা শেষ করিবার পূর্ব্বেই কি আমি ইহাকে আয়ত্ত করিয়া ফেলি নাই? না, না! ইনি আমার, আমি ইহাকে রাখিব।”

“কিন্তু সেই বালিকাটী কোথায়? এখন কি তাহাকে ইনি বিবাহ করিতে পারেন না?”

“অবশ্যই পারে কিন্তু বালিকা আর ইহাকে পছন্দ করে না এবং সেরূপ সুযোগও আর উপস্থিত হবে না। নিশ্চয়ই না—নিশ্চয়ই না।”

“কতদিন হইতে আপনি ওপারে আছেন?” “পঞ্চাশ বৎসর।”

“এইরূপে ঘৃণিত রিপুর দাস হওয়া অপেক্ষা এই পঞ্চাশ বৎসরে আপনার সর্ব্বপ্রকার উন্নতিসাধন করা উচিত ছিল। আপনি এই কালের মধ্যে কি করিয়াছেন।

“আমি নরকে ছিলাম, যন্ত্রণাভোগ করিতেছিলাম। সর্ব্বত্রই গমনাগমন করিতে পারি এবং এইরূপ কার্য্য করিয়া বেড়াই!”

“আপনারা সকলে কি একাকীই থাকেন।”

“নিঃসঙ্গ বন্ধু রহিত।”

“আপনি কেমন করিয়া ইহাকে আয়ত্ত করিলেন?”

“শুনুন্ তবে! সৈন্য বিভাগে আমার আমলে আমি একজন সৈনিক কর্ম্মচারী ছিলাম। আমার বিশ্বাস আমি যত রমণীর সর্ব্বনাশ করিয়াছি, তত আর কোনও ব্যক্তি করে নাই! তৎপর পঞ্চাশ বৎসর হইল আমি এই লোকে আগমন করিয়াছি। এই সুদীর্ঘকাল আমি রমণী—সুন্দরী সুশ্রী রমণী দর্শনে ও তাহাদের সহিত কথা বলিবার এবং প্রেম করিবার অভিপ্রায়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। কিন্তু তাতে কি হয়, আমার তো কথা বলিবার ক্ষমতা নাই এবং তাহারাই বা আমার কি উপকার করিতে পারে! আমি কোনও রমণীকে স্পর্শ করিতে পারি না কিন্তু সর্ব্বদা চির কালের জন্য

আমি ঐ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতাম। যে আশা কখনও সফল হইবে না, আমি সেই আশা মরিচিকার ছলনায় তাড়িত হইয়া দুঃসহ যন্ত্রণাভোগ করিয়া পরে আমার আত্মীয়বর্গকে দেখিতে যাইয়া দেখিলাম, আমারি ন্যায় তাহারাও ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমার পৌত্রীর সর্ব্বনাশ ঘটিতে দেখিলাম। 'ইহাকে ব—, ব—করিব! নিশ্চয়ই ইহাকে ব—করিব! দুরহ পাপিষ্ঠ!'—এই বলিয়া তিনি কোচের সহিত মাথা ঠুকিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন,—ইহাকে আর কি বলিব? পাপিষ্ঠ! কিন্তু আমি ইহার প্রতিশোধ লইব। আরও চারিমাস—রাত্রি দিন, দিবা রাত্র; তৎপর চিরদিনের তরে হ—! তাহাই ইহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত।" বাক্যশেষে তিনি ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে উচ্চ হাস্য করিলেন।

"আপনাকে দেখে, কি আপনাকে আদর করে, এমন লোক কি কেহই নাই?"

"না।"

"আপনি তো বহু রমণী ভালবাসিয়াছিলেন?"

"তাহারা এখন নরকে,—সকলেই নরকে বাস করিতেছে। আপনি কি ভাবেন যে, তাহারা আমায় ভালবাসে? না না, তাহারা নিরন্তর আমায় অভিসম্পাৎ করিয়া থাকে।'

'না, তাহারা নরকে অবস্থান করিতেছে, একথা আমার বিশ্বাস হয় না। রমণীগণের স্বভাব অতি নম্র, তাহাদের কেহ কেহ অবশ্যই আপনাকে ভালবাসে।"

"না—কেহই না।"

আমি নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বলিলাম,—"আপনার সম্পূর্ণ ভুল। কেহই জানে না,—রমণীর ভালবাসা কত গভীর কত উন্নত। আপনি জীবনে কখনো কি কোন কার্য্য নিঃস্বার্থ ভাবে করিয়াছেন?'

"নিশ্চয়ই না! নিশ্চয়ই না! আমি আত্মসুখ অন্বেষণ করিতাম।"

"হতভাগ্য! আমি আপনার জন্য নিরতিশয় দুঃখিত হইলাম।"

প্রবল ঘূর্ণবাত্যায় পড়িয়া ক্ষুদ্র তৃণখণ্ড যেমন ঘুরিয়া বেড়ায়, আগন্তুক হতচৈতন্য হতভাগ্য ব্যক্তির দেহও তেমনি প্রবল ভাবে মোচড়াইয়া উঠিল।

"না—না! ভয়প্রদ বিরক্তিকর স্বরে তিনি বলিলেন,—আমায় সাহায্য

করিবেন না। 'দয়া প্রদর্শন করিবেন না। "আমি ইহা সহ্য করিতে পারি।"

"কিন্তু আপনার প্রতি আমার করুণার উদ্রেক হয়"। আমি উত্তর করিলাম, "আমি আপনার জন্য গভীর শোকসন্তপ্ত। এরূপ অবস্থা অতি শোচনীয়।"

"আমি দয়ার প্রত্যাশী নহি, আমি চাই প্রতিহিংসা; এবং তাহাই আমি এখন লইতেছি। আমি ইহার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু লইতেছি না এবং লইবও না!"

"আপনি ইহার নিকট হইতে প্রচুর লইয়াছেন,—ইহার সাধ্যাতিরিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এখন আপনার ত্যাগ করা উচিত।"

"কে আমায় তাড়াইবে?"

"ইনি নিজেই।"

"ইহার নিজের কোনও ইচ্ছা নাই।"

"আমি কি আপনাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারি?"

"পারেন; যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করুন।"

"ইনি যে আমার এখানে আসিয়াছেন, তাহা কি আপনার অনুমোদিত?"

"না, আমি অনুমোদন করি নাই।"

"তবে ইনি কেন আসিলেন?"

অনিচ্ছার ভাবে তিনি বলিলেন,—"তাহার কারণ এই পা—যাহাকে তাহার মন বলিয়া থাকে—তাহা আমার, তাহার নহে। কেবল এক কণিকা মাত্র আছে, যাহা সময় সময় তাহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করায়।"

"ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ইনি আপনার অনভিমতেই এখানে আসিয়াছেন।"

দেহ খিঁচাইয়া এবং মুখাকৃতি ভয়ঙ্কর করিয়া তিনি বলিলেন, —হাঁ, তাই আসিয়াছে।' শূকর শাবকের ছুঁচোল নাসিকার ন্যায় না হওয়া পর্য্যন্ত ইহার জিহ্বা অগ্রে বাহির হইতে থাকিবে, কিন্তু ঠিক গোল হইয়া নহে, দেখিতে কদর্য্য হয় এইরূপ কদাকার।'

"যে ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে ইনি আপনার বিনা অভিপ্রায়ে এখানে আসিয়াছেন, সেই ইচ্ছাবলেই ইনি আপনাকে বিতাড়িত করিবেন।"

"হা হাঃ! অসম্ভব, অসম্ভব! তাহা আমার; আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই তার দ্বারা করাইতে পারি। যদি বলি পাপাত্মা দক্ষিণ দিকে তোমার মস্তক ফিরাও, তবে তাহাই সে ফিরাইবে। যদি বলি দক্ষিণ স্কন্ধের উপর স্থাপন কর, তাহাই সে করিবে। আমি ইহার মস্তক দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরাই। আমি বলি পাপাত্মা! দক্ষিণ দিকে ফিরো; অমনি ফিরিল। বলিলাম—বামে ফিরো; অমনি আজ্ঞা পালন। আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই ইহার শরীর দ্বারা করাইতে পারি; এই পা—কদাকার আমারই!"

"আপনি কেমন করিয়া ইহার উপর অধিকার লাভ করিলেন?"

"বলি তবে, শুনুন! কতিপয় ব্য—Spiritualism বলিয়া থাকে। ইনি Dujja Board এর সহিত সম্মোহন-বিদ্যার আলোচনা করিতেন, কোন কোন আত্মার নিকট হইতে উত্তরও প্রাপ্ত হন। তৎপর ইহার খেয়াল হয়—হস্তাক্ষর বিষয়ে আলোচনা করিতে। একটী লেখনী ধারণ করিলেন। আমি ইহাকে দেখিলাম। আমি সে সময় নিজ ইচ্ছামত চলিয়া যাইতেছিলাম,—ইনি কি করেন তাহা দেখিলাম। আমার পৌত্রীর কথা মনে করুন। সুন্দর বালিকা, সুশ্রী বালিকা, আর এই পা—কদাকার কুৎসিত।"

"তা'তে কি? আপনি বলিয়া যান।"

"আমি অপেক্ষা করিয়া, ইহার উপর আবির্ভূত হইবার বিষয় চিন্তা করিলাম। একদা ইনি একটী কলম লইয়া আপনা আপনি লেখা হয় কি না তাহার চেষ্টা করিতেছিলেন। হো হোঃ! আমি ইহার হস্ত ধারণ করিলাম এবং লিখিয়া দিলাম। আরব্ধ কার্য্য সফলকাম হওয়ায় ইনি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিলেন। সৌভাগ্যবতী সেই সুন্দরী বালিকা, সর্ব্বদা উপাসনা করিত, সুন্দর আত্মা; সে ইহাকে ধর্ম্মপথে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আগমন করে। হো হোঃ! আমি কি ইহাকে বেকুব করি নাই? আমি লিখিলাম—তোমার অধ্যবসায় পুরস্কৃত হইয়াছে।' পরে আমি ইহাকে বলিলাম, কি বলিলাম? ইনি সেই বালিকা ও নিজের সম্বন্ধে যাহা জানেন বা চিন্তা করেন, তাহা আমি ইহার হাত ধরিয়া লিখিলাম। ইনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া লিখিতেন। যাহাতে ইনি যন্ত্রণা পাইতে পারেন, আমি তাহাই করিতাম, এমন কি, যে সময়ে ইনি সৌভাগ্যবান বলেন, সে সময়েও যন্ত্রণা

দিতে আমি কসুর করি নাই। কি—নির্ব্বোধ! সর্ব্বদাই বলে কি—নির্ব্বোধ; 'তুমি জান না' সুন্দর যুবাপুরুষ, সুন্দর যুবা কর্ম্মচারী। অবশেষে আমি ইহাকে হস্তগত করিলাম, আর ইনি আমাকে বিদূরিত করিতে পারেন না।

"হাঁ, ইনি পারেন। ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে ইনি আপনাকে নির্ব্বাসিত করিতে পারেন।'

"ইহার ইচ্ছাশক্তি নাই, আমার আছে। ইচ্ছাশক্তি আমার। আপনি দেখিতেছেন এই পুরাতন দেহকে আমি কি ভাবে ব্যবহার করিতেছি। আমি ব্যবহার করি, ঘৃণা করি, অভিসম্পাত করি!—অতি ঘৃণা করি। আমি চারি মাস ইহাকে যন্ত্রণা দিয়াছি, আরও চারি মাস দিব; তৎপরে ইহার কণ্ঠচ্ছেদ করিব! হাঁ, নিশ্চয় করিব!'

"না, আপনি পারিবেন না। আপনি এ রকম কিছুই করিবেন না। এখন আর কি, আপনার বাহির হওয়া উচিত। আপনি বহুদিন হইতে বাস করিতেছেন।'

তিনি আর কথা বলিলেন না। দুই একটী গা মোড়া দিয়া, একবার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আগন্তুক আত্মাবিষ্ট ব্যক্তি চোক মুছিতে মুছিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

তিনি বলিলেন,—'দেখিলেন, সে আমাকে যা'তাই করিতে পারে।

'সে আপনার বিষয় বহু কথা আমায় বলিয়াছে।'

সে আপনাকে কি বলিয়াছে?

প্রথমে তাহার আত্ম কথা বলে, তাহাতে প্রকাশ, আপনি তাহার পৌত্রীর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন। অবশ্য আমি ইহার বিন্দু বিসর্গও জানি না, সে যাহা বলিয়াছে, তাহাই বলিতেছি।

আগন্তুক চুপ করিয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম—ভাল, ওকথা কি সত্য?

হাঁ, সত্য।

তবে বন্ধু! আমার বিবেচনায় আপনার অবস্থা শঙ্কটাপন্ন। ইহা হইতে রক্ষা পাওয়ার নিমিত্ত অবিলম্বে আপনার পলায়ন কর্ত্তব্য।

তা, কেমন করিয়া পারি?

কেবল তাহার কথা শুনিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া।. আপনি ইচ্ছা করিলে তাহাকে নির্ব্বাসিত করিতে পারেন; কেবল আপনার ইচ্ছা হওয়া চাই।

"আমি অক্ষম। আমার ইচ্ছা থাক্ বা না থাক্ সে নিজ ইচ্ছায় আইসে এবং কথা বলে; যাহা তাহার বলিবার ইচ্ছা থাকে, তাহাই সে আমার হাত ধরিয়া আকাশে লিখায়।"

"আচ্ছা, যখন সে আপনার হাত ধরিবে, তখন আপনি হাত পকেটে পুরিবেন।"

"সে আমার সহিত কথা বলিবে।"

"আপনি উত্তর দিবেন না, তাহার কথা শুনিবেন না। আপনি অধিক দিন আর তাহার সহিত টানা হেঁচড়া করিতে পারিবেন না। তাহার সহিত আপনাকে প্রাণপণে সংগ্রাম করিতে হইবে।'

"সত্য, আমার জীবন রক্ষার্থে এই সংগ্রাম করিতে হইবে; আমি ইহা বেশ বুঝি। আমি এখন সাহস করিয়া কামাইতে পারি না!'

"হাঁ, তা সে আমায় বলিয়াছে। আমি তাকে বলিয়াছি—এটা কিছুই না। কথাটা এই, সে আপনার রাজ্য অতিক্রম করিয়াছে কিন্তু দুর্গটী এখনো কার্য্যক্ষম আছে। আপনি এখানে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আসিয়াছেন। ইহাকেই আপনি আপনার ভাগ্যচক্র পরিবর্ত্তনের কেন্দ্র বলিয়া মনে করিবেন। সে যাহা বলে তাহা কখনো করিবেন না। যে পরিমাণে আপনি তাহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া নিজের উক্তি স্থির রাখিতে পারিবেন, সেই পরিমাণে তাহার শক্তি হ্রাস হইয়া আপনার শক্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে।'

পরে বলিলাম,—'আচ্ছা, সেই রমণী ঘটিত ব্যাপারখানা কি?

"আমি তাহার কথা বলিতে ইচ্ছা করি না। সে এ দেশে নাই। আমাদের মধ্যে চির ব্যবধান।'

"আচ্ছা, যদি সুবিধা হয় তবে কি আপনি তাহাকে বিবাহ করিতে পারেন?'

"আমি কি পারি না? সে যে একথা শুনিবে না।"

"কেমন করিয়া এ বিচ্ছেদ হইল?'

"আহা! সে অত্যন্ত অনুতপ্ত, আমায় তীব্র তিরস্কার করিয়াছে। আর কখনো আমার মুখ দর্শন করিবে না।'

"কেহ কি এ বিষয় জানে না?"

"সে আর আমি ব্যতীত অপর কেহ জানে না।'

ভাল সে যদি প্রকৃতই অনুতপ্ত হইয়া থাকে,—আমার বিশ্বাস সে নিশ্চয়ই হইয়াছে। তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে আপনাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করিবে। তাহাকে এ বিষয় জ্ঞাপন করা আপনার উচিত।

আগন্তুক কিয়ৎক্ষণ কি যেন চিন্তা করিলেন, তৎপরে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—সে (আত্মা) আমায় কি বলিয়াছে, জানেন?

"তুমি যদি একথা সে রমণীকে বল, তবে অদ্য রজনীতেই তোমাকে হত্যা করিব। নিশ্চয়ই রজনীতে তোমার বধক্রিয়া নির্ব্বাহিত হইবে।

এখানেই আমার কথা শেষ করিলাম। আমি এই হতভাগ্য ব্যক্তিকে পরে আর একবার দেখিয়াছিলাম। পূর্ব্বাপেক্ষা তাহার আত্মশক্তি প্রভুত পরিমাণে মন্দীভূত, ইচ্ছাশক্তি একবারেই শূন্য। তাহার অঙ্গখেচন আরও ভয়ঙ্কর এবং আকুঞ্চন প্রসারণ আরো তীব্র। মেঝের উপর পড়িয়া যখন তিনি "ছাড়মটমট" করেন এবং সর্ব্বশরীর অসাড় ও নির্জীব না হওয়া পর্য্যন্ত যতক্ষণ তিনি গড়াইতে থাকেন, ততক্ষণ—তাহার তৎকালীন অবস্থা আরো শোচনীয় অতি হৃদয়বিদারক।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল।

কস্তুরী প্রকরণম্।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

দানাদ্যং সুকৃতং কষায় বিজয়ং পূজঞ্চ পিত্রোর্গুরো
র্দেবানাং বিনয়ং নয়ং পিশুনতা ত্যাগং সতাং সঙ্গতি
হৃচ্ছুদ্ধিং ব্যসন ক্ষতীন্দ্রিয়দমাহিংসাদি ধর্ম্মান্ গুণান্
বৈরাগ্যঞ্চ বিদগ্ধতাঞ্চ কুরু চেদ্ভোক্তুং বিমুক্তিং মনঃ ॥১২॥

চেৎ (যদি) বিমুক্তিং (মোক্ষং) ভোক্তুং (সেবিতুং) মনঃ (চেতঃ)

মোক্তুমিচ্ছসি চেদিত্যর্থঃ। তর্হি দানত্বং (দান প্রভৃতি) সুকৃতং (সৎকর্ম্ম), কষায় বিজয়ং (রাগ পরাজয়ং) পিত্রোঃ (পিতুর্মাতুশ্চ) গুরোঃ (উপদেষ্টুঃ) দেবানাং (ত্রিদশানাং) চ (সমুচ্চয়ার্থে চ শব্দঃ) পূজাং (অর্হাং) তথা, বিনয়ং (অনৌদ্ধতং) নয়ং (নীতিং) পিশুনতা ত্যাগং (খলতা পরিহারং) সতাং (সাধু জনানাং) সঙ্গতিং (সমাগমং) হৃচ্ছুদ্ধিং (চিত্তনৈর্ম্মল্যং) ব্যসনক্ষতীন্দ্রিয়দমাহিংসাদি ধর্ম্মান্ (ব্যসনানাং কামকোপজ দোষাণাং ক্ষতিঃ নাশঃ ইন্দ্রিয় দমঃ চক্ষুকর্ণোপস্থাদীনাং নিগ্রহঃ অহিংসাহননেচ্ছা রাহিত্যং ইত্যাদয়ঃ যে ধর্ম্মা তান্) গুণান্ (দয়াদাক্ষিণ্যাদীন্) বৈরাগ্যং (অভিলাষ রাহিত্যং) বিদগ্ধতাং (পাণ্ডিত্যং) চ (সমুচ্চয়ার্থে চকারঃ) কুরু (সম্পাদয়) মুমুক্ষুণা দানাদিকমবশ্য কর্ত্তব্য মিত্যাশয়ঃ ॥১১॥

ভ্রাতঃ, সংসার বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইলে দানাদি পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান, আসক্তিত্যাগ, পিতামাতা গুরু এবং দেবতাদের পুজা, বিনয় নীতি, খলতা পরিত্যাগ, সজ্জনের সংসর্গ, চিত্তশুদ্ধি, ব্যসন পরিত্যাগ, ইন্দ্রিয় সংযম ও অহিংসা প্রভৃতি ধর্ম্মগুণ বৈরাগ্য ও পাণ্ডিত্য অবলম্বন কর ॥১১॥

অথ দান প্রক্রমমারভ্যতে ঃ—

> খ্যাতিং পুষ্যতি কৌমুদীমিব শশীসূতে চ পূতাত্মতা
> মুদ্যোতং দ্যুতিমানিবাবতি সুখং তোয়ং তড়িত্বানিব।
> চাতুর্য্যঞ্চ চিনোতি যৌবনবয়ঃ সৌভাগ্য শোভামিব
> ক্ষেত্রে বীজমিবানঘে বিনিহিতং পাত্রে ধনং ধী ধনৈঃ ॥১২॥

ধী ধনৈঃ (ধী বুদ্ধিরেব ধনং যেষাং তৈঃ) ক্ষেত্রে (ভূমৌ) বীজং (উৎপত্তি কারণং বস্তু) ইব, অনঘে (নিষ্পাপে) পাত্রে বিনিহিতং (প্রদত্তং) ধনং (বস্তু) কর্ত্তৃ, শশী (চন্দ্রঃ) কৌমুদীং (জ্যোৎস্নাং) ইব, খ্যাতিং (প্রতিষ্ঠাং) পুষ্যতি (বর্দ্ধয়তি) চ (তথা) দ্যুতিমান্ (সূর্য্যঃ) উদ্যোতং (আলোকং) ইব, পূতাত্মতাং (পবিত্রাত্মত্বং) সূতে (জনয়তি) তথা, তড়িত্বান্ (মেঘঃ) তোয়ং (জলং) ইব, সুখং অবতি (রক্ষতি) যৌবনবয়ঃ, (তারুণ্য কালঃ) চাতুর্য্যং (চতুরতাং) ইব সৌভাগ্য শোভাং (সম্পৎ সৌন্দর্য্যং) চিনোতি (সংগৃহ্লাতি)। সৎ পাত্রায় প্রদত্তং ধনং সর্ব্বসম্পদাং নিদানং ভবতীতি ভাবঃ ॥১২॥

বুদ্ধিমান ব্যক্তিকর্ত্তৃক ক্ষেত্রে বীজের ন্যায় সৎ পাত্রে প্রদত্ত ধন, চন্দ্র যেমন জ্যোৎস্না বিস্তার করে, সেইরূপ খ্যাতি বিস্তার করে; সূর্য্য যেমন আলোক প্রসব করে, সেইরূপ পবিত্রতা প্রসব করে, মেঘ যেমন জল রক্ষা করে, সেইরূপ সুখ রক্ষা করে, যৌবন বয়স যেমন চাতুর্য্য সঞ্চয় করে সেইরূপ সম্পৎ সৌন্দর্য্য সঞ্চয় করে। (সৎপাত্রে প্রদত্ত ধন সর্ব্বসম্পদের কারণ) ॥১২॥

যে শীলং পরিশীলয়ন্তি ললিতং তে সন্তি ভূয়স্তরা
স্তপ্যন্তে ননু যে সুদুস্তর তপস্তে সন্তি চানেকশঃ।
তে সন্তি প্রচুরাশ্চ ভাস্বরতরং যে ভাব মাবিভ্রতে
যে দানং বিতরন্তি ভূরি করিবত্তে কেচি দেবাবনৌ ॥১৩॥

অবনৌ (পৃথিব্যাং) যে জনা ইতি শেষঃ ললিতং (সুন্দরং) শীলং (চরিত্রং) পরিশীলয়ন্তি (আচরন্তি) তে ভূয়স্তরাঃ (বহবঃ) সন্তি (ভবন্তি, তথা সুদুস্তরং তপঃ দুঃখেন তরীতুং শক্যং তপঃ) তপস্তে, তে অনেকশঃ (বহ্বর্থে শস্ প্রত্যয়ঃ) সন্তি; যে ভাস্বরতরং (অতিশয়েন দীপ্যমানং) ভাবং আবিভ্রতে (ধারয়ন্তি) তে প্রচুরাঃ (বহবঃ) সন্তি কিন্তু যে জনা ইতি শেষঃ। করিবৎ (হস্তী) ভূরি (বহু) দানং (ধনাদি দেয়ং বস্তু; পক্ষে মদং) বিতরন্তি (দদাতি) তে কেচিদেব (অত্যল্প সংখ্যকা এ চেত্যর্থঃ) সন্তীত্যনেনান্বয়ঃ। জগতি দাতারঃ সুদুর্লভা ইতি ভাবঃ ॥১৩॥

এ জগতে সুন্দর চরিত্র বিস্তার করেন এরূপ বহু সংখ্যক লোক আছেন; উগ্র তপস্যা করেন এরূপ লোকও অনেক এবং অত্যন্ত দীপ্তিমান্ ভাব ধারণ করেন, এরূপ লোকও প্রচুর আছেন, কিন্তু অবিরত ধনাদি বিতরণকারী ব্যক্তি অবিরত মদস্রাবী হস্তীর ন্যায় অত্যন্ত অল্পই দেখিতে পাওয়া যায় ॥১৩॥

সঞ্জাতাত্মজ সম্ভবাদিব মহাদেবী প্রসাদাদিবী
প্রাপ্তৈশ্বর্য্য পদাদিব স্থিরতর শ্রীভোগযোগাদিব।
লব্ধস্বর্ণ রসায়নাদিব সদা সঙ্গাদিব প্রেয়সাং
দেহীত্যক্ষরয়োঃ শ্রুতেরপি ভবেদ্দাতারদাতাননঃ ॥১৪॥

সঞ্জাতাত্মজ সম্ভবাৎ (সঞ্জাতঃ সম্যক্ উৎপন্নঃ য আত্মজঃ পুত্রঃ, তস্য সম্ভবাৎ উৎপত্তেঃ) ইব মহাদেবী প্রসাদাৎ (মহাদেব্যাঃ প্রসাদাৎ প্রসন্নতায়াঃ প্রসাদস্তু প্রসন্নতা ইত্যমরঃ) ইব, প্রাপ্তৈশ্বর্য্য পদাৎ (প্রাপ্তং লব্ধং যৎ ঐশ্বর্য্য পদং সম্পৎ

তস্মাৎ) ইব, স্থিরতর শ্রীভোগ যোগাৎ (স্থিরতরঃ নিশ্চলঃ যঃ শ্রিয়ঃ সম্পদঃ ভোগঃ তস্য যোগাৎ সম্পর্কাৎ) ইব, লব্ধ স্বর্ণ রসায়নাৎ (লব্ধং প্রাপ্তং যৎ স্বর্ণ রসায়নং সুবর্ণ ঘটিতৌষধং তস্মাৎ ইব, সদা (সর্ব্বেস্মিন্ কালে) প্রেয়সাং (অতিশয় প্রিয়ানাং) সঙ্গাৎ (সম্পর্কাৎ) ইব সর্ব্বত্র সাদৃশ্যে ইব শব্দঃ। তথা দাতা জনঃ ইতি শেষঃ দেহীতাক্ষরয়োঃ (বর্ণদ্বয়স্য) শ্রুতেঃ (শ্রবণাৎ) অপি অবদাতাননঃ (স্মরাননঃ "অবদাতঃ স্মিতো গৌর" ইত্যমরঃ যশসি ধবলতা বর্ণ্যতে হাস কীর্ত্ত্যোঃ ইত্যালঙ্কারিকাঃ।) ভবেৎ (স্যাৎ)। জনো যথা পুত্রোৎপত্যাদিভিঃ সঞ্জাতানন্দো ভবতি তথা দাতা জনো যাচক জনস্য দেহীতি বচনমাকর্ণ্য আনন্দিতো ভবেদিতি ভাবঃ॥১৪॥

পুত্রোৎপত্তি হইলে, মহাদেবী প্রসন্না হইলে, ঐশ্বর্য্যপদ প্রাপ্ত হইলে, নিশ্চয় সম্পদ ভোগ করিতে পারিলে, সুবর্ণ ঘটিত ঔষধ পাইলে এবং সর্ব্বদা প্রিয়জন সংসগ করিতে পারিলে লোকে যেমন আনন্দে সহাস্য মুখ হয়, সেইরূপ দাতা ব্যক্তি যাচকের "দাও" এই দুইটী অক্ষর শ্রবণ করিয়া সহাস্য মুখ হইবে॥১৪॥

ধৈর্য্যং ধাবতু দূরতঃ প্রবিশতু ধ্যানঞ্চ ধূমধ্বজে
শৌর্য্যং জর্জ্জরতাং প্রযাতু পটুতা দুষ্টাটবীং ঢৌকতাং।
রূপংকূপমুপৈতু মূর্চ্ছতু মতির্বংশোঽপি বিধ্বংসতাং
ত্যাগস্তিষ্ঠতু যেন সর্ব্বমচিরাৎ প্রাদুর্ভবেদপ্যসৎ॥১৫॥

ধৈর্য্যং (ধীরতা) দূরতঃ (দূরং) ধাবতু (গচ্ছতু) ধ্যানং চ (তথা) ধূমধ্বজে (বহ্নৌ) প্রবিশতু (গচ্ছতু) শৌর্য্যং (শূরতা) জর্জ্জরতাং (জীর্ণত্বং) প্রযাতু (প্রাপ্নোতু) পটুতা (পাণ্ডিত্যং) দুষ্টাটবীং (দুষ্টবনং) ঢৌকতাং (গচ্ছতু) রূপং (সৌন্দর্য্যং) কূপং উপৈতু (গচ্ছতু) মতিঃ (বুদ্ধিঃ) মূর্চ্ছতু (মোহং প্রাপ্নোতু) বংশঃ (পুত্রাদিঃ) অপি (তথা) বিধ্বংসতাং (নাশং) উপৈতু ইত্যনেনান্বয়ঃ। ধৈর্য্যাদিকং গচ্ছতু তত্র নাস্তি কাপি ক্ষতিরিতি ভাবঃ। কেবলং ত্যাগং (দানং) তিষ্ঠতু (বর্ত্ততাং) যেন (ত্যাগেন) অসৎ (অবিদ্যমানং) অপি সর্ব্বং (সকলং) অচিরাৎ (অল্পকালেনৈব) প্রাদুর্ভবেৎ (সম্ভবেৎ) ত্যাগঃ সর্ব্বসম্পদা সম্পদমিতি ভাবঃ॥ ১৫ ॥

ধৈর্য্য দূরে থাক, ধ্যান অগ্নিতে প্রবেশ করুক, শূরতা জীর্ণত্ব প্রাপ্ত হউক, পাণ্ডিত্য ঘোর বনে প্রস্থান করুক, রূপ কূপগত হউক, বুদ্ধি মোহ

প্রাপ্ত হউক এবং বংশও ধ্বংশপ্রাপ্ত হউক, (ক্ষতি নাই); একমাত্র ত্যাগ বিদ্যমান থাকুক, যে ত্যাগ দ্বারা অবিদ্যমান বস্তুসকলও প্রাদুর্ভূত হইবে॥ ১৫॥

কাব্যং কাব্যকলা কলাপকুশলান্ গীতঞ্চ গীতপ্রিয়ান্
স্মেরাক্ষী স্মরঘস্মরার্ত্তি বিধুরান্ বার্ত্তা-বার্ত্তারতান্॥
চাতুর্য্যঞ্চ চিরং বিচার চতুরাং স্তৃপ্নোতি দানং পুনঃ
সর্ব্বেভ্যোঽপ্যাধিকং জগন্তি যুগপৎপ্রীণাতি যস্ত্রিণ্যপি॥ ১৬

কাব্য (সাহিত্যং) কর্ত্তৃ, কাব্যকলাকলাপকুশলান্ (কাব্যশাস্ত্রসমূহ পরিদর্শিনঃ, জনান্ ইতি শেষঃ) তথা গীতং (গানং) কর্ত্তৃ, গীতপ্রিয়ান্ (সঙ্গীতানুরাগিণঃ), তথা স্মেরাক্ষী (সস্মিত নয়না কামিনীতি শেষঃ) স্মরঘ স্মরার্ত্তি বিধুরান্ (কামপীড়য়া পীড়িতান্ জনানিতি শেষঃ) চ (এবার্থে) বার্ত্তা (বৃত্তান্তঃ) বার্ত্তরতান্ (বৃত্তান্ত পরাণ) চাতুর্য্যং (চতুরতা) চিরং নতু তৎক্ষণাৎ বিচার চতুরান্ চ তৃপ্নোতি (প্রীণাতি)। কাব্যাদয়ঃ সর্ব্বানেব জনান্ প্রীণয়িতুং ন শক্নুবন্তীতি ভাবঃ। পুনঃ (কিন্তু) যৎ (যথাৎ) দানং (ত্যাগঃ) কর্ত্তৃ, ত্রীণি (স্বর্গমর্ত্তপাতালরূপাণি) জগন্তি (ভুবনানি) যুগপৎ (এককালে) নতু বিভিন্ন সময়ে ইতি ভাবঃ। প্রীণাতি (তৃপ্নোতি) অতঃ সর্ব্বেভ্যঃ (কাব্যাদিভ্যঃ) দানং অধিকং (উৎকৃষ্টং) দানাদুত্তমং নাস্তি ইতি ভাবঃ॥ ১৬॥

কাব্য কাব্যশাস্ত্রদর্শীদিগকেই, গীত গীতপ্রিয়দিগকেই, সস্মিত নয়না কামিনী কামপীড়িতদিগকেই, ইতিবৃত্ত ঐতিহাসিকদিগকেই, এবং চতুরতা বিচার চতুরদিগকে বহুকালে প্রীতি প্রদান করে; কিন্তু একমাত্র দানই, এক কালে ত্রিজগৎকে প্রীতি করে; অতএব দানই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ॥ ১৬॥

অথ শীলপ্রক্রমং—

শীলাদেব ভবন্তি মানব মরুৎসম্পত্তয়ঃ পত্তয়ঃ
শীলাদেব ভুবি ভ্রমন্তি শশভূবিস্ফূর্ত্তয়ঃ কীর্ত্তয়ঃ।
শীলাদেব পতন্তি পাদপুরতঃ সচ্ছক্তয়ঃ শক্তয়ঃ।
শীলাদেব পুণন্তি পাণি পুটকং সর্ব্বর্দ্ধয়ঃ সিদ্ধয়ঃ॥১৭॥

শীলাৎ (চারিত্র্যাৎ) এব, মানবমরুৎসম্পত্তয়ঃ (মনুষ্যদেবর্দ্ধয়ঃ) পত্তয়ঃ ভবন্তি (স্বয়মেব পাদচারে নৈবোপস্থিতা ভবন্তি) তথা শীলাদেব ভুবি (পৃথিব্যাং) শশ-

ভূত্বিস্ফূর্ত্তয়ঃ (চন্দ্রবদ্‌বিশদাঃ)· কীর্ত্তয়ঃ (যশাংসি) ভ্রমন্তি (সঞ্চরন্তি) তথা শীলাদেব সচ্ছক্তয়ঃ (সাধূনাং শক্তয়ঃ) শক্তয়ঃ (পত্ন্যোভূত্বা) পাদপুরতঃ (পাদসন্নিধৌ) পতন্তি, তথা শীলাদেব সর্ব্বর্দ্ধয়ং (সর্ব্বা সকলা ঋদ্ধিঃ সম্পৎ যা স্থতাঃ) সিদ্ধয়ঃ, পাণি-পুটকং (করপুটং) পুনন্তি (পবিত্রং কুর্ব্বন্তি) শীলমেব সর্ব্বসম্পদাং নিদান মিতি ভবঃ ॥১৭॥

সচ্চরিত্রতা হইতে সার্ব্বভৌম রাজারও সম্পত্তি আপনা হইতে পাদচার করিয়া :নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়। চরিত্র বল হইতেই চন্দ্রের ন্যায় বিশদ কীর্ত্তি জগতে বিস্তৃত হয় ; চরিত্রবল হইতেই সাধুদিগের শক্তিও পত্নী-স্বরূপে আসিয়া চরণতলে নিপতিত হয় ; চরিত্রবলেই সর্ব্ব সম্পৎশালিনী সিদ্ধি করপুট পবিত্র করে ; (চরিত্রই সর্ব্বসম্পদের মূলীভূত কারণ) ॥১৭॥

বাল্লভ্যং বিতনোতি যচ্ছতি যশঃ পুষ্ণাতি পুণ্যপ্রথাং
সৌন্দর্য্যং সৃজতি প্রভাং প্রথয়তি শ্রেয়ঃ শ্রিয়ং সিঞ্চতি।
প্রীণাতি প্রভুতাং ধিনোতি চ ধৃতিং সূতে সুরৌকঃ স্থিতিং
কৈবল্যং করসাৎ করোতি সুভগং শীলং নৃণাং শীলিতং ॥১৮॥

শীলিতং (আচরিতং) শীলং (চরিত্র্যং) নৃণাং (নরানাং) বাল্লভ্যং (প্রিয়ত্বং) বিতনোতি (বিস্তারয়তি) যশঃ (কীর্ত্তিং) ইচ্ছতি (দদাতি) পুণ্যপ্রথাং (পবিত্র খ্যাতিং) পুষ্ণাতি (বর্দ্ধয়তি) সৌন্দর্য্যং (সুন্দরতাং)সৃজতি (জনয়তি) প্রভাং (দীপ্তিং) প্রথয়তি (বিস্তারয়তি) শ্রেয়ঃ শ্রিয়ং (কল্যাণসম্পদং) সিঞ্চতি ; প্রভুতাং (প্রভূত্বং) প্রীণাতি (তৃপ্নোতি) ধৃতিং (ধৈর্য্যং) ধিনোতি (সঞ্চিনোতি) সুরৌকঃ স্থিতিং (স্বর্গাবস্থানং) সূতে (জনয়তি) সুভগং (সুখকরং) কৈবল্যং (মুক্তিং) চ করসাৎ (হস্তগতং) করোতি ॥১৮॥

স্বচ্চরিত্রতা মানবের ঐশ্বর্য্য বিস্তার করে, যশোদান করে, পবিত্র খ্যাতি বিস্তার করে, কল্যান সম্পদ বর্দ্ধিত করে, প্রভুত্বের প্রীতি জন্মায়, ধৈর্য্যসঞ্চয় করে, সর্গাবস্থিতি প্রসব করে এবং সুখকর মুক্তি হস্তগত করে ॥১৮॥

তাবদ্ব্যালবলঞ্চ কেশরিকুলং তাবৎ ক্রুধা ব্যাকুলং
তাবৎ ভোগিভয়ং জলঞ্চ জলধে স্তাবদ্‌ভৃশং ভীষণং ॥
তাবচ্চাময় চৌর বন্ধ রণভী স্তাবল্লসন্ত্যগ্নয়ো
যাবন্নৈতি জগজ্জয়ী হৃদি মহান্ শ্রীশীল মন্ত্রাধিপঃ ॥১৯॥

যাবৎ (যৎকাল পর্য্যন্তং) জগজ্জয়ী (সংসার জেতা) মহান্ (উত্তমঃ) শ্রীশীল মন্ত্রাধিপঃ (শ্রীতিশব্দসূচকঃ শব্দঃ শীলমেব মন্ত্রাধিপঃ মন্ত্ররাজঃ) হৃদি (চেতসি) নৈতি (ন আগচ্ছতি) তাবৎ (তৎকাল পর্য্যন্তং) ব্যালবলং (পশুকুলং) ভীষণ-মিত্যনেনান্বয়ঃ তথা তাবদেব ক্রুধা (কোপেন) ব্যাকুলং, কেশরিকুলং (সিংহ সমূহং) ভীষণ মিত্যনেনান্বয়ঃ তথা তাবদেব ভোগিভয়ং (সর্পভীতিঃ) তথা তাবদেব জলধেঃ (সমুদ্রস্য) জলং (বারি) ভৃশং (অত্যন্তং) ভীষণং (ভয়ানকং) তথা তাবদেব আময়চৌরবন্ধরণভীঃ (আময়ঃ রোগঃ, চৌরঃ তস্করঃ, বন্ধঃ বন্ধনং, রণঃ সংগ্রামঃ তেভ্যঃ ভীঃ ভয়ং) তথা তাবদেব অগ্নয়ঃ (বহ্নয়ঃ) ভয়ানকাঃ সন্ত ইতি শেষ ; লসন্তি (দীপ্যন্তে)। শীলিব্যালব্যালাদি ভীতি র্নাস্তি ইতি ভাবঃ ॥১৯॥

যে পর্য্যন্ত জগজ্জয়ী মহান্ শীলরূপী মন্ত্রাধিরাজ হৃদয়ে সমাসীন না হয়, সেই পর্য্যন্তই পশুকুল, ক্রুদ্ধ কেশরিকুল, সর্প ও সমুদ্র জল ভীষণ হইয়া থাকে এবং রোগ, চৌর, বন্ধন ও সংগ্রামের ভয় থাকে, সেই কাল পর্য্যন্তই অগ্নি ভীষণ আকার ধারণ করিয়া দীপ্ত :পাইতে থাকে। অর্থাৎ হৃদয়ে শীলতা উপস্থিত হইতে কিছুরই ভয় থাকে না ॥১৯॥

ন্যস্তা তেন কুলপ্রশস্তিরমলা শীতদ্যুতের্মণ্ডলে
ভ্রাম্যং স্তেন নভস্বতাং সহচরশ্চক্রে স্বকীর্ত্তের্ভরঃ।
তেনালেখিনিজাভিধানমনঘং বিম্বে চ রোচিষ্মতঃ
কামং কামিতকাম কামকলশং যঃ শীলমাসেবতে ॥ ২০ ॥

যঃ জন ইতি শেষঃ, কামিতকাম কামকলশং (কামিতং ইপ্সিতং যৎ কামস্য কামকলসং অভিলাষকুম্ভং) শীল বিশেষণমেতৎ, তৎশীলং (চরিত্রং) আসেবতে (আচরতি) তেন জনেন শীতদ্যুতেঃ (চন্দ্রস্য) মণ্ডলে ; অমলা (বিশদা) কুলপ্রশস্তি (বংশপ্রাধান্যং) ন্যস্তা (অর্পিতা) তথা তেন (জনেন) ভ্রাম্যন্ (বিচরন্) স্বকীর্ত্তেঃ (স্বযশসঃ) ভরঃ (সম্ভারঃ) নভস্বতাং (বায়ুনাং) সহচরঃ (অনুচরঃ) চক্রে (বিদধে) তথা তেন জনেন, অনঘং (নিষ্পাপং) নিজাভিধানং (নিজনাম) রোচিষ্মতঃ (সূর্য্যাস্য) বিম্বে (মণ্ডলে) অলেখি (লিখিতং)। চন্দ্রসূর্য্যাদ্যবস্থানকাল পর্য্যন্তং শীলিনঃ কীর্ত্তিরবতিষ্ঠতে ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥২০॥

যে ব্যক্তি ঈপ্সিত কামকুম্ভসদৃশ শীলের সেবা করে, সে চন্দ্রমণ্ডলে নিজের কুলপ্রশস্তি স্থাপন করে, ভ্রমণশীল নিজকীর্ত্তি সম্ভারকে বায়ুর সহচর করে এবং

স্বকীয় নিষ্পাপ নাম সূর্য্যমণ্ডলে লিপিবদ্ধ করে॥ চন্দ্রসূর্য্যের অবস্থানকাল পর্য্যন্ত চরিত্রবান্ ব্যক্তির খ্যাতি অবস্থিত থাকে অর্থাৎ চিরস্থায়িনী হয় ॥২০॥

> ন স্বর্ভোজ্যমিব ত্যজন্তি বদনাৎ স্বর্যোষিতস্তদ্‌যশো
> নৈর্বোজ্মন্তি তদঙ্ঘ্রি রেণুমমরা মৌলেশ্চ মালামিব।
> সিদ্ধধ্যান মিবোদ্‌বহন্তি হৃদয়ে তন্নাম যোগীশ্বরাঃ
> শীলালঙ্কৃতি মঙ্গসঙ্গতি মতীং যে জন্তবঃ কুর্ব্বতে॥ ২১ ॥

যে জন্তবঃ (প্রাণিণঃ) শীলালঙ্কৃতিং (চরিতালঙ্কারং) অঙ্গসঙ্গতিমতীং (অঙ্গে শরীরে সঙ্গতিঃ সম্পর্কঃ, বিদ্যতে অস্যাঃ তাং) কুর্ব্বতে (কুর্ব্বন্তি) তৎ (তেষাং যশ (কীর্ত্তিং) স্বর্যোষিতঃ (স্বর্গস্থাঃ কামিণ্যঃ) স্বর্ভোজ্যং (সুধাং) ইব বদনাৎ (মুখাৎ) ন ত্যজন্তি (ন উজ্মন্তি) অমরাঃ (দেবাঃ) তদঙ্ঘ্রি রেণুং (তচ্চরণ রজঃ) মালাং (পুষ্পস্রজং) ইব মৌলেঃ (শিরসঃ) নৈর্বোজ্মন্তি (ন ত্যজন্তি) যোগীশ্বরাঃ (যোগিশ্রেষ্ঠাঃ) তন্নাম (তদভিধানং) সিদ্ধধ্যানং (সিদ্ধ মন্ত্রং) ইব, হৃদয়ে (চিত্তে) উদ্‌বহন্তি। শীলিনাং যশঃ দেব্যোঽপি গায়ন্তি; দেবা অপি তচ্চরণেররজঃ শিরসি ধারয়ন্তি; যোগিনোঽপি তন্নাম স্মরন্তীতি ভাবঃ॥২১॥

যাঁহারা চরিত্ররূপ অলঙ্কার দ্বারা শরীর ভূষিত করেন, তাঁহাদের যশঃ দেবাঙ্গনাগণ সুধার ন্যায় মুখচ্যুত করেন না; দেবতারাও তাঁহাদের পদরজঃ পুষ্পমালার ন্যায় মাথায় ধারণ করিয়া থাকেন; যোগীশ্বরগণ তাঁহাদের নাম সিদ্ধধ্যানের ন্যায় হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকেন॥ ২১ ॥

(ক্রমশঃ)

হিন্দু দর্শন।

বৌদ্ধদর্শন ও শঙ্কর দর্শন।

বুদ্ধদেবের "পরি-নির্ব্বাণ" বৌদ্ধদর্শন ও শ্রীশঙ্করাচার্য্যের "মায়াবাদ" শঙ্কর-দর্শন নামে খ্যাত। শ্রীচৈতন্যদেব মায়াবাদকে "অসৎ-শাস্ত্র" ও "প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মত" বলিয়াছেন। হিন্দুগণ "বৌদ্ধদর্শনকে" নাস্তিক দর্শন আখ্যা দিয়া থাকেন; কারণ হিন্দুগণের মতে যিনি বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার করেন না ও পুনর্জন্মতত্ত্বে বিশ্বাস করেন না, তিনিই নাস্তিক। শ্রীচৈতন্যদেব সুপ্রসিদ্ধ

নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক বাসুদেব সার্ব্বভৌমের মুখে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ ব্যাখ্যা শুনিয়া বলিয়াছিলেন যে "বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ নাস্তিক হয়, কিন্তু বেদ মানিয়া যে নাস্তিকতা তাহা আরও ভয়ঙ্কর, এবং মায়াবাদ ভাষ্য শুনিলে সর্ব্বনাশ হয়।" ইহাদ্বারা অন্ততঃ এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে বুদ্ধদেবের পরি-নির্ব্বাণতত্ত্ব ও শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদতত্ত্ব একই তত্ত্ব*। বৌদ্ধ দর্শনের পারগামিনী বিদুষী মহিলা ম্যাডাম্ ব্লাভাট্স্কী বলেন—শ্রীশঙ্করাচার্য্য বুদ্ধদেবের অবতার।

"Shankaracharya was reputed to be an Avatara, an assertion the writer implicitly believes in, but which other people are, of course, at liberty to reject. And as such he took the body of a southern Indian, newly-born Brahman baby, that body, for reasons as important as they are mysterious to us, is said to have been animated by Gantana's astral remains." (The Secret Doctrine, Vol. III. p. 380).

শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে আছে—

"বৌদ্ধম্—বুদ্ধকৃত নিরীশ্বর শাস্ত্রম্। তৎ সর্ব্বৈঃ শাস্ত্রকারৈঃ খণ্ডিতং অগ্রাহ্যম্। ইতি শ্রীভাগবতম্॥ বৌদ্ধশাস্ত্র সংস্থাপনকর্ত্তা বৃহস্পতিঃ।" বৌদ্ধ দর্শন বুদ্ধদেব কৃত নিরীশ্বর শাস্ত্র। ইহা সর্ব্ব শাস্ত্রকারগণই খণ্ডন করিয়াছেন ও অগ্রাহ্য করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ইহার প্রমাণ আছে। বৃহস্পতি বৌদ্ধশাস্ত্রের সংস্থাপন কর্ত্তা। মৎস্যপুরাণের চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে বৃহস্পতি এই শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া রজিপুত্রদিগকে মুগ্ধ করেন এবং সর্ব্ব ধর্ম্ম বহিষ্কৃত রজিপুত্রদিগকে ইন্দ্র বজ্রদ্বারা নিধন করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকে আছেঃ—

"ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সংমোহায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধো নাম্নাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি॥"

দেবদ্রোহী অসুরদিগের সম্মোহনের জন্য কলির প্রারম্ভে অঞ্জনাসুত বুদ্ধ কীকটদেশে জন্মগ্রহণ করিবেন। শ্রীধর স্বামী বলেন—কীকটদেশে অর্থাৎ

* এ কথা আমরা স্বীকার করি না। পঃ সং।

গয়া প্রদেশে এবং অঞ্জনাসুতের 'অজিনসুত' পাঠও দৃষ্ট হয়। মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় পাণিগ্রন্থ হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে গৌতম বুদ্ধ গয়াপ্রদেশে বোধিসত্ব লাভ করেন, এই জন্য কীকটদেশে বা গয়াপ্রদেশে তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত পাওয়া যায়।

বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে নানা গ্রন্থে নানারূপ মত প্রকটিত হইয়াছে, তজ্জন্য বৌদ্ধ মতের প্রকৃত মর্ম্ম উদ্ধারণ করা সুকঠিন। শ্রীযুক্তা আনী বেশান্ত মহোদয় বলেনঃ—

"A religion can only be understood by sympathy; a religion can only be expounded by the speaker placing himself for the time being, in the hart of that religion and showing it forth as it would appear to its most devoted and learned adherents." (Four Great Religions, p. II")

বাস্তবিকই কোন ধর্ম্মের প্রকৃত সন্দর্ভ পরিজ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করিলে সেই ধর্ম্মের বিশ্বাসী ও ধার্ম্মিক শিষ্যমণ্ডলীর মতামত সবিশেষ আদরণীয়। বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে প্রকৃততত্ব ম্যাডাম্ ব্লাভাট্‌স্কীর গুপ্তবিদ্যায় (Secret Doctrine) যেরূপ পাণ্ডিত্যের সহিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেইরূপ মর্ম্মোদ্‌ঘাটক আর কোন গ্রন্থকার করিতে পারেন নাই। (Dr. Rhys Davids) ডাক্তার রসদেবিদ্ বৌদ্ধদর্শনে অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং অধুনা সভ্যজগতে তৎপ্রণীত বৌদ্ধশাস্ত্র সমধিক আদর ও প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। তিনি বলেন, "Budhism is diametrically apposed to Hinduism," অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। হিন্দুশাস্ত্রও এ যাবৎকাল বৌদ্ধধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধবাদীই জ্ঞান করিয়া আসিয়াছেন। ম্যাডাম্ ব্লাভাট্‌স্কী শ্রীশঙ্করাচার্য্যকে বুদ্ধদেবের অবতার স্বাকার করিয়া ও বৌদ্ধমত এবং মায়াবাদ এক তত্বরূপে বিবৃত করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের উক্তিরই পোষকতা করিয়াছেন।

হিন্দুশাস্ত্র বৌদ্ধদর্শনকে চার্ব্বাক দর্শনের অনুচর বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, উদয়নাচার্য্য কৃত "পরমাত্ম নিরূপণ কুসুমাঞ্জলি" নামক সুপ্রসিদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রের প্রথম স্তবকটীকায় শ্রীরামভদ্রাচার্য্য বলিয়াছেনঃ—

"শরীরাণ্যেব চেতনানি গৌরোঽহং জানামীত্যাদিজ্ঞানেন গৌরবত্ব জ্ঞান-

বস্তুয়োঃ সামানাধিকরণ্যানুভবাদিতি চার্ব্বাকানাং মতঞ্চ। তেষাং মতে জগতঃ ক্ষণভঙ্গুরত্বং নযন্তু ক্ষণভঙ্গঃ পূর্ব্ব পুঞ্জাচ্চোত্তর পুঞ্জোৎপত্তিস্তথা চ পুঞ্জ-নিষ্ঠ এব কুর্ব্বদ্রূপত্বাখ্য জাতিবিশেষঃ স্মরণ জনকতাবচ্ছেদক ইতি ন দোষঃ।”

বৌদ্ধধর্ম্মের দশবিধ মত এইঃ—

"বদন্তি পুত্র আত্মেতি (১) দৃঢ় প্রাকৃতবুদ্ধয়ঃ।
দেহ আত্মেতি (২) চার্ব্বাকা ইন্দ্রিয়াণ্যপরে চ তে (৩)॥
তেঽন্যে প্রাণ (৪) স্ততোঽন্যে তে মন (৫) আত্মেতিবাদিনঃ।
বুদ্ধিরাত্মেতি (৬) বৌদ্ধা বৈ শূন্যমাত্মেতি (৭) তেঽপরে॥
যাজ্ঞিকা যজ্ঞপুরুষং সর্ব্বজ্ঞং (৮) সৌগতা বিদুঃ।
নিরাবরণ (৯) মাহর্ষং দিগম্বরমতানুগাঃ॥
চার্ব্বাকাশ্চপি লোকানাং ব্যবহার প্রসিদ্ধকম্ (১০)॥

ইত্যাত্মপ্রকাশঃ॥

চার্ব্বাকগণ বলেন আমি গৌরবর্ণ, আমি শ্যামবর্ণ, আমি স্থূল, আমি কৃশ ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহারে আত্মাই গৌর শ্যাম স্থূল কৃশাদি ভাবে হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। কিন্তু গৌর স্থূলতাদি ধর্ম্ম সচেতন ভৌতিক শরীরেই লক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে সচেতন দেহই আত্মা, তদতিরিক্ত আত্মা নাই।

বৌদ্ধদর্শনের প্রতি হিন্দুশাস্ত্রের এই বিদ্বেষ কি কোন অভিসন্ধিমূলক? আমরা তাহা মনে করিতে পারি না। কারণ কুসুমাঞ্জলির টীকাকার ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পুরাণশাস্ত্র স্বার্থান্ধ হইয়া প্রকৃত সত্যের অপলাপ করিয়াছেন এ কথা মনে করিতেও হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মণযুগেই (Brahmanical Period) আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্ম্মের এবং বেদ পুরাণ দর্শনাদি শাস্ত্রের সাতিশয় উৎকর্ষ সাধিত হয়। আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্ম্ম বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার করিতে, পুরাণ শাস্ত্রের সত্যতা উপলব্ধি করিতে, ঈশ্বর ও তেত্রিশ কোটী দেবতার পূজা করিতে অত্যন্ত ব্যগ্র। যদি কোন ধর্ম্ম প্রচারক ঈষৎ ইঙ্গিতেও এই আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধমত প্রচার করিয়া থাকেন তাহা হইলে হিন্দুশাস্ত্র সেই মহাপুরুষকে বিষ্ণুর অবতার (যেমন বুদ্ধদেব নবম অবতার, কপিলাচার্য্য বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার) ও মহাদেবের অবতার (যেমন শ্রীশঙ্করা-

চার্য্য শ্রীশঙ্করের অবতার) বলিয়া পূজা করিতে প্রস্তুত ; কিন্তু তাঁহাদের প্রচারিত মত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। অদৃষ্টবাদী হিন্দু বলিবেন "ভগবান্ যাহা করেন তাহা আমাদের মঙ্গলের জন্যই করেন। বিষ্ণুর অবতার যে শূন্যবাদ ও মহাদেবের অবতার যে মায়াবাদ প্রচার করেন তাহার গূঢ় অভিপ্রায় এই যে তদ্দ্বারা আসুরী প্রকৃতির লোকদিগকে মুগ্ধ করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যা গোপন করা।" বুদ্ধদেব বিষ্ণুর অবতার। বুদ্ধদেবের প্রতি হিন্দুদিগের এই অনন্য সাধারণ উদারতা দেখিয়া ডাক্তার হুষ দেবিদ্ মোহিত হইয়াছেন। তিনি বলেনঃ—

"Wherever he (Buddha) went, it was precisely the Brahmins themselves who often took the most earnest interest in his speculations, though his rejection of the soul theory and of all that it involved was really incompatible with the whole theology of the Vedas, and therefore with the supremacy of the Brahmins."

শ্রীমতী আনীবেশান্ত বলেন বুদ্ধদেব নিজে হিন্দুদিগের আত্মা সম্বন্ধীয় মত ও তদুপরি স্থাপিত দেবতাবৃন্দকে অগ্রাহ্য করেন নাই, কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণ এই সাংঘাতিক ভ্রম করিয়া ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের অস্তিত্ব লোপ করেন।

"He (Buddha) did not reject the soul theory with all that it involves ; and when some of His followers committed this terrible blunder Buddhism became extinct in Iudia, for never will Hindus accept any so called religion that casts aside belief in the Gods, and in the immortality of man."

পূজার্হা আনী বেশান্ত ও ম্যাডাম্ ব্ল্যাভাট্স্কী হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার ব্রতে ব্রতী হইয়া সভ্য জগতের সমক্ষে পুরুষোত্তম, বুদ্ধদেব ও শ্রীশঙ্করাচার্য্যকে স্থাপিত করিয়া হিন্দুর গৌরব সহস্রগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

Dr Rhys Davids বলিয়াছেন :—

"He (Buddha) was no doubt the greatest of then all

(preciding Hindus); and most probably the world will come to acknowledge him, as in many respect, the most intellectual of the religions teachers of mankind. But Buddhism is essentially an Indian system. The Buddha himself was throughout his career, a characteristic Indian. And whatever his position as compared with other teachers in the West, we need here only claim for him, that he was the greatest and wisest and best of the Hindus."

হিন্দুগণের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর অধিক গৌরবের কথা কি হইতে পারে ? কিন্তু গৌড়দেশবাসী হিন্দুগণের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিকতর গৌরবের কথা আছে। গৌড়দেশবাসী ব্রহ্মবিৎ আচার্য্যগণ বার্ত্তিক শ্লোক নিরূপণ করিয়া বৌদ্ধদর্শনের শূন্যবাদ খণ্ডন করেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য গৌড়াচার্য্যদিগের বার্ত্তিক শ্লোক অনুসরণ করিয়া বুদ্ধমত নিরসণ করেন, এবং শ্রীচৈতন্যদেব অচিন্ত্যভেদাভেদ দ্বারা শ্রীশঙ্করের মায়াবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। কথিত আছে ন্যায়দর্শনকার গৌতম ঋষি (অক্ষপাদ ঋষি) গৌড়দেশবাসী ছিলেন, ষড়দর্শনকারদিগের মধ্যে একমাত্র তিনিই ন্যায়ের যুক্তিবলে ঈশ্বর নিরূপণ করিয়াছেন।

পঞ্চদশী বলেন :—গৌড়াচার্য্যা নির্ব্বিকল্পে সমাধাবন্য যোগিনাম্।
সাকার ধ্যাননিষ্ঠানামত্যন্তং ভয়মুচিরে ॥

অর্থাৎ বৌদ্ধদর্শন বলেন—"এই অনন্ত জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল অসৎমাত্র ছিল"—(অসদেবেদং এবাসীৎ। বৌদ্ধদিগের পক্ষে নির্ব্বিকল্প সমাধি—"অস্পর্শ যোগ," কারণ তাহারা ভীত হইয়া এই যোগকে স্পর্শ করিতে পারে না। বৌদ্ধগণ বলেন যে, এই পরিদৃশ্যমান চরাচর জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল "শূন্য মাত্র" ছিল (শূন্যমাসীৎ)।

বৌদ্ধগণ চারিশ্রেণীতে বিভক্ত :—(১) মাধ্যমিক, (২) যোগাচার, (৩) গোত্রান্তিক, (৪) বৈভাষিক। মাধ্যমিকদের মতে কিছুই নাই; সকলই শূন্য। স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্ট পদার্থ জাগ্রদাবস্থায় দৃষ্ট হয় না, এবং

জাগ্রদাবস্থায় দৃষ্ট পদার্থ স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্টিগোচর হয় না; আবার সুষুপ্তি-দশায় কিছুই দেখা যায় না। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে কোন বস্তুই সত্য নহে, সত্য হইলে অবশ্যই সকল অবস্থাতেই সত্যও দৃষ্ট হইত। যোগাচারদের মতে বাহ্য বস্তু মাত্রেই অলীক। কেবল ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপ আত্মাই সত্য। এই বিজ্ঞান দুই প্রকার—প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও আলয়-বিজ্ঞান। জাগ্রদাবস্থায় ও সুপ্তাবস্থায় যে জ্ঞান জন্মে তাহার নাম প্রকৃতি-বিজ্ঞান এবং সুষুপ্তি দশায় যে জ্ঞান জন্মে তাহার নাম আলয়-বিজ্ঞান। জ্ঞান কেবল আত্মাকেই অবলম্বন করিয়া থাকে। গোত্রান্তিকদের মতে বাহ্যবস্তু সত্য ও অনুমান সিদ্ধ। বৈভাষিক-দের মতে বাহ্যবস্তু সকল প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

বৌদ্ধদর্শনের শূন্যবাদ নিম্নলিখিত প্রণালীমতে খণ্ডিত হইয়াছে।

"সৎ—শূন্যয়ো র্বিরোধিত্বাৎ শূন্যমাসীৎ কথং বদ"—

সৎ বা ভাব এবং শূন্য বা অভাব, পরস্পর বিরোধী। "শূন্য"—অভাব বা নাস্তিত্ব, এবং "আসীৎ" ছিল বা অস্তিত্ব। "শূন্যের" সহিত "সতের", "অভা-বের" সহিত "ভাবের" সংযোগ অসম্ভব। "না সতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ"—অভাব কখনও ভাব হয় না, ভাব কখনও অভাব হয় না। সুতরাং "আদিতে শূন্য ছিল এইরূপ বাক্যই প্রয়োগ হইতে পারে না।

"বিয়দাদের্নামরূপে মায়য়া সতি কল্পতে।
শূন্যস্য নামরূপে চ তথা চেৎ জীব্যতাং চিরম্॥"

ব্যোম প্রভৃতির নাম, রূপ মায়াদ্বারা কল্পিত হয়, অর্থাৎ আকাশ, মরুৎ, তেজ, জল ও ক্ষিতির নামরূপ বাস্তবিক মিথ্যা, ব্রহ্ম অবিদ্যা কর্তৃক আচ্ছাদিত হওয়ায় ঐ সমস্ত নামরূপ কল্পিত হয়। সেইরূপ "শূন্যের" নামরূপ ও অবিদ্যা দ্বারা কল্পিত হইয়াছে। এইরূপ তর্ক উত্থাপিত করিলেও "শূন্যবাদ" থাকে না, কারণ "শূন্য" অভাব বা মিথ্যা। "সৎ ব্রহ্মে" অবিদ্যা প্রভাবে মিথ্যা কল্পনা হয়। "নিরধিষ্ঠানো ন ভ্রমঃ কচিদীক্ষতে"—আধার বা আশ্রয় শূন্য ভ্রম কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বিদ্যমান্ বস্তু বা সৎপদার্থেই অন্য পদার্থের বা ভ্রমের আরোপ হইতে পারে।

বৌদ্ধমতে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং মন ও বুদ্ধি এই দুই

উভয়েন্দ্রিয়, এই দ্বাদশ ইন্দ্রিয়ের আয়তন বলিয়া দেহকে দ্বাদশায়তন কহে। সকল বৌদ্ধমতেই ধনোপার্জ্জন দ্বারা এই দ্বাদশ আয়তন শরীরের সম্যক্ উপাসনা (শুশ্রূষা) করাই প্রধান কর্ম্ম। সকল বস্তুই ক্ষণিক, অর্থাৎ একক্ষণে উৎপন্ন ও পরক্ষণে বিনষ্ট হয় এবং আত্মাও নিত্য স্থায়ী নহে, ক্ষণিক জ্ঞান-স্বরূপ, ক্ষণিক জ্ঞানের অতিরিক্ত স্থিরতর আত্মা নাই। চার্ব্বাক মতের সহিত এই মতের অধিক কিছু বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। যদি আদিতে মহা শূন্যই থাকে, তাহা হইলে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম কোথা হইতে আসিল? যাহা ছিল না, তাহা হইতে কিছু হইতেও পারে না। যদি ক্ষিত্যাদিব বাস্তবিক অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া শুধু মায়াই বলা যায়, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিবে "চৈতন্য" কোথা হইতে আসিল? চার্ব্বাকগণ বলিবেন—পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই চারি তত্ত্বের রাসায়নিক সংযোগে "চৈতন্য গুণ" জন্মে। রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা অভিনব তত্ত্ব উৎপন্ন হইতে পারে না, বস্তুর অস্তিত্ব ধ্বংসও হয় না, উৎপন্নও হয় না। বস্তুব আকার পরিবর্ত্তিত হইতে পারে মাত্র। যদি আদিতে চৈতন্য না থাকে, তাহা হইলে রাসায়নিক প্রক্রিয়া চৈতন্য উৎপাদন করিতে পারে না। যদি বল "চৈতন্য" কোন অভিনবতত্ত্ব নহে, পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ুর রাসায়নিক সংযোগে চৈতন্য নামক একটী গুণ দৃষ্ট হয়। "চৈতন্যের" গুণ কর্ত্তৃত্ব, জ্ঞাতৃত্ব ও সামঞ্জস্য রক্ষা। পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই চারি তত্ত্বকে কে রাসায়ণিক সংযোগে সংযুক্ত করিবে? যেখানে যেরূপ সংযোগ প্রয়োজন, সেইরূপ সংযোগ বা সামঞ্জস্য রক্ষা কে করে? কোন্ কোন্ বস্তু সংযুক্ত করিলে কিরূপ ফল উৎপন্ন হইবে এই বুদ্ধি পূর্ব্বক সংযোগে কে করে? যদি বল যে কর্ত্তৃত্ব, জ্ঞাতৃত্ব ও সামঞ্জস্য রক্ষা পৃথিবী, জল,তেজ ও বায়ুর "স্বভাব," তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিবে "স্ব" কে, কোন"স্ব"এর ভাব? ভাবের আশ্রয় যিনি তিনিই "স্ব"। চৈতন্য একটী ভাব-পদার্থ, সুতরাং যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া চৈতন্য অবস্থান করেন তিনিই ভাবপদার্থ। অতএব আদিতে মহাশূন্য ছিল এরূপ বলা অযৌক্তিক। যদি বল, এই চৈতন্য একটী কল্পিত ভাব। তাহা হইলে 'কল্পনা' ক্রিয়ার কর্ত্তার প্রয়োজন হইবে। যদি বল স্বভাব "সৎ" ও "চিবকল্পিত," তাহা হইলে বলিতে হইবে সূর্য্যই অন্ধকার এবং অন্ধকারই সূর্য্য। যাহা আছে তাহা সৎ, যাহা নাই তাহা

কল্পিত। "সৎ' কখনও কল্পিত হইতে পারে না, এবং "কল্পিত" বলিলে প্রশ্ন উঠিবে কাহার কল্পিত? এস্থানে কল্পনা ক্রিয়ার কর্ত্তা কে? এ কথা ঠিক বটে যে অন্নের বিকার শুক্র শোণিত ও তাহাদের সংযোগে স্থূল শরীর গঠিত হয়। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে "চেতন" ব্যক্তির কর্ত্তৃত্ব ভিন্ন অন্ন শুক্র শোণিতে পরিণত হয় না এবং "চেতন" ব্যক্তিদ্বয়ের সংযোগ ভিন্ন শুক্র শোণিতে চৈতন্য সঞ্চারিত হয় না। যদি বল যে অচেতন গোময় হইতে কীট কিরূপে উৎপন্ন হয়? ইহার উত্তর এই যে গোময় অচেতন নহে। চৈতন্য নিরাকার, চৈতন্য হইতেই গোময় বিকাশিত হইয়াছে, চৈতন্যের প্রকৃতিই স্থূলভূত পদার্থ। চৈতন্য পুরুষ এবং নামরূপযুক্ত পদার্থ প্রকৃতি। যেরূপ তর্কেরই অবতারণা কর না.কেন, কোন মতেই "চৈতন্যের" হাত এড়াইয়া বাহিরে যাইবার সাধ্য নাই।

বৌদ্ধমতে দুঃখ, আয়তন, সমুদয় ও মার্গ এই চারিতত্ত্ব, বিজ্ঞানস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ ও রূপ নাম ধর্ম্মায়তন। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ বিষয় (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ) এবং মন ও বুদ্ধি এই দ্বাদশটি আয়তন তত্ত্ব। মনুষ্যদিগের অন্তঃকরণে স্বভাবতঃ যে রাগদ্বেষাদি জন্মে তাহাকে সমুদয় তত্ত্ব কহে। সকল সংস্কারই ক্ষণমাত্র স্থায়ী এইরূপ যে স্থির বাসনা, তাহার নামই মার্গতত্ত্ব বা মোক্ষতত্ত্ব। বৌদ্ধগণের "নির্ব্বাণ-মোক্ষ"? মোক্ষতত্ত্বের বিশেষ বিবরণ পরে আলোচিত হইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীজানকীনাথ পাল, শাস্ত্রী।

পঞ্চীকরণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সহোবাচ গান্ধর্ব্বী কথং বাস্মাসু জাতাসৌ গোপালঃ কথং বা জ্ঞাতোসৌ ত্বয়ামুনে কৃষ্ণঃ কোবাস্য মন্ত্রঃ। কিং বাস্য স্থানং কথং বা দেবক্যাং জাতঃ কোবাস্য জ্যায়ান্ রামো ভবতি। কীদৃশী পূজাস্য গোপালস্য ভবতি। সাক্ষাৎ প্রকৃতেঃ পরোঽয়মাত্মা গোপালঃ কথং ত্ববতীর্ণোভূম্যাং হি বৈ সহোবাচ তাং হি বৈ॥ ২৬॥

দুর্ব্বাসার নিকট শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ তত্ত্বাবগত হইয়া গান্ধর্ব্বী গোপী দুর্ব্বাসাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, এবম্ভূত শক্তিমান্ আত্মা যাঁহাকে গোবিন্দ বলিয়া বেদে উক্ত করিয়াছেন, তিনি কি হেতু আমাদিগের গোপকুলে জাত হইয়াছেন এবং ইনিই যে সেই পরমাত্মা, তাহা আপনিই বা কি প্রকারে জ্ঞাত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণই যদি ঈশ্বর, তবে ইহাঁর মন্ত্রই বা কি ও অবস্থিতিই বা কোথা, দেবকী গর্ভে জন্মিবার কারণ কি, বিশেষতঃ ইহাঁর জ্যেষ্ঠ বলরাম তিনিই বা কে, রূপ নামাদিই বা কি, কীদৃশী ইহাঁদিগের পূজা, সাক্ষাৎ প্রকৃতির পর পরমাত্মা পরম পুরুষ গোবিন্দ কি নিমিত্তেই বা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন,—এতৎ প্রশ্ন প্রাপ্তে দুর্ব্বাসা গন্ধর্ব্বীকে তৎপ্রশ্নের উত্তর করিতেছেন।

একোহবৈ পূর্ব্বং নারায়ণোদেবঃ ॥ ২৭ ॥

পূর্ব্বে এক পুরুষ মাত্র নারায়ণ ছিলেন। তিনি স্বদেহ দীপ্তিতে প্রলয়ান্ধকারকে নিবারণ করেন, এতদর্থে তাঁহার নাম দেব। তদ্ভিন্ন দ্বিতীয় ছিল না; এ কারণ তাঁহাকে এক কহে। যিনি সকলের আত্মা, অথবা স্বশক্তিতে সকল জগতে পরিপূর্ণ রহিয়াছেন, এহেতু তাঁহাকে পুরুষ বলা যায়। ইহা ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের প্রথমাধ্যায়ে পুরুষসূক্তে উক্ত হইয়াছে, সকলের আশ্রয়ভূত ভূতাবাস বা সকলের অন্তরাত্মা অথবা জলরূপ, কিম্বা জলশায়ী, এতৎ কারণ পুরুষকে নারায়ণ বলিয়া আখ্যাত করা যায়। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণেতিহাসাদি সকল শাস্ত্রেই উক্ত আছে, যথা—"আপোনারা ইতি প্রোক্তা আপোবৈনরসূনবঃ। তা যদস্যায়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণ স্মৃতঃ॥" ইতি তথাহি—"আপোনারায়ণঃ সাক্ষাৎ আপোবৈ সর্ব্বদেবতা ইতি"। সুতরাং নারায়ণ ব্রহ্ম, তদর্থে নারায়ণ ও এক আত্মবোধোপনিষদেও স্পষ্ট কহিয়াছেন, যথা, "একোহবৈ পুরুষো নারায়ণ আসীদিতি"; অতএব নারায়ণই আত্মা শ্রুতি সমন্বয়ে প্রাপ্ত হইতেছে, যথা,—"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চিন মিষদিতি শ্রুতিঃ"। এতদর্থে ব্রহ্মবাচক নারায়ণ শব্দ বলিয়া নিরাকার বলা যাইতে পারে না; যেহেতু উত্তরা শ্রুতিতে তাঁহার অবয়বের প্রমাণ হইতেছে, যথা :—

যস্মিল্লোকাস্তুতাশ্চ প্রোতাশ্চ তস্য হৃৎপদ্মাজ্জাতোহব্জয়োনিঃ তপিত্বা তস্মৈ হি বরং দদৌ ॥ ২৮ ॥

ঋষি কহিতেছেন, সেই নারায়ণ এই জগতে পরাবররূপে ব্যাপ্তময় রহিয়া-

ছেন, ওতঃ প্রোতঃ (তন্তুবায় নির্ম্মিত বস্ত্রের দীর্ঘ সূত্রের নাম ওত ; প্রস্থ সূত্রের নাম প্রোত) অর্থাৎ অন্তর্ব্বহিস্থ নারায়ণ একমাত্র। তাঁহার হৃৎপদ্ম হইতে ব্রহ্মা জন্মিয়াছিলেন, যাঁহাকে পদ্মযোনী কহে, তিনি পদ্মমধ্যে থাকিয়া তপস্যা করেন। ভগবান নারায়ণ তাঁহাকে বর প্রদান করেন, (বর শব্দে সৃষ্টি সামর্থ্য বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বেদ প্রদান করেন) ইহাতে শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি প্রমাণে প্রামাণ্য হইতেছে, যথা,—"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ ইত্যাদি"। যাঁহার শরীর হইতে পদ্ম উৎপত্তি হইল, তাঁহাকে অশরীরী কহা যায় না। বৃহদারণ্যক ও নারায়ণ এবং মহোপনিষদাদি হইতে তাহার উদাহরণ দিতেছি, যথা,—

"আত্মা পুরুষবিধঃ স একাকী ন রমেত" "অহং বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি" তথা নারায়ণোহকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়মিতি" "তস্য ধ্যানান্তস্থস্য ললাটাৎ স্বেদোহপতদিতি" এই সকল শ্রুতি প্রমাণে পরমাত্মা নারায়ণ সাকার প্রতিপাদিত হইয়াছে। বিশেষতঃ যখন বৃহদারণ্যকে "আত্মা একাকী থাকিতে সুখী হইলেন না" স্বীকার করিয়াছেন, তখন স্পষ্ট তাঁহাকে শরীরী কহিয়াছেন, যেহেতু দেহবান্ ব্যতীত সুখ দুঃখের অনুভব কদাপি হয় না, ফলতঃ শরীর না থাকিলে কপাল ঘর্ম্মে জলোৎপত্তির কথা বেদে কেন রহিয়াছে।

স কাম প্রশ্নমেব বব্রে তং হ্যস্মৈ দদৌ ॥ ২৯ ॥

অনন্তর ব্রহ্মা নারায়ণের নিকট আত্ম অভিলষিত বর যাচ্ঞা করাতে নারায়ণ তাঁহাকে মনোভিমত বর প্রদান করিলেন।

এখানে সুধীগণ বিচার করিয়া দেখিবেন যে, জ্ঞানাভিমানী অজ্ঞানীরা আপনাদিগকে বেদজ্ঞ বলিয়া মনুষ্যবৎ কর্ম্মদৃষ্টে শ্রীকৃষ্ণ প্রতি যে বিদ্রূপ করিয়া থাকেন, সে কেবল তাঁহাদিগের আপনার স্বভাব ব্যক্ত করা মাত্র। কারণ বেদ প্রতি দৃষ্টি না থাকাতেই এই স্বভাবের উদ্ভব হইয়াছে। ইহা তাঁহারা আলোচনা করেন না যে, যে ব্যক্তি লাম্পট্যাদি দোষযুক্ত হয়, সে কি কখন কাহাকে যোগৈশ্বর্য্য অবলোকন করাইতে পারে, না তাহার কথায় কেহ বিশ্বাস করে? যখন ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুনকে জ্ঞানোপদেশ করাইয়া বিশ্বরূপ দর্শন করাইলেন; তখন কি তাঁহাকে পাপাত্মাদিগের উক্তিমত কদর্য্যাচারী বলা সম্ভব হয় না, ঈশ্বর বলিতে পারা যায় না সুধীবর্গ ইহা বিবেচনা করি-

বেন। তবে শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যাবতার প্রযুক্ত মনুষ্যবৎ ধর্ম্মাধর্ম্মযুক্ত যে সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন, সে সকল কর্ম্ম তাঁহাতে লিপ্ত হয় নাই; যেহেতু বেদে তাঁহাকে "অপহত পাপ্মা" বলিয়া উক্ত করেন, অর্থাৎ সকল পাপ তাঁহাতে নাশ পায়, এতদর্থে ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে প্রথমাধ্যায়ে উক্ত করিয়াছেন।

তস্যোদিতি নাম স এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য ,উদিত উদেতিহবৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যোঃ য এবং বেদ। ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

স এষ দেবঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য পাপ্মানা সহ তৎ কার্য্যেভ্য ইত্যর্থো য আত্মাপহত পাপ্মেত্যাদি বক্ষতি। উদিত উৎইত উদ্গত ইত্যর্থঃ। অতো সা বুমামা তমেবং গুণ সম্পন্ন মুন্নামানং যথোক্তেন প্রকারেণ যো বেদ সোপ্যেব মেবোদে তৃদ্গচ্ছতি সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মাভ্যো বৈ ইতি। শাঙ্করিভাষ্যং।

নতস্থ সর্ব্ব পাপ্মোদয় স্তৎকার্য্য ভাক্তত্বাদিত্যা শংক্যাহ। পাপ্মনেতি আদিত্য ক্ষেত্রজ্ঞেপি সর্ব্ব পাপ্মোদয়ঃ সম্ভবতি। যথা—"ন হিবৈ দেবান্ পাপং গচ্ছতি ইতি শ্রুতিঃ"—ইত্যাশঙ্ক্য পরমাত্ম বিষয় বাক্য শেষঃ॥

ভগবদানন্দ কৃত ভাষ্য টীকায়াং।

এই স্বপ্রকাশ পরমাত্মা পরম পুরুষ সকল পাপ কার্য্যের সহিত উদিত হয়েন, অর্থাৎ শুভাশুভ তাবৎ কর্ম্মকেই অঙ্গীকার করেন, কিন্তু তাঁহাতে কোন পাপই লিপ্ত হয় না, যেহেতু বেদে তাঁহাকে "অপহত পাপ্মা" বলেন, সুতরাং তিনি সকল পাপের সংহারক হয়েন, অতএব ঈশ্বর সম্বন্ধে শুভাশুভ কর্ম্ম দৃষ্টে যে সাধক তাঁহাকে নির্লিপ্ত জানে সেই বেদজ্ঞ; নচেৎ ঈশ্বর প্রতি কুতর্ক বাদ যোজনায় শুদ্ধ ঈশ্বরনিন্দা করাই প্রতীত হয়, এতদর্থে টীকাকার লেখেন যথা, কোন কোন সাধক তাঁহার পাপোদয়ের সহিত তৎ কার্য্যকে ভাক্ত বলিয়া আশঙ্কা নিবারণ করেন, তাহা নিষ্প্রয়োজন, যেহেতু তিনি অপহত পাপ্মা, পাপের সহিত কার্য্য করিলেও তদ্দোষে ব্যাপ্ত (লিপ্ত) হয়েন না। কারণ সূর্য্যে এবং পরমাত্মাতে সর্ব্বপাপোদয়ের সম্ভব আছে, যেহেতু উভয়ে লোক হিতার্থে শিক্ষাপ্রদ হইয়াছেন।

বিজ্ঞান,—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

আধ্যাত্মিক জীবনের প্রয়াস মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কিন্তু কিছু দিন পূর্ব্বে প্রফেসর লমব্রোজো নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক আধ্যাত্মিক জীবন ও এমন কি মনিষীগণের জীবনকে বিকৃত মস্তিষ্কের ও স্নায়ু দৌর্ব্বল্যের ফল বলিয়া প্রচার করেন। স্বাভাবিক বা স্থূল মস্তিষ্কের ক্রিয়া ভিন্ন অন্য যাহা কিছু দেখা যায় তৎসমুদায়ই বিকার মাত্র। এই মত তিনি অনেক গবেষণার দ্বারা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টিত হয়েন। কিন্তু সুখের বিষয় এই ডাঃ পল্লিভিনোর সহিত একত্রে এই বিষয় অনুশীলন করার পর তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তিনি আর অদ্ভুত ঘটনাবলী অবিশ্বাস করেন না, পরন্তু উহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

*   *   *

কিন্তু ইহাতেই আমাদের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়। কোন ঘটনা সত্য হইলেই হইল না। ঘটনাটির মূলে উন্নতি প্রবণতা অথবা বিকারশীলতা আছে কি না তাহা দেখা উচিত। সাধ্য ভাবে সত্য শব্দ ব্যবহৃত হইলে সুধু অস্তিত্ব বুঝায়। সত্য বটে দার্শনিক ভাবে দেখিলে সত্যই প্রেয় ও শ্রেয়, কিন্তু এ ভাবে প্রফেসর লমব্রোজো কথাটি ব্যবহার করেন নাই বলিয়া বোধ হয়। উৎকট চিন্তার বশে মানব মস্তিষ্ক সময়ে সময়ে বিকৃত হইতে পারে, ইহা সত্য। কিন্তু এই বিকারশীলতার গতি কোন্ দিকে। যদি উন্নতির দিকে হয় তাহা হইলে চিন্তাশীলতা ত্যাগ করা উচিত নহে; তবে অল্পে অল্পে পরিমিত ভাবে অভ্যাস করা চাই। কিন্তু ইহার গতি যদি অবনতির দিকে হয়, তাহা হইলে ঘটনা সত্য হইলেও আমাদের চিন্তা ত্যাগ করা উচিত।

*   *   *

আমাদের দেশে প্রায় কেহই এ ভাবে দেখেন না। আমরা ঘটনাবলীতেই সন্তুষ্ট ও তাহার গতি নির্ণয়ের জন্য সাধকদিগকে প্রায়ই ভাবিতে দেখা যায় না। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে প্রফেসর লমব্রোজোর মত চলিত হইলে, বোধ হয় সুফলই প্রসব করিবে। উন্নতি, অবনতি বিচার করিতে গেলে কেবল ক্ষুদ্র অহংকে ধরিলে চলে না; সমগ্র বিশ্বের সহিত মিলাইয়া দেখিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের সাধকেরা প্রায়ই এই ভাবটি হারাইয়া ফেলিয়াছেন। অদ্ভুত ক্ষমতা লাভ হইলেই আমরা সন্তুষ্ট; কিন্তু ঐ ক্ষমতার সহিত সমগ্র মানব জাতির কি সম্পর্ক; সমগ্র মানবের উন্নতি কল্পে ঐ ক্ষমতা কতদূর প্রযোজ্য, মোটকথা ঐ ক্ষমতার ব্যবহার দৈবি বা আসুরিক কোন ভাবে করা উচিত, ও উহার মুল তত্ত্ব উদ্ঘাটন করা কর্ত্তব্য—এ জ্ঞান প্রায়ই আমাদের নাই। সেই জন্য আমরা বার বার পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মূলভাব আমাদের হৃদয়ে সংক্রামিত হউক, এই প্রার্থনা করি।

১০ম ভাগ } মাঘ, ১৩১৩ সাল। { ১০ম সংখ্যা।

অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন।

শ্রীমদ্ভবদ্গীতা ১১শ অধ্যায়।

মূল।

পশ্যামি দেবাং স্তব দেব দেহে
সর্ব্বাং স্তথা ভূত বিশেষ সঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥

অনেক বাহূদর বক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপং।
নান্তংন মধ্যংন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥

পয়ারানুবাদ।

হেরি আমি, দেব! তব দেহে সমুদায়।
দেবতা ও যত জাতি জীব সমবায়॥
পদ্মাসনে প্রভু ব্রহ্মা, দিব্য ঋষিদল।
(বাসুকি প্রভৃতি যত) পন্নগ সকল॥

বহু বাহুদর মুখ, অগনিত নেত্র!
অনন্তরূপে তোমা দেখিহে সর্ব্বত্র॥
অন্ত নাই, মধ্য নাই, না মূল তোমার।
নিরখি, হে বিশ্বপতি! তোমা বিশ্বাকার॥

মূল।

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তা
দ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্॥

ত্বংমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বংমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বংমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥

অনাদি মধ্যান্ত মনন্ত বীর্য্য
মনন্ত বাহুং শশীসূর্য্য নেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্ত হুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥

দ্যাবা পৃথিব্যোরিদমন্তরংহি
ব্যাপ্তংত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমিদং তবোগ্রং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতা প্রাঞ্জলয়ো গৃনন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষি সিদ্ধসঙ্ঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ॥

রুদ্রাদিত্যা বসবো যেচ সাধ্যা :
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে॥

পয়ারানুবাদ।

মুকুট রাজিত শিরঃ, গদাচক্রধারী।
তেজোপুঞ্জকায়, সর্ব্ব দিগোজ্জলকারী॥
অপ্রমেয় মিলিতাগ্নি রবিসম ভাতি।
চতুর্দ্দিকে দেখি তোমা সুদুর্দ্দর্শ অতি॥

অক্ষর পরম তুমি, জ্ঞাতব্য প্রধান।
তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডের চরম নিধান॥
নিত্য ধর্ম্ম রক্ষয়িতা, অব্যয়, হে তুমি।
চিরন্তন পুরুষ, তোমায় মানি আমি॥

আদি মধ্য অন্তহীন, অপ্রমেয় বীর্য্য।
অসংখ্য কর তোমার, চক্ষু চন্দ্র সূর্য্য॥
প্রদীপ্ত পাবক মুখ—নিরখিহে তব।
স্বীয় তেজে সন্তাপিত তাই এই ভব॥

দ্যুলোক, ভুলোক কিবা, কিবা অন্তরীক্
একক তোমার দ্বারা ব্যাপ্ত সর্ব্বদিক্।
হেরি হেন উগ্ররূপ তোমার অদ্ভুত।
তিন লোক মহাত্মন্ হৈছে অভিভূত॥

দেবতা সমূহ ওই তোমাতে প্রবেশে।
কৃতাঞ্জলি পুটে; ... কেহ বা তরাসে॥
যাচিছে শরণ; আর স্বস্তি স্বস্তি রবে
বন্দিছে মহর্ষি সিদ্ধ—শ্রেষ্ঠ স্তুতি স্তবে॥

রুদ্রাদিত্য, সাধ্য, বসু, পবন সকল।
পিতৃগণ, বিশ্ববর্গ, অশ্বিনী যুগল॥
অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, সিদ্ধের সংহতি।
সবিস্ময়ে যাচিতেছে সবে তোমা প্রতি॥

মূল।

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রা করালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্॥

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেক বর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রং
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো॥

দংষ্ট্রা করালানি চতে মুখানি।
দৃষ্টৈব কালানল সন্নিভানি।
দিশো ন জানেন লভেচ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥

অমীচ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মোদ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ॥

বক্ত্রাণি চ তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রা করালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ॥

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্র মেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোক বীরাঃ
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতোজ্বলন্তি॥

পয়ারানুবাদ।

ভীষণ দশন বহু, বহু নেত্রানন।
বহু হস্তোদর ঊরু, বহুল চরণ॥
হেরি তব, মহাভুজ! সে বিরাট রূপ।
কাতর সমস্ত লোক; আমিও (তদ্রূপ)॥

ব্যোমস্পর্শী-জ্যোতির্ম্ময় বিচিত্র চরণ।
ব্যাদিত বদন, দীপ্ত আয়ত লোচন॥
দেখিয়া তোমার, বিষ্ণো! অন্তরাত্মা ভীত
ধৈরয না মানে চিত, শান্তি বিরহিত॥

প্রলয়াগ্নি প্রায় তব বদন জ্বলন্ত—
দেখিয়া, দেবেশ! তথা অতি তীক্ষ্ণ দন্ত॥
দিশে হারা, গত আমি—চিত্ত হর্ষ শূন্য।
(অতএব) বিশ্বাধার হও হে প্রসন্ন॥

(দুর্য্যোধন আদি) সব ধৃতরাষ্ট্র সুত।
(অনুগামী) মহীপালবৃন্দ সহযুত॥
ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্য আর সুত পুত্র কর্ণ।
সহিত মোদের বহু বীর অগ্রগণ্য;

তীক্ষ্ণ দন্ত ভয়ঙ্কর তোমার বদনে।
প্রবেশ করিছে, সবে ত্বরিতগমনে॥
দন্ত পংক্তি সন্ধি মধ্যে বিলম্বিত কায়।
(চর্ব্বণে) চূর্ণিত শির কেহ দৃষ্ট হয়॥

(বেগবতি) স্রোতস্বতী যথা বহুধারে।
(অবশে) বহিয়া চলি প্রবেশে সাগরে॥
সর্ব্বত্র প্রদীপ্ত তথা তোমার বদনে।
প্রবেশিছে ওই নরলোকপালগণে॥

মূল।

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা।
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ॥

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা—
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো॥

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তুতে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতু মিচ্ছামি ভবন্ত মাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্॥

* * * *

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ॥

কস্মাচ্চতে ন নমেরন্মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদি কর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎ পরং যৎ॥

ত্বমাদি দেবঃ পুরুষঃ পুরাণ
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥

পয়ারানুবাদ।

(অথবা) পতঙ্গ যথা মরিবার তরে।
সবেগে প্রবেশে দীপ্ত অনল ভিতরে॥
তেমতি সমূহ লোক বিনাশ কারণে।
ধাইয়া পাশিছে তব অসংখ্য আননে॥

সমস্ত জ্বলন্ত আস্যে গ্রাসি বিলক্ষণ।
চতুর্দ্দিক হতে লোক করিছ ভক্ষণ॥
বিষ্ণো হে! তোমার তীব্র দীপ্ত তেজোগণ
সমগ্র জগৎ ব্যাপি করিছে দাহন॥ ৩০

উগ্ররূপী কেবা তুমি আমারে হে কও
প্রণমি দেবেশ! তোমা; সুপ্রসন্ন হও॥
সবিশেষে জানিবারে করি অভিলাষ।
আদিতব, নাই বুঝি কি তব প্রয়াস॥

* * * *

মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে তব জগৎ যে হৃষ্ট।
সবে হৃষীকেশ, তথা হয় প্রেমাবিষ্ট॥
চতুর্দ্দিকে রক্ষোগণ পলায় সন্ত্রস্ত।
প্রণমে সিদ্ধেরা তোমা;—ইহা অতি যুক্ত॥

কেননা মহাত্মা, তোমা করিবে প্রণাম
আদিকর্ত্তা তুমি, ব্রহ্ম হ'তেও মহান্॥
অক্ষর, অনন্ত তুমি, দেব বিশ্বাধার।
সৎ বা অসৎ যাহা, পর পুনঃ তার॥

তুমি আদিদেব, তুমি পুরুষ পুরাণ!
পরম পদবী তুমি, বিশ্বলয়স্থান॥
জ্ঞাতা তুমি, জ্ঞাতব্যের তুমি মাত্র সার
তোমা দ্বারা বিশ্বব্যাপ্ত অনন্ত আকার॥

মূল ॥	পয়ারানুবাদ।
বায়ুর্যমোঽগ্নি বরুণঃ শশাঙ্কঃ	বায়ু, যম, অগ্নি তুমি—বরুণ, চন্দ্রমা
প্রজাপতি স্তং প্রপিতামহশ্চ।	পিতামহ পিতা তুমি, প্রজাপতি (ব্রহ্মা)।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্র কৃত্বঃ	নমস্কার তোমারে, নমঃ সহস্রবার।
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥	পুনশ্চ নমো নমঃ নমস্কার আবার ॥
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে	নমস্কার সম্মুখে, পশ্চাতে নমস্কার।
নমোঽস্তুতে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।	সর্ব্ব তুমি, তোমারে সর্ব্বত্র নমস্কার ॥
অনন্তবীর্য্যামিতা বিক্রমস্তং	অসীম বিক্রম তুমি, অনন্ত সামর্থ।
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥	সকল স্বরূপ তুমি, সকলেতে ব্যাপ্ত ॥
সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং	তব বিশ্বরূপ আর নাজানি মাহাত্ম্য
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।	প্রণয়বেশেতে কিংবা প্রমাদ বিভ্রান্ত ॥
অজানতা মহিমানং তবেদং	সখাজ্ঞানে আমি যেবা কহেছি তোমারে
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥	হে"কৃষ্ণ,"যাদব"সখে"বলি তিরস্কারে ॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎ কৃতোঽসি	ক্ষম, হে অচ্যুত! মোরে, অপ্রমেয় তুমি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।	অনাদর, আর যেবা করিয়াছি আমি।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎ সমক্ষং	ভোজনে, উপবেশনে, পরিহাসচ্ছলে।
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহম প্রমেয়ম্ ॥	শয়নে, ভ্রমনে, কিংবা সম্মুখে,বিরলে।
পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য	অনুপমমহিম হে, স্থাবর জঙ্গম।
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরু গরীয়ান্।	সর্ব্বলোক পিতা তুমি, গুরু পূজ্যতম ॥
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো	কে তব অধিক কোথা তুমি, গরীয়ান।
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥	তিন লোক মাঝে তব নাহিক সমান॥
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং	তাই আমি নমি দেব! প্রণিপাতকায়
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।	তুষ্টি হেতু স্তবনীয় ঈশ্বর তোমায় ॥
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ	ক্ষমদেব! মোরে, যথা পিতা ক্ষমে পুত্রে,
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্ ॥	প্রিয়ারে প্রিয়জন, বা মিত্র যথা মিত্রে ॥

মূল।	পয়ারানুবাদ।
অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোহস্মি দৃষ্ট্বা	অপূর্ব্ব দর্শিত রূপ হেরি হরষিত।
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে	তবু ভয়ে, দেব! মম চিত্ত বিকলিত॥
তদেব মে দর্শয় দেবরূপং	সেরূপ দেবেশ! তুমি দেখাও সেজন্য।
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥ ৪৫	জগৎ আশ্রয়! মোরে হও হে প্রসন্ন॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত	গদাধারী, চক্রপানি, মুকুটিত শিরে।
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টু মহং তথৈব।	সেই রূপে ইচ্ছা তোমা হেরি বারতরে
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন	(সম্বরি) সহস্র বাহু, ওহে বিশ্বরূপ!
সহস্র বাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে॥ ৪৬	ধর পুনঃ সেই তব চতুর্ভুজরূপ॥ ৪৬

শ্রীভবেন্দ্র নাথ দে

চৈতন্য কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সবিশেষ ব্রহ্ম।

"বেদ পুরাণে কহে ব্রহ্ম নিরূপণ।
সেই ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু ঈশ্বর লক্ষণ॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান॥
নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
প্রাকৃত নিষেধি করে অপ্রাকৃত স্থাপন॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ষষ্ঠাঙ্কে—একবিংশাঙ্ক ধৃত হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রং

যাযাশ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবিশেষ মেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষ মেব॥

যে সকল শ্রুতি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের বিষয় বলিয়াছেন, তাঁহারাই আবার

সবিশেষ ব্রহ্মেরও বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বিচার করিলে সবিশেষ ব্রহ্মপক্ষেই প্রমাণ বাহুল্য লক্ষিত হইয়া থাকে।

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব, ব্রহ্মেতে জীবয়
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়॥
অপাদান করণাধিকরণ কারক তিন
ভগবানের সবিশেষ এই চিহ্ন তিন।
ভগবান বহু হৈতে যবে কৈল মন
প্রাকৃত শক্তিকে তবে কৈল বিলোকন।
সে কালে নাহি জন্মে প্রাকৃত মন নয়ন
অতএব অপ্রাকৃত ব্রহ্মের নেত্র মন।

* * *

অতএব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ
মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে নির্ব্বিশেষ।

* * *

সৎচিৎ আনন্দময় ঈশ্বর স্বরূপ
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিনরূপ।
অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, তটস্থা জীবশক্তি
বহিরঙ্গা মায়া, তিনে করে প্রেমভক্তি।

* * *

ঈশ্বরের বিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার
সে বিগ্রহ কহ সত্বগুণের বিকার? মধ্যলীলা ৫ পরিচ্ছেদ

সচ্চিদানন্দাকার ঈশ্বরের বিগ্রহ অর্থাৎ দেহ। এই দেহ প্রাকৃত নহে, অপ্রাকৃত। যদি সম্পূর্ণ ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলা হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দাকার দেহ অপ্রাকত বলিয়া ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলা হয়। লক্ষণা অর্থাৎ abstraction দ্বারা সবিশেষ ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলা হয়।

অপ্রাকৃত শুদ্ধ সত্য বৈকুণ্ঠের উপাদান।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া মেতাং তরান্তি তে॥

গুণময়ী মায়া উত্তীর্ণ হইলেই ভক্ত শুদ্ধ সত্ত্বের উপাদানে গঠিত হয়।

আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকা পুনরাবর্ত্তীনোর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম নবিদ্যতে॥

ব্রহ্ম লোক হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য লোক পুনরাবর্ত্তী। আমাকে আশ্রয় করিয়া পুনরায় ব্রহ্মাণ্ডে জন্মগ্রহণ হয় না।

ইহাতে জানা যায় ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সকল লোক মায়ার অধীন। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড প্রাকৃতিক মায়ার উপাদানে গঠিত। ব্রহ্মাণ্ডের উপরে এমন এক লোক আছে, যেথানে প্রাকৃতিক মায়া যাইতে পারে না। সে লোকে গেলে আর পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না।

ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ। গীতা

যে লোক সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নির সীমার বহির্ভূত।

নতদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধামং পরমং মম॥

সেই লোক কি? বুদ্ধদেব যে লোককে একরূপ শূন্য বলিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য তাহাকে নির্গুণ ব্রহ্ম বলিয়াছেন, পুরাণে তাহাকে বৈকুণ্ঠ বলিয়াছে। তিণ গুণ অতিক্রম করিলেই শূন্য হয় না বা নির্গুন ব্রহ্ম হয় না। যদ্গত্বানিবর্ত্তন্তে— সেখানে জীবের অস্তিত্ব লোপ পায় না।

'অর্জ্জুনঃ উবাচ

কৈ র্লিঙ্গৈ স্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।।
কিমাবারঃ কথং চৈতাং স্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে॥

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সং প্রবৃত্তানি ননিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥
উদাসীন বদাসীনো গুণৈ র্যো নবিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥
সম দুঃখ সুখ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্ম্য কাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীর স্তুল্যর্নিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥
মানাপমানয়োস্তুল্য স্তুল্যমিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ সউচ্চতে॥

মাঞ্চযোঽব্যভিচারেন ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতিত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

বৈকুণ্ঠে প্রাকৃতিক বিচিত্রতা নাই। সেখানে সকলেই বিষ্ণুরূপী। সেখানে সকলই নিত্য। ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়ে সে নিত্যতাব কিছু যায় আসে না। বৈকুণ্ঠের লীলা নিত্য লীলা। তবে সে লোকের উপাদান কি? শুদ্ধ সত্ব।

সত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব শব্দিতং যদি যতে তত্র পুমানপাবৃতঃ
সত্বে চ তস্মিন্ ভগবান বাসুদেবোহ্যধোক্ষজে মে মনসা বিধীয়তে॥

বিশুদ্ধ সত্বকে 'বসুদেব' বলে। আবরণরহিত ভগবান্ বাসুদেব সেই বিশুদ্ধ সত্বে প্রকাশ পান্।

সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিনরূপ।
আনন্দাংশে হ্লাদিনী,সদংশে সন্ধিনী
চিদংশে সম্বিত, যারে জ্ঞান করি মানি।
সন্ধিনীর সার অংশ, শুদ্ধসত্ব নাম
ভগবানের সত্তা হয় তাহাতে বিশ্রাম।
মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ শয্যাসন আর
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্বের বিকার। চঃ চঃ

নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ, আনন্দ মাত্র সবিকল্প মবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্, ভূতেন্দ্রিয়াত্মক মদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি॥

ভাগবৎ পুরাণ ৩-৯ ৩

হে পরম, তোমার অবিদ্ধতেজ, অবিকল্প আনন্দমাত্র যে স্বরূপ,তাহা এই কৃষ্ণ স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে।

এখানে আনন্দ মাত্র স্বরূপ ভাগবতে আছে। কোথাও চিন্মাত্র স্বরূপ আছে। ভগবদ্বিগ্রহকে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব "চিচ্ছক্তি বিলাস" বলিয়াছেন। এই চিচ্ছক্তি বিলাস ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ। চতুঃশ্লোকী ভাগবতের তৃতীয় শ্লোককে মহাপ্রভু ভগবদ্বিগ্রহের প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন।

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥

ভা পুঃ—৯—৩২—

অহমেব অহমেব শ্লোকে তিনবার
পূর্ণৈশ্বর্য্য বিগ্রহের স্থিতি নির্দ্ধার।
যেই জন এই বিগ্রহ না মানে
তারে তিরস্করিবারে করিল নির্দ্ধারণে।
"এই" শব্দে হয় জ্ঞান বিজ্ঞান বিবেক
মায়া কার্য্য মায়া হৈতে আমি ব্যতিরেক।
যৈছে সূর্য্যের স্থানে ভাসয়ে আভাস
সূর্য্য বিনা স্বতঃ তার না হয় প্রকাশ।
মায়াতীত হৈলে হয় আমার অনুভব
এই সম্বন্ধ তত্ত্ব কহিল আর সব।

"সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের" কথা ব্রহ্মসংহিতাতে আছে। এই জন্ম মহাপ্রভু ব্রহ্মসংহিতার পরম আদর করিতেন।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥
মহা ভক্তগণ সহ তাঁহা গোষ্ঠি কৈল
ব্রহ্মসংহিতাধ্যায় পুঁথি তাঁহাই পাইল।
পুঁথি পাঞা প্রভুর হৈল আনন্দ অপার
কম্প অশ্রু পুলক স্বেদ স্তম্ভ বিকার।
সিদ্ধান্ত শাস্ত্র নাহি ব্রহ্মসংহিতার সম
গোবিন্দ মহিমা জ্ঞানে পরম কারণ।
অল্পাক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার
সকল বৈষ্ণব শাস্ত্র মধ্যে অতি সার।

এই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ স্থাপন করিবার জন্যই যেন মহাপ্রভুর অবতার। গীতাতে ইহার আভাস আছে, ভাগবতে ইহার উল্লেখ আছে, ব্রহ্মসংহিতাতে এই বিগ্রহের কথা স্পষ্ট রহিয়াছে। তথাপি মহাপ্রভু চৈতন্যদেব তর্ক দ্বারা এই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য্যের ঈশ্বর সমষ্টি মায়ারূপ দেহধারী। চৈতন্যদেবের ঈশ্বর মায়ার অতীত, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহধারী।

শঙ্করাচার্য্যের জীব ও ঈশ্বর উভয়ই মায়া উপহিত। চৈতন্যদেবের জীব মায়া উপহিত, কিন্তু ঈশ্বর মায়া উপহিত নহেন ; মায়ার অধীশ্বর। এই ত জীব ও ঈশ্বরের ভেদ। এ ভেদ কল্পিত নহে, বাস্তব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে চৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন—

মায়াধীশ, মায়াবস, ঈশ্বরে জীবে ভেদ ;
হেন জীব ঈশ্বর সহ কহহ অভেদ।
গীতা শাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানে
হেন জীব অভেদ কর ঈশ্বরের সনে।
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমে পরাং। ইতি গীতায়াং ॥

এই সচ্চিদানন্দাকার ঈশ্বরই পূর্ণব্রহ্ম। বাস্তবিক ব্রহ্ম সবিশেষ। লক্ষণা বা Abstraction দ্বারা তিনি নির্ব্বিশেষ। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞান অসম্পূর্ণ।

চর্ম্ম চক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্ব্বিশেষ।
জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে তাঁহার বিশেষ।

এই ঈশ্বর চতুষ্পাদ। তাঁহার তিন পাদ মায়ার বহির্ভূত। এক পাদ লইয়া মায়ার কার্য্য।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন ধনঞ্জয়।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংসেন স্থিতো জগৎ ॥ গীতা।

তথাচ।—তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যং অনন্তং পরমং পদম্॥ পাদ্মোত্তরখণ্ড॥

বিরজার পারে ত্রিপাদ, সনাতন পরব্যোম ধাম। সেই পরম পদ অমৃত, শাশ্বত, নিত্য ও অনন্ত। বিরজা মায়ার সীমা। বিরজার পারে মায়ার গতি নাই।

ব্রহ্মাণ্ডের পারে,. বিরজার পারে নিত্য বৈকুণ্ঠ ধাম। সেই বৈকুণ্ঠধামের উপাদান শুদ্ধসত্ব। শুদ্ধসত্ব চিচ্ছক্তির বিলাস। এবং বৈকুণ্ঠধামে যে সকল ভক্ত পারিষদ থাকেন, তাঁহাদের শরীর শুদ্ধসত্বময়। ভগবানের বিগ্রহও চিচ্ছক্তির বিলাস। এই বৈকুণ্ঠ ত্রিপাদ্বিভূতির ধাম।

প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তম স্তয়োঃ
সত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কাল বিক্রমঃ।

ন যত্র মায়া কিমুতা পরে হরে
রনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ। ভা, পু, ২—৯—১

যেখানে রজোগুণ বা তমোগুণের প্রভাব নাই এবং এই দুই গুণমিশ্রিত সত্বগুণও যেখানে প্রবেশ করিতে পারে না; যেখানে কাল কৃত বিনাশ নাই এবং মায়ার স্থান নাই, রাগ, লোভাদি অন্য উপদ্রবের ত কথাই নাই; যেখানে সুরাসুরার্চ্চিত ভগবানের পার্ষদগণ নিরন্তর অবস্থিতি করিতেছেন। যদি কেহ বলেন "সত্বঞ্চ মিশ্রং" বলাতে প্রাকৃতিক মিশ্র সত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে, প্রাকৃতিক শুদ্ধ সত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই; সে কথা প্রামাণিক নহে। কারণ প্রাকৃতিক শুদ্ধসত্ব হয় না। "ন যত্র মায়া"—যেখানে মায়ার অধিগম নাই, সেখানে প্রাকৃতিক সত্ব কিরূপে থাকিতে পারে?

ত্রিপাদ্বিভূতের্ধামত্বাং ত্রিপাদ্ভূতং হি তৎ পদম্।
বিভূতি র্মায়িকী সর্ব্বা প্রোক্তা পাদাত্মিকা যতঃ॥ পাদ্মোত্তর খণ্ড।

ত্রিপাদ্বিভূতির ধাম বলিয়া ভগবানের স্থানকে ত্রিপাদ্ভূত বলা যায়। আর সর্ব্বপ্রকার মায়িক বিভূতি পাদাত্মিকা মাত্র।

জীব নির্বিশেষ অথবা সাবশেষ ব্রহ্মে লীন হইতে পারে কিম্বা ঈশ্বরের পারিষদ হইতে পারে। এই তিন প্রকার মুক্তিই সম্ভবপর।

যদ্যপি মুক্তি হয় এই পঞ্চ প্রকার
সালোক্য, সামীপ্য সারূপ্য সার্ষ্টি সাযুজ্য আর।
সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবা দ্বার।

(অর্থাৎ এই সকল মুক্তিলাভ করিয়া জীব যদি ভগবানের সেবা করিতে পারে অর্থাৎ তাঁহার সৃষ্টি স্থিতি লয় কার্য্যে সহায়তা করিতে পারে:—)

তবু কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার।
সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়।
ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুই ত প্রকার
ব্রহ্ম সাযুজ্য হইতে ঈশ্বর সাযুজ্য ধিক্কার। চরিতামৃত মধ্য ৬।

ভাগবত অনুসরণ করিয়া চৈতন্যদেব সেবার মার্গ ভক্তির মার্গ প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া মুক্তি তাঁহার নিকট গর্হিত ও স্বার্থপর ছিল। কিন্তু

তিনি কি রামানুজের মুক্তি, কি শঙ্করাচার্য্যের মুক্তি, কোন মুক্তিই স্বীকার করেন নাই। (ক্রমশঃ)

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

হিন্দু দর্শন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

নির্ব্বাণ-মোক্ষ।

গ্রীক দার্শনিক পীথাগোরাস্ ভারতের আর্য্য ঋষিগণের শিষ্য ছিলেন। তিনি বিশ্বসৃষ্টি একটী গণিতের প্রহেলিকা অবলম্বনে প্রমাণ করিয়াছেন। তাহা এই ;— ১+২+৩+৪=১০।

এখানে একত্ব—জগদীশ্বর। দ্বৈত—জড় বা অচিৎ। ত্রিতয়—একত্বের ও দ্বৈতের মিশ্রণ, বা উভয়ের স্বরূপ সম্বলিত দৃশ্যমান্ জগৎ। চতুষ্টয়—পূর্ণাবস্থা, সকলের মহাশূন্যাবস্থা। দশম—সকলের সমষ্টি, অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

পীথাগোরাসের ব্রহ্ম—সবিশেষ ব্রহ্ম বা ব্যক্তিগত (personal) ঈশ্বর নহেন। তাঁহার মতে দৃশ্যমান আকারের অন্তঃতলে—সকল নামরূপের, পরিবর্ত্তনের ও বিশ্বের অপরাপর দৃশ্যের অন্তঃস্তলে—এক নিত্য একত্বতত্ত্ব (Principle of unity) বিরাজমান আছেন।

উপনিষদে আছে—"কঃ শোকঃ কো মোহ একত্বমনুপশ্যতঃ"—এই একত্ব যিনি উপলব্ধি করিতে পারেন তাঁহার আবার শোক বা মোহ কি? এই বহুত্বপূর্ণ সৃষ্টি-প্রপঞ্চে যিনি একত্ব অনুভব করিতে পারেন, একত্বে পৌঁছিতে পারেন, তিনিই নির্ব্বাণ-মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন। এই একত্ব—অবস্থাকে নির্ব্বাণ কহা যায়। নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ স্বর্গাদির ন্যায় কোন লোকে গমন করা নহে, অবস্থা বিশেষ প্রাপ্তি। এই নির্ব্বাণ অবস্থার নাম—Nothing=No thing, কোন বস্তু নহে, সর্ব্বপ্রকার নামরূপের, পরিবর্ত্তনের ও আকার বিশিষ্ট পদার্থের অভাব। এই একত্ব-অবস্থা অচিন্তনীয়, অদৃশ্য, ও অবিভাজ্য। এই অবস্থার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু আমাদের

অনুভবনীয় অস্তিত্ব নাই। ইহা অনুভবনীয় এক অস্তিত্বের Annihilation, বা নাশ, কিন্তু সর্ব্ব অস্তিত্বের মিশ্রণ। সুতরাং নির্ব্বাণকে annihilation বলা যুক্তিযুক্ত নহে।

পীথাগোরাসের প্রহেলিকার অর্থ কি? এই সৃষ্টিপ্রপঞ্চকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা দুই তত্ত্বে উপস্থিত হই:—এক চিৎ (আত্মা), অপর অচিৎ (জড় বা অনাত্মা)। ইহা ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। ইহাই ১+২। কিন্তু এই চিৎ বা আত্মা এবং অচিৎ বা জড়কে আমরা বিশুদ্ধ ভাবে, অবিমিশ্রিত ভাবে পাই না। এমন আত্মা নাই যাহা জড়ের সহিত মিশ্রিত নহে; এমন জড় নাই যাহার আত্মা নাই। জড়ের সংস্রব রহিত নিরবচ্ছিন্ন আত্মা এই সৃষ্ট জগতে নাই; এবং আত্মার সংস্রব রহিত নিরবচ্ছিন্ন জড় এই বিশ্বে নাই। এই যে জড়ের সহিত আত্মার মিশ্রণ—মেশামিশি ভাব, ইহাই তৃতীয় তত্ত্ব বা ৩।

এই জড় ও আত্মার আদিম অবস্থা কল্পনা করুন। এই সৃষ্টি প্রপঞ্চের, সৃষ্টির অতীত অবস্থা—পূর্ব্বাবস্থা কল্পনা করুন। দেখা যাইবে সেই অব্যক্ত অবস্থায় আত্মা ও জড়ের অব্যক্ত ভাব, এক মহা আকাশ বা মহাশূন্য। আকাশ বাস্তবিক অভাব নহে, সমস্ত জড় ও আত্মার আধার ভূমি, অব্যক্ত অবস্থা, পরব্রহ্মের স্বরূপ। তজ্জন্যই বেদান্ত দর্শন ব্রহ্মকে বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিলেন—"আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ"—আকাশ ব্রহ্মের চিহ্ন স্বরূপ। অতএব দেখা যাইতেছে আকাশ বা শূন্য অভাব নহে। সেইরূপ নির্ব্বাণ বা annihilation অভাব নহে। অভাবের কল্পনা মানববুদ্ধির অগোচর। গীতা বলেন—"না সতো বিদ্যতে ভাবো, নাভাবো বিদ্যতে সতঃ;—অভাবের অস্তিত্ব সম্ভবে না, অস্তিত্বেরও অভাব সম্ভবে না। এই নির্ব্বাণ-মোক্ষ যাঁহারা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা বলেন এই অবস্থায় পরমানন্দ, পরমশান্তি।

নির্ব্বাণ—Re-absorption in the Universal Force, Eternal bliss and rest. অর্থাৎ পরম একত্বে ভেদাত্মক আত্মার লয়।

প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ, যাঁহারা প্রাচ্য দেশীয় শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা প্রাচ্য শাস্ত্রবিৎ (Oriental scholar—Orientalist) নামে খ্যাত।

তাঁহারা বলেন—নির্ব্বাণ—annihilation, the blowing out, the extinction, complete annihilation and not absorption. ইহা যে প্রকৃত বৌদ্ধদর্শনের মত বা মায়াবাদ নহে, তাহা ক্রমে দেখান যাইতেছে।

পীথাগোরাসের দর্শন ও রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত একই তত্ত্ব। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছেন। "বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অর্থ—রামানুজের মত। কি না, জীব-জগৎ-বিশিষ্ট-ব্রহ্ম। সব জড়িয়ে একটী। যেমন একটী বেল। একজন খোলা আলাদা, বীজ আলাদা, আর শাঁস আলাদা ক'রেছিল। বেলটী কত ওজনে, জান্‌বার দরকার হ'য়েছিল। এখন শুধু শাঁসে কি ওজন পাওয়া যায়? খোলা, বীচি, শাঁস, সব এক সঙ্গে ওজন কর্‌তে হবে। প্রথমে খোলা নয়, বীচি নয়, শাঁসটাই সার পদার্থ বলে বোধ হয়। তার পর বিচার ক'রে দেখ যে, যে বস্তুর শাঁস সেই বস্তুরই খোলা আর বীচি। আগে "নেতি", "নেতি" ক'রে যেতে হয়; বীজ—নেতি, জগৎ—নেতি এইরূপ বিচার কর্‌তে হয়। ব্রহ্মই বস্তু, আর সব অবস্তু। তার পর অনুভব হয়—যারই শাঁস তারই খোলা বীচি। যা থেকে ব্রহ্ম ব্রহ্ম বল্‌ছো, তাই থেকেই জীব-জগৎ। যারই নিত্য, তারই লীলা। তাই রামানুজ বল্‌তেন—জীবজগৎ বিশিষ্ট ব্রহ্ম। এরই নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।"

রামানুজ বলেন প্রপঞ্চ সত্য, শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলেন প্রপঞ্চ মায়ার বিবর্ত্ত। ইহা ভিন্ন রামানুজ ও শ্রীশঙ্করের মত এক। এই জন্যই "পূর্ণ প্রজ্ঞদর্শন" বলেন—রামানুজ ভেদ, অভেদ ও ভেদাভেদ তত্ত্বত্রয় অঙ্গীকার করিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতের প্রতিপোষকতা করিয়াছেন।

সংস্কৃত দর্শনে বৌদ্ধদর্শনকে শূন্যবাদ বলা হইয়াছে, ও শূন্যবাদের অর্থ অভাববাদ উল্লেখ করিয়া তাহা খণ্ডন করা হইয়াছে। আমি নিজে এই সম্বন্ধে অনেক বৌদ্ধমতপোষক দার্শনিক পণ্ডিতের সহিত আলাপ করিয়া দেখিয়াছি, সকলেরই মত এই যে শূন্যবাদ নামে এক বুদ্ধদর্শন গৌতমবুদ্ধের প্রাদুর্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতেই (বুদ্ধের জন্ম ৬২৩ অথবা ৬৮৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ) হিন্দুস্থানে প্রচলিত ছিল, এবং সেই মতই পঞ্চদশী ও গৌড়পাদাচার্য্যগণের বার্ত্তিক শ্লোক খণ্ডন করিয়াছে। গৌতম বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণতত্ত্ব ও প্রাচীন বুদ্ধদর্শনের শূন্যবাদ এক কথা নহে। এ সম্বন্ধে আমারও এই মত।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে পরবর্ত্তী বৌদ্ধগণ দেববৃন্দের প্রতি অবিশ্বাসী ও মানবাত্মার অমরত্ব অস্বীকার করাতেই, হিন্দুগণ বুদ্ধধর্ম্মদ্বেষী হইয়াছেন। মন্ত্রময় দেবতা; যাঁহারা দেবতা মানেন না তাঁহারা মন্ত্রও মানেন না, সুতরাং বেদও মানেন না। এই নিমিত্ত হিন্দুশাস্ত্র বৌদ্ধগণকে নাস্তিক বলিয়াছেন। কিন্তু শ্রীশঙ্করাচার্য্য বেদ মানিতেন; তাঁহার স্থাপিত মায়াবাদকে শ্রীচৈতন্যদেব নাস্তিকতাবাদ বলিলেন কেন? এই স্থলে "নাস্তিকতাবাদ" কি নিন্দাসূচক বচন, অথবা প্রকৃত অর্থমূলক বাক্য?

মহাত্মা হার্ব্বার্ট স্পেন্সার ঈশ্বর নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক যুক্তিমূলে জগতের আদিকরণ সম্বন্ধে যতদূর ঊর্দ্ধে উঠিয়াছেন তাহার উপরে কোন মানবই যাইতে পারেন নাই। তিনি এই ব্যক্ত জগৎকে বিশ্লেষণ করিয়া অব্যক্তে উপস্থিত হইয়াছেন, এবং অব্যক্তরূপ মহাশূন্য সমুদ্র পার হইতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়াছেন—অপরিজ্ঞেয়! The unknowable। সাংখ্যাচার্য্য কপিলদেব মানবীয় যুক্তির অনীশ্বরত্ব বুঝাইবার জন্য প্রথমেই বলিয়া রাখিলেন "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ"। কেন না, "প্রমাণাভাবাৎ"। মীমাংসা দর্শন বেদের কর্ম্মকাণ্ডের উপরে উঠিলেন না; এবং বৈশেষিক দর্শন অদৃষ্টের প্রহেলিকা ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে গমন করিলেন না। পাতঞ্জলদর্শন সাংখ্যদর্শনের অনুগমন করিয়াও যোগসমাধির সাহায্যার্থ একটা "পোষাকী ঈশ্বর" স্বীকার করিয়া বলিলেন "ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ বা"। বেদান্ত দর্শন জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে সাংখ্যের ও হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের সহিত একমত। কিন্তু হার্ব্বার্ট স্পেন্সার যে স্থানে "অপরিজ্ঞেয়" বলিয়া তাহার ঊর্দ্ধে না উঠিয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, বেদান্ত দর্শন তথায় যাইয়া বলিলেন—"ভয় কি? আরও উপরে গমন কর। বেদবাণীরূপ আলোক সঙ্গে লও। বেদ বলিতেছেন যে ব্রহ্ম হইতে ব্যক্ত জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে, তাঁহাতেই স্থিতি করিতেছে এবং তাঁহাতেই বিলয়প্রাপ্ত হইবে।" হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের অজ্ঞেয়, সাংখ্যের অব্যক্ত, বেদান্তে ব্রহ্ম নাম ধারণ করিলেন। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বেদের সহায়তা প্রাপ্ত হয়েন নাই, শ্রীশঙ্করাচার্য্য বেদের সাহায্য লইয়া ব্রহ্ম স্থাপন করিলেন। ন্যায়দর্শন বাঙ্গালীর প্রাণধন; ন্যায়দর্শন বলেন অচেতন অদৃষ্ট নামক কারণাবলম্বনে ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।

বেদান্তদর্শনের "ব্রহ্ম" শব্দের দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে, (১) সবিশেষ ব্রহ্ম, বা ব্যক্তিগত পরমেশ্বর ; এই অর্থে ন্যায়দর্শনের ঈশ্বরের সহিত অভেদ। (২) নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বা বৃহৎ বস্তু, সমস্ত শক্তির মিশ্রণ অব্যক্ত অবস্থা, মহাকাশ, মহাশূন্য। ইহাই শ্রীশঙ্করাচার্য্যের "মহামায় ব্রহ্ম", এবং বুদ্ধদেবের মহাশূন্য। শ্রীচৈতন্যদেব বলেন—বেদের নানা স্থানে নানা প্রকার উক্তি আছে ; ঐ সকল উক্তির সাহায্যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মও পাওয়া যায় সবিশেষ (individual) ব্রহ্মও পাওয়া যায়। কিন্তু বেদ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে নির্ব্বিশেষ উক্তি অপেক্ষা সবিশেষ উক্তিই প্রবল বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়। শ্রীশঙ্করাচার্য্য "অধ্যাত্মবাদ" সৃষ্টি করিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্থাপন করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব সবিশেষ ব্রহ্ম স্থাপনার্থ পুরাণের সাহায্য গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। এই জন্যই তিনি বলিয়াছেন শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্ত দর্শনের ভাষ্য স্বরূপ। এই জন্যই শ্রীজীব গোস্বামী ষট্‌সন্দর্ভে মহাভারতকে "পঞ্চমবেদ" প্রমাণ করিবার জন্য বহু তর্কজালের অবতারণা করিয়াছেন। বারাণসীর ঘোর মায়াবাদী প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে উদ্দেশ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব এক দিন ভগবানের আবেশে বলিয়াছেন—

"বেদ প্রতি ক্রোধ করি বলয়ে উত্তর॥
হস্ত পদ মুখ মোর নাহিক লোচন।
এই মত বেদে করে মোরে বিড়ম্বন॥
কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশ-আনন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥
বাখানয়ে বেদ মোর বিগ্রহ না মানে।
সর্ব্ব অঙ্গে হৈল কুষ্ঠ তবু নাহি জানে॥"

এখন দেখা যাউক বুদ্ধদেবের "নির্ব্বাণ মোক্ষ" ও শ্রীশঙ্করাচার্য্যের "পরব্রহ্ম" শব্দের অর্থ কি ?

ম্যাডাম্ ব্লাভাট্‌স্কী লিখিয়াছেন:—

"Nihil" therefore stands as a synonym for the impersonal, divine Principle, the Infinite All, which is no Being or thing —the Parabrahman of the Vedanta.

"Nihil" in the minds of the Ancient Philosophers had a meaning quite different from that it has now received at the hands of Materialists. It means certainly "nothing"—or "no—thing." * * * * He (F. Kircher) tells his readers that in the Zoharo the first of the Sephiroth (Hindu Prajapatis, the Dhyan Chohans of Esoteric Buddhism) has a name the significance of which is "the Infinite," but which was translated indifferently by the Kabalists as "Ens" and "Non-Ens"—Being and "Non-Being", a Being, in as much as it is the *root* and source of all other beings; "Non-Being" because Ain Soph—the Boundless and the Causeless, the Unconscious and the Passive Principle—resembles nought else in the Universe. This is the reason why St. Denys did not hesitate to call it Nihil.

The "Nihil" is *in esse* the Absolute Deity itself, the hidden Power or Omnipresence degraded by Monotheism into an Anthropomorphic Being, with all the passions of a mortal on a grand scale. Union with That is not annihilation in the sense understood in Europe. In the East, annihilation in Nirvan refers but to matter: that of the visible as well as the invisible body, for the astral body, the personal double, is still matter, however sublimated. Buddha taught that the primitive Substance is eternal and unchangeable. Its vehicle is the pure, luminous ether, the boundless, infinite space. Not a void resulting from the absence of forms, but on the contrary, the foundation of all forms. This denotes it to be the creation of Maya, all the works of which are as nothing before the uncreated Form (Spirit), in whose profound and sacred depths all motion must cease for ever. Motion here refers only to illusive objects, to their change as opposed to perpetuity, rest—perpetual motion being the Eternal Law, the ceaseless Breath of the Absolute.

The Anima Mundi (or world-soul) was not the Deity, but a manifestation. Those philosophers never conceived of the one as an *animate nature*. The original One did not

exist, as we understand the term. Not till he (it) had united with the many emanated existences (the Monad and Duad), was a being produced. The honoured, the something manifested, dwells in the centre as in the circumference, but it is only the reflection of the Deity—the World-Soul. In this Doctrine we find the spirit of Esoteric Buddhism. And it is that of Esoteric Brahminism and of the Vedantic Adwaities.

Plato's "God" is the "Universal Ideation," and Paul saying "Out of him, and through him, and in him, all things are," had surely a Principle—never a Jehovah—in his profound mind.—(The Secret Doctrine.)

উদ্ধৃত অংশের বঙ্গানুবাদ এইরূপ :—

"নির্ব্বাণ" এবং বেদান্তের "পরব্রহ্ম" একই কথা। নির্ব্বাণও যাহা আর অশরীরী, ঐশ্বরিক ভাব, অনন্ত সর্ব্বমিদং, যাহা কোন পদার্থ বা প্রাণী নহে, তাহাও একই কথা।

জড়বাদিগণ নির্ব্বাণের যে ব্যাখ্যা করেন, তাহা অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে প্রাচীন দার্শনিকগণ নির্ব্বাণ শব্দ প্রয়োগ করিতেন। ইহা ঠিকই যে, নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ অনস্তিত্ব বা নিরস্তিত্ব (nothing or no-thing)। এক্ কার্চ্চার বলেন যে জোহরে প্রথম্ সেফিরথের (হিন্দুদিগের প্রজাপতির, আধ্যাত্মিক বৌদ্ধধর্ম্মের ধ্যান-চোহানের) একটী নাম ছিল যাহার অর্থ "অনন্ত," কিন্তু কাবালিষ্টগণ উহা এইরূপ অনুবাদ করিয়াছিলেন "এন্‌স্" ও "নন্—এন্‌স্" (প্রাণী ও অপ্রাণী, সৎ ও অসৎ)। "প্রাণী" বা সৎ এই অর্থে যে ইহা অপর সমস্ত প্রাণীর মূল ও উৎস। 'অপ্রাণী" বা "অসৎ" এই অর্থে যে অসীম ও কারণ-হীন, জ্ঞানশূন্য নিষ্ক্রিয়ভাব, যাহা এই বিশ্বের অপর কিছুরই তুল্য নহে। এই জন্যই রেভা দেনীশ এই ভাবকে নির্ব্বাণ বলিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

এই "নির্ব্বাণের" অস্তিত্ব আছে, ইহা সদেক ব্রহ্ম, ইহা অপ্রকাশিত মহাশক্তি অথবা সর্ব্বত্র বিদ্যমানতার ভাব। একেশ্বরবাদী অর্থ বিপর্য্যয় করিয়া এই ভাবকে এক হস্ত-পদ-ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট মানুষ করিয়া তুলিয়া-

ছেন। এই ঈশ্বরে নশ্বর মানবের রাগ দ্বেষাদি সমস্ত অন্তঃকরণ বৃত্তিরই মানবাতিরিক্ত অত্যধিক পরিমাণে আরোপ করিয়াছেন। তাহার সহিত সম্মিলনকে ইয়ুরোপে প্রচলিত অর্থ বিশিষ্ট নির্ব্বাণ মুক্তি বলা যায় না। প্রাচ্যদেশে নির্ব্বাণের লয় বলিতে জড়পদার্থের লয়কেই বুঝায়; স্থূল (দৃশ্য) ও সূক্ষ্ম (অদৃশ্য) শরীরকেই বুঝায়। কারণ জড়পদার্থ যতই সূক্ষ্ম হউক না কেন, সূক্ষ্ম দেহ, সূক্ষ্ম ভৌতিক দেহ সমস্তই জড়পদার্থ। বুদ্ধ এই শিক্ষা দিয়াছেন যে আদিম মহাপদার্থ নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয়। ইহার বাহন (দেহ) বিশুদ্ধ, স্বচ্ছ ইথার (আকাশ), অসীম, অনন্ত ব্যবধান (মহাকাশ)। আকার (রূপ) হীন শূন্য নহে, কিন্তু পক্ষান্তরে সমস্ত আকারের মূল। ইহা দ্বারা এই প্রকাশ পায় যে ইহা মায়ার সৃষ্টি, মায়ার সমস্ত কার্য্য, নিত্য (অদৃষ্ট) মহদাকারের (আত্মার) নিকট কিছুই নহে; এই মহদাকারের বিশুদ্ধ গম্ভীর গভীরতায় সমস্ত গতি চিরকালের জন্য নিবৃত্ত হয়। এস্থানে "গতি" বলিতে মায়াময় পদার্থ সম্বন্ধেই বুঝাইতেছে। নিত্য অবস্থার সহিত, শান্ত অবস্থার তুলনায় মায়াময় পদার্থের পরিবর্ত্তনকে বুঝাইতেছে। কারণ নিত্য গতি বা পরিণামশীলতাই অবিনশ্বর নিত্য পদার্থের মহা অভিব্যক্তি—সদেক ব্রহ্মের মহানিঃশ্বাস।

জগদাত্মা ঈশ্বর পরমেশ্বর নহেন, তিনি প্রকাশ অবস্থা। ঐ সকল দার্শনিকগণ কখনও সদেক ব্রহ্মকে প্রকৃতির অভ্যন্তরস্থ শক্তি বলিয়া মনে করিতেন না। আমরা জীবন বলিতে যাহা বুঝি সেই অর্থে আদি কারণ সদেক ব্রহ্ম অস্তিত্ববান্ ছিলেন না। যে পর্য্যন্ত না তিনি (বা ইহা) বহু সমুদ্ভূত সত্বার (অণু, দ্ব্যণু) সহিত মিলিত হইলেন, সে পর্য্যন্ত কোন প্রাণী উৎপন্ন হইল না। সেই প্রকটীভূত বস্তু, বৃত্তের যেমন কেন্দ্রস্থলে সেইরূপ পরিধিতে ও সমভাবে বর্ত্তমান্ আছেন; কিন্তু ইহা পরব্রহ্মের—জগদাত্মার প্রতিবিম্ব মাত্র। এই উপদেশে আমরা আধ্যাত্মিক বৌদ্ধধর্ম্মের মর্ম্ম দেখিতে পাই। ইহাই আধ্যাত্মিক ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের ও বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদীর মর্ম্ম।"

গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর "ঈশ্বর," মহৎস্রষ্টা চৈতন্য খ্রীষ্টীয়ান

ধার্ম্মিক পলের "তাঁহা হইতে, তাঁহার দ্বারা ও তাঁহাতে সমস্ত পদার্থ জীবিত আছে" এই বাক্যের দ্বারা নিশ্চয়ই একটী মহাভাবই বুঝাইয়াছেন ; কোন জিহোবার (সৃষ্টিকর্ত্তার বা ব্রহ্মার) কথা কহেন নাই।"

এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাসী ও মায়াবাদের প্রকৃত মর্ম্মগ্রাহী ব্যক্তির নিকট মহানির্ব্বাণ বা পরমব্রহ্ম একই কথা, ইহা কোন ব্যক্ত ঈশ্বর নহেন, মহাভাব মাত্র :—কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নহেন, কিন্তু সমস্ত ব্যক্তভাবের মূলাধার স্বরূপ। ইহার নাম "তৎ সৎ," এখানে "তৎ" শব্দ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই ভাবে সমষ্টি-ভাবে (collectively) ব্যবহৃত হইয়াছে। এই মতে সবিশেষ বা ব্যষ্টি (Individual) ব্রহ্ম নাই। কিন্তু নির্ব্বিশেষ বা সমষ্টি ব্রহ্ম, সর্ব্বব্যাপী অপ্রকট মহাশক্তি (ব্যক্তি নহেন) আছেন।

মনুষ্য শরীর একটী ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান কারণ জানিতে হইলে মানব শরীরের উপাদান কারণ জানিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে। উপনিষদে শ্বেতকেতুর পিতা এক খণ্ড লবণ জলে নিক্ষেপ করিয়া সেই জল লইয়া শ্বেতকেতুকে আচমন করিতে বলিয়াছিলেন। শ্বেতকেতু সেই লবণ মিশ্রিত জলের সর্ব্বস্থান হইতে জল লইয়া আচমন করিয়া দেখিলেন যে সমস্ত জল লবণাক্ত। তখন শ্বেতকেতুর পিতা আরুণি বলিলেন যে "ব্রহ্মও এই লবণ স্বরূপ—তত্ত্বমসি শ্বেত কেতো।" মনুষ্যদেহে ব্রহ্ম ও প্রকৃতি উভয়ই আছেন।

সবিশেষ বা ব্যষ্টি ব্রহ্ম বা ঈশ্বর স্বীকার না করিলে নাস্তিকতার দিকে অগ্রসর হইতে হয়। এই জন্তই বৌদ্ধদর্শনকে ও মায়াবাদকে নাস্তিকতা পোষক বলা হইয়া থাকে। ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কীও তাহাই বলিয়াছেন :—

ইহাকে ন্যায্যরূপেই এক প্রকার নাস্তিকবাদ বলিতে হইবে। কারণ ইহা ঈশ্বর কিম্বা দেবতাবৃন্দকে স্বীকার করাত দূরের কথা ; ইহা কোন অভিনব সৃষ্টিই স্বীকার করে না। কিন্তু যদি বৌদ্ধদিগের এবং ব্রাহ্মণ অধ্যাত্মবাদীদিগের এই অপরাধ হয়, তাহা হইলে অনেকেশ্বর বাদীদিগের ও নিরীশ্বরবাদী-

দিগের এবং ঈশ্বরবাদী ইহুদীদিগেরও এই অপরাধ আছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই কবালার ইহুদীদিগকে নাস্তিক আখ্যা প্রদান করেন নাই।

যদি এই ব্যক্ত জগতের অন্তরালে আদি কারণ অব্যক্ত প্রকৃতি বা ব্রহ্ম স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সেই ব্রহ্ম হইতে জগৎ ব্যক্ত হইল কিরূপে? উপনিষদ বলেন—তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়—সেই ব্রহ্ম সঙ্কল্প করিলেন বা ইচ্ছা করিলেন আমি বহু হইয়া জন্ম গ্রহণ করি। যদি ব্রহ্ম সবিশেষ না হইয়া নির্ব্বিশেষ হয়েন, তাহা হইলে ইচ্ছার উদ্ভব হইল কিরূপে? ইহা বুঝাইবার জন্য ম্যাডাম্ ব্লাভাট্স্কী একটী যুক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা এইরূপ :—

The tendency to gravitation in a stone is as much unexplainable as thought in the human brain. If matter can—no one knows why—fall to the ground, then it can also—no one knows why—think. * * If you consider that there is in a human head some sort of a *spirit*, then you are obliged to concede the same to a stone. If your dead and utterly passive matter can manifest a tendency toward gravitation or, like electricity, attract and repel and send out sparks then as well as the brain it can also think. * * All that which is in the first instance real and objective—body and matter—it transforms into a representation, and every ***manifestation into will*** (by dividing all things into *will* and manifestation).

"প্রস্তরখণ্ডের অভ্যন্তরস্থ মাধ্যাকর্ষণী শক্তিও যেমন অজ্ঞেয়, সেইরূপ মানব মস্তিষ্কের চিন্তাশক্তিও অজ্ঞেয়। যদি কোন পদার্থ ভূতলে পতিত হইতে পারে এবং কেহই তাহার কারণ জানিতে না পারে, তাহা হইলে ঐ পদার্থ চিন্তাও করিতে পারে এবং কেহই তাহার কারণ নির্ণয় করিতে পারে না। যদি তুমি মনে কর, মনুষ্যের মস্তিষ্কে চিন্তা করিবার জন্য এক আত্মা আছে, তাহা হইলে তোমাকে বলিতে হইবে প্রস্তরখণ্ডেও আকর্ষনীশক্তির জন্য এক আত্মা আছে। যদি তোমার নির্জীব এবং সম্পূর্ণ অচল পদার্থ আকর্ষণের দিকে বস্তুশক্তিস্বভাব প্রকাশ করিতে পারে এবং বিদ্যুৎশক্তির ন্যায় আকর্ষণ, তাড়ণ ও স্ফুলিঙ্গ প্রকাশ করিতে পারে, তাহা হইলে মস্তিষ্কও

চিন্তা করিতে পারে। পদার্থ সকলকে চিৎ ও জড় এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় না (কারণ সকল পদার্থেরই প্রাণ আছে) কিন্তু পদার্থ সকলকে ইচ্ছাশক্তি ও প্রকাশ ভাব এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। তদ্দ্বারা প্রত্যেক প্রকাশ অবস্থা ইচ্ছাশক্তিতে পরিবর্ত্তিত হয়।"

চার্ব্বাকগণও দেহাতিরিক্ত আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কিন্তু চার্ব্বাকগণ দেহের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। উল্লিখিত উদ্ধৃত অংশে স্বতন্ত্র জড়পদার্থের (আত্মা ভিন্ন জড়পদার্থের এবং) স্বতন্ত্র আত্মার (জড়ের সংস্রব ভিন্ন বিশুদ্ধ আত্মার) অস্তিত্ব অস্বীকৃত হইয়াছে। গীতা বলেন "না সতো বিদ্যতে ভাবঃ" তাহাই ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কী বলিয়াছেন (Matter was always co-enternalized with Spirit)। চার্ব্বাকগণ জড়বাদী ছিলেন। ম্যাডাম্ ব্লাভাট্স্কী বলিয়াছেন যে প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ বুদ্ধের নির্ব্বাণ তত্ত্বের ভুল অর্থ করিবার জন্য লঙ্কাবতার নামক গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত করিতে পারেন, তাঁহারা চার্ব্বাকও উদ্ধৃত করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। চার্ব্বাকগণ জড়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, ইহা অযৌক্তিক। পদার্থ কার্য্য অথবা ক্রিয়াবিশেষ। বস্তুর অবস্থার পরিবর্ত্তনের নামই ক্রিয়া। এই ক্রিয়া যে শক্তিবলে হয়, তাহাই পদার্থরূপ কার্য্যের কারণ। কারণ না জানিলে কার্য্য জানা যায় না। সুতরাং যাঁহারা (জড়বাদিগণ) পদার্থের পূর্ব্বাবস্থা বা শক্তির অবস্থা মানিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা জড়ের অস্তিত্ব কিরূপে স্বীকার করিতে পারেন?

বৌদ্ধদর্শন মতে "নির্ব্বাণের" অর্থ এই যে পদার্থ যে আকারেই থাকুক না কেন, সেই আকারের বিনাশ সাধন করিয়া মৌলিক, অব্যক্ত, অপরিবর্ত্তনীয়, গতিশূন্য, স্থির, অখণ্ড, অবস্থায় পরিণত করা। কারণ যে কোন পদার্থেরই আকার আছে তাহা সৃষ্ট পদার্থ, তাহার নিশ্চয়ই ধ্বংস হইবে," সর্ব্বমুৎপাদি ভঙ্গুরম্"। এই ধ্বংসের অর্থ আকার পরিবর্ত্তন করা। ইহাই মায়া বা ঐন্দ্রজাল। কাল বাস্তবিক অসীম ও অনন্ত, ইহা অবিভাজ্য। মানবগণ কার্য্যসৌকার্য্যার্থ কালকে দিন মাস প্রভৃতিতে কল্পনায় বিভক্ত করিয়াছেন। আকৃতি সকল ক্রমে ক্রমে বিদ্যুল্লতার ন্যায় ঝলসিয়া অলক্ষ্য হইতেছে ও অন্য আকার ধারণ করিতেছে। ইহাই মায়া। মানবগণের সূক্ষ্ম দেহও

মায়িক পদার্থ, তাহাও মানবগণের সুকৃতি ও দুষ্কৃতি অনুসারে পরিবর্ত্তিত হয়। ইহাই জন্মান্তর রহস্য। যখন আত্মিক পুরুষ চিরকালের জন্য পদার্থের প্রতি অনু পরমানু হইতে পৃথগ্‌ভূত হইয়া নিত্য অবস্থায় উপনীত হইতে পারেন, তখনই তিনি অপরিবর্ত্তনীয় নির্ব্বাণ অবস্থা প্রাপ্ত হন। তখন তিনি মাত্র আত্মায় অবস্থান করেন। যাহাকে আকার, আকৃতি বা আকারের অনুরূপ বলা যায়, তাহা হইতে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া পূর্ণ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়েন। তখন আর তাঁহাকে পুনরায় মরিতে হয় না, কারণ এই অবিশ্রান্ত পরিবর্ত্তনশীল মিথ্যা জগৎ মায়ার খেলা মাত্র; একমাত্র পরমাত্মাই মায়া নহে। (Spirit alone is no Maya, but the only Reality)।

ম্যাডাম ব্লাভাট্‌স্কী লিখিয়াছেন :—

Nirvana and Moksha then, as said before, have their being In non-being, if such a paradox be permitted to illustrate the meaning the better. Nirvana, as some illustrious Orientalists have attempted to prove, does mean the "blowing out" of all sentient existence. It is like the flame of a candle burnt out to its last atom, and then suddenly extinguished. Quite so. Nevertheless, as the old Arhat Nagasena affirmed before the King who taunted him. "*Nirvana is"—and Nirvana is eternal*, But the Orientalists deny this, and say it is not so. In their opinion Nirvana is not a re-absorption in the Universal Force, not eternal bliss and rest, but it means literally "the blowing out, extinction, complete annihilation, and not absorption."

"অতএব দেখা যাইতেছে যে নির্ব্বাণ ও মোক্ষের অস্তিত্ব, অনস্তিত্বের উপর স্থাপিত। কোন কোন প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পণ্ডিত প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে নির্ব্বাণের অর্থ সর্ব্ব প্রকারের জ্ঞানযুক্ত সত্তাকে নষ্ট করা। ইহা নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের দশার (সলিতার) ন্যায় শেষ পরমাণু পর্য্যন্ত পুড়িয়া শেষ করা, তৎপরে হঠাৎ নির্ব্বাপিত হওয়া। ইহা সম্পূর্ণ ঠিক। কিন্তু তথাপি ইহা মনে রাখিতে হইবে যে প্রাচীন অর্হৎ নাগসেন এক রাজার শ্লেষবাক্যের উত্তর দিয়াছিলেন "নির্ব্বাণ আছে"এবং নির্ব্বাণ নিত্য সত্য।" কিন্তু প্রতীচ্যদেশীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ ইহা

অস্বীকার করেন। তাঁহারা ভুল করিয়া বলেন যে নির্ব্বাণ, বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তিতে পুনঃ প্রবেশ নহে—নিত্য আনন্দ ও শান্তি নহে, কিন্তু ধাত্বর্থে নির্ব্বাণের অর্থ "নিবাইয়া দেওয়া একান্ত বিনাশ সম্পূর্ণ ধ্বংস"—মিলন নহে।"

মহাত্মা হার্ব্বার্ট স্পেন্সারও বলিয়াছেন যে "এই বিশ্বের মূলকারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা এক নিত্যা মহাশক্তির নিকট উপনীত হই, যাহা হইতে সমস্ত পদার্থ বাহির হইয়াছে।" We at last arrive at an ever lasting energy from which everything, proceeds)। যদি অনুলোমক্রমে সেই মহাশক্তি হইতে সমস্ত উদ্ভূত হয়, তবে বিলোমক্রমে সেই মহাশক্তিতে সমস্ত লয় হয়, "নির্ব্বাণ" হয়। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার সেই শক্তিকে অজ্ঞেয় বলিয়াই শক্তিমানের কোন অনুসন্ধান করেন নাই; কপিলাচার্য্য যেই শক্তিকে অব্যক্ত প্রকৃতি বলিয়াছেন। বুদ্ধদেব সেই শক্তির কোন পরিচয় দেন নাই। বেদান্তদর্শন "শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ" এই যুক্তি ও বেদ অবলম্বনে ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন, এবং শ্রীমদ্ভাগবত এই অব্যক্তের উর্দ্ধে বা 'তমসঃ পরস্তাৎ' ভগবত্তত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন।

"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাশিষ্যতে॥" (শ্রুতিঃ)।

সেই ভগবান্ পূর্ণ, এই নির্বিশেষ ব্রহ্ম পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণ উদ্ভূত, পূর্ণ ভগবান্ হইতে পূর্ণ ব্রহ্ম গ্রহণ করিলে পূর্ণ ভগবান্ই অবশিষ্ট থাকে, কোনরূপ হ্রাস বৃদ্ধি হয় না।

বেদান্ত দর্শনের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ভাষ্যকারগণ পূর্ব্বোক্ত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উর্দ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীভগবান্‌রূপে স্থাপিত করিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম জ্যোতিকে ঐ সবিশেষ ব্যষ্টি ভগবানের চিন্মাত্রসত্বা ও তনুভারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। পরমব্যোমে গোকুলাখ্যা বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ আনন্দময় ভুবনে আনন্দময় বিগ্রহে পরিকর ও শক্তিগণ সহ বিলাস করিতেছেন। আদিভুবনে ও অনুপাদক ভুবনে তাঁহার যে বিকাশ তাহাকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বা বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তি বলা যায়। এই শক্তি হইতে অসংখ্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন।

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদীনাং ভবো যস্যা নিজেচ্ছায়।
পুনঃ প্রণীয়তে যস্যাং সা নিত্যা পরিকীর্ত্তিতা॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবতাদের জন্ম যে দেবী হইতে হয় এবং তাঁহারা পুনরায় যে দেবীতে লীন হন, সেই মহাদেবী নিত্যা।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মা শ্রীভগবান্‌কে স্তব করিয়া বলিয়াছেন "আমি, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তোমা হইতেই জন্মিয়াছি, তোমার স্বরূপ জানি না"।

বেদান্তদর্শনের অদ্বৈতবাদী ভাষ্যকার বলেন—ব্রহ্ম অনাদি, অনন্ত, অখণ্ড, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, চৈতন্যস্বরূপ। বিশুদ্ধ সত্বাত্মিকা মায়া উপহিত চৈতন্য ঈশ্বর। যোগ-ঐশ্বর্য্যশালী সগুণ ব্রহ্মই ঈশ্বর। এই বিষয়ে পরে আলোচিত হইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীজানকীনাথ পাল শাস্ত্রী।

সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম।

কয়েকটী প্রশ্ন।

এই সংখ্যায় এই বিষয়ে পূর্ণেন্দু বাবু ও জানকী বাবু যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে কতকগুলি প্রশ্নের উদয় হইতেছে। ইহাতে পাঠকদিগের উপকার হইতে পারে ইহা ভাবিয়া এ সম্বন্ধে গুটিকতক প্রশ্ন দেওয়া গেল। আশা করি উক্ত মহোদয়গণ সমাধান করিয়া ভ্রম দূর করিবেন।

১। সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ বলিলে 'বিশেষ' অর্থে কি বুঝায়। বিশেষ বা বিশিষ্টতা, ভেদমূলক শব্দ ও সাধারণতঃ এই ভাবে প্রয়োগ হয়। বেদান্ত শাস্ত্রে বলা আছে যে স্বজাতিয়, বিজাতিয় ও স্বগত ভেদশূন্য পদার্থই নির্ব্বিশেষ। সুতরাং এই নির্ব্বিশেষ তত্ত্বকে ভেদ ভাষায় কি করিয়া লক্ষিত করা যাইতে পারে; ভাগবতে ব্রহ্মকে অনির্দ্দেশ্য বলা হইয়াছে। যথা,—

ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণ্যনির্দ্দেশ্যে নির্গুণে গুণবৃত্তয়ঃ।
কথং চরন্তি শ্রুতয়ঃ সাক্ষাৎ সদসতঃ পরে॥ ১০ম, স।৮৭ম অ।১

বিশিষ্টতা শব্দের পরিবর্ত্তে নির্দ্দেশ শব্দ প্রয়োগ করিলে আমরা অনেকটা বুঝিতে পারি। নির্দ্দেশ করিলেই গুণ দেওয়া হয় বলিয়া ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা

হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে এই অনির্দ্দেশ্য পদার্থকে কি প্রকারে সবিশেষ বলা যাইতে পারে? ভাগবতে অন্যস্থানে এই পরম বস্তুকে—

* * * * যজ্‌জ্ঞানম অদ্বয়ম।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানেতি শব্দ্যতে ॥

বলিয়া উক্ত করা হইয়াছে। তাহা হইলে কি অদ্বয়বাদ ভাগবতের মত নহে? যদি সেই পরম পদার্থ অনির্দ্দেশ্য ও অদ্বয় জ্ঞান হয়েন, তাহা হইলে শ্রীশঙ্করাচার্য্য কি অপরাধ করিলেন?

২। যদি অদ্বয় জ্ঞানই পরম তত্ত্ব হয়, তাহা হইলে তদতিরিক্ত স্বতন্ত্র-সত্বা প্রকৃতি কোথা হইতে আসে? ভাগবতের মতে "মায়ানাম মহাভাগ যয়েদম নির্ম্মমে বিভুঃ" উক্তিতে মায়া শক্তির স্বীকার আছে এবং এই মায়া শক্তির দ্বারা সৃষ্ট নাম রূপাত্মক জগৎ আপাততঃ সত্য বলিয়া মনে হইলেও, যে বাস্তবিক সত্য নহে, একথা ভাগবতও স্বীকার করেন।

* * * *

* * য একং বহুরূপমিজ্যৈ
মায়াময়ং বেদ স বেদ বেদম্॥　　১১।১২।২৩

বহু রূপের মধ্যে বিভিন্ন জীবভাব না দেখিয়া যিনি একত্ব দেখিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত বেদবিৎ। অন্যত্র আছে যে তিনি 'নিষেধ সিদ্ধি' অর্থাৎ নিষেধের পরিসমাপ্তি এবং শব্দাদি শ্রুতি প্রমাণও কেবল নিষেধরূপে তাঁহাকে ইঙ্গিত করিতে পারে। যথা,

শব্দোঽপি বোধক নিষেধয়াত্মমূল
মর্থোক্তমাহ যদৃতে ন নিষেধ সিদ্ধিঃ।　১১ শ, স্কঃ। ৩। ৩৬

তিনি সর্ব্বভূতে সমভাবে এক রস রূপে বর্ত্তমান। কারণ গীতা বলেন,—

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তম্ পরমেশ্বরম্।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে এই সমতা ভাবের উপরেও যে বিশিষ্ট ভাব আছে ও ঐ বিশিষ্ট-ভাব জীব হইতে অতিরিক্ত তাহা বলিবার যুক্তি কি? ভগবানের এক অংশে জগৎ আছে সত্য; কিন্তু এ অংশ শব্দের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ভাবটি কখনও গীতোক্ত 'সমং' নহে। প্রকাশ অংশে জীবে ও ঈশ্বরে পার্থক্য আছে সত্য, কিন্তু সমতা অংশে পার্থক্য থাকিতে পারে না। কারণ ভাগবতের মতেও ব্রহ্মই জীব রূপে প্রতীয়মান; যথা,—

সূক্ষ্মং মহানহমিতি প্রবদন্তি জীবম্

* * * *

ব্রহ্মেচ ভাতি সদসদ চ তয়ো পরম যৎ॥ ১১। ৩। ৩৭

এই শ্লোকে ভাষ্যকারগণ অহং অর্থে অহঙ্কার ধরিয়াছেন, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। উহা সঙ্গত বলিয়া মানিয়া লইলেও, জীবের স্বতন্ত্র স্বত্বা প্রমাণ হয় না; কারণ উহা উপাধি প্রসূত এবং উপাধি নাশে উহার নাশ হইবে।

৩। ভগবান বা ব্রহ্মকে যে বিগ্রহবান বলা হইয়াছে তাহার কারণ কি? অদ্বয় জ্ঞানে উপাধি স্বরূপতঃ আসিতে পারে না, সুতরাং বিগ্রহ থাকিতে পারে না। জগৎ প্রকাশের জন্য ঐন্দ্রজালিক উপাধি গ্রহণ সম্ভব হইতে পারে বটে, কিন্তু তত্বাংশে বিচার করিলে উপাধির স্বতন্ত্র সত্বা থাকা অসম্ভব। তাহা হইলে তাহাকে বিগ্রহ দ্বারা বিশিষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আশা করি লেখকেরা প্রশ্নের সমাধান পূর্ব্বক সংশয় নাশ করিবেন।

শ্রীরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

পঞ্চীকরণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ;)

"ন হবৈ দেবান পাপং গচ্ছতি ইতি শ্রুতিঃ" শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে, দেবতাদিগের প্রতি পাপ গমন করে না, তাহাতে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে পাপ স্পর্শের বিষয় কি? এই ছান্দোগ্য শ্রুতির সহিত তাপনীয় শ্রুতির এক বাক্যতা প্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণে গোপী সঙ্গাদি দোষের অবস্থান হইতে পারে না, তবে মূঢ়, পাষণ্ড, ও অজ্ঞানী নাস্তিকেরা যে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে অসূয়া করতঃ কুবাক্য প্রয়োগে নিন্দায় আনন্দিত হইতেছেন তাহাতে ঈশ্বরের অপকার কি? এবং তৎ সাধকেরই বা অপচয় কি! শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ নিন্দা তাঁহাদিগের অকল্যাণ বীজ স্বরূপ অঙ্কুরিত হইতেছে; তাহাদিগকে অশেষ যাতনা সংস্থ প্রেতলোকে স্বকৃত কর্ম্মের ফল পুনঃ পুনঃ অনুভব করিতে হইবে। অভক্ষ্য ভক্ষণ, অগম্যাগমন, অবাচ্য কথন, জন্য দুষ্কৃত কোথাও যাইবে না। "অগ্রে ধাবন্তি ধাবন্তি"।

স্বয়ং কৃত কর্ম্ম স্বয়ং ভোগ করিবেন। পিতৃদায়বৎ অন্যে অংশ গ্রহণ করিবে না। যথা, "ধেনু সহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরং।" তথা শুভাশুভং কর্ম্ম কর্ত্তার মনুগচ্ছতি॥" সহস্র সহস্র ধেনু মধ্যে যেমন বৎস আপন মাতাকে চিনিয়া অনুগামী হয়, তদ্রূপ শুভাশুভ কর্ম্ম সহস্র সহস্র লোক মধ্যে কর্ত্তার প্রতি অনুগমন করে। অতএব হে দেশজ ভ্রাতরঃ! সকলে কৃষ্ণ নিন্দার বিরাম কর, একান্ত চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ চরণানুস্মরণ কর, সর্ব্বভূতে কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি কর, সর্ব্ব জীবে কৃপাবিস্তার কর, সেই মুখ্যজ্ঞান, আত্মতত্ত্ব জ্ঞান, তাহাকেই ব্রহ্মনিষ্ঠ কহে।

এই সকল সিদ্ধান্ত কথা শ্রবণে, ভাক্তত্বজ্ঞানী পাপ বাহুল্য বশে, বুদ্ধির মলিনতা প্রযুক্ত, সম্যক্ বুঝিতে অক্ষম হইলেও, লিপি কৌশলের বিস্তর প্রশংসা করিয়া, (পুনঃ প্রশ্ন করিতে পন্থা না পাইয়া সুতরাং মৌনাবলম্বনে) নিরস্ত হইলেন। এক্ষণে কথা এই যে, ভাক্তগণ যদি ইহাতেও প্রবোধ প্রাপ্ত না হয়েন, তাহাতেও আমাদের কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখিত হইবার কারণ নাই, কেননা অস্মদাদির একমাত্র ভরসা এই যে, সুধীগণ এই মিমাংসা পাঠে অবশ্যই সন্তোষ প্রাপ্ত হইবেন।

গুরু শিষ্যের কথোপকথন।

গুরু। তুমি কে? ব্রহ্মস্বরূপ তুমি জানিয়াছ?

শিষ্য। আমি মনুষ্য, আমা দ্বারা কি প্রকারে ব্রহ্মস্বরূপ জানা যাইবে?

গুরু। এই তোমার দেহ মনুষ্য। দেহের দ্রষ্টা তুমি। আত্মা দেহ হইতে পৃথক্। তুমি মনুষ্য নহ; তুমি ব্রহ্ম। অজ্ঞান কারণ তুমি বলিতেছ যে, "ব্রহ্মস্বরূপ কি প্রকারে জ্ঞাত হওয়া যাইবে।"

শিষ্য। প্রভু! আপনি বলিতেছেন যে, তুমি ব্রহ্ম, কিন্তু আমি ব্রহ্ম কি প্রকারে হইতে পারিব? আমি ত সংসারী, সুখী দুঃখী কর্ত্তা ও ভোক্তা, উহাতে আপনার উপদেশ আমার অনুভবে আসিতেছেন না।

গুরু। হে মুমুক্ষো! তুমি বিচার করিয়া দেখ এই যে, তোমার দেহেতে যে অহঙ্কার আছে—সেই সংসারী, সুখী দুঃখী, কর্ত্তা এবং ভোক্তা দৃশ্য হয়। তুমি তাহার দ্রষ্টা হও। দেহের চিহ্ন (যদ্রূপ অজার লক্ষণ সিংহের সহিত মিলে না, তদ্রূপ) তোমার আত্মার সহিত একটীও মিলে না; আর ব্রহ্মের

সৎচিৎ আনন্দাদি লক্ষণ (যদ্রূপ সিংহের লক্ষণ সিংহের সহিত মিলিয়াছে, তদ্রূপ) তোমার আত্মার স্বরূপেতে (মিলিতেছে) পাওয়া যাইতেছে। যেমন ব্রহ্ম সত্য, তেমনি তুমি জাগ্রদাদি তিন অবস্থাতে সত্যরূপ তুমিই সর্ব্বাবস্থায় এক অবিকৃত ভাবে রহিতেছ। তেমনি তুমি তিন অবস্থাকেই জান অর্থাৎ অবস্থাত্রয়েরই জ্ঞাতা, সেই হেতু জ্ঞানরূপ। যেমন ব্রহ্ম আনন্দরূপ তেমনি তুমিও পরমপ্রেমাস্পদ; সেই হেতুই তুমি পরমানন্দরূপ। তুমি ব্রহ্মের মত "অস্তি জায়তে" ইত্যাদি ষড়্‌বিকার রহিত। এই তোমার দেহ দৃশ্য, অসত্য, জড় ও দুঃখরূপ এবং ষড়্‌বিকারবান্। আর দেহের সহিত তোমার কোনও বাস্তবিক সম্বন্ধ নাই, কেবল তোমার স্বরূপের অজ্ঞান দ্বারা (স্বরূপ না জানা হেতু) সুখ, দুঃখ, কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব ইত্যাদি অন্তঃকরণের ধর্ম্ম সকল ভ্রান্তিবশতঃ আত্মাতে স্বীকৃত (আরোপিত) হইয়াছে। বস্তুতঃ তুমি শুদ্ধ ব্রহ্ম। তোমাতে সংসার নাই। সেইরূপ শ্রীমদ্ভাগবতেও একাদশ স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের উপদেশ বাক্য আছে যে—

"শোক হর্ষ ভয় ক্রোধ লোভ মোহ স্পৃহাদয়ঃ।
অহংকারস্য দৃশ্যন্তে জন্মমৃত্যুশ্চ নাত্মনঃ॥

শোক (দুঃখ) হর্ষ (প্রসন্ন হওয়া), ভয় (ভীত হওয়া) লোভ মোহ স্পৃহা (ইচ্ছা) জন্ম মৃত্যু ইত্যাদি শব্দ হইতে কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব আদি এই সমগ্র ধর্ম্ম অহঙ্কারেতে দেখা যায়। আত্মাতে নাই। যেহেতু সুষুপ্তি সমাধি আদি অবস্থাতে আত্মা (বিদ্যমান) আছেন, কিন্তু যদি অহঙ্কারলীন হয় তবে সুখ দুঃখাদি ধর্ম্ম প্রতীত হয় না। আর জাগ্রতাবস্থায় অহংকার আছে সেই হেতু সুখ দুঃখাদি প্রতীত হইয়া থাকে। ঐ কারণে সেই (উপরোক্ত শোক হর্ষাদি) ধর্ম্ম অহঙ্কারেতেই রহিয়াছে আত্মা নির্ব্বিকারই আছেন।

এই প্রকারে সদ্‌গুরু যখন বোধ করান, তখন শিষ্য বিচার করিয়া দেহাজ্ঞান ত্যাগ পূর্ব্বক, "আমি ব্রহ্মস্বরূপ" এইরূপ নিশ্চয় করে এবং সংসার দুঃখ হইতে মুক্ত হয়। দৃষ্টান্তে যেমন পার্ব্বতীয় বিজ্ঞ সিংহের উপদেশ ব্যতীত প্রথমোক্ত অজ্ঞ সিংহের "আমি অজা" এরূপ দৃঢ় অধ্যাস হইয়াছিল; তেমনি অজ্ঞানী জীবাত্মাও সদ্‌গুরু উপদেশ বিনা অনাদি কালের ভ্রম দ্বারা এইরূপ স্বীকার করিয়া লইয়াছে যে দেহই আমি।

এই প্রকারে প্রথম চতুষ্পদির পূর্ব্বার্দ্ধে অনাদি কালের অধ্যাস দ্বারা জীবের দেহাধ্যাস হইয়াছে ইহারই বর্ণন করা হইল।

এখন উত্তরার্দ্ধে দেহাধ্যাসের ফল জন্ম মরণাদি যে সংসার উহারই বর্ণন করা হইতেছে।

"তে সারু করে চৌরাশী লক্ষ যোণিনে ইতি।"

অর্থাৎ সেই হেতুতে ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতেছে ইতি।

যে কারণে জীব নিজের স্বরূপ ভুলিয়া দেহে অধ্যাস করিয়াছেন, সেই কারণে সে ৮৪ লক্ষ যোণিতে বারম্বার ভ্রমণ করিতেছে আর পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ ভুগিতেছে। এই বিষয়ে নিম্নে দৃষ্টান্ত কহিতেছি উহা হইতে বুঝিয়া লওয়া যায়।

দৃষ্টান্ত কোন বড় সহরে একটী অন্ধ বাস করিত। চতুর্দ্দিক প্রাচীর বেষ্টিত সেই সহরে তাহার অনেক প্রকার কষ্ট হওয়ায় তথা হইতে বাহিরে যাইবার তাহার ইচ্ছা হইল। তাহাতে সেই অন্ধ কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিল যে সহরের বাহিরে যাইবার রাস্তা কোন্ দিকে আছে? তাহাতে সেই ব্যক্তি উত্তর দিল যে চতুর্দ্দিক প্রাচীর বেষ্টিত এই সহরের কেবল মাত্র একটী দ্বার আছে সেই হেতু তুমি প্রাচীরে হাত লাগাইতে লাগাইতে চলিতে থাক এবং যে স্থানে দরজা আসিবে সেই স্থান দিয়া সহরের বাহিরে যাইবার রাস্তা পাইবে। তাহা হইলে তুমি পূর্ণকাম অর্থাৎ সুখী হইতে পারিবে।

এইরূপ শ্রবণ করিয়া সেই অন্ধ দেওয়ালে হাত লাগাইতে লাগাইতে চলিতে লাগিল। তৎপর চলিতে চলিতে যখন দরজার নিকট আসিল তখন সেই অন্ধের শরীরে কণ্ডুয়ন অর্থাৎ চুলকানি উপস্থিত হইল। সেই জন্য তখন দেওয়াল হইতে সে হাত উঠাইয়া গা চুলকাইতে চুলকাইতে চলিতে লাগিল আর কণ্ডুতি (চুলকানি) বন্ধ হইলে পর যখন তাহার হাত প্রাচীর ধরিতে গেল তখন তাহার হাত প্রাচীর পাইল অর্থাৎ প্রাচীরে হাত লাগিল; পরন্তু গা চুলকাইতে চুলকাইতে চলিবার সময় দরজা পশ্চাতে রহিয়া গেল। সেই জন্য সে সেই বৃহৎ সহরের সমুদয় দেওয়াল ধরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনেক দুঃখভোগ করিতে লাগিল। রাস্তায় উহার পদে কণ্টক বিদ্ধ হইতে লাগিল এবং সহরের স্থানে স্থানে মল মূত্রেও পড়িয়া যাইতে লাগিল; রৌদ্রে অতিশয় সন্তপ্ত

ও ব্যাকুল হইতে লাগিল, আর বাতাসে ধূলা উড়িয়া আসিয়া তাহার চক্ষে পড়িতে লাগিল। এইরূপে সেই অন্ধ অনেক কষ্ট পাইতে লাগিল।

এই প্রকারে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিয়া যে সময় অন্ধ সেই সহরের দ্বারের নিকটে আসিতেছে, সেই সময়েই তাহার পূর্ব্বের কর্ম্মদোষের নিমিত্ত পুনঃ কুণ্ডুয়ণ (গা-চুলকানি) হইতেছে ও দ্বার পশ্চাতে রহিয়া যাইতেছে। এইরূপ বারম্বার ভ্রমণ করিয়া সেই অন্ধ মহা দুঃখ ভুগিতে লাগিল।

এক্ষণে অন্ধের পরিবর্ত্তে অজ্ঞানী বুঝিতে হইবে, প্রাচীরের পরিবর্ত্তে চৌরাশী লক্ষ যোনি, দ্বারের পরিবর্ত্তে মনুষ্যদেহ এবং কণ্ডুয়ণ পরিবর্ত্তে বিষয় সুখ বুঝিতে হইবে।

এই প্রকারে অজ্ঞানী জীব চৌরাশী লক্ষ যোনি বারম্বার ভ্রমণ করিয়া অবশেষে মনুষ্য দেহরূপী মুক্তিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর উপদেশ পাইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ও আত্মস্বরূপ বুঝিতে পারিয়া উক্ত চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ হইতে ত্রাণ পাইয়া মোক্ষ সুখ লাভ করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। কিন্তু অজ্ঞানরূপী অন্ধতাহেতু এই মনুষ্য দেহ যে মুক্তির দ্বার এবং ইহাকে যে মোক্ষের সাধন করিয়া লইতে হয়, তাহা বোধগম্য হয় না; এবং নানারূপ বিষয় ভোগ ও অসদাচরণরূপ কণ্ডুয়ণ হেতু সম্পূর্ণ আয়ুধকাল বৃথায় যাপন করিয়া থাকে।

যেমন দক্রুর উপর চুলকাইলে খুব মিঠা সুখ বোধ হয়, সেইরূপ নানাপ্রকারের বিষয়ভোগ ভুগিতেও অতিশয় প্রিয় বোধ হয়। তাহাতে মৃত্যু পর্য্যন্তও সেই বিষয় হইতে আশক্তি ছাড়িয়া পরমেশ্বরে প্রীতি আইসে না। এইরূপ সুখভোগ করিতে করিতে প্রাণ যখন বাহির হইয়া যায়, তখন মনুষ্য দেহরূপী মোক্ষদ্বারও পশ্চাৎ রহিয়া যায় এবং ৮৪ লক্ষ যোনিরূপ সহরের প্রাচীর হাতে আসে। তদ্ধেতু বৃষ, অশ্ব, গর্দ্দভ আদি পশুদেহ ধারণ পূর্ব্বক, পশ্চাৎ মহাদুঃখ ভোগ করিতে হয়। তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণ এই, যে পশুর উপর ভার চাপাইয়া যষ্টি প্রহার দ্বারা চালান যায়, সে পশুকে যদি কেহ ঘাস দেয়, তবে সে খাইতে পায় এবং যদি জল পায় তবে পান করিতে পারে। এই প্রকারে সেই পশুর নিজের স্বাধীন ব্যবহার কিছুই হইতে পারে না। সেই কারণ বশতঃ এই মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়াও যে পুরুষ

আজকাল কর্ম্মত্যাগী এমন তত্ত্বজ্ঞানী অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা কথায় কথায় বলিয়া থাকেন, "কর্ম্মকাণ্ড, ও কেবল অজ্ঞানের জন্য বইত নয়,—যাহার জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, সে কর্ম্ম করিবে কেন?" যাঁহারা এই সকল কথা বলেন, তাঁহাদের মধ্যেও অধিকাংশই কর্ম্মকারী এবং কর্ম্মচারী; তবেই এখানে কর্ম্ম বলিতে বুঝিতে হইবে, দেবতার উপাসনার জন্য যে কর্ম্ম তাহাই অজ্ঞানীগণের নিমিত্ত; তদ্ভিন্ন—স্ত্রী পুত্রাদির জন্য যে সকল কর্ম্মের প্রয়োজন, তাহা জ্ঞানীকেও অবশ্য করিতে হইবে। কেন না শাস্ত্র বলিয়াছেন, "তৎপ্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব," যাহা হউক্, বোধ হয়, এই সকল ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই যেন সকল জ্ঞানীর অন্তর্যামী ভগবান্ বলিয়াছেন "দেহধারী জীব মাত্রেই কর্ম্ম ব্যতিরেকে কেহ ক্ষণার্দ্ধও অবস্থিত হইতে পারে না, অনিচ্ছা স্বত্বেও জীব বাধ্য হইয়া কর্ম্মরূপ বায়ু কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়;" অর্থাৎ কেহ যেমন বায়ুর গতিরুদ্ধ করিতে না পারিয়া সকলেই তাহার অনুগমন করে, তদ্রূপ কর্ম্মের অনিবার্য্য গতি কেহ রোধ করিতে না পারিয়া তাহার অনুবর্ত্তী হয়। জীব কর্ম্ম দ্বারাই সুখভোগ করে, কর্ম্মদ্বারাই দুঃখ ভোগ করে; কর্ম্মবলেই জাত, মৃত এবং অবস্থিত হয়। এজন্য শাস্ত্রে আমি সাধনযোগে বহুবিধ কর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছি, অল্প জ্ঞানীগণের নির্ব্বাণ ধর্ম্মের প্রবৃত্তির জন্য, অর্থাৎ সর্ব্বদা সাধুসঙ্কল্পে হৃদয় ব্যাপৃত থাকলে দুষ্কার্য্যের চিন্তাই আদৌ হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইতে পারে না।" এক্ষণে ভগবান্ কর্ম্ম সূত্রটী যেন একটু বিশদ বিস্তৃতরূপে ইঙ্গিত করিয়া দিতেছেন। "যেহেতু কর্ম্ম দ্বিবিধ; শুভ এবং অশুভ, অশুভ কর্ম্ম হইতে জীব কর্ম্মফলে আসক্তচিত্ত, সুতরাং কর্ম্মপাশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া ইহ ও পরলোকে বারম্বার যাতায়াত করে, অর্থাৎ ঐ যে বুঝিয়াছে যে দেব দেবীর উপাসনার জন্য কর্ম্ম করিলে, তাহা বন্ধনের জন্য; আর সংসারের জন্য যাহা করি, তাহা কেবল বন্ধন মোচনের জন্য—এই বুদ্ধি বন্ধনের গ্রন্থিটি একটু শিথিল করিতে হইবে—বুঝিতে হইবে, যাহার জন্য যাহা কর, তাহাই জানিবে "কর্ম্ম"—তন্মধ্যে যাহা সৎ, তাহাই জানিবে শুভ, এবং যাহা অসৎ, তাহাই অশুভ; এই শুভ অশুভ উভয়বিধ কর্ম্মই জীবের সংসারবন্ধনের মূল। এই শুভ বা অশুভ কর্ম্মের ক্ষয় যতকাল না হয়, শত কল্প গত হইলেও ততকাল জীবের মুক্তি হয় না। অর্থাৎ

সৎকর্ম্মের যেমন ক্ষয় হইবে, সঙ্গে সঙ্গে অসৎ কর্ম্মেরও তেমনি ক্ষয় হইবে। নতুবা তোমার সৎকর্ম্মগুলি সব উঠিয়া যাইবে, অসৎ কর্ম্মের প্রবাহ সমানই থাকিবে, অথবা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইবে; এরূপ কর্ম্মক্ষয়ে সংসারবন্ধন মোচন হইবে না। অধিকন্তু সৎকর্ম্মের অভাবে স্বর্গের বন্ধন ছিন্ন হইবে; অসৎকর্ম্মের প্রভাবে নরকের বন্ধন আরও দৃঢ় হইবে। শৃঙ্খল লৌহময় হউক, অথবা স্বর্ণময় হউক, তাহাতে যেমন বন্ধনের কিছুমাত্র তারতম্য হয় না, তদ্রূপ কর্ম্মও শুভ বা অশুভ হউক, জীবকে বন্ধন করিতে উভয়েই সমান সমর্থ; তাহাতে কিছুমাত্র বৈষম্য হয় না। সৎ হউক বা অসৎ হউক, কর্ম্ম সঞ্চিত থাকিলেই, সে জীবকে যে সংসারে পুনরাবৃত্ত করিবে, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। সতত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে নানা কষ্টভোগ করিয়াও জীব যে কাল পর্য্যন্ত জ্ঞান লাভ না করে, তাবৎ মুক্ত হইতে পারে না। অর্থাৎ কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে যদি জ্ঞানতত্ত্বের অনুশীলন না থাকে, তবে সে কর্ম্ম কখনও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুক্তি বিধান করিতে পারে না।" মোক্ষ হইবার সাধন না করে এবং অধর্ম্মাবলম্বনে কেবল বিষয়ভোগ করিয়া সমগ্র আয়ু বৃথা অতিবাহিত করে, সে পুরুষ মনুষ্য দেহ নাশ হইবার পরেও পশ্বাদিদেহ ধারণ করিয়া মহাদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। ইহা প্রবোধ সুধাকর নামক গ্রন্থে শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য গুরু বলিয়াছেন।

বৃত্ত উপগীতী।

নরদেহাঽতিক্রমণাৎ প্রাপ্তৌ পশ্বাঽদি দেহানাম্।
স্বতনোরপ্যজ্ঞানং পরমার্থস্যাঽত্র কা বার্ত্তা॥ ১॥

আত্মবোধ ব্যতীত আয়ুনাশ হইলে মনুষ্যদেহের নাশ হইবার পর যে প্রাণী পূর্ব্বের বহু পাপ কর্ম্ম দ্বারা পশ্বাদিদেহ ধারণ করে, তাহার পশ্বাদি অবতারে নিজ শরীরেরও পূর্ণ জ্ঞান হয় না, তবে তাহার পরম সুখরূপ পরমব্রহ্মের জ্ঞান হয়, এরূপ বার্ত্তা কিরূপে সম্ভবে? অর্থাৎ পশু পক্ষী আদির দেহে পরব্রহ্মের জ্ঞান কখনই হইবে না॥ ১॥

তবে পশুদেহে কি হয়? এরূপ শঙ্কা হইলে, তাহার উত্তর এই যে, কেবল দুঃখই ভুগিতে হয়। তদ্বিষয়ে কথিত হইতেছে।

মূল আর্য্যা।

সততং প্রবাহ্যমাণের্ষভৈরুষ্ট্রৈঃ খরৈর্গজৈর্মহিষৈঃ।
হা কষ্টং ক্ষুৎক্ষামৈঃ শ্রান্তৈর্নোশক্যতে বক্তুম্॥ ২॥

ষাঁড়, উট, গাধা, হাতী ও মহিষ-শাবক সকল, এইরূপ পশুজাতীয় যত শরীরধারী আছে, তাহাদের উপরে বহুভার চাপাইয়া দিয়া মনুষ্য উহাদিগকে নিরন্তর চালাইয়া থাকে, তাহাতে উহাদিগকে পরাধীন হইয়া ভার বহন করিয়া লইয়া যাইতে হয়। উহারা কতই না কষ্ট পায়! ক্ষুধায় পরিমিত আহারও মিলে না, তাহাতে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। বোঝা টানিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তবুও বলিতে পারে না যে, আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, তজ্জন্য এক্ষণে আমাকে ছাড়িয়া দাও" ॥ ২ ॥

পশুদেহ ধারণ করায় কত দুঃখ, ইহা প্রসিদ্ধরূপে দেখা যাইতেছে। উহাতে এই প্রকার সিদ্ধান্ত হইল যে, আত্মজ্ঞান বিনা মনুষ্যদেহ নাশ হইবার পর প্রাণীকে ৮৪ লক্ষ যোনিতে অনেক প্রকারে জন্ম মরণ দুঃখ ভুগিতে হয়। যখন জীব মাতার উদরে "গর্ভবাস" করে, তখন তাহাকে সেই স্থানে মল, মূত্র, রুধির, মাংস এবং নীল ও পীতবর্ণযুক্ত শ্লেষ্মাদির ধাতু, ক্রিমি এবং জঠরাগ্নিতে অনেক প্রকার দুঃখ ভোগ করিতে হয়। নরকবাস হইতে গর্ভবাসে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। "গর্ভবাস"—ইহা বড়ই নরক। জন্ম সময়েও মাতার এবং গর্ভের (গর্ভস্থ প্রাণীর) যে দুঃখ হয়, তাহা অবাচ্য। যেহেতু প্রসব সময়ে যে দুঃখ হয়, উহা মাতার ও গর্ভের (ভ্রূণস্থ প্রাণীর) বিলক্ষণ অনুভবে আসিয়া থাকে। বাল্যাবস্থায় পরাধীনতায়, যৌবনাবস্থায় স্ত্রী আদি বিষয়ের ইচ্ছায়, এবং বৃদ্ধাবস্থাতে অসামর্থ্যতা ও অনেক প্রকারের রোগ, এবং স্ত্রী পুত্রাদির অনাদর হেতু, অনেক দুঃখ হয়। তাহার অনুভব সকলেরই প্রসিদ্ধরূপে জানা আছে। সেই প্রকার মরণ সময়েও অসংখ্য দুঃখ সকল শরীরেই হইয়া থাকে; এবং জীবিত মনুষ্যের হাত পা আদি অঙ্গ "করাত" দ্বারা কাটিলে যেরূপ কষ্ট হয়, সেইরূপ কষ্ট মৃত্যু সময়ে হয়। এইরূপে অজ্ঞানী, পরাধীন, পাপী জীবের বারম্বার জন্মমৃত্যুর দুঃখ হইয়া থাকে। এতদ্বিষয়ের দৃষ্টান্ত শ্রীশঙ্করানন্দ মুনি আত্মপুরাণে নিম্নে কহিয়াছেন।

জাতো বালো যুবা বৃদ্ধো মৃতো জাতঃ পুনস্তথা।
বিভ্রমীত্যেষ সংসারে ঘটীযন্ত্রসমোঽবশঃ॥ ১॥

কূপোপবিষ্ঠ ঘটীযন্ত্র যেমন—ঘটমালা চক্রসংযোগে নিম্নে গমন করে এবং পুনর্বার ঊর্দ্ধে আগমন করে; যেমন কুম্ভকারের চক্র অনবরত ঘূর্ণায়মান থাকিয়া একই বৃত্তে ভ্রমণ করে; আর যেমন, কলুরঘানির * বলদ একই পথে নিরন্তর পাদচারণ করে, সেইরূপ ইহ সংসারে অজ্ঞানীজীব (নানা কর্ম্মবশ হেতু) পরাধীনতা বশতঃ জন্মগ্রহণ করে, এবং যথাক্রমে বাল্যাবস্থা, যৌবনকাল ও বৃদ্ধত্ব ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়; আর ইহার পর পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে। এই অজ্ঞান হেতু জীব আত্মস্বরূপ বিস্মিত হইয়া. জন্মমরণরূপ "ঘটমালায়" পুনঃ পুনঃ আসিয়া ফিরিয়া মহাদুঃখ ভোগ করিতে থাকে।

এইরূপে পূর্ব্বোক্ত চৌরাশী লক্ষ যোনিতে (জীবের) দুঃখের কথা শুনিয়া শিষ্যের অন্তরে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইল, এবং "দুঃখ কিরূপে দূর হইতে পারে"—ইহা জানিবার ইচ্ছা হইল। তখন "গুরুর শরণ ব্যতীত অন্য উপায় নাই"—স্বতঃই তাহার এইরূপ স্মৃতির উদয় হওয়াতে, সে গুরুর নিকট যাইয়া জন্ম মরণাদি দুঃখের নিবৃত্তি কি প্রকারে হইতে পারে, তদ্বিষয়ক প্রশ্ন করিল। ক্রমে সেই সকল বিষয় অপর দ্বিতীয় চতুষ্পদীতে নিরূপিত হইতেছে।

নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য ও প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ স্নান, সন্ধ্যা, জপ, তপ, যজ্ঞ, দান এবং ব্রতাদি নানাবিধ কর্ম্ম করিতে করিতে অনেককাল গত হইলেও তাহাতে জন্মমরণ দুঃখ যে নিবৃত্ত হয়, এরূপ. কোন দৃঢ়বিশ্বাস শিষ্যের মনে উদয় হয় নাই, সেইজন্য ঈশ্বরানুগ্রহ হেতু (কর্ম্মের স্বভাবে কিঞ্চিৎ চিত্তের নির্ম্মলতা প্রযুক্ত) বিচার দ্বারা তাহার মনে স্বতঃ এই স্মৃতির উদয় হইল যে, "জন্মমরণ নিবৃত্তির একমাত্র উপায় কেবল আত্মজ্ঞান; অর্থাৎ আত্মজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে, কোন সাধনেই. জন্মমরণ রূপ দুঃখ নিবৃত্তি হয় না। কিন্তু এই "আত্মজ্ঞান" প্রাপ্তির উপায় কেবলমাত্র সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হওয়া। চিত্তের নির্ম্মলতা প্রযুক্ত, ভগবৎ কৃপায় স্বতঃই জীবের এইরূপ স্মৃতির উদয় হইয়া থাকে।

* "মা! আমায় ঘুরাবি কত ? কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত॥" রামপ্রসাদ।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার "জ্ঞান-গঙ্গা-শতক" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, "অজ্ঞানী কর্ম্মেতে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেনা এবং জ্ঞানীরও কর্ম্মের প্রয়োজন হয় না।" এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, তবে কর্ম্মের প্রকৃত অনুষ্ঠাতা কে হইবে? উত্তর, যিনি "অর্দ্ধ-প্রবুদ্ধ" তিনিই কর্ম্মের প্রসিদ্ধ অনুষ্ঠাতা। কর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁহারই সিদ্ধিলাভ হইবে। অর্দ্ধ-প্রবুদ্ধ ব্যক্তিই ক্রমশঃ কর্ম্মানুষ্ঠান, উপাসনা, এবং জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন; ইহাঁদেরই বিবেকী বলে। বিবেকোদয় হইলে, মানুষ আগে চরিত্রবান হয়, পরে ধর্ম্মজীবন লাভ করে। মনে বিবেক স্থায়ী করিবার জন্যই শাস্ত্র বিচারের আবশ্যক। বিবেকোদয় হইলে বৈরাগ্যের (দীনাভাবের) জন্য তপস্যার আবশ্যক হয়। কেন না বৈরাগ্য ব্যতীত কর্ম্ম ও জ্ঞান, ইহার কিছুই সিদ্ধ হয় না। বিশেষতঃ বিবেক ও বৈরাগ্য ব্যতিরেকে শাস্ত্রপাঠে কোন ফল হয় না। বৈরাগ্য দৃঢ় হইলে তীব্র মোক্ষেচ্ছা জন্মে। বস্তুলাভ ও তৎক্ষণাৎ হয়। তাহার পর বিদেহ সুখ অর্থাৎ জীবন্মুক্তি সুখ লাভ বা স্বারাজ্যসিদ্ধ হয়। নতুবা কেবল উপাসনাদি শুভকর্ম্ম ত্যাগ করিলেই জ্ঞানী হয় না।

তত্ত্ববিচার [ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ মিথ্যা, অর্থাৎ ব্রহ্ম বিভূতি ভিন্ন জগৎ স্বতন্ত্র নহে, এই বিচার] এবং নিষ্কাম কর্ম্ম, এই উভয় দ্বারা পাপের ক্ষয় এবং অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইলে, তবে জ্ঞানের উদয় হয়। অর্থাৎ ব্রহ্ম তত্ত্বের অনুশীলন এবং কর্ম্মফলের কামনা পরিহার পূর্ব্বক নিরন্তর ভগবদ-আরাধনা করিতে করিতে দেখিবে, যে অন্তঃকরণে পাপের প্রবৃত্তিই আর হয় না, রজোগুণ এবং তমোগুণের কোন বৃত্তিবিকাশ না হইয়া কেবলই শুদ্ধ সত্ত্বের অনুভব হয়। অন্তঃকরণ এইরূপ নির্ম্মল হইলে, তখনই তাহাতে জ্ঞানের উদয় হয় জানিবে। ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ মায়া কল্পিত, কেবল পরব্রহ্মই একমাত্র সত্য, এই তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে তবে জীব প্রকৃত সুখ লাভ করে। অর্থাৎ দ্বৈত জগতের এই যাহা কিছু বিচিত্রতা পরিদৃশ্যমান, এ সমস্তই স্বপ্ন বা ঐন্দ্রজালিক দৃশ্যবৎ মায়া রচিত। একমাত্র ঐন্দ্রজালিক পুরুষ ভিন্ন, তাঁহার কৃত ক্রিয়া সমস্তই যেমন মিথ্যা, তদ্রূপ সেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম ভিন্ন তাঁহার কৃত এই সংসার দৃশ্য সমস্তই মিথ্যা। লৌকিক নিদ্রা ভঙ্গ হইলে সেই সঙ্গে সঙ্গে যেমন সকল স্বপ্ন তিরোহিত

হয়, তদ্রূপ ভগবৎপ্রসাদে আমাদের মায়া নিদ্রা ভঙ্গ হইলেও সেই সঙ্গে সঙ্গেই এই মায়াময় সংসারও তিরোহিত হইয়া যায়। জাগিলে জীব যেমন দেখিতে পায় কেবল সে, নিজেই রহিয়াছে, আর নিদ্রাও নাই স্বপ্নও নাই, তদ্রূপ জীবের আত্ম চৈতন্যের উদয় হইলেও তিনি তখন দেখিতে পান, কেবল একমাত্র পরমাত্মা আমিই রহিয়াছি, আর মায়াও নাই, সংসারও নাই। জীব যখন এইরূপে তত্ত্ব সমুদ্রে ডুবিয়া যান, তখনই তিনি সেই সুখে সুখী, যে সুখের পর আর কখনও দুঃখ নাই। সমস্ত নামরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যিনি সত্য ও নিশ্চল ব্রহ্মে পরিনিশ্চিততত্ত্ব হইয়াছেন, তিনিই কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

সমস্ত নামরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিশ্চল সত্য ব্রহ্মে পরিনিশ্চিত তত্ত্ব হইতে হইবে, ইহাতেই বুঝিতে হইবে, ব্রহ্ম যদি সত্য এবং নিশ্চল, তবেই নামরূপ মিথ্যা এবং চঞ্চল। যাহা সত্য, তাহাই চিরস্থায়ী, যাহা মিথ্যা তাহাই ক্ষণভঙ্গুর; সুতরাং সত্যে পৌছিতে হইলেই মিথ্যা পরিত্যাগ করিতে হইবে। মায়াতীত ব্রহ্মতত্ত্বে ডুবিতে হইলে মায়াময় নামরূপ পরিহার করিতে হইবে।

নামরূপ বলিতে এখানে স্বরূপ নামরূপ বুঝিতে হইবে না, বুঝিতে হইবে যাহা বিকার জন্য নামরূপ। যেমন মৃত্তিকার স্বরূপতঃ মৃত্তিকা এই নাম এবং সাধারণ ভূভাগ তাহার রূপ। কিন্তু এই মৃত্তিকা দ্বারা যখন ঘট, কুম্ভ, কপাল, সরাবস্থলী প্রভৃতি গঠিত হয়, তখনই সেই সকল বস্তুর রূপ এবং নাম কেবল মৃত্তিকার বিকার জন্য ভিন্ন আর কিছুই নহে; অর্থাৎ স্বরূপ মৃত্তিকা যদি আজ এই বিকৃত ঘটাদিরূপে পরিণত না হইত, তাহা হইলে মূল মৃত্তিকার কখনও ঘট কুম্ভ ইত্যাদি নামের ব্যবহার হইত না; আবার ঐ ঘট কুম্ভ ইত্যাদি যখন চূর্ণিত হইয়া সাধারণ মৃত্তিকা রূপে পরিণত হইবে, তখন তাহার সেই সেই রূপের সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই নামও বিলুপ্ত হইবে। এই ঘট কুম্ভ ইত্যাদি সমস্তই মিথ্যা, সত্য স্বরূপ এক মাত্র মৃত্তিকা, মৃত্তিকাতত্ত্ব বুঝিতে হইলে যেমন আমি, ঘট ইত্যাদি স্বতন্ত্র রাখিতে পারি না—তদ্রূপ ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে হইলেও আমি নাম রূপাত্মক ব্রহ্মাণ্ডকে স্বতন্ত্র রাখিয়া দিতে পারি না। ঘট সৃষ্টি হইবার

পূর্ব্বেও মৃত্তিকাই ছিল, পরেও মৃত্তিকাই হইল; মধ্যে যে কয়েক দিন "ঘট ঘট" বলিয়া একটা কথা উঠিয়াছিল, তাহাই জানিবে মিথ্যা। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—"আদাবন্তেপি যন্নাস্তি মধ্যে কালেপি তত্তথা," পূর্ব্বেও যাহা ছিল না, পরেও যাহা থাকিবে না, মধ্যে যদি কয়েক দিন, তাহার ভান হয়, তবে তাহাও জানিবে মিথ্যা। এই মিথ্যাটী কিন্তু আবার স্বরূপতঃ মিথ্যা নহে, স্বপ্নদৃশ্য পদার্থ মিথ্যা বলিয়া স্বপ্নও মিথ্যা নহে, নিদ্রাও মিথ্যা নহে; তদ্রূপ এই জগৎ মিথ্যা নহে। কেন না, নিদ্রা যদি মিথ্যা হয়, তবে স্বপ্ন দেখায় কে? মায়া যদি মিথ্যা হয়, তবে সংসার সৃষ্টি করে কে? মায়া মিথ্যা হইলে সংসার আবার সত্য হইয়া দাঁড়ায়, তাই মায়া আছে এবং থাকিবে; এই মায়ার মধ্য হইতেই মহামায়াকে দর্শন করিতে হইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ শর্ম্মা।

বিজ্ঞান প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

মাছ মাংস আহার করা ভাল কিনা এই সম্বন্ধে ইংলণ্ডে আন্দোলন চলিতেছে। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় ইংরাজী ধর্ম্মযাজকগণ এ বিষয়ে বড় সহায়তা করিতেছেন না। তাহার প্রধান কারণ এই যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে লোকের সংস্কার অত্যন্ত ভ্রমাত্মক। কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য খণ্ডে লোকের মনে অহঙ্কার এরূপ বদ্ধমূল হইয়াছে, যে সকলেই মনে করে রাম, শ্যাম অভিধেয় স্থূল ব্যক্তি যে উপায়ে মৃত্যুর পর পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণরূপে আপনাকে বজায় করিতে পারে তাহাই ধর্ম্ম। বড় দুঃখের বিষয় এই যে এ ভাব আমাদের দেশকেও সংক্রামিত করিয়াছে এবং ধার্ম্মিক অর্থে ঘোর স্বার্থপর ব্যক্তিই বুঝাইতেছে। ইউরোপে নূতন করিয়া আবিষ্কৃত মহত্তর প্রজ্ঞা যে কি পদার্থ তাহা একটু বুঝিতে পারিলে এই ভ্রান্তি দূর হয়।

* * * *

এই মহত্তর প্রজ্ঞার বশে দূরদৃষ্টি প্রভৃতি ক্ষমতা সকল, জীবে দেখা দেয়। কিন্তু এই ক্ষমতা গুলি যে সর্ব্ব জীবের মধ্যে পরম একতার নিদর্শন তাহা কেহই বুঝেন না। আমার "আমি" যদি কোন অপরিজ্ঞাত ভাবে অন্যান্য জীব ও বস্তু সকলের সহিত সংশ্লিষ্ট না থাকিত, তাহা হইলে বাযুক কোন প্রকার যোগশক্তি লাভ করিতে পারিতেন না, যোগশক্তি মাত্রেই একতা বাচক।

তাহা হইলে পশুর সহিত আমাদের নিকট সম্বন্ধ আছে। পশুদের ভিতরে প্রকাশিত চৈতন্য নিম্নতরস্তরে স্থিত চৈতন্য অপেক্ষা ঘনিষ্ট সম্পর্কে মানবের সহিত আবদ্ধ। এ ভাবে দেখিলে কি আর পশু বধে প্রবৃত্তি হয়? অথচ এক ইংলণ্ডে ৩০০, ০০০, ০০০ পশু প্রতি বৎসর মানবের রাক্ষসী প্রবৃত্তি চরিতার্থে হনন হইতেছে। যিনি অন্য জীবকে দয়া করেন না, তিনি যে কি প্রকারে ভগবানের নিকট দয়ার প্রার্থনা করেন—বলিতে পারি না।

* * * *

স্থানীয় মিশনারী সম্প্রদায়ের দলে একজন মেম সাহেব ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি মাংসাহারী ছিলেন না। এই অপরাধে ঐ সম্প্রদায়ের ইংলণ্ডস্থ কমিটী তাঁহাকে "প্রচ্ছন্ন হিন্দু" বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন এই অভিযোগে বিতাড়িত করিয়াছে। তিনি এই মর্ম্মে কোন বিলাতী সংবাদ পত্রে পত্র লিখিয়াছেন। অথচ, এই সকল স্থানে থাকিবার জন্য আমাদের "স্বদেশী" যুবকগণের বড় আগ্রহ! যাঁহারা সামান্য আহার ব্যবহারে ক্ষুদ্র লালসারূপ স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারেন না, যাঁহারা আপন পরিবারস্থ আত্মীয়বর্গকে "পর" বলিয়া দেখেন, যাহারা কি রাজনীতি, কি শিক্ষা, কি ধর্ম্ম—সর্ব্ব ব্যাপারেই ক্ষুদ্র স্থূল শরীরে প্রকাশিত অহংকে জীবনের কেন্দ্র বলিয়া ভাবেন, তাঁহাদের দ্বারা ভারত মাতার উদ্ধার বা আদ্যকৃত্য, কোন্‌টি সাধিত হইবে, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। অথচ সেই দলের অভোজ্যভোজী, বিকৃতমনা বিলাতি ভাবের দ্বারা দেহ মন প্রভৃতি কবলিত নেতাগণ ভারতের প্রকৃত বন্ধু শ্রীমতি আনী বেশান্তকে গালি দিতে ছাড়েন না। প্রাণে স্বদেশী না হইলে কি দেশের উদ্ধার সাধিত হয়? স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিলে কি স্বদেশী হইতে পারা যায়? "স্ব" না জানিলে, দেহজ্ঞান না ভুলিলে ক্ষুদ্র অহং বিসর্জ্জন না দিলে ও মহত্তর অহংকে গ্রহণ না করিলে প্রকৃত স্বদেশী হওয়া যায় না।

১০ ভাগ। } ফাল্গুন, ১৩১৩ সাল। { ১১শ ভাগ।

প্রার্থনা।

মা আমার !! জান তুমি অন্তর আমার,
প্রাণে মোর কি কামনা
সব তব আছে জানা
শীঘ্র এসে কোলে কর সন্তানে তোমার।
মা মা ব'লে কোলে যাব
তব বুকে মিশে রব
প্রাণের অতৃপ্ত আশা সব মিটাইব।
হৃদয় কবাট খুলি
বলিব গো ব্যথাগুলি
কাঁদিয়া মা অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইব।
জিজ্ঞাসা করিব তোরে
কেন কষ্ট দিলে মোরে

দেখিব মা কাঁদ কি না সন্তানের দুঃখে
বজ্রসম প্রেমময়ী বাজে কি না বুকে।
স্নেহময়ী মা আমার! নাহি তোর লাজ
প্রেমময়ী নাম ধ'রে
কেমনে গো থাক দূরে
সন্তানের দুঃখনাশ, তারা! তোর কাজ,
তোর কি হৃদয় নাই ?
তবে কেন দুঃখ পাই ?
অথবা পাষাণী তুমি দয়া মায়াহীন
তোমার সন্তান হয়ে
প্রাণে কেন জ্বালা সয়ে
আকুল হৃদয়ে আমি কাঁদি নিশি দিন ?
মা মা ডাক প্রাণে তোর
পশে নাকি মাগো মোর ?
সন্তানের তরে প্রাণ হয় না ব্যাকুল ?
অথবা বধির তুমি! সব মোর ভুল।
তোমার কি চক্ষু নাই কিছু নাহি দেখ
দয়াময়ী নাম ধর
ছেলে কাঁদে অনিবার।
শক্তি নাই সন্তানের ঘুচাইতে দুঃখ)
কি কলঙ্ক মা আমার
প্রাণে সবে কত আর
সে সকল গত কথা না চাই বলিতে
মাতৃরূপে দেখা দাও
সন্তানেরে কোলে লও
বড় সাধ অবিরাম থাকি মা বুকেতে।
সংসারের দুঃখ ভার
সহিতে পারিনে আর

প্রার্থনা।

কোথায় গো মা আমার! কাছে আয় ত্বরিতে
সন্তানের মা মা বোলে
কি আনন্দ প্রাণে খেলে
মোরে কোলে নিলে পরে পা'বে তা বুঝিতে।
এতদিন থেকে দূরে
যত কষ্ট দি'ছ মোরে
কোলে উঠে সে সবার প্রতিশোধ দিব
কোলে থেকে প্রেমময়ী আর না নামিব॥
কত লীলা জান তুমি বুঝিতে যে নারি
অন্তরে অন্তরে থাক
তথাপি অন্তরে রাখ
কেমন মতে বলনা তোর কোলে যেতে পারি।
কেন ভোলা মহেশ্বর
সদা পরে বাঘাম্বর
শ্মশানে মশানে ফিরি খায় ভিক্ষা মাগী।
অন্নপূর্ণা ঘরে যাঁর
কুবের ভাণ্ডারী আর
তথাপি কিসের তরে শিব সর্ব্বত্যাগী।
এই সব গূঢ় তত্ব
বলিতে হইবে সত্য
নতুবা কাঁদিয়া আমি কাঁদাব তোমারে।
সন্তানের অশ্রুজল
পশিবেক মর্ম্মস্থল
দেখিব মা অশ্রুজলে কত শক্তি ধরে।
তাই বলি ভাল চাও
শীঘ্র এসে কোলে লও
ক্ষণেকের তরে আর থেকোনা মা দূরে।
অবোধ সন্তান সনে পারিবে কি জোরে।

প্রেমময়ী মার প্রাণে প্রেম কিগো নাই
স্তনে হেরি ক্ষীর ধারা
শূন্য কোল হেরে, তারা!
সন্তান কি কোলে নিতে প্রাণে চায় নাই
অবোধ সন্তান আমি
প্রেমময়ী মাগো তুমি
তনয় দুরিত নাশ সদা তোর কাজ
তবে কেন দিয়ে ফাঁকি
আড়ালে আড়ালে থাকি
কত ভাবে কত রূপ ধর কত সাজ
যেন মাগো তুমি নাই
বিভীষিকা দেখি তাই
কেঁদে উঠে মা মা করে খুজি কত ঠাঁই
তখনি সৰ্ব্বত্র হেরি
প্রেমময়ী মা আমারি
কি এক আনন্দে যেন কোথা ভেসে যাই!!
পলকে না হেরে, তারা!
হই যে গো দিশা হারা
সকলি ত জান তুমি কি বলিব আর
তুমি ছাড়া নাহি জানে মোহিনী তোমার॥

শ্রীমোহিনীমোহন বসু।

হিন্দুদর্শন।

(পূৰ্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পূৰ্ব্বে আমরা মায়াবাদীর ব্রহ্মের ও বৌদ্ধদর্শনের শূণ্যব্রহ্মের অথবা অব্যক্ত শক্তিপুঞ্জের কথঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছি। এক্ষণে ব্রহ্ম, ভগবান্ ও

ঈশ্বর শব্দের তাৎপর্য্য এবং যুগলমূর্ত্তি (হর পার্ব্বতি অথবা রাধাকৃষ্ণ) উপাসনায় তাৎপর্য্য আলোচনা করা যাইবে।

"যস্ত ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং কচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্র সত্তা-
প্যংশো যস্তাংশকৈঃ স্বৈর্বিভতি বসয়ন্নেব মায়াং পুমাংশ্চ।
এবং যস্তৈবরূপং বিলসতি পরমব্যোম্নি নারায়ণাখ্যং
স শ্রীকৃষ্ণো বিধত্তাং স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেম তদ্পাদভাজাম্॥"

শ্রীজীব গোস্বামী।

সেই শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্, এই জগতে তৎ পাদ-পদ্মসেবিগণকে প্রেম প্রদান করুন। সেই শ্রীকৃষ্ণ কে? তিনি এক বচনান্ত "যস্ত" অর্থাৎ "যাঁহার" পদবাচ্য। অতএব তিনি স্বরূপানুবন্ধি আকৃতি, গুণ ও বিভূতি-বিশিষ্ট কৃষ্ণাখ্য পরমতত্ত্ব। তাঁহার আকার আছে বটে; কিন্তু তাহা তাঁহার নিজের আনন্দময় আকার। তাঁহার নিজের গুণ আছে, তাঁহার নিজের বিভূতি আছে, অতএব তিনি ভগবান্। তিনি যদি সাকার, গুণবান্ ও ভগবান্ হইলেন, তাহা হইলে কি তিনি ব্রহ্মচৈতন্য হইতে উদ্ভূত বেদান্তীর ঈশ্বর বা অবতার, অথবা সাংখ্যের "জন্য" ঈশ্বর? তাহা নহে। তবে তিনি কি? এই জন্য বলা হইতেছে—কোন কোন উপনিষদে যাঁহাকে ব্রহ্ম বলা হয় (যথা—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম) সেই ব্রহ্মত্ব তাঁহার চিৎ-সত্তা—ব্রহ্মচৈতন্য নির্ব্বিশেষ অব্যক্ত জ্ঞানরূপ সত্তা (সতের ভাব)। যাঁহাকে প্রকৃতির পুরুষ বলা হয়, অর্থাৎ যে সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমাত্মা স্বীয় অংশ সমূহের দ্বারা (অংশ অবতার—সহস্রশীর্ষ সঙ্কর্ষণ, মৎস্যাদির অবতার; গুণ অবতার—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব; শক্ত্যাবেশ অবতার—সনক সনন্দ, পৃথু, ব্যাস, কপিল প্রভৃতি) মায়াকে বশীভূত করিয়া ঈশ্বররূপে প্রকটিত হয়েন। যে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-রূপ, পরমব্যোমে (অষ্ট আবরণের পরপারে) নারায়ণ নামে বিলাস করেন। সেই শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। শ্রীকৃষ্ণ = শ্রী + কৃষ্ণ। "শ্রী" অর্থে কৃষ্ণের অব্যভিচারিণী স্বরূপশক্তি।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে মহর্ষি বেদব্যাস মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন—"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়", এবং ভাগবতের শ্রীদশমের শীর্ষে আছে—"ওঁ নমঃ কৃষ্ণায়"। শ্রীমদ্ভাগবতে আছেঃ—

"বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥১।২।১১।

শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ বিশেষে তিন নাম ধারণ করেন, তিনি তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির নিকট অদ্বিতীয় অদ্বয় জ্ঞান (বৌদ্ধগণের ন্যায় ক্ষণিক জ্ঞান নহেন)। বেদান্তজ্ঞেরা এই অদ্বয় জ্ঞানকে ব্রহ্ম বলেন। হিরণ্যগর্ভের উপাসকেরা পরমাত্মা বলেন। আর ভক্তেরা তাঁহাকে ভগবান্ বলেন।*

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানে বিশেষত্ব প্রদর্শনার্থ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেনঃ—

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥"

উপনিষদে যাঁহাকে অদ্বৈত ব্রহ্ম বলে, তিনি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের তনুভা বা অঙ্গকান্তি। যোগিগণ যাঁহাকে পরমাত্মা বা অন্তর্য্যামীপুরুষ বলেন তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অংশ-বিভব। যিনি ভক্তগণের ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ তিনিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অপেক্ষা পরতত্ত্ব আর কিছুই নাই। অর্থাৎ ব্যক্ত জগতের পর ব্রহ্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মচৈতন্য, তাহার পরের তত্ত্ব যোগীগণের হৃদয়বাসী পরমাত্মা, তাহার পরতত্ত্ব ভগবানের বিলাসস্বরূপ পরব্যোমে (অষ্ট আবরণের পরে) অবস্থিত শ্রীপতি নারায়ণ, তাহার পরের তত্ত্বশেষ তত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণাখ্য কিম্বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাখ্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

সাংখ্য মতে ব্যক্তজগতের পরপারে অব্যক্ত প্রকৃতি ও বহুপুরুষ বিদ্যমান। মায়াবাদীর মতে অব্যক্ত প্রকৃতি ও বহু পুরুষ নাই, মাত্র পরব্রহ্ম আছেন। বৌদ্ধগণের মতে মহাশূন্য বা অব্যক্ত মহাশক্তি আছেন। হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারের মতে অজ্ঞেয় মহাশক্তি আছেন। সেই অব্যক্তশক্তির

---

* শ্রদ্ধাস্পদ লেখক মহাশয় শ্লোকটী অনুবাদ কি এক ভাবে করিলেন। তত্ত্ববিদ ব্যক্তিগণ অদ্বয় জ্ঞানকে এক তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করেন। ঐ জ্ঞানই ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান নামে অভিহিত হয়। বোধ হয় অনুবাদ এইরূপ হওয়া উচিত। তাহা হইলে অদ্বয় জ্ঞান যে পরম তত্ত্ব তাহা কি স্বীকৃত হইল না? পং সং।

অবস্থাকে কারণ সলিল বলা যায়।† তাহা হইতেই সমস্ত অবতার (ঈশ্বর) ও জীবাদি উদ্ভূত হইয়াছেন। যোগীদের মতে ব্রহ্ম, জ্ঞেয় জ্ঞাতাদি ভেদ রহিত বিশুদ্ধজ্ঞান। ভক্তদের মতে তাহার পরতত্ত্ব প্রকৃতির অতীত ভগবানের বিলাসস্বরূপ নারায়ণ, ও তাহার পরতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

ভক্তগণ ভিন্ন অন্যে প্রশ্ন করিতে পারেন, ইহার প্রমাণ কোথায়? প্রমাণ উপনিষাদাবলী ও শ্রীমদ্ভাগত এবং অন্যান্য পুরাণ।

শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন—"মাধুর্য্য ভগবত্তার সার," উপনিষদে আছে মধুরো বৈ সঃ"। এই মাধুর্য্য পূর্ণ মাত্রায় শ্রীকৃষ্ণেই আছে, এমন কি নারায়ণেও তত নাই।

"যে মাধুরীর উর্দ্ধ আন, নাহি যার সমান,
পরব্যোমে স্বরূপের গণে।
যিঁহো সব অবতরী, পরব্যোমের অধিকারী,
এ মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে ॥
তাতে সাক্ষী সেই রমা, নারায়ণের প্রিরতমা,
পতিব্রতাগণের উপাস্যা।
তিঁহো এ মাধুর্য্যলোভে, ছাড়ি সব কায ভোগে,
ব্রত করি করিলা তপস্যা ॥" কবিরাজ গোস্বামী।

পরমাত্মা মায়াকে বশীভূত করিয়া ঈশ্বররূপে প্রকটিত হন কি রূপে? দর্শনশাস্ত্রানুসারে অভিনব সৃষ্টি নাই, যাহা আছে তাহা নিত্যকালই আছে, যাহা নাই তাহা কোন কালেই "আদৌ" হয় না; আকারের, নামরূপের ও কালদেশের (এখন এক কালে, এক স্থানে, অন্য সময়ে অন্য স্থানে) পরিবর্ত্তন হয় মাত্র। সুতরাং দর্শন শাস্ত্রানুসারে সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর বা পরমেশ্বর নাই। সম্পূর্ণ নূতন পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা না থাকিলেও অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত বা প্রকটিত অবস্থার পরিণাম বিধানকারী ঈশ্বর আছেন। এই দৃশ্যমান জগতের মূল অবস্থা অতি সূক্ষ্ম পরমাণু, তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, সুতরাং অব্যক্ত। সাংখ্যদর্শন এই অব্যক্ত অবস্থাকে অব্যক্ত প্রধান,

† কারণ সলিল অর্থে আমরা Precosmic root of matter বুঝিতাম। বুদ্ধির "অবস্থা" শব্দে কি সূচিত হয়? পঃ সং।

বা প্রকৃতি বলিয়া থাকেন, এবং ব্যক্ত প্রকৃতিকে জগৎ বলেন। সাংখ্যমতে প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ ও তমগুণের সম্যাবস্থা, এবং সত্ত্ব রজ তমগুণ গুণ-পদার্থ নহে; দ্রব্য পদার্থ, অর্থাৎ মহাণু। এই তিন গুণের গুণসাম্য ভঙ্গ হইয়া অশেষ বিশেষ প্রকারে মিশ্রণ হইলেই ব্যক্ত জগৎ উৎপন্ন হয়। এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির ব্যক্ত হইবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে (Having a tendency to manifes)। পুরুষ চৈতন্যের সান্নিধ্যবশতঃ সেই প্রবৃত্তি ক্রিয়োন্মুখী বা সৃষ্টিকার্য্যের জন্য উন্মুখী হয়। প্রকৃতি পুরুষের প্রথম সৃষ্টি "জন্য ঈশ্বর,"। ইনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যশালী। কিন্তু পুরুষ ও প্রকৃতি অনাদি, জন্মরহিত। সাংখ্যমতে আদি মুক্ত পুরুষই ঈশ্বর শব্দ বাচ্য; এবং সাংখ্যাচার্য্য কপিলদেবই জন্মসিদ্ধ, আদি মুক্তপুরুষ। সাংখ্যদর্শন প্রকৃতি পুরুষের উপর অপর কোন তত্ত্ব স্বীকার করেন না। সাংখ্যের "জন্য ঈশ্বর" নিত্য ঈশ্বর নহেন। তিনি মহাপ্রলয় অবস্থায় প্রকৃতিতে লীন থাকেন. পুনরায় সৃষ্টিকালে প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হইয়া সৃষ্টির সহায়তা করেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইহাঁরা ঈশ্বর। তাঁহাদের অধীন বহু দেবতা-বৃন্দ, এবং প্রত্যেক মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, উদ্ভিদ, লতা, গুল্ম প্রভৃতি সকলই এক এক পুরুষ, সাংখ্যমতে পুরুষ বহুল, এবং পুরুষ চৈতন্যমাত্র।

বেদান্ত বলেন সকল প্রকার অব্যক্ত শক্তিপুঞ্জের আধার ব্রহ্ম-চৈতন্য। ব্রহ্ম-চৈতন্য ভিন্ন প্রকৃতি বা জড় এবং ঈশ্বর ও জীবাত্মা বলিয়া প্রকৃত কোন পদার্থ নাই। এই জগৎ, এই জীবাত্মা, এই ঈশ্বর সমস্তই ভ্রম কল্পিত। সেই ভ্রম কি? না, মায়া। শ্রীশঙ্কর বলেন মায়া ইন্দ্রজালের ন্যায় মিথ্যা। তবে মায়া কি? মায়া, ব্রহ্মের অঘটন ঘটন-পটিয়সী শক্তি, অনির্ব্বচনীয় শক্তি, সৃষ্টি প্রসবিনী শক্তি, মায়া ব্রহ্মের ইচ্ছা, মায়া Illusion মাত্র। ব্রহ্মচৈতন্য রূপ স্বপ্রকাশ আলোককে মায়ারূপ চিম্‌নী দ্বারা আচ্ছাদিত করিলে ঈশ্বর উদ্ভূত হয়েন; কারণ প্রকৃতির তিন গুণ—সত্ত্ব, রজ, তমের মধ্যে মায়া শুদ্ধসত্ত্বগুণপ্রধানা। মলিনসত্ত্ব প্রধানার নাম অবিদ্যা বা অজ্ঞান। ব্রহ্মচৈতন্যকে অবিদ্যা বা অজ্ঞানরূপ চিম্‌নী দ্বারা আচ্ছাদিত করিলে দেব, নর, বানর, পশু, পক্ষী, উদ্ভিদ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। মায়া

এবং অবিদ্যারূপ আচ্ছাদন অপসারিত করিলে একমাত্র ব্রহ্মচৈতন্যই থাকেন; সুতরাং ঈশ্বর, দেব, নর বানর প্রভৃতি সমস্তই মায়া ও অবিদ্যার কার্য্য, ভ্রমমাত্র। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম, সেইরূপ এক ব্রহ্মে এই রূপ নানাত্ব ভ্রম। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে ব্রহ্ম এক হইলেও তিনি ব্রহ্মচৈতন্যমাত্র, ব্যক্তিগত ঈশ্বর বা ভগবান্ নহেন, যেমন বায়ু, আকাশ, বহু তেজ-সমষ্টি সূর্য্য, তদ্রূপ। বৈদান্তদর্শন মতে মায়া এক মাত্র, মায়া সমষ্টিরূপা; সুতরাং ঈশ্বরও একমাত্র মহান্ ঈশ্বর। অবিদ্যা মায়ার অংশস্বরূপ, ও অবিদ্যার বহুত্ব হেতু জীবেরও বহুত্ব দৃষ্ট হয়। সাংখ্যদর্শনেও অবিদ্যা শব্দ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার অন্য অর্থ; অর্থাৎ তাহার অর্থ বুদ্ধি-ভ্রম, যেমন লোকে অনিত্যকে নিত্যজ্ঞান করে, অনাত্মকে আত্মজ্ঞান করে, অশুচিকে শুচিজ্ঞান করে; নারী-শরীর বাস্তবিক কুৎসিৎ, তাহাকে সুন্দর জ্ঞান করা ইত্যাদি। কিন্তু সাংখ্যের প্রকৃতি বা মায়া ভ্রম নহে; জগতের মূল কারণ মহা-অণু পদার্থ। সাংখ্যাচার্য্য বিজ্ঞান ভিক্ষু প্রকৃতিকে মায়া, অজা (জন্মরহিতা, অনাদি), শক্তি, প্রধান, অব্যক্ত, তম প্রভৃতি বলিয়াছেন। উপনিষদেও আছে—"মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ।" বেদান্তমতে ঈশ্বর মায়াধীশ, জীব মায়াবশ। প্রকৃতি দ্বিবিধা—মায়া ও অবিদ্যা।

আমরা "নাসদীয় সূক্তের" ব্যাখ্যা কালে বলিয়াছি ঋগ্বেদে যে "স্বধা" শব্দ আছে; তাহার অর্থ সায়ণাচার্য্যের মতে "মায়া"। বেদেও মায়া শব্দ আছে:—

"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" (ঋগ্বেদ সংহিতা)। শ্রীসায়ণাচার্য্য বলেন "মায়া" অর্থে জ্ঞান বা সংকল্প। "মায়াভিঃ জ্ঞানেনামৈতৎ জ্ঞানৈঃ আত্মীয়ৈঃ সঙ্কল্পৈঃ পুরুকপো বহুবিধ শরীরঃ"। শ্রীশঙ্করাচার্য্য এই ঋকের মায়াবাদপোষক সঙ্গত অর্থ করিতে পারেন নাই।

বেদান্তমতে এক ব্রহ্মকে জানিলেই সমস্ত জানা যায়, যেমন মৃত্তিকাকে জানিলে সমস্ত মৃন্নির্ম্মিত পদার্থ জানা যায়, স্বর্ণকে জানিলে সমস্ত স্বর্ণনির্ম্মিত অলঙ্কারাদি জানা যায়, সেইরূপ এক ব্রহ্মকে জানিলে ব্রহ্মনির্ম্মিত জগৎ জানা যায়। অতএব দেখা যায় ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ, ব্রহ্মই সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি। কিন্তু ব্রহ্ম আবার জগতের নিমিত্ত কারণ,

সুতরাং তিনি ন্যায় দর্শনের ঈশ্বরস্থানীয়। ব্রহ্ম, শক্তি ও শক্তিমান্‌বৎ জগতের উভয় কারণ। সাংখ্যমতে প্রকৃতি উপাদান কারণ। ন্যায়দর্শন ও বৈশেষিক দর্শনমতে পরমাণুই উপাদান কারণ, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট (কর্ম্মজ প্রকৃতি বা মায়া) সহকারী কারণ, এবং ন্যায়দর্শনমতে ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ। অর্থাৎ যেমন কৃষক বীজে জল সেচন করিলে অঙ্কুর জন্মে, সেইরূপ ঈশ্বর—কৃষক, বীজ—প্রকৃতি, এবং জলসেচন কর্ম্ম—ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট। ফল—জীবের কর্ম্মসমষ্টি সূক্ষ্ম সংস্কার উৎপাদন; তাহাই অদৃষ্ট। কর্ম্ম বা অদৃষ্ট জড়। পাতঞ্জল দর্শনমতে ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ। মীমাংসা দর্শনমতে এক কর্ম্মই জগতের বীজ।

ন্যায় দর্শনকার গৌতম ঋষি ঈশ্বরকে জগৎকর্ত্তা—এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের "কর্ত্তা" বলিয়া সপ্রমাণিত করিয়াছেন। এই অসংখ্য জীবসঙ্ঘপূর্ণ জগৎ ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে প্রসূত হইয়াছে। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও স্বরাট্ এবং অদৃষ্টের অধীশ্বর। ঈশ্বর "অদৃষ্ট" কারণ গ্রহণ পূর্ব্বক কর্ম্মচক্র পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থেও ঈশ্বরকে অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা বলিয়াছেন। "অদৃষ্ট" জড়, তাহার কার্য্যকরণে শক্তি নাই, সুতরাং "অদৃষ্ট" ঈশ্বর কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইলেই কার্য্যকরণে সমর্থ হয়। বৈশেষিক দর্শন ন্যায়দর্শনের ন্যায় "অদৃষ্ট" স্থাপন করিয়া নিবৃত্ত হইয়াছেন, ঈশ্বর পর্য্যন্ত গমন করেন নাই। তবে ইহা অনুমান করা যায় যে তিনি ঈশ্বর-সত্তা প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। সাংখ্যদর্শন ও পাতঞ্জল দর্শন একজাতীয় হইলেও, পাতঞ্জল দর্শন "ঈশ্বর" স্বীকার করিয়াছেন। সাংখ্য দর্শনকে নিরীশ্বর যোগশাস্ত্র বলা যায়। সাংখ্যদর্শন "ঈশ্বরাসিদ্ধি" করিয়াছেন; ন্যায়দর্শন ঈশ্বরকে সিদ্ধ করিয়াছেন। মীমাংসা দর্শনে ঈশ্বর নাই, কিন্তু দেবতা আছেন; দেবতা মন্ত্রময়। পাতঞ্জলের ঈশ্বর ও ন্যায় দর্শনের ঈশ্বর সমান নহেন। বেদান্তের ঈশ্বর শুদ্ধ সত্ত্বগুণ প্রাধান্য মায়া দ্বারা উপহিত ব্রহ্মচৈতন্য। এই ঈশ্বর মহা বিভূতিশালী বৌদ্ধ দর্শনের অমিতাভ বা অবলোকিতেশ্বর; উপনিষদের হিরণ্যগর্ভও এই ঈশ্বরস্থানীয়। ইনিই বৌদ্ধ ধর্ম্মের আদি বুদ্ধ। কিন্তু ভক্তগণের শ্রীকৃষ্ণাখ্য ভগবান্ তাঁহার এক অংশের দ্বারা এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড

ধারণ করিয়া রহিয়াছেন—

"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমে-কাংশেন স্থিতো জগৎ (গীতা—১০।৪২)।

এই জন্য শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীসনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন:—

"কৃষ্ণের যতেক খেলা,　　　　সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপ বেশ বেণুকর,　　　　নবকিশোর নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ॥
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
সে রূপের এক কণ,　　　　ডুবায় সব ত্রিভুবন,
সব প্রাণী করে আকর্ষণ॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি,　　　　বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপ রতন,　　　　ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈল নিত্যলীলা হৈতে॥"

সাংখ্যদর্শন বলেন জগৎ সৃষ্টিকার্য্যে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব দেখা যায় না। কেহ ইচ্ছা করিয়া, বুদ্ধি, বিবেচনা ও চিন্তা করিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করেন নাই। চিৎসংযোগে (পুরুষ সান্নিধ্যে) জড়ে (প্রকৃতিতে) ক্ষোভ উৎপন্ন হইলে প্রকৃতির গুণসাম্য ভঙ্গ হয়; অব্যক্তের একত্রাবস্থানের সংরক্ষণী শক্তি কেন্দ্র হইতে বিচলিত হয়, অব্যক্ত ব্যক্তে পরিণাম হয়, অর্থাৎ প্রকৃতির বিকারভাব উৎপন্ন হইয়া সৃষ্টিরূপ পরিণত হয়। ইহার অতিরিক্ত কোন ইচ্ছাময়, জ্ঞানময় কর্ত্তা পাওয়া যায় না॥ সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরকে অনুমান করিবার কারণ নাই। সৃষ্টি একটী কার্য্য। লোকে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় দুই কারণে, (১) স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে (২) করুণাবশতঃ। ঈশ্বর সর্ব্বদাই আপ্তকাম বা পূর্ণকাম, তাঁহার কোন স্বার্থ নাই ও সৃষ্টির প্রয়োজন নাই। পুনশ্চ এই দুঃখ পরিপূর্ণ সৃষ্টি করুণাবশতঃ কেহ করেন না। করুণাই বা কাহার প্রতি করিবেন? জীবসৃষ্টির পূর্ব্বে জীব ছিল না, সুতরাং কাহারও প্রতি করুণাও ছিল না। দুঃখ দর্শনে করুণার উদয় হয়, যেমন বুদ্ধদেবের করুণার উদ্রেক হইয়াছিল। যদি করুণাবশতঃ ঈশ্বর এই

জগৎ সৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে জগৎ অতি সুখময় হইত। সে যাহা হউক, এই স্থানে ন্যায় দর্শনের সহিত সাংখ্যের অমত হইল। সাংখ্য বলিবেন জীবের কর্ম্মফল বা অদৃষ্ট বশতঃ জগতে দুঃখ দারিদ্র্য সংঘটিত হয়, তাহাতে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব নাই। ন্যায়াচার্য্য বলিবেন ঈশ্বর অদৃষ্টে অধিষ্ঠান না করিলে সৃষ্টিই হইতে পারে না। যদি ঈশ্বর স্বীকৃত না হয়েন তাহা হইলে বেদের অবস্থা কি হইবে? এ স্থানে মীমাংসা দর্শন বলিবেন "ঈশ্বরের আবশ্যকতা কি? বেদ নিত্য, তাহার সৃষ্টিও নাই, বিনাশও নাই। জগৎও নিত্য, তাহারও উৎপত্তি বিনাশ নাই। "ন কদাচিদনীদৃশং জগৎ"। কর্ম্ম এবং "অপূর্ব্ব" (অদৃষ্ট) দ্বারাই এই জাগতিক বিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে।" সাংখ্যের পুরুষ দুই প্রকার, মুক্ত ও বদ্ধ॥ মুক্ত পুরুষ বাসনাশূন্য, তিনি; প্রশংসার্থ ঈশ্বর অভিহিত হইতে পারেন. কিন্তু পূর্ণকাম ও বাসনা বিবর্জ্জিত হওয়ায় সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মের নির্ব্বিকারত্ব রক্ষা করিবার জন্য "বিবর্ত্তবাদের" আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি একমাত্র সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে অধিষ্ঠান করিয়া তাঁহার বিবর্ত্তস্বরূপ জগতের প্রকাশ স্বীকার করিয়াছেন।

"বিবর্ত্ততে—অন্যস্বরূপেন প্রতিভাতি বস্তু যেন স বিবর্ত্তঃ;" সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, বস্তু অন্যরূপে প্রতিভাত হইলেই "বিবর্ত্ত" কথিত হইয়া থাকে। নব্য বেদান্তিগণ বলেন—যখন বস্তু নিজের স্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়া অন্য বস্তুর প্রতীতি জন্মাইবে, সেই বস্তুর অন্যথা-খ্যাতিকে বিবর্ত্ত বলে। এই বিবর্ত্ত বশতঃ রজ্জু হইতে সর্পবুদ্ধি জন্মে। এইরূপ, ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হইতেছে। ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, তিনি বিশেষণ রহিত অর্থাৎ তিনি হস্ত পদ মন অন্তঃকরণ প্রভৃতি যুক্ত বিশিষ্ট পদার্থ নহেন। তিনি শুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপ, সুতরাং অচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য। তিনি অমনা, তিনি স-মনা ঈশ্বর নহেন। এই ব্রহ্ম শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা মায়াতে উপহিত হইলে ঈশ্বর হন এবং অজ্ঞানে উপহিত হইলে জীব হন। প্রকৃতপক্ষে তিনি নির্ব্বিকার; তিনি যে ঈশ্বর, জীব ও জগৎরূপে প্রতীত হন, ইহা ভ্রমমাত্র। বিবর্ত্তবাদের কয়েকটী উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। যদি বিবর্ত্তের প্রভাবে ব্রহ্ম হইতে জগৎ বোধ জন্মাইত, তাহা হইলে কদাচিৎ জগতেও ব্রহ্মবুদ্ধি জন্মাইতে

পারিত। বিবর্ত্তবাদে তিনটী পদার্থ আবশ্যক, (১) ভ্রান্তির দ্রষ্টা অর্থাৎ ভ্রান্ত ব্যক্তি (২) শুক্তি, যাহা দর্শনে ভ্রম জন্মে (৩) রজত, যাহা বলিয়া প্রতীত হয়। ব্রহ্ম যদি একমেবাদ্বিতীয়ং হয়েন, অর্থাৎ তাঁহার সহিত স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ না থাকে, তিনি যদি অবিভাজ্য হন, তাহা হইলে বিবর্ত্তবাদ কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? শ্রীশঙ্করাচার্য্য শারীরক ভাষ্যে অধ্যাসবাদ বুঝাইয়াছেন। অত্যন্ত বিসদৃশ বিষয়ী ও বিষয়ের ইতরেতর অধ্যাস হয়। ব্রহ্মের চিন্মাত্র সত্তা অবিষয়ীভূত, তাহাতে গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্যের আরোপ হইতে পারে না। অর্থাৎ ব্রহ্ম গ্রহীতা বিষয় নহেন, গ্রহণ বিষয় নহেন ও গ্রাহ্য বিষয় নহেন। ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ, এই স্বপ্রকাশ ভাবই গ্রহীতা। ব্রহ্ম অস্মৎ প্রত্যয় লক্ষ্য, অর্থাৎ গ্রাহ্য ও গ্রহণরূপ অনাত্ম বিষয়ের চিন্তা হইতে অন্তঃকরণকে নিরুদ্ধ করিয়া আত্মপ্রত্যয় লক্ষ্য করিয়া সমাধি অবলম্বন করিলে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। ইহা পরে কথিত হইবে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে শুক্তিতে রজতভ্রম, রজ্জুতে সর্পভ্রম, সূর্য্যরশ্মিতে বারিভ্রম, এ সমস্তই প্রত্যক্ষ বিষয়ে অধ্যাস হইতেছে। তাহার উত্তরে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলেন:—

"ন চায়মস্তি নিয়মঃ পুরোঽবস্থিত এব বিষয়ে বিষয়ান্তরং অধ্যাসিতব্যং ইতি। অপ্রত্যক্ষেঽপি হি আকাশে বালাঃ তলমলিনতাদি অধ্যস্যন্তি।" সম্মুখে অবস্থিত প্রত্যক্ষ বিষয়েই যে অধ্যাস হইবে এইরূপ কোন নিয়ম নাই। মূর্খেরা অপ্রত্যক্ষ আকাশেও তল মলিনতাদির অধ্যাস করে।

প্রকৃত পক্ষে অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে যে বিষয়ান্তরের অধ্যাস হওয়ার এরূপ উদাহরণ পাওয়া যায় না। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের উল্লিখিত "আকাশের" উদাহরণ প্রযোজ্য নহে। কারণ মূর্খেরা আকাশকে দর্শনযোগ্য রূপশালী দিগন্ত-প্রসারী গভীর তেজোদ্ভুত পদার্থ বলিয়াই জানে, সুতরাং তাহার তলা ও মলিনতা প্রভৃতি বোধ করে।

সে যাহা হউক, ইহার নাম শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ। শ্রীমতী আনী বেশান্ত সাধারণ লোকদিগের বোধসৌকর্য্যার্থে একটী উদাহরণ দিয়াছেন তাহা এই প্রকার। কোন ব্যক্তিকে মেস্‌ম্যারাইজ্ বা হিপ্‌নটাইজ্ করিলে (Mesmarise or hypnotise) যে বিষয় প্রত্যক্ষ না থাকে বা

পুরোভাগে উপস্থিত না থাকে, এমন মিথ্যা বিষয়েরও স্পর্শজ্ঞান প্রভৃতি জন্মে। আমরা যোগিগণের যোগবলে অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ, এমন কি, শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র লবের অনুরূপ কুশকে নির্ম্মাণ, করিবার কথা শুনিয়াছি। শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ বেদান্ত দর্শনের—"আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি" (২ অধ্যায়, ১ পদ, ২৮), এর ভাষ্যে লিখিয়াছেন যে যেমন কল্পবৃক্ষ হইতে বিচিত্র গজ তুরগাদি প্রকাশিত হয়, সেইরূপ সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণু হইতে দেব, তির্য্যগ, মনুষ্যাদির সৃষ্টি হইয়াছে।

বৈষ্ণব দর্শনেও বিবর্ত্ত বিলাস পাওয়া যায়। শ্রীরামানন্দরায় সাধ্য-সাধনের চরমোৎকর্ষ স্বরূপ প্রেম-বিলাস—বিবর্ত্ত প্রকটিত করিয়া স্বরচিত একটী প্রসিদ্ধ গীত শ্রীচৈতন্যদেবকে শুনাইয়াছিলেন। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে শুদ্ধ সত্বপ্রধানা মায়া দ্বারা আবৃত ব্রহ্ম ঈশ্বরোপাধিক। ভগবন্নিষ্ঠ স্বরূপশক্তির বৃত্তি বিশেষই শুদ্ধ-সত্ব। শুদ্ধসত্ব প্রধানা মায়া ব্রহ্মের অনির্ব্বচনীয় অঘটন ঘটন পটিয়সী সৃষ্টি প্রসবিনী স্বরূপ-শক্তি। শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ, যেমন অগ্নি ও অগ্নির দাহিকাশক্তি অভেদ। মায়া ব্রহ্মের ইচ্ছা শক্তি। শুদ্ধ-সত্ব চতুর্ব্বিদ—(১) হ্লাদিনী শক্তিপ্রধানা বিশুদ্ধতত্ব। (২) সন্ধিনী শক্তি প্রধানা বিশুদ্ধ সত্ব। (৩) সম্বিৎ শক্তি প্রধানা বিশুদ্ধ সত্ব। (৪) হ্লাদিন্যাদি শক্তিত্রয় সম্বলিত বিশুদ্ধ সত্ব। ইহার মধ্যে সম্বিৎ শক্তি প্রধান বিশুদ্ধ সত্বের পরিণাম বিশেষকেই প্রেম বলে। এই প্রেমের বিভূতি বশতঃ সত্য বস্তুকেও অন্যরূপে প্রতীতি হয়। সুতরাং সর্ব্বৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ প্রেমবিলাসের বিবর্ত্তরূপে নিজেই রাধারূপ অঙ্গীকার করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ আনন্দস্বরূপ, চিৎ-শক্তির সারবৃত্তি প্রেমই তাঁহার জ্ঞানকে আবরণ করিয়া রাধারূপ বিবর্ত্ত জন্মাইয়া দেয়। প্রেম ভগবানের স্বরূপ শক্তি, সুতরাং তদ্দ্বারা তাঁহার ব্যাপ্তির কোন দোষ ঘটে না, অর্থাৎ বিবর্ত্তে যুগল মূর্ত্তি হইলেও কৃষ্ণ ও রাধা অদ্বৈত তত্ব।

"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥"

বৃহদ্ গৌতমীয় তন্ত্র।

যেমন সুবর্ণময়ী প্রতিমা সুবর্ণের বিকার, অর্থাৎ অন্তরে ও বাহিরে

সর্ব্বত্রই সুবর্ণের প্রতীতি থাকে। সেইরূপ রাধা কৃষ্ণের বিকার স্বরূপ; (চিৎ শক্তির সারবৃত্তি প্রেমের আবরণে কৃষ্ণ বিকারপ্রাপ্ত হইয়াছেন) অর্থাৎ অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বত্রই কৃষ্ণরূপ। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা অদ্বৈততত্ত্ব। অদ্বৈত বলিবার কারণ এই যে চিৎশক্তি, স্বরূপ-শক্তি। কিন্তু মায়াবাদীদিগের "মায়া" ব্রহ্মের স্বরূপ-শক্তি নহে, ব্রহ্মের স্বরূপশক্তি চৈতন্য। মায়া ব্রহ্মের ইচ্ছা। ইচ্ছা অন্তঃকণের ধর্ম্ম। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্তকে অন্তকরণ বলে। ব্রহ্মের মায়া আছে বলিলে ইচ্ছা আছে বুঝিতে হইবে, ইচ্ছা থাকিলেই অন্তঃকরণ থাকল। সুতরাং ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ হইলেন না, তাঁহার স্বগত ভেদ জন্মিল। (স্বগতভেদ অর্থে যেমন মনুষ্যের সহিত তাঁহার নিজের ইন্দ্রিয়গণের ও অন্তঃকরণের ভেদ)। সাংখ্যমতে পুরুষ চৈতন্য স্বগত ভেদ শূন্য। পুরুষ চৈতন্য প্রকৃতির দিকে নিরীক্ষণ করিলে বুদ্ধি নামক ব্যক্তাবস্থা জন্মে। এই অব্যক্ত বা প্রকৃতি বহুবার পুরুষ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে বহু জীব বা বুদ্ধি জন্মে। এই বহু বুদ্ধি বুঝিতে হইলে হয় অব্যক্তকে বহু ও পুরুষকে এক, অথবা প্রকৃতি এক ও পুরুষ বহুত্ব স্বীকার করিতে হয়। প্রকৃতিতে পুরুষের অসংখ্যবার দর্শনের দ্বারা অসংখ্য বিকার জন্মে। পুরুষ এক স্বীকার করিলে তাঁহার স্বগতভেদ আসিয়া পড়ে. সুতরাং পুরুষ বহুল। এক পুরুষ মুক্ত হইলে সব পুরুষ মুক্ত হয় না। প্রত্যেক পুরুষের বুদ্ধি পৃথক্ পৃথক্।

এইরূপ পুরুষ বহুত্ব হয় দেখিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্য এক অদ্বয় ব্রহ্ম স্থাপন জন্য জীবকে বহু বলিলেন বটে, কিন্তু তৎসঙ্গেই বলিলেন জীব কিছু নহে, জীব মিথ্যা। ব্রহ্ম অজ্ঞান বা অবিদ্যা কর্ত্তৃক আবৃত হইলে জীব হইলেন। জীব বহুল, সুতরাং অবিদ্যাও বহুল। মলিনসত্ত্ব প্রধানা মায়ার অংশ সমূহই অবিদ্যা। যেমন পরিষ্কৃত চিম্নীর ভিতরস্থ স্বপ্রকাশ আলোক স্বচ্ছালোকরূপে প্রকাশিত হয় এবং সেই আলোক রঙ্গিন চিম্নীর ভিতর দিয়া রঙ্গিনরূপে প্রতিভাত হয় ও মৃত্তিকা নির্ম্মিত চিম্নীর ভিতরে থাকিলে বাহিরে প্রকাশিত হয় না, সেইরূপ একই ব্রহ্মচৈতন্য ভিন্ন ভিন্ন আবরণ বা উপাধি (দেহ, Vehicle) সংযোগে ঈশ্বর, দেবতা, মানব, পশু উদ্ভিদ, পর্ব্বত, কঠিন মৃত্তিকা প্রভৃতি হয়। মানব অবিদ্যাকে অপসারিত করিতে পারিলেই মুক্ত

হয়েন। তাহা হইলে অবিদ্যার বিনাশ আছে, অবিদ্যা নিত্যা নহেন। কিন্তু শ্রীশঙ্করের মতে মায়া ও অবিদ্যা অনাদি। তাহাতে দেখা যায় যে অবিদ্যা অনাদি কিন্তু শান্ত। যদি মায়া ব্রহ্মের ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে অবিদ্যাকে জীবের ইচ্ছা বলিতে হয়। ব্রহ্ম ইচ্ছা করিয়া এইরূপ শৃঙ্খল পরেন কেন? আবার কোন্ পুণ্যফলেই বা মুক্ত হয়েন? শ্রীশঙ্কর সূর্য্য ও জলপাত্রের উদাহরণ দিয়া বলেন যেমন একই সূর্য্য বহু জলপূর্ণ শরাবে পতিত হইয়া বহুরূপে প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ একই ব্রহ্ম বহু উপাধি বা অবিদ্যা সংস্পর্শে বহু জীবরূপে প্রতিভাত হয়েন। এই উদাহরণটী বিজ্ঞানসম্মত নহে। সূর্য্যকিরণমালা সমষ্টি, সূর্য্যের যে রশ্মি এক শরাবে পতিত হয়, সেই রশ্মি অপর শরাবে পড়ে না। বিশেষতঃ ব্রহ্ম নিরাকার, তাঁহার প্রতিবিম্ব পড়িতেই পারে না। বৈষ্ণবদর্শন জীবগণকে মিথ্যা না বলিয়া বলিলেন যে জীব অনাদি ও নিত্য, জীব ভগবানের নিত্যদাস, ইহাই ভগবানের সহিত জীবের নিত্য সম্বন্ধ। জীবকে ব্রহ্মের অংশ বা ব্রহ্মের অবিদ্যোপহিত চৈতন্য না বলিলে একটী আপত্তি উপস্থিত হয়, ব্রহ্ম এক প্রান্তে ও জীব অপর প্রান্তে উভয়ই স্বতন্ত্র, এই উভয়কে সংযুক্ত করিবার জন্য কোনরূপ সেতু নির্ম্মিত হওয়া আবশ্যক, নচেৎ জীব কোন্ সেতু অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মকে জানিবেন। অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদীরা বলিবেন জীব, ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র নহে। এই মতানুসারে জীবের সহিত ব্রহ্মের ঐক্য ও পার্থক্য পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। জীব ব্রহ্মকে কিরূপে জানিবে? বৈষ্ণব শাস্ত্র বলিবেন, অপরিচিত ব্যক্তি অপরিচিত ব্যক্তিকে চিনিতে বা ভালবাসিতে পারে না। অতএব মানব ভগবানের সহিত একটী সম্বন্ধ স্থাপন করুক। যে সম্বন্ধ অনাদিকাল হইতেই আছে, সেই সম্বন্ধ সাধনাবলে পুনঃরুজ্জীবিত হউক। ভগবানের সহিত জীব কি সম্বন্ধ পাতাইবে? অনেক প্রকার সম্বন্ধ পাতাইতে পারে, তন্মধ্যে এই পাঁচটী প্রধান—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। কে এই সম্বন্ধ পাতাইয়া দিবে? শ্রীকৃষ্ণই গুরুরূপে অথবা শ্রীকৃষ্ণের কোন নিত্যসখা, কিম্বা শ্রীমতীর কোন নিত্যসখী এই সম্বন্ধ স্থাপনের সহায়তা করিবেন।

আমরা নিত্য যাহা দেখিতেছি, যাহা স্পর্শ করিতেছি, যাহা অনুভব

করিতেছি, তৎ সমস্তকেই মিথ্যা কল্পনা করিতে মন প্রস্তুত হয় না। খৃষ্টান মুসলমান, বৈষ্ণব প্রভৃতি কোন ধর্ম্মাবলম্বীই নিজে নিজে মিথ্যা বলিতে প্রস্তুত নহেন। তারপর ব্রহ্ম সম্বন্ধে চিন্তা করিলেও দেখা যায় শ্রীশঙ্কর বলেন, ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, সমস্তই ব্রহ্ম, ব্রহ্মময়মিদং জগৎ—এই জগৎ ব্রহ্মের বিকার, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—যাহা কিছু আছে সমস্তই ব্রহ্ম। যদি অবিদ্যাকে বহু না বলিয়া এক বলা যায় তাহা হইলে সাংখ্যাচার্য্যের ন্যায় শ্রীশঙ্করকে ব্রহ্মের বহুত্ব স্বীকার করিতে হয়। সাংখ্যের পুরুষ ও অদ্বৈতক রস চৈতন্য, শ্রীশঙ্করের ব্রহ্ম ও একমেবাদ্বিতীয়ং (সর্ব্ব প্রকারের বিশেষণ ও ভেদ রহিত) চৈতন্য সত্তা। শ্রীশঙ্করের মতে এই ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, তাঁহার "আমিত্ব" "ব্যক্তিত্ব" ও "মন" নাই, তিনি অমনা। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে সৃষ্টির পূর্ব্বে—"তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়ে" "বহু স্যাম্" এই সমস্ত আমিত্ব বাচক এক বচনান্ত পদের উপায় কি? এবং কে ঈক্ষণ বা দর্শন বা সঙ্কল্প বা ইচ্ছা করিলেন? নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের অন্তঃকরণ নাই, মন নাই, ইন্দ্রিয়াদি নাই; সুতরাং দর্শন, ইচ্ছা ও সঙ্কল্প কাহার হইবে?

এইরূপ বহু বহু উপনিষদে ব্রহ্মের "আমিত্ব" "বিগ্রহ" "মন" "গমন" "শয়ন" প্রভৃতি পাওয়া যায়। চৈতন্য সত্তা অবিভাজ্য, তাহার ব্যক্তিত্ব নাই। সুতরাং ব্রহ্মের ঊর্দ্ধে ভগবত্তত্ব স্বীকার করিবার জন্য মানব মন ব্যাকুল হয়, এই ব্যাকুলতা এই লালসাকে কিছুতেই মানব চিত্ত হইতে উৎপাটিত করা যায় না।

মায়া যে কি বস্তু কিম্বা অবস্তু তাহা ধারণা করিতে হইলে সত্ত্ব রজ ও তমোগুণের আলোচনা করিতে হয়। আমরা দেখিয়াছি যে মায়া বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণাত্মিকা। সত্ত্ব রজ ও তমগুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি। প্রকৃতিকেও মায়া বলা যায়। প্রকৃতি দুই প্রকার, এক মায়া অপর অবিদ্যা। সত্ত্বগুণ প্রকাশ শক্তি অর্থাৎ প্রকাশকারী গুণ। রজগুণ ক্রিয়া শক্তি বা গতিশক্তি। তমগুণ প্রকাশাভাব। সাংখ্যের অব্যক্ত বা প্রকৃতি ক্রিয়া শূন্য মূল অবস্থা। এই অব্যক্ত অবস্থা ক্রিয়াশীল হইলে ব্যক্ত জগৎ হয়। অব্যক্তের কোন জ্ঞান সম্ভবে না। ক্রিয়াশীল ব্যক্ত অবস্থারই জ্ঞান হয়। অব্যক্তে গুণ প্রকটিত হইলে প্রকট পদার্থ হয়, সুতরাং প্রকট পদার্থমাত্রই উক্ত তিনগুণের বিভিন্ন মিশ্রণ

মাত্র। অব্যক্তে ক্রিয়া উৎপন্ন হইলেই গুণ উৎপন্ন হয় ও বস্তুজ্ঞান জন্মে। এই জন্য বস্তুজ্ঞানের পূর্ব্বে এক ক্রিয়া উৎপন্ন হওয়া আবশ্যক। অব্যক্তে ক্রিয়া-বিশেষ উৎপন্ন হইলে বস্তু প্রকটিত হয়, বস্তু মানবেন্দ্রিয়ে সন্নিবিষ্ট হইয়া চিত্তে ক্রিয়াবিশেষ জন্মাইলে বস্তুজ্ঞান জন্মে। ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষহেতু জ্ঞান জন্মে। শুধু ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হইলেই জ্ঞান হয় না, মনকে সেই জ্ঞান গ্রহণের জন্য সক্রিয় হওয়া আবশ্যক। জ্ঞান গ্রহণকারী বা গৃহীতা, জ্ঞানগ্রহণে শক্তিক্ষম ইন্দ্রিয় বা গ্রহণ, এবং গ্রাহ্য পদার্থ এই তিন তত্ত্ব একত্র না হইলে জ্ঞান জন্মে না। গ্রাহ্য পদার্থকে গ্রহণ করা যায় কিরূপে? রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি গুণ দ্বারা বাহ্য পদার্থকে গ্রহণ করা যায়। ফটোগ্রাফের প্লেটের ন্যায় বাহ্যবস্তু ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া অন্তঃকরণের উপর পড়িয়া অন্তঃকরণের এক প্রকার বৃত্তি জন্মায়। এই বৃত্তি গ্রাহ্য পদার্থের তদাকার বৃত্তি বা Thought form।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে অন্তঃকরণ চতুষ্টয়, মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার। মনের বিষয় সংশয়, বুদ্ধির বিষয় নিশ্চয়, চিত্তের বিষয় স্মৃতি, এবং অহঙ্কারের বিষয় অভিমান বা গর্ব্ব। চারি প্রকার মনোবৃত্তির ইংরাজি নাম—Feeling, willing, remembering and reasoning অন্তঃকরণকে এক স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় মনে করিলে তাহার উপর গ্রাহ্য পদার্থের প্রতিবিম্ব পড়ে, গৃহীতা সেই প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিলে বস্তুর জ্ঞান জন্মে। গৃহীতা অন্যমনস্ক বা নিষ্ক্রিয় থাকিলে জ্ঞান জন্মে না। একটী গানে আছেঃ—

"রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা।
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে,
না শুনে কাহারও কথা॥

বস্তুমাত্রই ক্রিয়ার ফল। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দাদিও ক্রিয়া। যাহা অন্তঃকরণ দ্বারা বা বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায় সমস্তই ক্রিয়া। ক্রিয়া কি? বস্তুর এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে পরিবর্ত্তনের নাম ক্রিয়া। ক্রিয়া কেন হয়? শক্তি দ্বারা ক্রিয়া হয়। শক্তি ও ক্রিয়া, কারণ কার্য্যরূপে সম্বদ্ধ। কার্য্যের পূর্ব্বভাবের নাম কারণ। সেইরূপ ক্রিয়ার পূর্ব্বভাবের নাম শক্তি। যাহা অবলম্বন করিয়া শক্তি প্রকাশ পায় তাহা শক্তির আশ্রয়

যেমন বিদ্যুৎ শক্তি, বিষয়কে আশ্রয় করিয়া প্রকটিত হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা, ত্বক্ জ্ঞানেন্দ্রিয় বা জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তি ; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ কর্ম্মেন্দ্রিয় শক্তি ; প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, উদান শরীর ধারণ করিবার প্রাণ শক্তি। বিকল্প সংকল্প স্মৃতি ও অভিমান অন্তঃকরণের শক্তি। কোন জ্ঞান ক্রিয়া হইলে তাহার পূর্ব্ব ভাব এই সমস্ত গ্রহণ শক্তি ও গ্রাহ্য শক্তি। সুতরাং গ্রহণ শক্তি ও গ্রাহ্যশক্তি অব্যক্ত প্রকৃতির ভাব, ব্যক্তবস্তু জ্ঞানের পূর্ব্বভাব। প্রকৃতিই মূলশক্তি ক্রিয়ার পূর্ব্বভাব শক্তি। শক্তি আশ্রয় অবলম্বন করে। আশ্রয়ও ক্রিয়া বিশেষ। এই ক্রিয়ারও শক্তি আছে। সুতরাং মূল শক্তি অব্যক্ত প্রকৃতি। এই মূল শক্তির কোন আশ্রয় নাই। তবে বাহ্যজগৎ কি ? রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ ক্রিয়া, বাহ্যজগৎও ক্রিয়া বাহ্য-জগৎ রূপ রসাদির আশ্রয়। এই আশ্রয়ও ক্রিয়া, ক্রিয়ার শক্তি অবশ্য থাকিবে। সুতরাং যাহাকে পরিদৃশ্যমান জগৎ বলিতেছি সেই জগৎও অব্যক্তেরই ক্রিয়া। জগৎকে প্রকৃতরূপে জানা যায় না, কেবল কতকগুলি ক্রিয়ার জ্ঞান হয় মাত্র। শ্রীশঙ্কর বলিলেন যে জগৎ কিছুই নহে, ব্রহ্মই অবিদ্যার আবরণ মাথায় দিয়া জগৎ হইয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্ম, ব্রাহ্মী শক্তি (মায়া ও অবিদ্যা), অব্যক্ত বা প্রকৃতি এবং দৃশ্য জগৎ সমস্তই দুর্জ্ঞেয়। সমস্ত ক্রিয়ার মূল শক্তি। এই শক্তির তিন ভাব,—প্রকাশভাব (সত্ব), ক্রিয়াশীল ভাব (রজ), এবং আবরণশীল ভাব (তম)। এই শক্তির প্রকাশের জন্য এক স্বপ্রকাশ (স্বরাট্—স্বেন রাজতে) বস্তু আবশ্যক। এই স্বপ্রকাশ ভাবই গৃহীতা, অস্মৎ প্রত্যয় লক্ষ্য ; সুতরাং গৃহীতা আত্মভাব, এবং গ্রহণশক্তি ও গ্রাহ্য অনাত্মভাব। গৃহীতার সংযোগ হইলেই (ইন্দ্রিয় সান্নিকর্ষ্য হেতু) গ্রাহ্য পদার্থ জ্ঞাত বা প্রকাশিত হয়। এই জন্য জ্ঞানই প্রকাশ, অজ্ঞান তমঃ। কাষ্ঠের অভ্যন্তরে অগ্নি আছে ; কিন্তু তাহা অপ্রকট ; সুতরাং শুষ্ক কাষ্ঠকে অগ্নিশূন্য বলা যাইতে পারে। এইরূপ সত্ব, রজ ও তমগুণের সাম্যাবস্থায় কোন গুণ প্রকাশিত হয় না, এই সাম্যাবস্থাকে শূন্যাবস্থা বলিতে কোন ক্ষতি নাই। গৃহীতা, ইন্দ্রিয় ও গ্রাহ্যবিষয় ভিন্ন জ্ঞান জন্মে না।

"বিদ্যাৎ তু ষোড়শৈতানি দৈবতানি বিভাগশঃ।
দেহেষু জ্ঞানকর্ত্তারমুপাসীনমুপাসতে ॥" মহাভারত শান্তিপর্ব্ব—২১০

দশ ইন্দ্রিয়, মন, ও পঞ্চভূত এই ষোড়ষ পদার্থকে বিভাগক্রমে দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিবে। দেহমধ্যে অধ্যাসীন জ্ঞানকর্ত্তাকে মনুষ্যগণ উপাসনা করিয়া থাকে।

এই জ্ঞানকর্ত্তা গৃহীতা। "দেবতা" শব্দের অর্থ দ্যোতনশীল, স্বপ্রকাশ। হিন্দুশাস্ত্র ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকলের নাম করিয়াছেন; অধিষ্ঠাত্রী দেবতা না থাকিলে শুধু ইন্দ্রিয় ও গ্রাহ্য পদার্থদ্বয়ের জ্ঞান হয় না। চিকিৎসা শাস্ত্র শুশ্রুতের শারীর-স্থানে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বর্ণনা আছে:—

"অথ বুদ্ধে ব্রহ্মা। অহঙ্কারস্যেশ্বরঃ। মনসশ্চন্দ্রমাঃ। দিশঃ শ্রোতস্য। ত্বচো বায়ুঃ। সূর্য্যশ্চক্ষুষোঃ। রসনস্যাপঃ। পৃথিবী প্রাণস্য। বচসোঽগ্নিঃ। হস্তয়োরিন্দ্রঃ। পাদয়ো "বিষ্ণুঃ"। প্রজাপতিরুপস্থস্যেতি॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ আছে। তাহার অনুবাদ এইরূপ:—

সেই বিরাট পুরুষের মুখ জন্মাইলে, লোকপাল অগ্নি নিজ শক্তি বাক্যের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন। জীব বাক্য দ্বারা শব্দ উচ্চারণ করে। তাঁহার তালু আবির্ভূত হইলে, লোকপাল বরুণ নিজশক্তি জিহ্বার সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন। জীব জিহ্বা দ্বারা রস গ্রহণ করে। তাঁহার নাসিকাদ্বয় উদ্ভূত হইলে অশ্বিনীকুমার দ্বয় শক্তি ঘ্রাণের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন। জীব ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় উৎপন্ন হইলে লোকপাল আদিত্য স্বীয় শক্তি দর্শন সহিত তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। জীব চক্ষুদ্বারায় রূপ গ্রহণ করে। তাঁহার চর্ম্ম প্রকটিত হইলে লোকপাল বায়ু স্বীয় শক্তি প্রাণের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন। জীব প্রাণদ্বারা স্পর্শানুভব করে। তাঁহার কর্ণ জন্মাইলে দিক্ সকল স্বীয় শক্তি শ্রোত্রের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন; শ্রোত্রদ্বারা শব্দ জ্ঞান হয়। তাঁহার মেঢ্র আবিষ্কৃত হইলে প্রজাপতি স্বীয় শক্তি শুক্রের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন, মেঢ্রদ্বারা আনন্দানুভব হয়। তাঁহার গুহ্য প্রকাশ হইলে লোকেশ মিত্র নিজ শক্তি পায়ুর সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন। জীব পায়ুদ্বারা মলত্যাগ করে। তাঁহার হস্তদ্বয় উৎপন্ন হইলে স্বর্গপতি ইন্দ্র স্বায় ক্রয়-বিক্রয়াদি শক্তির সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন, জীব হস্তদ্বারা

জীবকে অর্জ্জন করে। তাঁহার পদ উৎপন্ন হইলে লোকেশ বিষ্ণু স্বীয় শক্তি গতির সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন। গতিদ্বারা প্রাপ্য বস্তু লাভ করা যায়। তাঁহার হৃদয় উদ্ভিন্ন হইলে চন্দ্র নিজশক্তি মনের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন, মনদ্বারা সঙ্কল্প করা যায়। তাঁহার অহঙ্কার উৎপন্ন হইলে রুদ্র নিজশক্তি কর্ম্মের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন, জীব কর্ম্ম দ্বারা কর্ত্তব্যের জ্ঞানলাভ করে। তাঁহার বুদ্ধি প্রকাশিত হইলে ব্রহ্মা নিজশক্তি চিত্তের সহিত তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইলেন, জীব চিত্ত দ্বারা বিজ্ঞান লাভ করে।

ঐতরেয় উপনিষদে আছে :—অগ্নি বাক্য হইয়া মুখে প্রবেশ করিয়াছিলেন, বায়ু প্রাণ হইয়া নাসিকায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, আদিত্য চক্ষু হইয়া চক্ষুর্দ্বয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন। দিক্ শ্রবণ হইয়া কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ওষধি বনস্পতি সকল লোম হইয়া চর্ম্মে, ও চন্দ্র মন হইয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন। মৃত্যু অপান হইয়া নাভিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, জল রেত হইয়া উপস্থে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

"এতৎ সর্ব্বং মিলিতং লিঙ্গশরীরমিত্যুচ্যতে"—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মনঃ ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়বে যে সূক্ষ্ম শরীর গঠিত হয়, তাহার নাম লিঙ্গ শরীর।

আত্মার স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গশরীর এবং কারণ শরীর এই তিন শরীর আছে। প্রাণময়,অন্নময়, মনোময়,বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়, এই পঞ্চকোশ আছে। জাগ্রতাবস্থা স্বপ্নাবস্থা সুষুপ্তি অবস্থা তুরীয় অবস্থা, এই চারি অবস্থা আছে। এই সকলের বিস্তৃত বিবরণ আবশ্যক হইলে পরে দেওয়া যাইবে। জাগ্রতাবস্থায় স্থূল শরীরাভিমানী আত্মাকে বিশ্ব, স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্ম শরীরাভিমানী আত্মাকে তৈজস, সুষুপ্তি অবস্থা বিশিষ্ট কারণ শরীরাভিমানী আত্মাকে প্রাজ্ঞ কহে। স্বপ্নাবস্থায় পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য থাকে না। কেবল মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এই অন্তঃকরণ চতুষ্টয়ের কার্য্য থাকে। সুষুপ্তি অবস্থায় অন্তঃকরণ চতুষ্টয়ের বৃত্তি থাকে না। আত্মা যখন এই তিন অবস্থা-রহিত হইয়া সাক্ষীস্বরূপ নির্লিপ্ত ভাবে চৈতন্যরূপে অবস্থান করেন তখন তুরীয় অবস্থা হয়। আত্মা সূক্ষ্মশরীরে

স্বপ্নাবস্থায় মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার দ্বারা বাসনাময় শব্দরূপ রসাদি ক্রিয়ার উপলব্ধি করেন।

চার্ব্বাক দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শন এইরূপ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। জীবের জ্ঞান যদি তৈলধারার ন্যায় অবিশ্রান্ত থাকে, অর্থাৎ "ক্ষণিক জ্ঞান" না হয়, তাহা হইলে জ্ঞান গৃহীতার অভাব আমরা কল্পনা করিতে পারি না। "ক্ষণিক জ্ঞান" সম্ভবপর নহে; গ্রাহ্য পদার্থের গুণ সকল ক্রমাগত অন্তঃকরণে উদিত হইয়া লয় পাইতেছে, তাহা দেখিয়া চিত্তবৃত্তির ও গৃহীতার পূর্ব্বভাব ও পরের অভাব কল্পনা করিতে পারি না। চার্ব্বাক বলেন পরমাণু হইতে চৈতন্য জন্মে। জড় পরমাণুতে চৈতন্যের ধর্ম্ম নাই, সুতরাং জড় হইতে চৈতন্য জন্মিতে পারে না। ইচ্ছা, প্রেম, ভালবাসা, বোধ প্রভৃতি জড় হইতে কিরূপ উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা কল্পনা করা যায় না। থিওসফি সম্প্রদায় পরচিত্তের জ্ঞান (Thought reading), দূরশ্রবণ ও দর্শন, ভবিষ্যতের জ্ঞান প্রভৃতি দ্বারা স্পষ্টরূপে জড়বাদীদের ভ্রম প্রমাণিত করিয়াছেন। মস্তিষ্কে শক্তি প্রয়োগ করিলেই স্মৃতি ও ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতি অন্তঃকরণের বৃত্তি উৎপন্ন হয় না, সুতরাং স্বতন্ত্র জ্ঞানকর্ত্তার আবশ্যকতা দৃষ্ট হয়। শ্রীশঙ্করাচার্য্য নিজের কারণ শরীর ও সূক্ষ্মশরীর, স্থূল শরীর হইতে পৃথক করিয়া আত্মার অস্তিত্ব নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত করিয়াছেন। বুদ্ধদেবও নরক দর্শনের জন্য আত্মা প্রেরণ করিয়াছেন; স্বর্গলোকে নিজে সূক্ষ্মশরীরে অবস্থান করিয়াছেন ও পুনরায় ভূর্লোকে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে তিনি নিজে "আত্মার" অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন।

অব্যক্তের অন্তরালবর্ত্তী এক অদ্বয় সত্ত্বা, অদ্বয় জ্ঞান, অদ্বয় আনন্দ, প্রকাশ বিশেষে জ্ঞানীর নিকট অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, যোগীর নিকট অখৈণ্ডক রস পরমাত্মা, এবং ভক্তের নিকট স্বয়ং ভগবান্ রূপে অনুভূত হয়েন। জগতে শক্তির ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নয়ন ও মনের গোচর হয় না। সমুদয় শক্তিকে এক শক্তির বিকাশ বলিলে সেই আত্মাশক্তিকে—মহাশক্তিকে—হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের ভাষায় নিত্যাশক্তি কহা যায়। শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ, যেমন অগ্নি ও অগ্নির দাহিকাশক্তি। আত্মাশক্তির শক্তিমান্ পুরুষই ব্রহ্ম,

পরমাত্মা ও ভগবান্ নামে অভিহিত। ইনিই ন্যায়দর্শনের ঈশ্বর শব্দবাচ্য। অন্যান্য দর্শনমতে ঈশ্বর, অব্যক্ত ব্রহ্মের বা অব্যক্ত প্রকৃতির প্রথম ব্যক্ত অবস্থা বিভূতিমান্ পুরুষ—প্রথম মুক্ত পুরুষ। জ্ঞানীর নিকট ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ—অদ্বয়সত্ত্বা, জ্ঞান মনের অগোচর। ভক্ত সাধকের নিকট ব্রহ্ম সবিশেষ—সচ্চিদানন্দময় পুরুষ—স্বয়ং ভগবান্। এই ভগবানের অধীনে ঈশ্বরাদি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। জ্ঞানীর মতে ব্রহ্মের অধীনে ভগবান্ ভগবতী, ব্রহ্মা ব্রহ্মাণী, বিষ্ণু লক্ষ্মী, শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা, মহেশ্বর পার্ব্বতী। ভক্ত সাধকগণ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। বৈষ্ণবগণ বলেন শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্, সেই ভগবানের শক্তিই ভগবতী আদ্যাশক্তি রাধা। তন্নিম্নে বিষ্ণু লক্ষ্মী, হর পার্ব্বতী, ব্রহ্ম ব্রহ্মানী ইত্যাদি। শৈব মতে শিব ও উমাই স্বয়ং ভগবান্ ও ভগবতী বা আদ্যাশক্তি। তন্নিম্নে ঈশ্বরাদি, শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকা, বিষ্ণু ও লক্ষ্মী, ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণী। শাক্তমতে মহাশক্তি বা মহামায়াই কালী তারা প্রভৃতি নামে আখ্যাতা; তিনি যখন ক্রিয়াশীল তখন তাঁহাকে কালী বলা যায়, এবং তিনি যখন নিষ্ক্রিয় তখন তাঁহাকে মহাকাল বা শিব বলা যায়। এই মহাশক্তি হইতেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি ঈশ্বর উদ্ভূত হইয়াছেন। তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বরের "স্তব্যাপরা" স্তবের অতীত। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে ইহা বর্ণিত আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের স্তবাতীত। সুতরাং যে দিক দিয়াই চিন্তা করা যাউক, ভগবান্ ও আদ্যাশক্তি, অথবা ঈশ্বর ও ঈশ্বরী জীবের উপাস্য। শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ, একই তত্ত্ব—অদ্বয় তত্ত্ব। "তমেবধ্যায়েৎ, তমেব রমেৎ", জীব তাঁহাকেই ধ্যান করিবে, তাঁহারাই প্রেমরস পান করিবে। এই ধ্যান রমণ সম্বন্ধে যোগশাস্ত্রে ও ভক্তিগ্রন্থে নানাপ্রকার পদ্ধতি বিভিন্ন সাধকগণের রুচি অনুসারে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যাইতেছে।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, চার্ব্বাক দর্শন বলিদানের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। বৌদ্ধদর্শন ও বৈষ্ণব দর্শন এবং বলিদানের বিরোধী। অনেক উপনিষদেও বলিদানের বিরুদ্ধে উক্তি আছে।

"যূপংকৃত্বা পশুংহত্বা কৃত্বা রুধির কর্দ্দমং।

যদি যাতি নরঃ স্বর্গং নরকং কেন গম্যতে ॥" (যোগোপনিষৎ)।

হাড়িকাঠ নির্ম্মাণ করিয়া পশুকে বলি দিয়া রুধিরের কর্দ্দম প্রস্তুত করিয়া যদি মনুষ্য স্বর্গে যাইতে পারে তাহা হইলে নরকে যাইবার আর পন্থা কি? থিওসফী সম্প্রদায়ের সভ্যগণও বলিদানের বিরোধী।

চার্ব্বাক দর্শনের অপর আপত্তি এই যে মস্তিষ্ক ভিন্ন স্বতন্ত্র কোন জীবাত্মা নাই। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার বা জীবের আমিত্ব সমস্তই মস্তিষ্কের ক্রিয়ামাত্র। ইচ্ছা শক্তি দ্বারাও মস্তিষ্কে ক্রিয়া সঞ্জাত হইতে পারে। এক মানবের ইচ্ছা অন্য মানবের মস্তিষ্কে চালিত হইতে পারে; ইহা দ্বারা জানা যায় যে জ্ঞান উৎপাদনের জন্য মস্তিষ্কের অতিরিক্ত অপর একটী শক্তি আছে। সেই শক্তি জীবদেহের অতিরিক্ত শক্তি। ইহা থিওসফী নিঃসন্দিগ্ধরূপে সপ্রমাণিত করিয়াছেন।

চার্ব্বাক দর্শনের অপর আপত্তি বেদের স্বতঃ প্রামাণ্যের বিরুদ্ধে। বেদের স্বতঃ প্রামাণ্য অনেকেই স্বীকার করেন না। শব্দের অবিনশ্বরত্ব, শব্দ প্রমাণের শ্রেষ্ঠত্ব ও বেদের স্বতঃ প্রামাণ্য মীমাংসা দর্শন সপ্রমাণিত করিয়াছেন। মীমাংসা দর্শন লিখিবার সময় ঐ দর্শনের যুক্তির আভাস দেওয়া যাইবে।

চার্ব্বাক দর্শন প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভিন্ন অপর কোন প্রমাণ মানেন না। ইহা চার্ব্বাকদর্শনের নিতান্তই ভুল। ন্যায় দর্শন, বৈশেষিক দর্শন প্রভৃতি অন্যান্য দর্শন চার্ব্বাকমতের ভ্রম প্রদর্শক করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ নির্ভুল নহে; জ্ঞাতা পুরুষের ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপটব প্রভৃতি দ্বারা, জ্ঞাত পদার্থের অতিদূরত্ব অতিসামীপ্য প্রভৃতি দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দোষস্পৃষ্ট হয়। আপ্তবচন প্রমাণই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। বেদই বলুন, বাইবেলই বলুন, আর কোরাণই বলুন, এই সমস্তকে আপ্তবচন আখ্যায় ভূষিত করিলে ইহাদের লিখিত প্রমাণই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার এই আপ্তবচন প্রমাণের সাহায্যে গ্রহণ না করায় জগতের আদি-কারণ এবং পরমাত্মা ও জীবাত্মা সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। সাংখ্যদর্শন নিতান্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনুমান প্রমাণের অসদ্ভাব বা অযোগ্যতা দেখাইয়া "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" বলিয়াছেন। সাংখ্যদর্শন

অন্তঃকরণ. গ্রাহ্যবিষয় ও ইন্দ্রিয়শক্তির সম্বন্ধ দেখাইয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্থাপন করিয়াছেন। নিত্য ঈশ্বরের ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ্যাদি জন্য জ্ঞান হওয়া অসম্ভব, সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণেও নিত্য ঈশ্বর স্থাপিত হয়েন না। নিত্য ঈশ্বর স্থাপন করিতে হইলে নিত্য প্রত্যক্ষ স্বীকার করিতে হয়; সাংখ্যাচার্য্য তাহা করেন নাই। প্রকৃতি অব্যক্ত, অতিসূক্ষ্ম। প্রকৃতির একত্বজ্ঞান প্রত্যক্ষ লক্ষ্যের বিষয়ীভূত নহে। সমগ্র প্রকৃতির উপদ্রষ্টা পুরুষের, অর্থাৎ নিত্য ঈশ্বরের প্রমাণাভাব। সাংখ্যদর্শন "ঈশ্বরাভাবাৎ" বলেন নাই বটে, কিন্তু "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" বলিয়াই নিত্য ঈশ্বর অস্বীকার ও "জন্য" ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং সাংখ্যযোগে "জন্য" ঈশ্বর যোগের অবলম্বন হইতে পারেন। সমস্ত বাহ্যবিষয় হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তির নিরোধ করিয়া কেবল অস্মৎ প্রত্যয়কে লক্ষ্য করিয়া চিত্তের যে সমাধি হয় তাহাকে নির্ব্বিকল্প সমাধি বলে এবং তদ্দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয় ও ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়। সাংখ্যাচার্য্য ইহা স্বীকার করেন না। সংখ্যমতে প্রত্যেক জীবই স্বতন্ত্র, জীবের আত্মস্বাতন্ত্র্য আছে। জীব প্রকৃতি হইতে এই আত্মস্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিলেই মুক্ত হয়েন। জীব মুক্ত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আত্ম-স্বাতন্ত্র্য প্রকৃতি হইতে পৃথক্ করিতে পারেন না। জীবের প্রকৃতিমধ্যগত আত্মস্বাতন্ত্র্যই কারণ শরীর, লিঙ্গশরীর বা স্থূল শরীর; তাহা পঞ্চকোষ বিশিষ্ট। লিঙ্গদেহধারী পুরুষই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ—স্বতন্ত্র জীব। সূক্ষ্ম দেহীরই স্থূল পরিণাম স্থূল দেহধারী পুরুষ—স্বতন্ত্র জীব। জীব মাত্রই স্বতন্ত্র অর্থাৎ পুরুষ বহুল; কেন না "ব্যক্তি-ভেদঃ কর্ম্মবিশেষাৎ"। চার্ব্বাক দর্শন সূক্ষ্মশরীর ও কারণ শরীরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। সাংখ্যদর্শন প্রকৃতি হইতে আত্মস্বাতন্ত্র্যের পৃথগ্ত্ব স্বীকার করিয়া পৃথক্ পৃথক্ বহু আত্মার বা পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু এক আত্মার বা পর-মাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা আত্মস্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিতে পারেন নাই। শঙ্করের দর্শন পরমাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু পরমাত্মার আত্মস্বাতন্ত্র্য—বিশেষত্ব—স্বীকার করেন নাই, কারণ স্বতন্ত্র অর্থে পৃথক্। পরমাত্মা আবার কাহার সহিত পৃথগ্ভূক্ত হইবেন? এই বিশ্বে পরমাত্মা ভিন্ন প্রকৃতি অথবা অন্য পুরুষ নাই। তিনিই জগদেকশরণ্য। তিনি আছেন

বলিয়াই জগৎ আছে, তিনি আছেন বলিয়াই জগৎ হইয়াছে, এবং যেমন তিনি অনুলোমক্রমে জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন, সেইরূপ জগৎ বিলোমক্রমে তাঁহাতেই পরিণত হইবে। প্রকৃতি বা মায়া স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, পরমাত্মার শক্তি মাত্র। এই শুদ্ধসত্ত্ব প্রধান মায়া পরমাত্মাকে আচ্ছাদন করিলে ঈশ্বর প্রতিবিম্ব বহিঃনিসৃত হয়। আর মায়ার ফলে মলিন স্বত্ত প্রধান অবিদ্যা বহুল দ্বারা পরমাত্মাকে আচ্ছাদন করিলে, অশেষ জীব জন্তুরূপ প্রতিবিম্ব বহিঃনিসৃত হয়। এই মতে নির্ব্বিকল্প সমাধিদ্বারা জীবাত্মার মিথ্যাভূত আত্মস্বাতন্ত্র্য নষ্ট হইতে পারে; ইহাই জীবাত্মার মুক্তি। বৈষ্ণব দর্শনের সমাধি অন্যরূপ। শ্রীভগবান্‌কে অবলম্বন করিয়া এই সমাধি হয়। প্রকৃতি হইতে আত্ম-স্বাতন্ত্র্য স্থাপন করা এই সমাধির প্রক্রিয়া নহে। আত্ম-স্বাতন্ত্র্যকে নষ্ট করাও এই সমাধির বিধান নহে। আত্ম-স্বাতন্ত্র্যকে আনন্দাকার বৃত্তিতে পরিণত করাই এই সমাধির উদ্দেশ্য। আত্ম-স্বাতন্ত্র্যকে আনন্দাকার বৃত্তিতে পরিণত করিয়া স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করত শ্রীভগবানের প্রেমরস পানে বিপুল আনন্দ উপভোগ করাই জীবাত্মার মুক্তি*। নায়ক নায়িকা পরম প্রেমে আত্ম-স্বাতন্ত্র্য বিস্মৃত হইয়া আনন্দাকার চিত্ত বৃত্তিতে পরিণত হয়েন, এই বৃত্তি নিত্য-স্থায়িনী হইলেই ভক্তের বিশুদ্ধানন্দরূপ মুক্তি নামে অভিহিত হইতে পারে। তখন ভক্ত আনন্দবাজারে, আনন্দ ধামে, আনন্দময় দেহে, বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগ করিতে থাকেন—"সে মাধুরীয় ঊর্দ্ধে আন—নাহি যার সমান, পর ব্যোমে স্বরূপের সনে।" এই মাধুর্য্য প্রাপ্তির উপায়—ভগবানের সহিত একটী সম্বন্ধ স্থাপন করা, যেমন শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য্য। এই সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইলে শ্রীভগবানের নিজ জন বা কোন সখা সখীর অনুগত হওয়া, আবশ্যক; কারণ সখা সখীরাই ভগবানের কাছে যাইবার পন্থা অবগত আছেন। সখা সখী, কে চিনিয়া দিবে! উত্তর, সেই পথের পথিক গুরু। এই জন্য সর্ব্ব শাস্ত্রেই বিধান আছে—সাধুসঙ্গই প্রকৃত পন্থা।

---

* যে ভক্তিমার্গে এত আনন্দ উপভোগে স্পৃহা থাকে তাহা ভক্তি বলিয়া গণ্য করা যায় না। উহা অহৈতুকী ভক্তি নহে। ইহাই আধুনিক বৈষ্ণব ধর্ম্মের অবনতির চিহ্ন বলিয়া মনে হয়। পং সং

ন্যায়দর্শন বলেন :—

"নাত্মমন সোঃ সন্নিকর্ষাভাবে প্রত্যেক্ষোৎপত্তিঃ।" আত্মা মনের সন্নিকর্ষের অভাবে প্রত্যেক্ষ হয় না। গ্রাহ্য বিষয় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মন এই ছয় জ্ঞানেন্দ্রিয় রূপ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া আত্মার সহিত সংযুক্ত না হইলে জ্ঞান জন্মে না। আত্মার সহিত অনাত্ম পদার্থের জ্ঞানকে বিমুক্ত করার নামই যোগ। চিত্ত বৃত্তির নিরোধের নাম যোগ।

মনের স্বরূপ জানা যায় না। মন মুকুরবৎ স্বচ্ছ। গ্রাহ্য বিষয় মনের সন্নিকর্ষ হইলে মনের উপর একটী প্রতিবিম্ব পতিত হয়; ইহাকে চিত্ত বৃত্তি কহা যায়। চিত্ত বৃত্তির আকার গ্রাহ্য বিষয়ের প্রতিবিম্ব মাত্র। প্রতিক্ষণ মনে এক এক বৃত্তি উদিত হইয়া লয় পাইতেছে। মনোবৃত্তি সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা, স্মৃতি। গ্রাহ্য বিষয় মনের যেরূপ বৃত্তি উৎপাদন করে, মন তদাকার হয়। এই জন্য মনের প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা জানা যায় না। মন ইচ্ছা না করিলে কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় কোন কার্য্য করিতে পারে না। এই জন্য মনকে ইন্দ্রিয়গণের রাজা বলা হয়, এবং মন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়—উভয় ইন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া মনকে উভয়েন্দ্রিয় কহা যায়। মনের সহিত প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান এই পঞ্চ বায়ুর সম্বন্ধ আছে; পঞ্চ বায়ুকে নিরুদ্ধ করিতে পারিলে মন ও নিরুদ্ধ হইতে পারে। চিত্তবৃত্তি নিরোধের প্রকৃত অর্থ এই যে জ্ঞানের গ্রাহ্য বিষয় সম্মুখে উপস্থিত থাকা সত্তেও মনকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করা; যেমন শব্দ হইতেছে তাহা আমি শুনিব না, রূপ আছে তাহা দেখিব না, অর্থাৎ মনকে শব্দজ্ঞান ও রূপজ্ঞান হইতে বিমুক্ত করিব ইত্যাদি।

মন চতুর্দ্দিকস্থ বিষয় সমূহের দ্বারা অনবরত পরিভ্রান্ত হইতেছে। প্রত্যেক বিষয়ের চিত্তবৃত্তি মনে নিরন্তর উদয় হইতেছে, এই ঘটাকার বৃত্তি, পরক্ষণেই অন্য বৃত্তি। মনের এই বিক্ষিপ্ত অবস্থাকে সংযত করিতে চেষ্টা করা, কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীনে আনিবার চেষ্টা করা সমাধিলাভের প্রথম সোপান। প্রতি দিন পাঁচবার "নমাজ" পড়িয়াই হউক, অথবা ত্রিসন্ধ্যা করিয়াই হউক, অথবা নির্দ্দিষ্ট সময়ে মালা জপ করিয়াই হউক, চিত্তের বিক্ষিপ্ত অবস্থাকে স্থৈর্য্যাবস্থায় আনিতে হইবে। পাগ্‌লা মনকে গম্ভীর করিতে হইবে। ইহা

করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ক্লেশদায়ক বৃত্তিগুলিকে ত্যাগ করিয়া আনন্দদায়ক বৃত্তিকে, ও আনন্দদায়ক বৃত্তির মধ্যে কোন একটী বিশেষ বিষয়ক বৃত্তিকে ধরিয়া মনের মধ্যে অধিকক্ষণ রাখিতে হয়; যেমন রূপ বিষয়ক বৃত্তির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের রূপ। অভ্যাস বলে এক বিষয়ক বৃত্তিকে ইচ্ছাক্রমে মনে উদিত করা যায়. ইহাকে ধারণা বলে। এক বিষয়ক বৃত্তিকে অধিকক্ষণ ধরিয়া রাখার নাম ধ্যান। ধ্যান অত্যন্ত গাঢ় হইলে, অর্থাৎ মন ধ্যেয় বিষয়ের তদাকার বৃত্তিতে পরিণত হইলে অপর বিষয়ক কোন জ্ঞানবৃত্তি মনে স্থান পায় না। কারণ একাধিক বৃত্তি এক কালে মনে উদিত হইতে পারে না। মনের এইরূপ একাগ্র অবস্থায় একই চিত্তবৃত্তি অনন্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের রূপে নিবিষ্ট হইলে মন আর মন থাকে না; শুধু শ্রীকৃষ্ণের রূপাকার হইয়া যায়। এই অবস্থায় আমিত্ব জ্ঞান পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া শুধু শ্রীকৃষ্ণের রূপ মনে জাগে। ইহার নাম সমাধি। এইরূপ রূপ সমাধিতে শ্রীকৃষ্ণের রূপ সাক্ষাৎকার হয়, তখন ধ্যায়ীর নিকট জগৎ ঐ রূপময় হয়। শ্রীকৃষ্ণের রূপ ভিন্ন মনের অন্য জ্ঞান থাকে না। এই প্রকার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই কয়েক বিষয়কে পৃথক পৃথক্ ভাবে সাক্ষাৎকার করা যায়। * এইরূপে বিষয় জয় হয়। মহাভূত জয়ী হইতে হইলে কৌশল দ্বারা ভূত সকলকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া পৃথক্ জ্ঞান লাভ করিতে হয়। আমরা শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক চিন্তার কথা বলিতেছিলাম। শ্রীকৃষ্ণের রূপ দ্বারা চক্ষু পরিপূর্ণ হইলে, অন্যরূপ চক্ষুতে স্থান পায় না। শ্রীমতী বলিবেন—সখি! এ ত যমুনার জল নহে, তরঙ্গায়িত কৃষ্ণরূপ, "জলে ঢেউ দিও না ও সজনি!" কর্ণ শ্রীকৃষ্ণের বংশীরবে পরিপূর্ণ, অন্য কথা কর্ণে স্থান পায় না। কর্ণ আন কথা শুনিতে পায় না। জিহ্বা শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আন কথা উচ্চারণ করে না। কেন এইরূপ হয়? মন ইন্দ্রিয়ের রাজা, মন তখন দেহ হইতে পলায়ন করে, শ্রীকৃষ্ণ তখন দেহে মনের স্থান অধিকার করিয়া ইন্দ্রিয় গণের উপর রাজত্ব করিতে থাকেন†। তিনি যাহা দেখান, যাহা শ্রবণ

---

* এক রূপে জগৎরূপ কি প্রকারে লয় হয়? অন্য বিষয় বা ভূত গুলিতে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা কিরূপে করিতে হয়? এই বিষয় বুঝাইয়া দিলে অনেকের উপকার হইতে পারে। পং সং

† এই স্তরটী বুঝিতে পারিলাম না। পং সং

করান, যাহা বলান, যেরূপ কার্য্য করিতে নিযুক্ত করান সমাধিস্থ জীব তাহাই করে। শ্রীকৃষ্ণ যখন মনের স্থান অধিকার করেন, তখন প্রেমিক ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকেই অবলম্বন করিয়া সবিকল্প সমাধি প্রাপ্ত হয়েন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শিষ্যমণ্ডলী শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাসী। শ্রীকৃষ্ণকে সকলেই ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন; কেহবা তাঁহাকে ব্রহ্মের উর্দ্ধতন তত্ত্ব স্বয়ং ভগবান; অথবা কেহ তাঁহাকে ব্রহ্মের অধস্তন তত্ত্ব "জন্য" ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন! নরবপুধারী শ্রীকৃষ্ণ প্রকট ব্রহ্ম, অর্থাৎ তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গ পরমাণু নখাগ্র কেশাগ্র পর্য্যন্ত প্রকট ব্রহ্ম। যিনি যে ভাবে তাঁহাতে তন্ময়ত্ব লাভ করেন, শত্রু রূপেই হউক মিত্র রূপেই হউক অথবা উপপতি * ভাবেই হউক তিনিই মুক্ত হয়েন। এইজন্য সবিকল্প সমাধি যোগে শ্রীকৃষ্ণই প্রধান অবলম্বন।

শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে বলিলেন—

"তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।

জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ॥" ভাগবত ১০।২৯।১০।

সেই সমস্ত গোপীদের শ্রীকৃষ্ণে উপপতি বুদ্ধি ছিল। তথাপি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহাদের কর্ম্ম বন্ধন ক্ষয় হইল এবং তাঁহারা তৎক্ষণাৎ ত্রিগুণের বিকারী দেহ ত্যাগ করিয়া চিন্ময় দেহে কৃষ্ণ সঙ্গিনী হইলেন। এতচ্ছ্রবণে রাজা পরীক্ষিৎ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং নতু ব্রহ্মতয়া মুনে।

গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণ ধিয়াং কথং॥" (ঐ)

গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে কান্ত বলিয়া জানিতেন পরব্রহ্ম বলিয়া জানিতেন না, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের গুণ ধ্যান করিয়া গুণের প্রতিই আসক্তা ছিলেন সুতরাং তাঁহাদের গুণপ্রবাহ বিরত হইয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি কিরূপে ঘটিল?

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিলেন যে সকল জীবই ব্রহ্ম সত্য; কিন্তু জীবের ব্রহ্মত্ব অবিদ্যা দ্বারা আবৃত। শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ হৃষিকেশ অপ্রকট অনাবৃত ব্রহ্ম। সুতরাং তাঁহাতে আত্মা বোধের অপেক্ষা নাই। †

---

* নারদ ঋষি এ কথা স্বীকার করেন না। পং সং

† উত্তরটী ভাল বুঝা গেল না পং সং

"নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভবতো নৃপ !
অব্যয়স্যা প্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ ॥
কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈকং সৌহৃদমেবচ।
নিত্যং হরৌ বিধতো যান্তি তন্ময়তাং হিতে ॥
ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবতি অজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে ॥"

শ্রীমঃ ১০—২৯—৩।১৪।১৫।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজানকী নাথ পাল শাস্ত্রী।

দুই একটী কথা।

(১)

পুনর্জ্জন্মবাদ ও জন্মান্তরের আত্যন্তিক বিনাশ-সাধন যে মুক্তি, তাহা আধ্যাত্মিক রাজ্যের একটী অতি প্রধান নিগূঢ়তমতত্ত্ব। কিন্তু এই তত্ত্বটীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিষয়ে বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই সন্দিহান। তাঁহারা এই তত্ত্বে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে পারেন না। তাঁহাদের কেহ কেহ এই পুনর্জ্জন্মবাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য লইয়া বৃথা বাদানুবাদ করেন; কেহ কেহ উহাতে কেবল অসারতাই দেখিতে পান বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ উহা দ্বারা মৃত্যুর পর প্রিয়বস্তু হইতে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় মনে এরূপ বিশ্বাস পোষণে আতঙ্কিত হন। আর যাঁহারা এই মতে বিশ্বাসী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহাদেরও দৈনিক জীবনে উহার সম্যক্ অনুশীলন হইতে দেখা যায় না; তাঁহারা কার্য্যতঃ পদে পদে উহা লঙ্ঘন করিয়া থাকেন। তবে এই পুনর্জ্জন্মবাদটী কি? ইহা কি নিমজ্জমান ব্যক্তির ঘটনাবশে সমাগত আশ্রিত কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় জীবনপথের কেবল সাময়িক—সুবিধাজনক ভাসমান অবলম্বন মাত্র, অথবা ইহা তর্কক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করিবার জন্য বাক্য প্রয়োগের একপ্রকার ব্যায়াম-কৌশল মাত্র কিম্বা ইহা আধ্যাত্মিক রাজ্যের অনন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডারে প্রবেশের কোন প্রকার আশাপূর্ণ সুসংবাদ বহন করিতে সমর্থ? ইহার

সত্যতত্ত্ব বর্ত্তমানকালে কোথায় পাওয়া যাইতে পারে? এই পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে জড়বিজ্ঞান নির্ব্বাক্। আধুনিক মনোবিজ্ঞান কেবল প্রশ্নমাত্র উত্থাপন করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াই নিরস্ত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বর্ত্তমানকালে যে যে দেশে এই মত সম্বন্ধে সন্দেহবাদ অত্যন্ত প্রবল, সেই সেই দেশেরই বহুসংখ্যক নরনারী ব্যক্তিগত নানাপ্রকার অভিজ্ঞতা দ্বারা পূর্ব্ব জন্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। তাঁহাদের সেইরূপে লব্ধ অভিজ্ঞতা যে অলীক স্বপ্ন নয়, তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য তাঁহারা এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীর প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অস্ত্র প্রয়োগকালে ক্লোরাফরমের ন্যায় সংজ্ঞাপহারক (anæsthetic) পদার্থের আঘ্রাণ গ্রহণে সংজ্ঞাহীন হইয়া প্রথমে এইরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করেন; এবং অপর কেহ কেহ বিশেষ বিশেষ এই জীবনে অননুভূত দৃশ্য ও পদার্থের সংস্পর্শে চিত্তক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ভাবান্তর উপস্থিত হওয়ায়, তাহা হইতে তত্তৎ বিষয়ে প্রথমে পূর্ব্বজন্মগত সম্পর্ক দৃঢ়রূপে অনুভব করেন। তৎপরে মৃত ব্যক্তির সাক্ষ্যে ও দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের (clairvo-yacnes) বর্ণনাসমূহে তাঁহাদের সেই সেই বিশ্বাস আরও দৃঢ়ীভূত হয়। কিন্তু লোকলোচন বহির্ভূত এতাদৃশ গুরুতর বিষয়ের প্রমাণের পক্ষে ইহাই কি যথেষ্ট? সমষ্টিগত বৈশ্বানর চৈতন্য ব্যষ্টিগত জীবচৈতন্যের ক্ষণিক সংযোগ বশতঃ, সময় সময় যে ব্যক্তিগত লৌকিক জ্ঞানের অতীত বিষয় সমূহের উপলব্ধি হইয়া থাকে, সেই সমস্ত অভিজ্ঞতা কি এই শ্রেণীর অন্তর্গত হইতে পারে না? কিন্তু যখন ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ার পরীক্ষিত ফল একই রূপ সিদ্ধ হইতেছে, তখন ইহা যে পূর্ব্বজন্মগত অভিজ্ঞতা নয় তাহাই বা কেমন করিয়া বলা যায়? যাহা হউক, এ সমস্তই পুনর্জ্জন্মবাদের অবান্তর বিষয়মাত্র, ইহার প্রকৃত লক্ষ্য নিরূপণ করিতে সচেষ্ট হওয়াই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

পুনর্জ্জন্মবাদ সম্বন্ধে সচরাচর এই আপত্তি উত্থিত হইয়া থাকে যে, এই জন্মের দুইটী ভালবাসার পাত্রকে অন্য জন্মে পুনর্জ্জন্ম দ্বারা দুই বিভিন্ন অপরিজ্ঞাত স্থানে লইয়া যাইতে পারে, তাহাকে ভালবাসার স্থায়িত্ব ও পরিমাণকে অতি সংকীর্ণ করিয়া ফেলে। আর এই

পার্থিব জীবনের ন্যূনাধিক শতবর্ষই সেই অতৃপ্ত ভালবাসার চরমসীমা বলিয়া অবধারিত হয়। কিন্তু আসঙ্গলিপ্সাই কি ভালবাসার চূড়ান্ত ফল? প্রকৃত ভালবাসা বাহ্য প্রকাশে পর্য্যবেশিত হয় না; উহার মধুর স্পর্শ অন্তরের নিগূঢ় প্রদেশে অনুভবের বিষয়। যেমন বাহ্য সম্বন্ধে বহুদূরে অবস্থান করিয়াও দিনকর করস্পর্শে সরসিস্থ কমলিনী অথবা শশাঙ্ক সন্দর্শনে কুমুদিনী হৃদয়োচ্ছাসে উদ্বেলিত হইয়া ফুটিয়া উঠে; সেইরূপ প্রেমিকযুগল বহু দুর্ভেদ্য আবরণে সমাবৃত হইয়া, বাহ্যভাবে সম্পূর্ণরূপে অপরিজ্ঞাত থাকিয়াও পরস্পর প্রাণে প্রাণে অভিন্নহৃদয়ে অমৃতযোগে প্রতিষ্ঠিত থাকে। কেহ কেহ এই পূর্ব্বজন্মের অভিজ্ঞতাকে পূর্ব্বপুরুষাগত স্মৃতি ও সংস্কার বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু এই সমস্ত অভিজ্ঞতাপূর্ণ কাহিনী, সময় সময় এরূপ প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া প্রতীত হয় যে, তৎসমস্ত কোনক্রমেই পুরুষপরম্পরাগত স্মৃতি বা সংস্কাররূপে গ্রহণ করা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কাহারও কাহারও মতে পুনর্জ্জন্মবাদ, খ্রীষ্টিয়ান্, মুসলমান প্রভৃতির ধর্ম্মমত বিরুদ্ধ। কিন্তু এই সমস্ত ধর্ম্মমতে ত বলা হইয়া থাকে যে, মানসিক ও নৈতিক পূর্ণতা লাভ করাই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য। এখন এই লক্ষ্যে কেমন করিয়া উপস্থিত হওয়া যায়? পুনর্জ্জন্মবাদ অনুসারে বারম্বার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় জন্ম-পরিগ্রহ দ্বারা এই লক্ষ্য-পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়া যায়।

যদি পুনর্জ্জন্মবাদ একটী স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বার বার জন্ম মৃত্যু দ্বারাই কি আমরা জীবনের চরম লক্ষ্য যে মুক্তি, তাহা লাভ করিতে পারিব? এই জন্মমৃত্যুই কি আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত? তাহা হইলে দার্শনিকগণ এই জন্মমৃত্যুরূপ সংসারচক্র হইতে অব্যাহতিকে দুঃখের নিবৃত্তি বলিলেন কেন? আর ঋষি-গণইবা এই ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য কঠোর তপস্যা অবলম্বন করি-লেন কেন? এই জন্মমৃত্যু চক্রের পরিধিতে থাকিয়া বারবার ঘূর্ণায়মান হওয়াই কি পুরুষার্থ? বার বার ভিন্নভিন্ন অবস্থায় জন্মপরিগ্রহ দ্বারা বিষয় জ্ঞানেচ্ছা ক্রমশঃ প্রবলা হইয়া সেই জন্ম-সংখ্যাকে উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি করিতে পারে? ভোগের দিক্ দিয়া দেখিলে তাহারই বা কিরূপে নিবৃত্তি হইবে? পুরাতন ভোগক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমশঃ নূতন নূতন ভোগী লালসা

উৎপত্তি হইয়া জীবকে ত একেবারে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিতে পারে ? আর কর্ম্মের দিক দিয়া দেখিলে পুরাতন কর্ম্মঋণ পরিশোধ করিতে না করিতেই ত জীব অভিনব কর্ম্মঋণে পুনরায় আবদ্ধ হইয়া পড়িতে পারে? সুতরাং ইহাতে ভাবী জীবন ক্রমেই যে জটিল হইতে জটিলতর হইতে থাকে।

পুনর্জ্জন্মবাদ সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যাহা কিছু বলা হইল, তাহা উহার "তটস্থ লক্ষণ" মাত্র। পুনর্জ্জন্মবাদের "স্বরূপ লক্ষণে" দুই প্রকার গতি স্বীকার করা হইয়া থাকে। (১) 'সাধারণ গতি' (২) 'বিশেষ গতি'। যদিও নিরবচ্ছিন্ন সাধারণ গতির দৃষ্টান্ত মানব সমাজে একান্ত বিরল, এখানে ইহা অনেক পরিমাণে "মিশ্রাগতি" রূপে জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে। "সাধারণ গতিতে" ব্যক্তিগত সম্বন্ধে জীবের সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই; পরমেশ্বরের বিধান অনুসারে সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জীবেরও মোক্ষপথে ক্রমবিকাশ হয়, অবশেষে কল্পান্তে সমস্ত বিশ্বের সহিত ভগবানে লীন হয়। এই গতির রূপান্তরই "পিতৃযান"। এই গতিতে চলিতে জীবের অন্তরস্থ স্বরূপ-গত চিদংশ অতি ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশে উন্মুখীন হইতে থাকে। যেমন কোন পর্ব্বত-গাত্রে মৃদু মৃদু উৎস-জল সঞ্চিত হইয়া কালে ঘোর নাদে সেই কঠিন পর্ব্বতগাত্র ভেদ করিয়া প্রবল স্রোতস্বতী রূপে প্রবাহিত হইয়া বহু শুষ্ক ভূমি উর্ব্বরা—বহু তরু লতা সরস করিয়া—বহু জনপদ উপকৃত করিয়া—অবশেষে নিজ গন্তব্য স্থান সাগর-সলিলে মিলিত হয়। সেইরূপ নানা জন্মের নানা অভিজ্ঞতার শুদ্ধসত্ত্ব কারণদেহে তিল তিল করিয়া সঞ্চিত হইয়া এমন এক শক্তির ক্রিয়ারূপে অল্পে অল্পে প্রকাশ পাইতে থাকে যে, সমস্ত অভিজ্ঞতা, সমস্ত ভোগ, সমস্ত কর্ম্ম একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এই শুদ্ধসত্ত্ব স্বরূপতঃ ভগবানেরই চিদংশ বলিয়া তাঁহার দিকেই আকৃষ্ট হয়। কালে ভগবানের কৃপায় সেই শক্তিদ্বারা ধীরে ধীরে সংসার বন্ধনরূপ অজ্ঞানতার কঠিন আবরণ ভাঙ্গিয়া জীবন-নদী মহাবন্যায় উৎপ্লাবিত হইয়া—চারিদিক আনন্দ ও শান্তিতে মগ্ন করিয়া—অনন্ত মহা-সাগরে মিলিত হয়।

"বিশেষ গতিতে" জীবের সাধন-নিষ্ঠার ঐকান্তিকতা প্রকাশ পাইয়া থাকে "দেবযান" এই গতিরই রূপান্তর। কিন্তু এই গতিতে প্রবেশ লাভ করা

বহুতপস্যা ও সর্ব্বোপরি ভগবানের অযাচিত কৃপা সাপেক্ষ। জীব ইচ্ছাকারলেই এই জন্মমৃত্যুর চক্র রোধ করিতে পারে না। যে পর্য্যন্ত কেন্দ্রস্থ হওয়া না যায়, যে পর্য্যন্ত বিশেষ সাধনা অবলম্বন দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ না হয়, ততদিন এই চক্র আবর্ত্তিত হইতেই হইবে। যেমন কর্ম্মাতীত হইবার জন্য প্রয়োজনমত কিছুকাল নিষ্কাম কর্ম্মাভ্যাস করিতে হয়, সেইরূপ আত্মজ্ঞান লাভের জন্য—সমস্ত অবস্থায় নিত্য অখণ্ড অহংজ্ঞান প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাস্ত অহঙ্কারের একত্ব সম্পাদনের জন্য—সর্ব্বশুদ্ধ সর্ব্বগত একরস উপলব্ধির জন্য অধিকার অনুরূপ কয়েক জন্ম যাতায়াত করিতেই হইবে। কিন্তু এই অধিকার কিরূপে লাভ করা যাইতে পারে? বাহ্য দৃষ্টিতে দেখিলে এই ব্যক্তাব্যক্ত বিচিত্র জগতে অনন্ত অভিজ্ঞতা, অপার অগম্য সমুদ্রের ন্যায় নিরন্তর উত্তাল তরঙ্গমালায় বিক্ষোভিত হইতেছে, কে এই সমুদ্রের পরিমাণ করিতে সমর্থ? অত্রিমুণি বহুশত বর্ষের চেষ্টায়ও এ সমুদ্রের পার পাইলেন না। বলাবাহুল্য যে, অহঙ্কার জ্ঞানের ন্যূনাধিক্যে, প্রত্যেক সাধককেই কিছুকালের জন্য এই পরিমাণ নির্ণয়ের বিফল প্রয়াসে চেষ্টা করিয়া অবশেষে নিরস্ত হইতে হয়। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, অনন্ত করুণার আধার ভগবান সংসারতাপক্লিষ্ট জীবের সহজ উদ্ধারের জন্য মঙ্গলময় বিধিরূপে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই জীবন্ত বিধির সংস্পর্শে আসিলে, অতি সহজেই অল্প সময়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের একত্ব উপলব্ধি হয়। যেমন বৃক্ষের মূলে জলসেচন করিলে, মূল, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র ও পুষ্প সকলেই তাহা অতি সহজে প্রাপ্ত হয়; কিম্বা যেমন কৃষক ভূনিম্নস্থ গভীর কূপ হইতে জল উত্তোলন করিয়া নিকটস্থ নিপানে স্থাপন করিবা মাত্র সেই জল নানা প্রকার প্রণালীর মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হইয়া অল্পায়াসেই সমস্ত ক্ষেত্র গুলিকে সিক্ত করে, সেইরূপ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের মূলাধার সেই ভগবানের স্পর্শে জীবনের সমস্ত অভিব্যক্তি পূর্ণ হইয়া যায়। এই পূর্ণত্বে অগ্রসর হইবার জন্য বিশেষ সাধন প্রণালী রহিয়াছে। সেই সমস্ত প্রণালী অবলম্বনে আমাদের ব্যক্তিগত "অহংজ্ঞানকে 'পরিপুষ্ট করিয়া পরে জাতিগত "অহংজ্ঞানে' প্রতিষ্ঠিত করা যায়, আবার সেই জাতীয় "অহংজ্ঞানকে" তদপেক্ষা উচ্চতর জাতীয় "অহংজ্ঞানে' পরিণত করা যায়। এইরূপেই ক্রমশঃ অপরত্ব' হইতে 'পরত্বে' যাইয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে হইতে অবশেষে স্বগত

স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদরহিত একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরব্রহ্ম পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারা যায়, তাহার অনুশীলন হইয়া থাকে। বলাবাহুল্য যে, আত্ম-শক্তিতে নির্ভর করিয়া বহির্দ্বার দিয়া যে এই মার্গে প্রবিষ্ট হইতে চেষ্টা করিবে, তাহার পক্ষে উহা চিরকালের জন্য অর্গল বদ্ধ (Ring pass not)। আর যিনি ভগবানের কৃপালাভ করিয়া আত্মত্যাগ রূপ সুকৃতির বলে অন্তঃপুরের নিগূঢ় দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে আদিষ্ট হইবেন, তাঁহার পক্ষে সমস্ত দ্বার মুক্ত হইয়া যাইবে, তখন তিনি অভ্যন্তর হইতে হর্ষপূর্ণ জয়ধ্বনির সহিত "স্বস্তি স্বস্তি" Be with us" বলিয়া অভ্যর্থিত হইবেন।

এখনে এই প্রবেশ লাভ কি উপায়ে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে? উচ্চ আদর্শ অনুসারে জীবন গঠন এবং সেই আদর্শে নিজের ব্যক্তিগত সর্ব্বস্ব ত্যাগ। রাজা হরিশ্চন্দ্র পৃথিবী দান করিয়া ছিলেন। প্রত্যেক সাধকেরই এক একটী পৃথিবী আছে—তাহা আসক্তির পৃথিবী—অহংকারের পৃথিবী। যিনি সেই পৃথিবীর রাজা তাঁহাকে তাহা দান করিতে হইবে। রাজা হরিশ্চন্দ্র কি জন্য পৃথিবী দান করিতে বাধ্য হইয়া ছিলেন; বিশ্বামিত্র মুনি কর্ত্তৃক আবদ্ধ পঞ্চকন্যার মুক্তি প্রদানের জন্য। বিশ্বের মঙ্গল সাধন উদ্দেশ্যে নিয়োজিত, সাধকের যে পঞ্চইন্দ্রিয়ের কামনা শক্তি এত দিন প্রবৃত্তি মার্গে আবদ্ধ ছিল, আজ তিনি কোন্ সাহসে তাহা মুক্ত করিয়া নিবৃত্তির পথে চালিত করিতেন? এই অপরাধে রাজা হরিশ্চন্দ্রের কি হইয়াছিল? রাজ্য ত্যাগ, স্ত্রী পুত্র ত্যাগ আর মহাশ্মশানের সেবক রূপে নিজকে ত্যাগ। প্রত্যেক সাধকেরই জীবনে একদিন না একদিন এই সৌভাগ্যের উদয় হইবে। এই ত্যাগের অপর নাম ভগবানে আত্ম নিবেদন। নিবেদন ব্যাপার সিদ্ধ হইলে, সমস্ত পদার্থ হইতে ভগবানের যে প্রসন্ন জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়া অন্তর স্পর্শ করে, সেই নৈবিদ্য প্রসাদে জীবন ধারণ করিয়া, তাঁহার ও তদীয় একরসে প্রকাশিত যে জগৎ, তাহার সেবা করাই সাধকের পরম পুরুষার্থ। রাজা হরিশ্চন্দ্র যেমন একাকী মুক্ত না হইয়া সমস্ত রাজ্য সহিত মুক্ত হইয়া, না পৃথিবীতে না স্বর্গে—অন্তরীক্ষে, অবস্থান করিলেন; এই পথে সাধকের ভাগ্যে ও সেইরূপ সমস্ত স্বরাজ্য সহিত মুক্ত হইয়া, না পৃথিবীতে না স্বর্গে—অন্তরীক্ষে, অবস্থান করিতে হইবে। (ক্রমশঃ)

আদর্শ চরিত্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

৫। শিবি

রা। যুধিষ্ঠির মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের নিকট রাজন্য মহাত্ম্য শ্রবণ করিতে অভিলাষ করিলে মার্কণ্ডেয় শিবি চরিত্র বর্ণন করিয়াছিলেন। শিবি রাজার কোন বিশেষ ইতিহাস আমরা দেখিতে পাইনা তবে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বর্ণিত শিবি চরিত্র পাঠে তাঁহাকে আদর্শ মানব বলিয়াই ধারণা হয়। তাঁহার অকপট আত্মোৎসর্গ এবং শরণাগত প্রতিপালনে দৃঢ় নিষ্ঠা দেবতারাও পরীক্ষা করিতে অভিলাষ করিতেন।

দেবর্ষি নারদ কুরুবংশীয় রাজা সুহোত্র এবং শিবি রাজা এই উভয়ের বিবাদ ভঞ্জন করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন "আমার মতে তোমরা উভয়েই উদার স্বভাব; কিন্তু উশীনর শিবি তোমা অপেক্ষা সচ্চরিত্র ও উৎকৃষ্ট" সচরাচর সচ্চরিত্র কথা ব্যবহার করা যায় কিন্তু দেবর্ষি নারদ যাঁহাকে সচ্চরিত্র বলিয়াছেন তাঁহার চরিত্রে কিছু না কিছু বিশেষত্ব আছে। দেবর্ষি বলিয়াছেন "যিনি দেবগণের অনির্ণীত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, যিনি দান দ্বারা কুকর্ম্ম নাশ, ক্ষমা দ্বারা ক্রূর ব্যক্তিরে পরাজয়, সত্য দ্বারা অসত্য বাদীকে পরাভব ও সাধু ব্যবহার দ্বারা অসাধু ব্যক্তিকে তিরস্কার করেন, তিনিই সাধুশীল।" এক্ষনে শিবি রাজা কি অনির্ণীত দেবকার্য্য করিয়াছিলেন অথবা তাঁহার এবম্প্রকার কার্য্য করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা ছিল কি না তাহা দেখা যাউক।

শিবি তাঁহার চরিত্রে যেরূপ উৎকর্ষতা সাধন করিয়াছিলেন তাহাতে দেবগণেরও বোধ হয় ঈর্ষা হইত এবং একদা দেবগণ মানব চরিত্রে এরূপ উৎকর্ষতা সম্ভব কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য ভূতলে অবতীর্ণ হইবার প্রস্তাব করেন। ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতাদিগের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হন।

ইন্দ্র শ্যেনরূপ ধারণ পূর্ব্বক কপোতরূপী অগ্নিকে তাড়না করিলেন। প্রাণ

ভয়ে ভীত কপোত শিবি রাজার সভায় প্রবেশ পূর্ব্বক রাজার ক্রোড় আশ্রয় করিলেন। সভাস্থ পুরোহিত রাজাকে জ্ঞাত করিলেন যে কপোত শ্যেন তাড়িত এবং প্রাণভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু কপোত সহসা এরূপ গাত্রে পতিত হইলে অনিষ্ট সংঘটন হয় সুতরাং তাঁহাকে পরিত্যাগ করা এবং অনিষ্ট প্রতিকারার্থ ব্রাহ্মণকে ধনদান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কপোত রাজাকে সম্বোধন করিয়া জানাইলেন যে তিনি প্রকৃত কপোত নহেন। তিনি স্বাধ্যায় সম্পন্ন ব্রহ্মচারী, তপোনিরত, দান্ত ও নিষ্পাপ এবং প্রতিদিন বেদ পাঠাদি করিয়া থাকেন। এক্ষণে প্রাণভয়ে ভীত হইয়াই তাঁহার গাত্রে নিপতিত হইয়াছেন সুতরাং তাঁহাকে শ্যেনমুখে নিক্ষেপ করা অবিধেয়। ক্ষুধিত শ্যেন রাজাকে কপোত তাঁহার জন্মান্তরীণ পিতা ছিল বলিয়া ভৎসনা করিলেন এবং তাহার আহারের বিঘ্নোৎপাদন করা সম্পূর্ণ অনুচিত তাহা বুঝাইয়া দিলেন। রাজা পক্ষিজাতি এরূপ উৎকৃষ্ট সংস্কৃত বাক্য উচ্চারণে সক্ষম দেখিয়া বিশেষ চিন্তিত হইলেন এবং নানা প্রকার বিচার করিয়া শরণাগতকে শত্রুহস্তে প্রদান করা গর্হিত এবং তাহাতে রাজ্যের ও প্রজাকুলের অনিষ্ট সম্ভব ইত্যাকার বিবেচনা করিয়া শ্যেনকে অন্য মাংস প্রতিশ্রুত হইয়া বলিলেন—"হে শ্যেন! তুমি যে প্রদেশে অবস্থিতি করিয়া প্রীত হও, তথায় গমন কর; শিবিরা তোমার নিমিত্ত সেই স্থানে মাংস বহন করিবে।" শ্যেন তাহাতে অসম্মত হওয়াতে রাজা তাঁহাকে যদ্দারা তাহার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন হয় তাহাই আদেশ করিতে বলিলেন। তখন শ্যেন রাজাকে তাঁহার দক্ষিণ উরু হইতে কপোত পরিমাণ মাংস কর্ত্তন পূর্ব্বক প্রদান করিতে কহিলেন। শিবি তাহাতেই সম্মত হইয়া দক্ষিণ উরু হইতে ক্রমশঃ তাঁহার সর্ব্ব শরীরের মাংস কর্ত্তন করিয়া দেখিলেন যে কপোতের গুরুত্ব কিছুতেই হ্রাস হইল না সুতরাং স্বয়ং তুলায় আরোহণ করিলেন। তখন শ্যেন "এই রাজার কিছুই অপ্রিয় নাই কপোত অনায়াসে রক্ষা পাইল" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। রাজাও কপোতরূপী অগ্নির প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া প্রীত হইলেন।

শিবি শরণাগত প্রতিপালন কিরূপে করিতে হয় তাহা আত্ম চরিত্রে যে শিক্ষা দিয়াছেন তাহা আমাদের ধারণার বহির্ভূত। রাজ্য এবং প্রজা পালনে

প্রকৃত এইরূপ আত্মোৎসর্গ প্রয়োজন। শিবি সামান্ত কপোতকে আশ্রয় প্রদান পূর্ব্বক তাহার রক্ষা করে নিজ অঙ্গচ্ছেদ করিয়া যে বীভৎস এবং কঠোর কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহা আধুনিক জগতে সম্ভব হইতে পারে না কারণ হৃদয়ের এরূপ উচ্চতা এবং প্রশস্ততা গল্প বলিয়া মনে হয় এবং হৃদয়ের এরূপ উচ্চতা ও প্রশস্ততা সম্পাদন করিতে যে অনুশীলন প্রয়োজন তাহা দুরাশা মাত্র। মানব জীবনে কার্য্যব্যপদেশে বাসনার অন্তরালে যাহা আমাদের জীবন পথে পতিত হয় তাহা হইতে ধীরে ধীরে শিক্ষালাভ ও উপযুক্ততা সম্পাদন করাই শ্রেয়॥ (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বিশ্বাস।

পঞ্চীকরণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বেদ বলিয়াছেন—"যাহা কিছু বাক্যের ব্যবহার, যাহা কিছু নামধেয়, সে সমস্তই বিকার, কেবল মৃত্তিকাই সত্য।" বিকার মিথ্যা নহে, স্বরূপের অন্যথা ভাব মাত্র; বিকৃত পদার্থও স্বরূপের অবস্থান্তর মাত্র। এই বিকৃত নাম রূপেরই যাহা কিছু আবির্ভাব ও তিরোভাব; তদ্ভিন্ন স্বরূপ রূপের কোন আবির্ভাব বা তিরোভাব নাই। যেমন ঘট কুম্ভ স্থলী কপাল যাহাই কেন গঠিত কর না, স্বরূপতঃ মৃত্তিকা, মৃত্তিকাই থাকিবে, তাহার অন্যথা হইবে না—কেয়ূর, কুণ্ডল, যাহাই কেন গঠিত করনা,—মূল স্বর্ণ যাহা, তাহা স্বর্ণই থাকিবে, তদ্রূপ এই নানাবিধ নামরূপময় বিচিত্র দ্বৈত জগতে পিতা, মাতা, স্ত্রী, তুমি, আমি, স্থাবর, জঙ্গম কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি যত যাহা নামরূপ দেখিতেছি, এ সমস্তই সেই পরব্রহ্মের মায়া বিকৃত রূপান্তর মাত্র। স্বরূপতঃ এ সমস্তই সেই ব্রহ্মবিভূতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। তবে জীবদেহে এই ব্রহ্মবিভূতি প্রকট নহে, ঈশ্বর দেহে প্রকট, এই মাত্র বিশেষ। তাই বলিতেছিলাম, বিকৃত নামরূপ মিথ্যা বলিয়া স্বরূপ নামরূপ মিথ্যা নহে। সাধনার রাজ্যে ইহাই ব্রহ্মদৃষ্টি।

সমস্ত নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চল ব্রহ্মে পরিনিশ্চিত-তত্ত্ব হইতে

হইবে, কেন না দৃশ্যমান নামরূপ ত্যাগ করিতে হইলেই বিবেকের প্রয়োজন। বিবেক আর কিছুই নহে, বস্তুর স্বরূপ বিবেচনা, নামরূপের মূলতত্ত্ব বিচার করিতে গেলেই পরব্রহ্মে একাগ্র-দৃষ্টি পতিত হইবে—যেমন ঘটের বস্তুতত্ত্ব বিচার করিতে হইলেই মৃত্তিকা লক্ষ্য করিতে হইবে। নামরূপ পরিত্যাগ করিতে হইবে বলিলেই যে ব্রহ্মাণ্ডে নামরূপ আছে, সে ব্রহ্মাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্রহ্মাণ্ড গিয়া বাস করিতে হইবে, একরূপ অর্থ নহে। বিচারের কর্ত্তা তুমি যে ব্রহ্মাণ্ডেই যাও না কেন, তোমার নামরূপ তোমার সঙ্গেই যাইবে—তাই নামরূপ ছাড়িয়া নামরূপের বিচার হইবে না। অন্ধকার না থাকিলে যেমন আলোকের স্বরূপ অবগত হওয়া যাইত না, তদ্রূপ এই নাম রূপাত্মক দ্বৈত ব্রহ্মাণ্ড না থাকিলেও অদ্বৈততত্ত্ব অবগত হওয়া যাইত না, দ্বৈতাদ্বৈত বিচার করিবার কর্ত্তাও কেহ থাকিত না, প্রয়োজন ও হইত না। মৃত্তিকা বুঝিতে হইলেই যে দেশে ঘট কুম্ভ কুম্ভকার কিছু নাই, সেই দেশে গিয়া বুঝিতে হইবে একরূপ নহে। বুদ্ধি থাকিলে ঘট সম্মুখে রাখিয়াই দেখিতে হইবে যে, ইহা স্বরূপতঃ মৃত্তিকা বই আর কিছুই নহে, এইরূপে মৃত্তিকাতত্ত্ব যিনি বুঝিয়াছেন, তিনি ঘট দেখিয়া বিস্মিত হয়েন না. অধিকন্তু মৃত্তিকার বিচিত্র শক্তি দেখিয়া আনন্দিত হয়েন, তদ্রূপ ব্রহ্মতত্ত্ব যিনি বুঝিয়াছেন, তিনি নাম রূপাত্মক এই ব্রহ্মাণ্ড রচনা দেখিয়া বিস্মিত হয়েন না, অধিকন্তু-ব্রহ্মময়ীর অনন্ত শক্তি দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া নামরূপ সকল ভুলিয়া গিয়া প্রতিরূপে সেইরূপ দেখিতে থাকেন, যে রূপে এই বিশ্বরূপ ডুবিয়া গিয়া ব্রহ্ম রূপের আবির্ভাব হয় তুমি আমি ঘট দেখিলেও জ্ঞানী যেমন তাহাকে মৃত্তিকা বই আর কিছুই দেখেন না, তদ্রূপ তুমি আমি স্ত্রী পুত্র পরিবারময় সংসার দেখিলেও সাধক তাহাকে ব্রহ্মময়ীর স্বরূপ বই আর কিছুই দেখেন না। নাম রূপ পরিত্যাগ করিতে হইলে, নামের নামত্ব, রূপের রূপত্ব ভুলিয়া গিয়া কেবল ব্রহ্মেরই স্বরূপ শক্তিতত্ত্ব বুঝিতে হইবে। ইহা যিনি বুঝিয়াছেন, তিনিই নামরূপ ত্যাগ করিয়া নিশ্চল ব্রহ্মে পরিনিশ্চিত-তত্ত্ব হইয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ শর্ম্মা।

বিজ্ঞান, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

দর্শনের বিরোধ আপাততঃ বড়ই দুরূহ বোধ হইলেও বাস্তবিক সেরূপ নহে, সর্ব্ব দর্শনের মূলেই সত্য রহিয়াছে। তবে যে যেভাবে দেখে সে সেই ভাবটীর উপর বিশিষ্টতা স্থাপন করে। প্রমাণ স্বরূপ বৈষ্ণবদর্শনে উক্ত "সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ" ভাবটী বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক। এই সংখ্যায় শ্রদ্ধাস্পদ জানকীবাবু জগৎকে শ্রীকৃষ্ণের রূপে প্রকাশিত দেখিতে বলিয়াছেন। এক্ষণে ঐ সুন্দর সুঠাম রূপই কি ভগবান? বৈষ্ণব দর্শনেও তাই বলেন। কিন্তু ভগবান ঐরূপই হইলে অনেক বিপদ ঘটে। প্রথমতঃ অনেক সাধক সূক্ষ্মভাবে ঐরূপ দর্শন করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্রে উক্ত তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে হৃদয় গ্রন্থি ভেদ বা অহংকারের আত্যন্তিক নাশ কি তাঁহাদের ঘটিয়াছে? সুতরাং রূপই যে ভগবান তাহা বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ দর্শনে আকাঙ্ক্ষা সব নিবৃত্ত হয় যথা, "যল্লব্ধ্বা তৃপ্তো ভবতি" এক্ষণে স্থূলে বা সূক্ষ্মে এই রূপ দর্শনে মনের সমস্ত বৃত্তির কি নিবৃত্তি হয়? তাহা যদি হইত তাহা হইলে রূপ দর্শন মাত্র মিলনেচ্ছারূপ লালসা জাগিত না। তাহা হইলে এমন কি রূপের জ্ঞান পর্যন্ত হইত না। সুধু দর্শন হয় না রূপের জ্ঞানও আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ রূপের জ্ঞান অর্থে যদি হস্তপদাদি অঙ্গ সৌষ্টব বুঝাইত তাহা হইলে ঐ বিশিষ্ট রূপে বিভিন্ন অনন্ত জগৎরূপ মিশিতে পারে না। সুতরাং বলিতে হইবে যে রূপজ্ঞান অর্থে রূপ বুঝায় না। উহাতে এমন এক পদার্থ বুঝায় যাহা সর্ব্বভূতেই এক ভাবে আছে।

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং * * *

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে এই সমভাবে স্থিত একত্ব—এই সর্ব্ব বিশেষভূত সকলে অবিশেষ ভাবে স্থিত পরমেশ্বরকে অবিশেষ বলাতে শ্রীশঙ্কর প্রভৃতি আচার্য্যগণের কি ভয়ানক অপরাধ হইল?

"সর্ব্বস্যচাহং হৃদি সন্নিবিষ্ট"—বলাতে কি এক বিশেষ রূপই বুঝায়?

সুধু রূপ হইলে শব্দময় জগৎ ভগবানে সমন্বিত হয় না। একটী কাঠের বাঁশীতে একজাতীয় শব্দ নিসৃত হয়। তাহা কখন মানবের স্বর বলিয়া মনে হয় না। গরগর বাজে বাঁশী শব্দের ভুবনে। যার মনে যা হৈছে সে তৈছে শুনে। এ বাঁশী কি একটী স্থূল মুরলী। নিতান্ত শৈশবাবস্থায় উপনীত মানব শিশুও একথা স্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু বিশাল সুগভীর শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখ নির্গত বৈষ্ণব শাস্ত্রের আধুনিক পোষকগণ যে আমাদের তাই বিশ্বাস করিতে বলেন ইহাই ঐ শাস্ত্রের বর্ত্তমান অধোগতির পরিচয় দান করিতেছে।

পৌরাণিক কথা।

শ্রীপূর্ণেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, এম, এ, বি, এল্ প্রণীত।

৮৭ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, "অধ্যাত্ম গ্রন্থাবলী প্রচার" কার্য্যালয় হইতে

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

"পুরাণ সাগর-মন্থনে গ্রন্থকার যে অমৃত ও মনিরত্নমালা উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা প্রথমে "পন্থা" পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল, এক্ষণে উহা পরিবর্ত্তিত, ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। পুরাণ ও তন্ত্র এই দুই বিভাগে হিন্দুধর্ম্মের মূল তথ্য সকল প্রচ্ছন্নভাবে রক্ষিত। বেদে যে সকল বিষয় ইঙ্গিতে বর্ণিত, যাহা একদেশমাত্র উপনিষদে-জ্ঞানযোগের ভিতর দিয়া অস্পষ্টভাবে দেখা যায়, সেই সকল নিগূঢ়তম আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক রহস্য গল্পের ভিতর দিয়া পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। নিগম কল্পতরু মধ্যে শ্রীভগবানের লীলাব্যঞ্জক ভাগবত পুরাণ অতি উপাদেয়। এ গ্রন্থে পুরুষ বা Logos তত্ত্ব, অবতাররহস্য, ব্রহ্মার সৃষ্টি প্রিয়ব্রত ও উত্তান পাদের দ্বারা সপ্ত সমুদ্র ও সপ্ত দ্বীপের বিভাগ রহস্য, ভরত রাজার বিবরণ প্রভৃতি বিষয়গুলি অতি সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছে। যাঁহার ছবি লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়া সকলকে চরম লক্ষ্যের পথে লইয়া যাইতেছে; সেই বেদবেদ্য পরমতত্ত্বের লীলামাধুরী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। অনুরাগপূর্ণ, জ্ঞানাগ্নিবিশুদ্ধ হৃদয়ে শ্রীভগবানের অলৌকিক লীলামাহাত্ম্য যেরূপে উদ্ভাসিত হয়, এই পুস্তক পাঠে তাহা জানিতে পারা যায়। রাসপঞ্চাধ্যায়ে "কুরুচির" আতঙ্ক নাই। রাস অভিসার সত্য ও নিত্য। ৺কাত্যায়নী পূজার দ্বারা পরিস্কৃত চিত্তে হ্লাদিনী শক্তির বিকাশে জীবব্রহ্মের যে নিত্য বিহার হয়, রাসলীলা যে সেই অপার্থিব, অলৌকিক সম্মিলন, তাহা ইহাতে বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। বাঙ্গালাভাষায় এরূপ ধর্ম্মস্পর্শী ও নিগূঢ় রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটনকারী, অথচ মধুর ভক্তি রসের অবভাষক, মৌলিক গ্রন্থ দ্বিতীয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মুদ্রাঙ্কণ অতি সুন্দর এবং মূল্যও অতি সামান্য। এই পুস্তক প্রত্যেক হিন্দুর গৃহে একখানি থাকা আবশ্যক।

সুন্দর কাগজে সুন্দর ছাপা ও সুন্দর মলাট আকার ক্রাউন ১৬ পে ৩০৪ পৃষ্ঠায়

১০ ভাগ। } চৈত্র, ১৩১৩ সাল। { ১২শ সংখ্যা।

গঙ্গাস্তোত্র।

গঙ্গে, বিলসিত তরঙ্গভঙ্গে।

চল রঙ্গে মিলিবারে বারিধি সঙ্গে।১।

গঙ্গে, কত রঙ্গে মিল যমুনা সাঙ্গ,

মনলোভা তব শোভা তপনতনয়াভিষঙ্গে।২।

তব তরঙ্গে, মাতর্গঙ্গে,

যেজন মরণ সময়ে,

ভাবিয়ে তব চরণ অভয়ে

নিজ হৃদয়ে,

সমর্পয় সদয়ে, কলুষ কলঙ্কিত অঙ্গে,

সুরাঙ্গনাগণ সেবিত সেজন,

সেজন মরণপরে,

অচিরে চলে অমরনগরে

বিহরে সুরেন্দ্র সঙ্গে,
তব তরঙ্গে, মাতর্গঙ্গে,
ত্যজে কলেবর যে জন রঙ্গে ।৩।
ধূর্জ্জটিজটজালে, গিরিরালে!
বস সদা, সুখদা মনরঙ্গে, মাতর্গঙ্গে,
মোহিত বিজিতানঙ্গে ।৪।
গঙ্গে, দুর্জ্জয় চলজল ভঙ্গে
মর্দ্দিত মত্তমাতঙ্গে।
কণ পরিমাণে ভ্রম কৃতপাসনে
ভববারি ভববারী
ভীষণ শমন ভয়বারে;
তারে ভবপারে,
লয় দিব্যপথে, করি দিব্যরথে!
তব জলকণা অতুলন শুভদানে।
জল মহিমা কে জানে! ৫।
সিতবরণে, আশ্রিতজনগণ শরণে!
তব শান্ত সুশীতল কমল সুকোমল
শুভময় অভয় চরণে
যদি রহে নিত চিত মা।
অয়ি অভয়ে, বিরহিত-উপমা,
ডরিনা মরণে, ডরিনা জননে,
বারবার ভব ভবনে।
তব অভয় চরণ স্মরণে,
তব অতুল সগুণ কথনে,
নাহি রহে ভয় ভীষণ শমনে,
অয়ি ভয় হারিণি হর রমণে ॥৬॥
জননী, সুতদুখহরণী তুমি গঙ্গে।
দিও মা দীনহীন তব তনয়ে

আশ্রয় শুভময় চরণে অভয়ে !
অতিকাতর, তব কিঙ্কর,
শঙ্করি ! তব উৎসঙ্গে—
স্থান দিও অয়ি দেবি দয়াময়ি !
কলুষকলঙ্কিত কৃতান্ত শঙ্কিত,
অধীন অধমে, মম চরমে
পতিতোদ্ধারিনি গঙ্গে,
শ্রান্তিহর, শান্তিকর তব উৎসঙ্গে।৭।
ত্রিপথগে, মাতর্গঙ্গে,
তব কথা প্রসঙ্গে,
স্নানে তব নির্ম্মলতরঙ্গে,
কলিমল তিলেক না রয় অঙ্গে।৮।
সুরধুনি মুনিকন্তে, পুণ্যে, অতি ধন্তে,
দুর্গম জগদরণ্যে গতিহীনে বিপন্নে
পথ নির্দ্দেশয় দীন শরণ্যে ;
সুরনরবন্দিনি গিরিবর নন্দিনি
দেবীগণাগ্রগণ্যে, মা বরেণ্যে ! ৯।
ঋষিকুল অর্পিত কুশফুলমালে
শোভিত শুভজন তব গিরিবালে,
স্রোতস্বতি সুবিশালে,
জীবজড়িত ভবজালে
মুক্তি লভে, অয়ি ভক্তিবিধায়িনি,
তব জল পরশে কলুষ কবালে।১০।
অমরনগরতরঙ্গিনী, মা মন্দাকিনী !
দেবানন্দ বিধায়িণী !
অভিনব যৌবনশীলা
সুর ললনাকুল জললীলা
বিগলিত, বিকশিত হরি চন্দন চর্চ্চিত,

পারিজাত মন্দারে, সুন্দর ফুল হাস্যে
শোভিত তব জল, দোলিত পবনে,
করে বিনোদিত সুরপুর রমণী;
দেবি দ্রবময়ি পুরহরঘরনি ॥১১॥
ভোগবতী পাতালে
মাতা তলবাহিনি সুবিশালে।
নাগাঙ্গনাগণ বন্দিত চরণে,
নন্দিত নাগকুল শরণে
ত্রিগুণে, ত্রিপথগে, গিরিবালে;
ত্রিতাপবারিনি জয় নিস্তারিনি,
মাতা ভোগবতী পাতালে।
বিমল মনীমনমানস কুরুমম
কলিমল বারিনি, মা গিরিবালে;
চন্দ্রমৌলিশিরচারিনি, চপলে,
ধৃত-চন্দ্র-করোজ্জ্বল তরঙ্গমালে,
অবভবভাবিনি, অব গিরিবালে ॥১২॥

মহিম্ন স্তব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

নমো নেদিষ্ঠায় প্রিয়দব দবিষ্ঠায় চ নমো
নমঃ ক্ষোদিষ্ঠায় স্মরহর মহিষ্ঠায় চ নমঃ।
নমো বর্ষিষ্ঠায় ত্রিনয়ন যবিষ্ঠায় চ নমো
নমঃ সর্ব্বস্মৈতে তদিদমিতি সর্ব্বায় চ নমঃ ॥২৯॥

সম্প্রতীশ্বরস্য সর্ব্বাত্মকত্বং সর্ব্ব ব্যাপিতঞ্চ ধ্যাত্বা নমস্করোতি। নম ইতি। তত্র প্রথমতোঽনিতস্য সংসারস্যা সারতা দর্শনং, ততো বৈরাগ্যং ততশ্চা-নিয়তেশ্বরধ্যাসায় তপোধনাশ্রয় শ্চৈতদবাস্থা ত্রয়ং তদধীনমেবেতি বোধনায় বিপরীতক্রমেণ প্রিয়দবেত্যাদিভি স্ত্রিভির্বিশেষণৈঃ সংবোধনম্। হে ত্রিনয়ন

ত্রিভি সূর্য্যচন্দ্রমাগ্নিরূপৈ রাত্মানং নয়তি প্রাপয়তি বোধয়তীতি, যদ্বা ত্রিভি সূর্য্যাগ্নি চন্দ্রৈর্নীয়তে অনুমীয়তেঽসাবিতি, যদ্বা ত্রীণি সূর্য্যচন্দ্রাগ্নি রূপানি নয়নানি লৌকিক জ্ঞানসাধনানি যস্মিন্ স্তং সংবোধনম্। এতেন সংসারস্থানিত্যতা দর্শনম্ ত্বদধীনমেবেতি সূচিতম্। হে স্মরহর কাম নাশন, স্মরঃ ভোগ্য বস্তুনো নিরন্তর স্মরণং হেতুভূতাতিশয়িত বিষয়-কামনেত্যর্থঃ তং হরতি নাশয়তীতি তৎ সংবোধনম্। এতেন বিষয় বৈরাগ্যং ত্বদধীন মেবেতি সূচিতম্। হে প্রিয়দব, প্রিয়দব, প্রিয়ঃ দবো বনং তপো-বনমিতি যাবৎ যস্য তৎ সংবোধনম্। সর্ব্বব্যাপিনোঽপি সর্ব্বত্র সমদর্শন-স্যাপীশ্বরস্য শান্তিরসাস্পদে তপোবনে সান্নিধ্য লক্ষণং নিরন্তর গ্রামনগরাদি দর্শনালসমানসৈঃ সুখেনানুভাব্যমিতো তৎ প্রসিদ্ধম্। তত্র চ লোক শিক্ষার্থৈ মহাযোগিরূপেণেশ্বরেণ ত্বয়ৈব যোগসাধনভূতং বনাশ্রয়ণং কৃতম্ অতস্ত্বাচ্ছিক্ষাধীনমেব লোকানাং তপোবনাশ্রয়ণমিতি তৎ সংবোধনম্। সর্ব্বাত্মকত্বং সর্ব্বব্যাপিতঞ্চ দর্শয়তি। নেদিষ্ঠায় অন্তিকতমায় অন্তঃ স্থায়েত্যর্থ তুভ্যং নমঃ। অন্তিক শব্দস্য নেদাদেশঃ। দবিষ্ঠায় দূরতমায় জ্ঞানা-তীত প্রদেশস্থায় তুভ্যং নমঃ। দূর শব্দস্য দবাদেশঃ। তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে চ তদন্তিকে। তদু সর্ব্বস্য মধ্যোঽস্তঃ তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যত ইতি শ্রুতেঃ। ক্ষোদিষ্ঠায় ক্ষুদ্রতমায় অনোরণীয়স ইত্যর্থ তুভ্যং নমঃ। ক্ষুদ্র শব্দস্য ক্ষোদাদেশঃ। মহিষ্ঠায় মহতোঽপি মহীয়সে অনন্তরূপায়েত্যর্থঃ তুভ্যং নমঃ। মহৎ শব্দস্য মহাদেশঃ। অণোরণীয়ো মহতো মহত্তমমিতি শ্রুতেঃ। বর্ষিষ্ঠায়, বৃদ্ধতমায় পিতৃণামপি পিত্রে সর্ব্বলোকপিতামহায় আদিভূতায়েত্যর্থঃ তুভ্যং নমঃ। বৃদ্ধ শব্দস্য বর্ষাদেশঃ। যবিষ্ঠায় যুবতমায় নিমিষকাশদস্যল্পকালনভূতায় তুভ্যং নমঃ। যুবন্ শব্দস্য যবাদেশঃ। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভি সংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্মেতি শ্রুতে ব্রহ্মণঃ সর্ব্বভূত কারণত্বাদ বৃদ্ধ তমত্বং সর্ব্বভূত ময়ত্বাচ্চ যবিষ্ঠত্বমিতি ধ্যেবেদ্ধব্যম্। তৎ অপ্রত্যক্ষমিত্যর্থঃ ইতি এবং রূপায় পরস্পর বিরুদ্ধাবিরুদ্ধরূপায় প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষরূপায় সর্ব্বস্মৈ নিখিলরূপায় তুভ্যং নমঃ। সর্ব্বতি ব্যাপ্নোতি বিশ্বমিতি সর্ব্বস্তস্মৈ সর্ব্বায় বিশ্বং ব্যাপ্নবতে একস্মৈ বিষ্ণুরূপায়েত্যর্থঃ তুভ্যং নমঃ। নমাসীত্যের্থঃ। তদিতি

ইদমিতি চাব্যয় যোগে চেবতি প্রথমা। তুভ্যমিতি সর্ব্বত্র নমঃ স্বস্তীত্যাদিনা চতুর্থী। দীপাকালঙ্কারঃ। ২৯।

তুমি সর্ব্বাপেক্ষা সমীপবর্ত্তী হইয়া আছ, তোমাকে নমস্কার। তুমি সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী হইয়া আছ তোমাকে নমস্কার। তুমি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম হইয়া রহিয়াছ তোমাকে নমস্কার। তুমি সর্ব্বাপেক্ষা মহত্তম হইয়া রহিয়াছ তোমাকে নমস্কার। তুমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বয়স্ক, তোমাকে নমস্কার। তুমি সর্ব্বাপেক্ষা অল্প বয়স্ক তোমাকে নমস্কার। এই প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ যাহা কিছু সকলই তুমি তোমাকে নমস্কার। বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থিত এক মাত্র তুমি তোমাকে নমস্কার। ২৯।

বহুল রজসে বিশ্বোৎপত্তৌ ভবায় নমোনমঃ,
জনসুখকৃতে সত্ত্বোদ্রিক্তৌ মৃড়ায় নমোনমঃ।
প্রবল তমসে তৎসংহার হরায় নমোনমঃ
প্রমহসি পদে নিস্ত্রৈগুণ্যে শিবায় নমোনমঃ॥ ৩০॥

পুনরপি পরমেশ্বরস্য সগুণত্বং নির্গুণত্বঞ্চোক্ত্বা নমস্করোতি। বহুলেতি। বিশ্বোৎপত্তৌ বিশ্বস্য উৎপত্তৌ বিশ্বরূপেণ বোৎপত্তৌ আবির্ভাব বিষয়ে বিশ্বোৎপাদন কার্য্যে ইত্যর্থঃ। বহুলং সত্ত্বতমোভ্যামধিকং রজঃ রজোগুণো যস্মিং স্তথোক্তায় ভবতি বিশ্বরূপো ভবতীতি ভবত্যস্মাদিতি বা তস্মৈ ভবায় বিধাতৃরূপায় ব্রহ্মণে তুভ্যং নমো নমঃ। পুনঃ পুনর্ণমামিতি দ্বিরুক্তিঃ। সত্ত্বস্য সত্ত্ব গুণস্য উদ্রিক্তৌ রজস্তমোভ্যামাধিক্যেন সত্ত্বগুণ প্রকাশে তেন চ সত্ত্বিক গুণানাং দয়াদীনাং প্রদর্শন বিষয়ে ইতি ভাবঃ, জনানাং সুখং করোতিতি জনসুখকৃৎ। কৃধাতো ক্বিপ্। তস্মৈ তথোক্তায় লোকহিত করায়েত্যর্থঃ মৃড়য়তি সুখয়তি লোকানিতি মৃড়স্তস্মৈ লোকপালকায় বিষ্ণুরূপায় তুভ্যমিতি শেষঃ নমো নমঃ। পূর্ব্ববদ্দ্বির্ভাবঃ। (পুন) স্তস্য বিশ্বস্য সংহারে আত্মনি প্রত্যবহার বিষয়ে প্রবলং সত্ত্বরজো-ভ্যামধিকং তমঃ যস্মিং স্তথোক্তায়। হরতি বিশ্বমাত্মনীতি হরস্তস্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ। প্রমহসি সর্ব্বশ্রেষ্ঠে মহধাতোরসুন্। পরাৎপরো যদুক্তং ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ মনসশ্চ পরাবুদ্ধি বুদ্ধেরাত্মা মহাংস্ততঃ। মহতঃ পরমব্যক্তং বক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা

সা পরাগতি রিতি, মনুসংহিতায়াং, তথা ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্য পরং মনঃ। মনসস্তু পরাবুদ্ধি র্যোবুদ্ধে পরতস্তু স ইতি ভগবদগীতায়াং মমুক্তে আত্মা অহঙ্কার মহান্ হিরণ্যগর্ভঃ। নিস্ত্রৈগুণ্যে নাস্তি ত্রয়ানাং গুণানাং স্বত্বরজস্তমসাং ভাব আবির্ভাব যস্মিন্ তথোক্তে। গুণানামপ্রকাশাবস্থা হীশ্বরস্য মূলাপ্রকৃতি তাদৃশয়া প্রকৃত্যা সমন্বিতং গুণাতীতঞ্চ পদং বস্তু ব্রহ্ম শব্দেনোচ্যতে। তৎপদমেব পদং ত্রাণ স্থানং মুমুক্ষুণামাশ্রয় ইতি যাবৎ তস্মিন্ নিস্ত্রৈগুণ্যে পদে মুমুক্ষেভ্য আশ্রয়দানে ইত্যর্থঃ শিবায় অশিবনাসকায় নিঃশ্রেয়সে তুভ্যং নমো নমঃ। পদং ব্যবসিত ত্রাণ স্থান লক্ষ্যাঙ্ঘ্রি, বস্তুষ্টিতামরঃ। ।৩০।

সৃষ্টি করিতে তুমি রজোগুণপ্রধান বিধাতা তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার; পালন করিতে তুমি স্বত্বগুণ প্রধান মৃড় তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। আবার তাহার সংহার করিতে তুমি তমো প্রধান হর তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। সকল শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ পূর্ব্বোক্ত গুণত্রয়ের অতীত পরমাশ্রয় মোক্ষধাম শিব তুমি, তোমাকে, পুনঃ পুনঃ নমস্কার। ৩০।

কৃশ পরিণতি চেতঃ ক্লেশবশ্যং ক্কচেদং
ক্ক চ তব গুণসীমো মোল্লঙ্ঘিনী শশ্বদৃদ্ধিঃ।
ইতি চকিত সমন্দীকৃত্য মাং ভক্তি রাধা
ৎবরদ চরণয়োস্তে বাক্যপুষ্প হারম্॥ ৩১।—

কৃশেতি। হে বরদ কৃশা অল্পা পরিণতি পরিপাকো যস্য তথোক্তং স্মৃত্যা বুদ্ধ্যা চ অনুন্নতং স্মৃতিহীনং বুদ্ধিহীনঞ্চেতি যাবং অন্যথা কথমহং তবাদেশং বিস্মরেবং কথং বা পুষ্পহরণে প্রবর্ত্তেয়েত্যর্থঃ তথা ক্লেশবশ্যং প্রকৃত্যা কষ্টাধীনং অতি দুর্ব্বলমিত্যর্থঃ অপিচ সম্প্রতি কারাবন্ধন যন্ত্রণায়া অস্থিরং ইদং মম চিত্ত মনশ্চ ক্ক কুত্রঃ শশ্বং নিরন্তরং গুণানাং অস্মদ বিদিতানাং সীমা নমুল্লঙ্ঘয়তি যা সা তথোক্তা গুণানাং চরমোৎকর্ষমস্যতীত্য বর্ত্তমানেত্যর্থঃ তব ধাদ্ধি ঐশ্বর্য্যঞ্চ ক্ক কুত্র, ক্ষুদ্রমেতদস্মদীয়ং চেত উত্তরোত্তরং যদেব পরমোৎকর্ষতয়া বেত্তি তব ঐশ্বর্য্যং অনন্তাৎ তদপ্যতিক্রম্য বর্ত্ততে অতো অদীয়েনৈত চিত্তেন ত্বদীয়ৈশ্চর্য্য জ্ঞানং সর্ব্বথৈবাসম্ভবমেতি অজ্ঞে অযোজ্ঞে ময়ি ক্রোধোহনুচিত এবেতি ভাবঃ ক্ক হয় মনস্তরস্ব ব্যঞ্জনাদয়োগ্যতা

সূচকম্। ইতি অস্মাং তবাপরিমেয়ত্ব দর্শনামিত্যর্থঃ চকিতং তব স্তব প্রবৃত্তোঽপি মন্দবুদ্ধিত্বাত্ত্বা মবজানামীতি ভয় বিহ্বলং মূঢ়ং মাং (কিম্ম) ভক্তি স্তয়ি অনুরক্তি (কর্ত্তৃ) অমন্দাকৃত্য মাং মোহাৎ মোচায় অস্ফুট বচসোঽপাস্তদপ্ত কুলিতস্ত শিশোরিব মে বিস্মৃত কৃত কলুষমবজ্ঞায় প্রেম কৃত নিরর্থমপি বচনং ত্বং পিতৃবৎ সম্যকত্বেন গৃহ্লাসীত্যেবং বুদ্ধি কৃদ্ ভক্তি র্মে ভয়ং মপনীয় সাহসাক্ষোৎপাদত্যর্থঃ তে চরণয়োঃ পূজা মহিম্নঃ স্বাপকৃষ্টত্ব সূচনায়েদং পদং শিষ্টপ্রয়োগ র্যেতৎ। তবোদ্দেশে ইত্যর্থঃ উপস্থিয়ত ইত্যুপহারঃ বাক্য পুষ্পাণ্যেব উপহারঃ বলিঃ তং আধাৎ অর্পিতবতী। দেবেষু পুষ্পোপহারস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ বাক্যাণাঞ্চ পবিত্রত্বাৎ প্রীতিকরত্বাচ্চ পুষ্প সাদৃশ্যম্ ॥৩১॥

স্বভাবতঃ শক্তিহীন ক্লেশ পরবশ চিত্তই বা কোথায়, আর গুণসীমা অতিক্রান্ত তদীয় অনন্ত ঐশ্বর্য্যই বা কোথায় ? আমার কিবা দোষ না সম্ভব হয়, আর তুমিই বা কিনা করিতে পার ? এই দেখিয়া আমি ভয়ে বিমূঢ় হইলে অর্থাৎ এতাদৃশ হীন চিত্তদ্বারা তোমার গুণ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়াও কেবল তোমার অপমানই করিতেছি ইহা বুঝিতে পারিয়া আমি ভয় বিহ্বল হইলে কেবল একমাত্র ভক্তিই আমাকে সাহস দিতেছে। এই ভক্তিই আমাকে তোমার চরণে এই বাক্য পুষ্পের উপহার দেওয়াইতেছে প্রভু! দীন ভক্তের সামান্য উপহারও ত তুমি সাদরে লইয়া থাক। পিতঃ আমার এই অস্ফুট বাক্য ভক্তির ব্যাকুলতা কি তুমি বুঝিতেছ না ? একাত্মতা কি তোমার স্নেহ আকর্ষণ করিবে না ॥৩১॥

অসিত গিরি সমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রং
সুরতরু বরশাখা লেখনী পত্র মুর্ব্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্ব্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পরং ন যাতি ॥৩২॥

হে ঈশ, সর্ব্বশক্তি নিধান, যদি অসিতগিরিসমং নীলাচল পরিমাণং কজ্জলং মসীসিন্ধুসাগরপাত্রং আধারো যস্য তথা ভূতং স্যাৎ, যদি সাগর মস্যাধারঃ তজ্জলে চ নীলাচল পরিমাণ কজ্জলে মসীকৃত্যা স্যাদিত্যর্থঃ। অশেষত্বাৎ সিন্ধু গ্রহণং যদি সুরতরুণাং দেবতরুণাং বরঃ শ্রেষ্ঠঃ কল্পবৃক্ষ ইত্যর্থঃ। পঞ্চৈতে দেব তরবো মন্দার পারিজাতকঃ। সন্তানঃ কল্পবৃক্ষশ্চ

পুংসিবা হরিচন্দন মিত্যমরঃ। তস্য শাখা লেখনী লেখ্য সাধন শলাকাস্যাৎ। কল্পনা মাত্রোদয়াৎ লেখনীনং খ্যাতামনন্তত্ব দ্যোতনার্থং কল্প বৃক্ষ গ্রহণম্। তস্য শাখা উর্ব্বী বিশাল পৃথ্বী যদি পত্রং লেখ্য পত্রং স্যাৎ সারদা স্বয়ং ভগবতী বাগ্দেবী যদি সর্ব্বং কালং নিত্যং কালং তদায়ুঃ পরিমিতং ব্রহ্মবর্ষশতং সমস্তং বা। ব্রহ্মণো দিন পরিমাণন্তু সহস্রং চতুর্যুগানি চতুর্থ্যা সহস্রাণি ব্রহ্মণো দিন মুচ্যতে ইতি মনুঃ। এতৎ পরিনৈতি স্থিংশদ্দিনৈ র্মাসঃ। তাদৃসাদ্বাদশ মাসৈশ্চ বৎসরঃ। তাদৃশোণং বৎসরাণাং শতং ব্রহ্মণঃ পরমায়ুঃ। তৎকালং গৃহীত্ব। আশ্রিত্য ব্যাপ্যেতি যাবৎ লিখতি, তদপি তথাপি সা দেবী তব গুণানাং পারমন্ত- ন যাতি ন প্রাপ্নোতি স্বয়ং বাগ্দেবা মহতা স্বজীবন কালেনাপি এতদৃশৈরস্যা পাদানৈ স্তব গুণানাং সমাগ্ বানিং কর্ত্তুং ন শক্নোতি তেষামনন্তত্বাৎ সন্বিধানা মনুষ্যাণাং কথা তু দূরে আস্তামিতি ভাবঃ ॥৩২॥

যদি নীলাচল পরিমাণ কজ্জল গুলিয়া সিন্ধু পাত্রে রাখা যায়, যদি কল্প বৃক্ষের কল্পনা মাত্রোদিত অসংখ্য শাখা লেখনী হয়, যদি স্বয়ং বাগ্দেবী ঐ সকল উপাদান লইয়া চিরকাল ব্যাপিয়া লেখেন, তথাপি তোমার গুণ লিখিয়া শেষ করিতে পারেন না ॥৩২॥

কুসুমদশননামা সর্ব্ব গন্ধর্ব্বরাজঃ,
শিশু শশধর মৌলেদ্দেব দেবস্যদাসঃ।
স খলু নিজ মহিম্নো ভ্রষ্ট এবাস্য রোষাৎ
স্তবনমিদ মকার্ষীদ্দিব্য দিব্যং মহিম্নঃ ॥৩৩॥

সম্প্রতি প্রচারক পুষ্পদন্তাবলম্বিতেনৈব ছন্দসাবাভ্যাং শ্লোকাভ্যাং স্তোতৃ স্তুৎ কৃৎ স্তুতে চ মহিমানং বর্ণয়ন্নুপ সংহরতি। কুসুমেতি। কুসুম দশনঃ পুষ্প দন্তঃ নাম যস্য স তথোক্ত সর্ব্বেষাং গন্ধর্ব্বাণাং রাজা প্রধানঃ। রাজাহঃ সখিভ্যষ্টিতি টচ্ প্রত্যয়ঃ। কশ্চিৎ গন্ধর্ব্ব প্রধানঃ শিশুশ্চাসৌ শশধরশ্চেতি স মৌলৌ শিরসি যস্য তথা ভূতস্য চন্দ্রার্দ্ধ শেখর স্বেতর্থঃ দেবানাং দেবস্য দেবানামপি পূজ্যস্বেত্যর্থঃ মহাদেবস্য দাসঃ সেবকঃ অস্মাদিতি শেষঃ। স খলু খল্বিতি দৈববশাদ্বৃত্তে। অস্যৈব মহাদেবস্য রোষাদ্ রাহু রাজোদ্যানে পুষ্প হরণকালে তদাদেশ লঙ্ঘনজনিত ক্রোধাৎ নিজঃ স্বকীয়ো যো মহিমা। ততো ভ্রষ্টশ্চ্যুতঃ শূন্যমার্গ গমনশক্তি রহিতো রাহুরাজ কারাকদ্ধশ্চ সান্নিত্যর্থঃ

মুক্ত্যাশয়া মহিম্ন ঐশ্বর্য্যস্য ঈশ্বরভাবস্যেত্যর্থং ইদং পূর্ব্বোক্তং দিব্যদিব্যং দিব্যাৎ দিব্যং অতি মনোহর মিত্যর্থঃ আতিশয্যে দ্বিভাব। স্তবনং স্তবং আকর্ষী অকরোৎ ॥৩৩॥

পুষ্পদন্ত নামক এক গন্ধর্ব্বপতি মহাদেবের সেবক ছিলেন, মহাত্মা লুপ্ত হওয়ায় তিনি প্রভুর পুনঃ প্রসন্নতা লাভের জন্য নিম্ন লিখিত মহিম্নস্তব রচনা করিয়াছেন ॥৩৩॥

সুরবরমপি পূজ্যস্বর্গমোক্ষৈক হেতুং
পঠতি যদি মনুষ্য প্রাঞ্জলির্ণান্য চেতাঃ।
ব্রজতি শিব সমীপং কিন্নরৈস্তূয়মানঃ
স্তবন মিদমমোঘং পুষ্পদন্তপ্রণীতম্ ॥৩৪॥

সুরবরমিতি। মনুষ্যো মানবঃ যদি সু সুখম অর্জ্জতে। ইতি স্বর্গঃ তস্য পুরাণাদিবর্ণিতস্য। স্বর্গভোগস্য মোক্ষস্য মুক্তৌ।

অদ্বিতীয়ঃ হেতু স্তং তথোক্তং সুরবরং দেবদেবং মহাদেব মিত্যর্থঃ। যথাবিধান মর্চ্চয়িত্বা।

প্রাঞ্জলি কৃতাঞ্জলিঃ ন অন্যস্মিনং বিষয়ে চেতঃ চিত্তং। অনন্যমানস সন্

পুষ্পদন্ত প্রণীতং অমোঘং অব্যর্থং ইদং স্তবনং স্তোত্রং পঠতি উচ্চারয়তি তদা স মনুষ্য কিন্নরৈঃ কিম্পুরুষৈঃ স্তূয়মানং সন্ শিবসমীপং মহাদেব সান্নিধ্যং মহাদেব সাদৃশ্যমিত্যর্থঃ ব্রজতি গচ্ছতি। মানুষ-পরিহার কিমপি সুখ।

দুঃখেতরং নির্গুণমাস্পদং ব্রহ্মানন্দং বা প্রাপ্নোতীতি নিরঞ্জনঃ পরমং সান্নিধ্য মহাদেব সাম্যমতীতি শ্রুতেঃ ॥৩৪॥

লোক যদি স্বর্গ মোক্ষের অদ্বিতীয় হেতু মহাদেবের যথা বিহিত পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে অনন্যমনা হইয়া পুষ্পদন্ত প্রণীত এই অব্যর্থ স্তোত্র পাঠ করে তাহা হইলে সে মনুষ্যত্ব পরিহার করিয়া কিন্নরগণের প্রসংশা সহকারে মহাদেবের সদৃশ নির্গুণ অবস্থা প্রাপ্ত হয় ॥৩৪॥

৺ প্যারীমোহন সেন গুপ্ত।

সমাপ্ত।

আর্হত দর্শন

বা

জৈন দর্শন।

আর্হতদিগের মধ্যে নানাপ্রকার মত দৃষ্ট হয়। তাহাদের মধ্যে এক সম্প্রদায় আছে, তাহার নাম জৈন। জৈনগণ জিনোক্ত তত্ত্বের অনুবর্ত্তী হইয়া চলেন।

তিব্বতীয় অধ্যাত্মবিদ্যা দুই অংশে বিভক্ত, এক অংশের নাম বুদ্ধ দর্শন, ও অপর অংশের নাম আর্হত দর্শন। ম্যাডাম্ ব্লাভাট্স্কীর মতে ক্যাল্ডি-তিব্বতীয় (Chaldae Tibetan) অধ্যাত্মবিদ্যা দুই ভাগে বিভক্ত, (১) তিব্বতীয় লামাদিগের মত (২) আর্হতদিগের মত। বুদ্ধ দর্শনে আর্হতগণ আরহত বা রহত কথিত হইয়া থাকেন। হিমালয় প্রদেশের বা তিব্বতদেশের সম্প্রদায় আর্হত নামে পরিচিত। তিব্বতীয়গণ তাঁহাদিগের অধ্যাত্মবিদ্যা যে ভারতবাসী ঋষিদিগের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন; কিম্বা প্রাচীন আর্য্যগণ তাঁহাদিগের গুপ্তবিদ্যা (উপনিষৎ) যে তিব্বতীয় মহাত্মগণের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন, অথবা উভয়েই এক সাধারণ উৎপত্তি স্থান হইতে স্বীয় স্বীয় অধ্যাত্মবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন, এই সম্বন্ধে কোন সঠিক সংবাদ জানা যায় না। হিন্দুদর্শন বৌদ্ধগণকে নাস্তিক বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন; কেন না, বৌদ্ধগণ বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার করেন না। জৈন পণ্ডিতগণ আবার বেদ ও ব্রাহ্মণ, সংহিতা, রাক্ষস ও দৈত্যগণের সৃষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন।

ম্যাডাম্ ব্লাভাট্স্কী বলেন যে সর্ব্বত্রই এই জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, যে তিব্বতের মানস-সরোবর নামক হ্রদ হইতে বেদ উদ্ধার হইয়াছে এবং আর্য্যগণ অতি দূরবর্ত্তী উদীচ্য দেশ হইতে আগমন করিয়াছেন। তিব্বতের আদিমবাসিগণের ও ক্যাল্ডিয়া (ব্যাবিলোনীয়া), তুরাণী ও আসিরীয়াবাসীদিগের আচার ও ধর্ম্ম বিশ্বাসের সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। সে যাহা হউক, হিমালয়ের পরপারবর্ত্তী দেশের অধ্যাত্মবিদ্যা ক্যালডি-তিব্বতীয় নামে-

পরিচিত ; তিব্বতদেশীয় অধ্যাত্মবিদ্যা আর্হতদর্শন ও বুদ্ধদর্শন নামে পরিচিত, এবং ভারতীয় আর্য্যদর্শন হিন্দুদর্শন নামে পরিচিত।

বুদ্ধ বলেন যে কোন সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর নাই, এবং কোন অদ্বিতীয় ব্রহ্মও নাই। যদি জ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্ম স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে প্রভূত ক্ষমতাশালী অসুরও স্বীকার করিতে হয়। জ্ঞান বলিলেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে সম্বন্ধ আসিয়া পড়ে। সম্বন্ধ স্বীকার করিলেই অদ্বৈত সত্তা থাকে না, দ্বৈত সত্তা স্বীকৃত হইয়া পড়ে। "তৎসৎ"—সেই একমাত্র অদ্বৈত সত্তা হয় মুক্ত, না হয় বদ্ধ। যদি মুক্ত ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে একমেবাদ্বিতীয়ং এ সম্বন্ধ রহিত, সুতরাং জ্ঞান সম্বন্ধ রহিত। (পাঠকগণ! এই স্থানে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রীয় ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ বাক্য স্মরণ করিবেন)। যদি বদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে সীমাবদ্ধ সত্তা একমেবাদ্বিতীয়ং হইতে পারে না। এই সসীমত্ব স্বীকার করিলেই এই বিশ্বের পাপতাপের জনয়িতা প্রভূত ক্ষমতাশালী অপর এক সত্তা বা অসুরকে স্বীকার করিতে হইবে। এই কারণে আর্হতদর্শন "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" স্বীকার না করিয়া এক অদ্বিতীয়, নিত্য, অক্ষর, অজ, শাশ্বত সত্তার "অজ্ঞানাবস্থা" (unconsciousness) স্বীকার করেন। এই অজ্ঞান-সত্তা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, নিত্যকাল স্থায়ী, ঈশ্বর, দেবগণ বা অপর কোন সত্তা বাঁচুক বা মরুক, তাহাতে সেই অজ্ঞান সত্তার ধ্বংস হয় না। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব থাকুক বা ধ্বংস হউক, মহাপ্রলয় হউক বা যাহাই কেন ঘটুক না, সেই অজ্ঞান সত্তার নাশ নাই। সেই অজ্ঞানসত্তা কি? মহাকাশ—মহাশূন্য।

এই মহাশূন্যোপরি—এই মহাকাশরূপ ক্ষেত্রে—নিত্যা শক্তিবর্গ ও নিয়তি (Eternal energy of an eternal unconscious Law) কার্য্য করিতেছেন, মহাশূন্য ও প্রাকৃতিক নিয়ম অশেষ বিশেষ প্রকারে মিলিত হইতেছেন। আকাশ ও প্রকৃতি, অজ্ঞান নিয়তির (শক্তির) প্রভাবে মিলিত হইতেছেন। সেশ্বরবাদী বলিবেন যে এই নিয়তি বা শক্তিই সজ্ঞান ব্রহ্মের নিশ্বাসবায়ু (ইচ্ছা বা শক্তি)।

এখন প্রশ্ন এই যে অজ্ঞান-সত্তা হইতে কি রূপে জ্ঞান জন্মে? কারণে যে জ্ঞান নাই, কার্য্যে সেই জ্ঞান কিরূপে উদ্ভব হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর আর্হতদর্শন অপর প্রশ্নদ্বারা দিবেন—যে বীজ-কারণ শঙ্করাচার্য্যকে জন্ম দিয়াছে সেই বীজ কি নিজকে নিজে জানিত—তাহার কি আত্মজ্ঞান ছিল।

এখন প্রশ্ন এই যে এই বীজ কোথা হইতে আসিল? ইহা কি জন্মিল; অথবা অপ্রকট অবস্থা হইতে প্রকট অবস্থায় আসিল? জড় বিজ্ঞান এইরূপ বলিবেন:—সামান্য পরিমিত স্থানেও পুঞ্জ পুঞ্জ প্রোটোপ্লাজম্ ইথার (মহাকাশ) সাগরে সন্তরণ করিতেছে। মনে করুন যদি পরিষ্কৃত জল তাহাদের সম্মুখে ধরা যায় এবং তাহারা যদি সেই জলে পতিত হয়, তাহা হইলে সেই সংযোগ হইতে কোন না কোন প্রকারের প্রাণ (জীবনী-শক্তি) দেখা দেয়। এই প্রাণ বা শক্তি (নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইবার শক্তি) কোথা হইতে আসিল? এ স্থানে (১) জলই ক্ষেত্র, যদুপরি প্রোটোপ্লাজম পতিত হয়। (২) প্রোটোপ্লাজম্ জীবাণু—যাহা হইতে জীব বিকশিত হয়। (৩) প্রাণশক্তি—জল ও প্রোটোপ্লাজমের সংযোগে যে শক্তি (নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইবার শক্তি) দেখা দেয়। এখন দেখা যাউক, মানব প্রাণ কিরূপে বিকশিত হয়। প্রকৃতি বা আকাশই ক্ষেত্র (উপরোক্ত উদাহরণের জলস্বরূপ)। পরব্রহ্ম বা বিশ্বব্যাপী আত্মাই জীবাণু বা প্রোটোপ্লাজম্। ঐ উভয়ের সংযোগে প্রাণশক্তি বিকাশপ্রাপ্ত হয়।

উপনিষদ বলেন, ব্রহ্মই ক্ষেত্র (Poety) মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহং। সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥ গীতা, ১৪ ৩।

প্রকৃতি বা আকাশই বীজ; এবং শক্তি, যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রাণ-প্রক্রিয়া শক্তি।

আর্হতদর্শন বলেন প্রকৃতি (স্বভাব) বা আকাশই স্থান বা ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্র, পদার্থই বল, অথবা অপদার্থ বা শূন্য পদার্থই (এত সূক্ষ্ম যে তাহা কেবল মনোবিজ্ঞানের গ্রাহ্য) বল, তদ্দ্বারা পরিপূর্ণ। ব্রহ্ম বীজ ঐ ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত হইলে এক দুর্জ্ঞেয় শক্তি জন্মে, এই শক্তিকে আর্হত-

দর্শন "ফো-হাট্" (Fohet) নামে অভিহিত করেন। স্থান (ক্ষেত্র) বা শূন্য এবং রূপ একই কথা। রূপই আকাশ, এবং আকাশই রূপ। প্রকৃতি এই বিশ্বের উপাদান, প্রকৃতি হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। আকাশও বিশ্বের উপাদান, কিন্তু আকাশ, প্রকৃতি অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম। প্রকৃতিকে শরীর বলিলে, আকাশ শক্তি সেই শরীরের আত্মা বা শক্তি।

হিন্দুদর্শন যাহাকে আকাশ বলেন, আর্হত দর্শন তাহাকেই শূন্য বলেন। বেদান্ত দর্শন বলেন আকাশই ব্রহ্মের লিঙ্গ—আকাশস্ত লিঙ্গত্বাৎ। প্রকৃতির প্রথমাবস্থার নাম—প্রকৃতিব নিজভাব বা স্বভাবের নাম—আকাশ। শক্তি, আকাশের একটী গুণ বিশেষ। পূর্ব্বে যে বলা হইল যে ব্রহ্ম ও প্রকৃতির সংযোগে শক্তি জন্মে—তাহার অর্থ এই যে ব্রহ্ম ও আকাশের গুণ শক্তির সংযোগ হইলে, অবয়ব জন্মে। আকাশেব সংযোগে শক্তি কার্য্যকারিণী হইলে শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হয়। আকাশ অধিষ্ঠান, যাহার ভিতর দিয়া সর্ব্বশক্তি প্রবাহ চালিত হয়। আকাশই অধিষ্ঠান ক্ষেত্র, যাহার উপর দিয়া নিত্যাশক্তি বা নিয়তি কার্য্য কবিতেছেন, এবং শক্তি আকাশেব গুণবিশেষ; আকাশের অভ্যন্তরেই সেই নিত্যশক্তি আছে যাহা আকাশই প্রকৃতি হইতে সমস্ত রূপ প্রকটিত করে। এই আকাশ শক্তি অক্রিয় অবস্থায় স্থিতিভাবাপন্ন থাকে। কে ইহাকে গতিভাবাপন্ন করে? বৌদ্ধ দর্শন বলিবেন—নিয়তি (Eternal law)। বেদান্ত দর্শন বলিবেন "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়"। বেদান্তের নিষ্ক্রিয় ও নিগুণ ব্রহ্মকেও আর্হত দর্শন স্বীকার করেন না; ঈশ্বর বা সবিশেষ ও সগুণ ঈশ্বরকে ত অঙ্গীকার করেনই না। আর্হত দর্শন অনুসারে আকাশ প্রকৃতিই শক্তিমান ও শক্তি অভেদ ভাবে অবস্থিত। এই জন্যই বলা হয় আদিতে মহাশূন্য ছিল, আছে ও থাকিবে। আকাশ প্রকৃতি নাম দিবার উদ্দেশ্য এই যে আকাশকে অন্য অর্থে ইথারও বলা হয়। ক্ষিতি অপ্ তেজ, মরুৎ (ইথার নং ১), বোম বা আকাশ (ইথার নং ২), সূক্ষ্ম আকাশ (ইথার নং ৩), মহাকাশ (ইথার নং ৪), ইহারাই মহাভূত পদার্থ।

শক্তি স্থিতিভাবাপন্ন অবস্থায় থাকিলে তাহাকে জড়বিজ্ঞান Potential Energy কহে, এবং ক্রিয়াশীল হইলে Kinetic energy কহে। শক্তি

কথনও নষ্ট হয় না ; Kinetic energy কথনও বিনষ্ট হয় না, অপ্রকাশিত অবস্থায় Potential eneigy এর অবস্থায় পরিণত হইতে পারে। কোন বস্তুতে আঘাত করিলে গতিশক্তি জন্মে ও অন্য বিরুদ্ধ শক্তি দ্বারা সে গতি স্থগিত হইতে পারে; কিন্তু প্রকৃত শক্তি বস্তুর অভ্যন্তরে অপ্রকাশিত অবস্থায়—প্রকাশের সম্ভাবিত অবস্থায় Potential energy হইয়া বাস করে। বৌদ্ধ দর্শনে সপ্ততত্ত্বের কথা আছে (১) স্থূল শরীর (প্রকৃতি), (২) সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ শরীর (প্রকৃতি ও শক্তির মিশ্রণে জাত) (৩) কামরূপ (শক্তি) (৪) বৌদ্ধ দর্শনের জীবাত্মা (ব্রহ্ম, শক্তি ও প্রকৃতির মিশ্রণে জাত)। (৫) জড়াত্মা Physical Intelligence or animal soal (ব্রহ্ম ও প্রকৃতির সংযোগে জাত)।(৬) বুদ্ধ্যাত্মা বা আত্মা (Spiritual Intelligence or soal), (ব্রহ্ম ও শক্তির সংযোগে জাত)। (৭) বিশুদ্ধ আত্মার বিকাশ (বেদান্তের জীবাত্মা)। অনাহত জীব বা প্রাণের অধিষ্ঠাণ ভূমি। এই সপ্ততত্ত্বের পরস্পরের সহিত বিমিশ্রণে সম্পূর্ণ নূতন নূতন শক্তি—যথা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি, নাভিচক্র শক্তি, অনাহত চক্রশক্তি, আজ্ঞাচক্র শক্তিই ইত্যাদি জন্মে। এই সমস্ত শক্তি অবিনশ্বর, কারণ তত্ত্বগণের সংযোগ শুধু রাসয়নিক সংযোগ ও জড়ীয় পদার্থের সংযোগ নহে। এই সংযোগের উৎপন্না শক্তিও অবিনশ্বর। এই অবিনশ্বর শক্তি Kinetic অবস্থা হইতে Potential অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হইতে পারে; এক আধার হইতে অন্য আধারে স্থানান্তরিত হইতে পারে। যেমন এক ব্যক্তি মরিলে তাহার Kinetic শক্তি অপর পরমাণু রাশিতে সঞ্চারিত হইয়া ভিন্ন অবয়ব গঠন করিতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে শক্তি দেহ ছাড়িয়া গেলে দেহের প্রকৃতিবর্গ লইয়া যায় কিরূপে? ইহাও অসম্ভব নহে, কারণ দেখা যায় যে বিদ্যুৎশক্তি বা চুম্বক শক্তি ব্যক্তি বিশেষের বিশেষত্ব লইয়া শব্দ সমূহ (যেমন গান) স্থানান্তরিত করিতে পারে। শক্তি বিনিময়ের দ্বারা এক জনের চিন্তা অন্য জনে স্থানান্তরিত করা যায়। সেইরূপ শক্তিও চিন্তা, ইচ্ছা, বোধ, প্রবৃত্তি প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া গমন করিতে পারে। আত্মা অপ্রকাশিত অবস্থায় থাকিতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয় না। বেদান্ত দর্শন সর্ব্বোপরি পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম স্বীকার করেন। ইহাও বেদের (উপনিষদের) দোহাই দিয়া। আর্হত দর্শন বেদ মানেন না; সুতরাং পরব্রহ্মও

স্বীকার করেন না। বেদ ছাড়িয়া দিয়া নিরপেক্ষ যুক্তিবলে অদ্বৈতবাদ, আর্হত বা বৌদ্ধদর্শনের নিকট ন্যূনতা স্বীকার করিতে বাধ্য ; অথবা উভয়ের একমত এই কথা ঘোষণা করিতে বাধ্য। আত্মজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান, যখন অহঙ্কার তত্ত্ব বিশ্বের আমিত্বে পরিণত হয়। বেদান্ত বিশ্বের আমিত্ব স্বীকার করেন, আর্হত দর্শন তাহা স্বীকার করে না। আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের পরিবর্ত্তে বৌদ্ধদর্শন বলিবেন "নির্ব্বাণ"। ব্যক্তিত্ব বা স্বতন্ত্র আমিত্বের উচ্ছেদ সাধন করিয়া বুদ্ধ্যাত্মাতে প্রকৃতির অবিনশ্বর নিয়মের অধীন করতঃ প্রকৃতির আনুগত্যে প্রাকৃতিক কার্য্যে প্রকৃতির সহায়ীভূত হওয়াকে নির্ব্বাণ কহা যায়। নির্ব্বাণ is negation of individual or seperate existence। বেদান্ত ইহাকে তুরীয় অবস্থা বলিবেন।

জড় পদার্থ বা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় মনের সৃষ্টি। আমাদের মনের (subjective self বাহ্যিক আকৃতিই জড় পদার্থ। আমাদের মন বা আমিত্ব, চিন্তা (Thoughts), ইচ্ছা (Volition), বোধশক্তি (sensations) এবং ভাব (Emotions) সমষ্টি মাত্র। জড় পদার্থ আমাদের. বোধশক্তির বা চিন্তাশক্তির বহিস্ফুরণ মাত্র। প্রাকৃতিক নিয়ম আমাদের মানসিক শক্তির গতির নিয়ম। বিশুদ্ধ আত্মা (Noumenal Egs) থাকিতে পারে না। মানসিক অবস্থা হইতে মন স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করিতে পারে না। মনও বাহ্য-পদার্থের জ্ঞান আমাদের মানসিক অবস্থা হইতে সমুৎপন্ন হয়। মানসিক অবস্থার সূত্র, মানসিক ও বাহ্যিক অবস্থাকে গ্রথিত করিয়াছে। মন ভিতরের বিষয় সুখ দুঃখ প্রভৃতিও চিন্তা করে, বহির্বিষয় জড় পদার্থও চিন্তা করে, সুতরাং মন উভয়েন্দ্রিয়। বৌদ্ধ দর্শনের মাধ্যমিকগণ বলেন যে কিছুই নাই, সকলই শূন্য। স্বপ্নাবস্থায় যে বস্তুজ্ঞান হয়, জাগ্রৎ অবস্থায় সে জ্ঞান হয় না, এবং জাগ্রৎ অবস্থায় যে বস্তুজ্ঞান হয়, স্বপ্নাবস্থায় সেই বস্তুর জ্ঞান হয় না, আবার সুষুপ্তি অবস্থায় কোন বস্তুই দেখা যায় না। এতদ্বারা সিদ্ধান্ত এই যে বস্তুত কোন বস্তুই সত্য নহে, কারণ বস্তু সত্য হইলে সর্ব্ব অবস্থাতেই দৃষ্ট হইত। বৌদ্ধ দর্শনের যোগাচার শ্রেণী বলেন যে এইরূপ অবস্থায় নিত্য সত্য আত্মাই থাকিতে পারে না, বাহ্য বস্তুমাত্রই অলীক, এবং ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপ আত্মাই সত্য। বস্তু ক্ষণিক, অর্থাৎ প্রতিক্ষণে

বস্তুজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া প্রতিক্ষণেই বিনষ্ট হয়, এবং আত্মাও ক্ষণিক জ্ঞানস্বরূপ, ক্ষণিক জ্ঞানাতিরিক্ত স্থিরতর আত্মা নাই।

দিগম্বর আর্হতগণ বৌদ্ধ দর্শনের এই "ক্ষণিক-আত্মা" সম্বন্ধীয় মত খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে যদি প্রতি দেহে এক স্থায়ী আত্মা স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে এক আত্মা কর্ম্ম করেন, অপর আত্মা অন্যক্ষণে তাহার ফলভোগ করেন, এইরূপ হইলে কর্ম্মে প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। লোক ব্যবহারে জানা যায় যে লোকে অনুভব করিয়া থাকেন "আমি কৃষি বাণিজ্যাদি দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিয়াছি আমিই তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকি।" আর্হতগণ বলেন জীবাত্মার পরিমাণ দেহের পরিমাণের সমান, অর্হংই পরমেশ্বর। তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও রাগদ্বেষাদি শূন্য। রামানুজ দর্শন প্রত্যুত্তরে বলেন যে "দেহের পরিমাণানুরূপ আত্মা হইলে জন্ম জন্মান্তরে একই আত্মা ক্ষুদ্র পিপীলিকা দেহ ও বৃহৎ গজদেহে কি প্রকারে অবস্থান করিতে পারে"। এই বিষয় রামানুজ দর্শনে আলোচনা করা যাইবে।

আর্হত দর্শনে তত্ত্বসংখ্যা লইয়া বিভিন্ন মত ভেদ দৃষ্ট হয়, কেহ কেহ বলেন তত্ত্ব দুইটী, জীব ও অজীব। জীব বোধাত্মক, অজীব অবোধাত্মক। কোন মতে পঞ্চ তত্ত্ব, কোন মতে সপ্ত তত্ত্ব, কোন মতে নবতত্ত্ব ইত্যাদি। তত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিভিন্ন মত শ্রীভাগবতের একাদশ স্কন্ধে সুন্দররূপে বর্ণিত আছে।

আর্হত দর্শন তিনটী রত্ন কণ্ঠে ধারণ করিতে উপদেশ করেন, যথা,—(১) সম্যক্ দর্শন (২) সম্যক্ জ্ঞান (৩) সম্যক্ চরিত্র। জিনোক্ত তত্ত্বে দৃঢ় শ্রদ্ধাই সম্যক্ দর্শন। জিনোক্ত তত্ত্বের প্রকৃত জ্ঞানই সম্যক্ জ্ঞান। গর্হিত কর্ম্ম ত্যাগের নাম সম্যক্ চরিত্র। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটী সম্যক্ চরিত্র।

স্থাবর জঙ্গম সর্ব্ব প্রকার জীবনাশে বিরক্তিই অহিংসা। এই অহিংসা মহাব্রত সাধন করিবার জন্য আর্হত দর্শনের জৈন নামক সম্প্রদায়ভুক্ত আর্হতগণ পথে গমন কালীন হস্তে পিচ্ছিকা লইয়া চলেন, চলিবার সময় জীবনাশের ভয়ে পিচ্ছিকা দ্বারা অগ্রে পথ হইতে জীবকুলকে দূরে সরাইয়া দিয়া পশ্চাৎ পদক্ষেপ করেন। জৈন সাধুগণ অস্তেয় মহাব্রত সাধন জন্য ভিক্ষালব্ধ অন্নমাত্র ভক্ষণ করেন তাহাও একাকী ভোজন করেন না

দত্তাতিরিক্ত বস্তু কথনও গ্রহণ করেন না। ইঁহারা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পূর্ণমাত্রায় অনুষ্ঠান করেন, স্ত্রী সম্ভোগে একান্ত বিরত। ইঁহারা হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া বারিপান করেন, জলপাত্র ব্যবহার করেন না; সর্ব্বথা সঙ্গ-বিহীন, অত্যন্ত ক্ষমাশীল। জৈন সাধুগণ কুঞ্চিত কেশ রাখেন ও শুক্ল বসন পরিধান করেন, জৈন ঋষিগণ কোন বস্ত্র ব্যবহার করেন না, ইঁহারাই দিগম্বর আর্হত। র্ব্ব বিষয়ে মমতা ত্যাগরূপ অভ্যাস যোগ অবলম্বন করিয়া জৈন ঋষিগণ নির্ম্মম ও নিস্পৃহ হইয়া পূর্ব্বোক্ত রত্নত্রয় সাধনা করেন।

বৌদ্ধ দর্শনের মতে ধনোপার্জ্জন করিয়া দ্বাদশায়তন শরীরের সম্যক্ শুশ্রূষারূপ পূজা করাই প্রধান কর্ম্ম। দেবতা সুগত, জগৎ ক্ষণভঙ্গুর, প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটী মাত্র প্রমাণ। বৌদ্ধ যতিগণ বর্ম্মাসন, কমণ্ডলু, মুণ্ডন, চীর, পূর্ব্বাহ্ন ভোজন, সমূহাবস্থান ও রক্তাম্বর গ্রহণরূপ ব্রত ধারণ করেন। জৈন সাধুগণের সহিত ইহাই বাহ্যিক পার্থক্য।

শ্রীজানকীনাথ পাল শাস্ত্রী।

বৈশারদী দেবীমায়া।

যাহা কিছু দেখা যায় সব মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু, অপর সমস্ত অনিত্য—আত্মার উপাধি কল্পিত হইয়া জীব বলিয়া ভ্রান্তি হইতেছে—এ সকল তত্ত্বের মূলে সেই 'প্রথম' অজ্ঞান, অবিদ্যা বা মায়া—সদসৎ হইতে অনির্ব্বচনীয়, ত্রিগুণ বিশিষ্ট, জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপ একটা কিছু। এই অজ্ঞানের তমপ্রধান বিক্ষেপ শক্তি হইতে আকাশাদি সূক্ষ্ম-ভূত কল্পিত হইয়া থাকে; আর ইহাতে উপহিত চৈতন্য, অন্তর্যামি, ঈশ্বর প্রভৃতি নামে অভিহিত হন। এই গোড়ায় গলদ—এই গলদকে কেউ বলেন লীলা, কেউ বলেন খেলা, কেউ বলেন আর কিছু—কিন্তু ঢেলা, ফেলা খেলাতে ছেলের আনন্দ হইতে পারে, ভেককুল তাহাতে বড় প্রমাদ গণে।

এখন কথা হইতেছে এই, যদি গোড়াতেই গলদ, অজ্ঞান নিত্যও বটে,

অনিত্যও বটে, তবে এ উপাধি কাটিবে কেন, মোক্ষই বা হয় কি প্রকারে? এই প্রশ্নের উত্তরে একজন বলিয়াছেন "হে শিষ্য" অতি সুন্দর প্রশ্ন করিয়াছ; তুমিই ধন্য তুমিই মোক্ষলাভের উপযুক্ত বটে। কথাটা কি জান—ও সবই ভ্রান্তি, ভ্রান্তি জিনিষটা লইয়া কি তর্ক চলে? তাহার অস্তিত্বই নাই, সমস্তই ব্রহ্মবস্তুতে কল্পিত; তখন যে বস্তু নাই, তাহা কাটিবে কি প্রকারে এ প্রশ্নই হইতে পারে না।"

সংশয় কাটিল না; অজ্ঞান যদি নিত্যও বটে এবং অনিত্যও বটে, তখন জোর এতটুকু বুঝা যায়, যে যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ ত নিত্য নিশ্চয়ই, যখন না থাকে, 'সরিয়া' যায় বা 'কাটিয়া' যায়, তখন অনিত্য বোধ হইতে পারে। কাটে কি? কাটেই বা কিসে?

কেউ বলেন "ওহে, একাংশে জগৎস্থিত, বলাতে বুঝিতে হইবে যে ব্রহ্মের অপর ত্রিপাদ নির্ব্বিকার অবস্থায় স্বস্বরূপে নিত্য অবস্থিত আছে। কাজেই ঐ অংশ হইতে—অবিদ্যার কবল হইতে—নিষ্কৃতি পাইলে, মোক্ষলাভ হওয়া অসম্ভব কেন হইবে?"

সংশয় নিবৃত্ত হইল না। নিত্য, পূর্ণস্বরূপ, অখণ্ডের আবার অংশ কল্পনা হয় কিরূপে?

আচ্ছা, তমগুণের আধিক্যে যদি সৃষ্টি হয়, তবে বিশুদ্ধ সত্ত্বাবস্থা প্রাপ্ত হইলে কি মায়ার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় না? শ্রীভাগবতে বলেন, যে রজ ও তমের বিক্ষেপক ও আবরক শক্তির দ্বারা এ বন্ধন কল্পিত হইয়াছে। যদি এ দুইয়ের গতি ফিরিয়ে, বুদ্ধিকে শুদ্ধসত্বাবস্থায় স্থিরীকৃত করা যায়, তবে শুদ্ধসত্ব বিষ্ণুর কৃপা লাভ হয়। শুদ্ধ সত্বলাভের উপায় নির্দ্দেশকল্পে বলিয়াছেন—লীলা কথা শ্রবণ, অনবরত তদ্‌গুণগান ও হৃৎপতিকে হৃদি-মাঝে ধারণ করারূপ মনন, অপর সমস্ত বস্তু চিত্ত হইতে নিরাকৃত করিয়া সেই সত্বমূর্ত্তি চিত্তে স্থাপন রূপ নিদিধ্যাসন, এবং তদাকারাকারিত হইয়া সমাধি অবস্থা লাভ। এই সমাধি দুই প্রকার, সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পক। সবিকল্পক সমাধিতে দ্বৈতভাব থাকে অর্থাৎ উপাস্য ও উপাসক জ্ঞানমাত্র থাকে। নির্ব্বিকল্পক সমাধিতে একমাত্র অদ্বয় জ্ঞান থাকে, আর কিছু থাকে না—'অহং ব্রহ্মাস্মি' একথা বলিবার কেহ থাকে না। এই সমাধি

শাস্ত্রে লয়, বিক্ষেপ, কষায় ও রসাস্বাদন এই চারিটী বিঘ্ন মুখ্যভাবে বলিয়াছেন। যে অবস্থায় চিত্ত কিছু ধরিতে না পারিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে, অর্থাৎ সমস্ত অবস্তু চিত্ত হইতে নিরাকৃত করিতে যাইয়া, 'কিছু ধরিবার নাই' এই ভাবনায় চিত্ত স্তব্ধীভূত হইয়া পড়ে, সম্বিৎ স্থূল দেহ হইতে অজ্ঞাতসারে সরিয়া পড়ে, বোধ হয় এই অবস্থাকেই লয় সংজ্ঞা দেওয়া হয়। চিত্তের নানা বস্তুতে অনুধাবনরূপ বিক্ষিপ্ত অবস্থাকে বিক্ষেপ বলা হইয়াছে। এই অবস্থা প্রথম প্রথম খুব হয়; কারণ মনকে পূর্ব্বে কখনও ধরিবার চেষ্টা না করাতে, সে তাহার 'সরিষার পুটুলি, ছিন্ন করিয়া সংসারে নানা অবস্থাতে ছড়াইয়া পড়িয়া থাকে; কাজেই সব গুলা একত্রিত করিয়া সরিষার প্রকৃত পুটুলি খুজিয়া স্থির করা এত কঠিন ঠেকে। এই কারণে চিত্ত প্রথম প্রথম খুব বিক্ষিপ্ত হয়; কেবলমাত্র অভ্যাসের দ্বারা বিক্ষিপ্ত চিত্তকে স্থির করিতে পারা যায়! বৈরাগ্যজনিত অনিত্য ধারণা দ্বারা এইরূপ অভ্যাস করিতে মতি হয়। তৎপরে কষায়—অর্থাৎ অনেক জন্মের অভ্যাসবশতঃ সংস্কাররূপ বাসনা কর্তৃক কলুষিত চিত্ত, অল্প অন্তর্মুখিন হইয়াও চৈতন্য গ্রহণে অসমর্থ হইয়া মধ্যাবস্থায় স্তব্ধীভূত হইয়া পড়ে, যেমন রাজমন্দিরে গমনোদ্যত পুরুষ দ্বারপাল কর্ত্তৃক নিবৃত্ত হইয়া স্তব্ধ হইয়া পড়ে, তদ্রূপ সাধন পথের বিঘ্নকে কষায় বলিয়াছেন। আর রসাস্বাদন—চিত্ত স্থির হইয়াছে, সবিকল্প সমাধির অবস্থা আসিয়াছে, সেই সময় সূক্ষ্ম আনন্দময় কোষের সান্নিধ্যবশতঃ আনন্দে অধীর হইয়া সাধকের চিত্ত আনন্দরূপ বাসনায় মজিয়া যাইতে পারে, ইহাও নির্ব্বিকল্প সমাধির অন্তরায় এই হেতু বিঘ্নরূপ বলা হইয়াছে।

এই চারি প্রকার বিঘ্ন হইতে নিস্তার পাইলে নির্ব্বিকল্প সমাধি ঘটে; তখন আর উপাস্য উপাসক ভেদ থাকে না, যাতায়াতের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়—মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। শ্রীভাগবতে বলিয়াছেন, যে, অবিদ্যাই তখন বিদ্যারূপে—মতিরূপে—সাধককে জ্ঞানপথে চালিত করেন, অর্থাৎ অবিদ্যাই তখন সাধকের নিকট বিদ্যারূপে প্রতিভাত হন এবং তখনই বিদ্যা অবিদ্যা দুই অবস্থার অতীত অদ্বয় ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতি হয়—জীব শিব হইয়া যায়।

তবে কি 'অবিদ্যাই' দুই রূপে প্রকাশ পান? যতক্ষণ অবিদ্যা, মায়া, ততক্ষণ তাহাকে অনিত্য বলা যায়; এবং যখন বিদ্যা, জ্ঞান, তখনই নিত্য? যতক্ষণ অবিদ্যা জ্ঞান বিরোধি, তমপ্রধান, ততক্ষণই তিনি অনিত্য; এবং যখনই বিদ্যা জ্ঞানস্বরূপ বিশুদ্ধসত্ত্ব-প্রধান, তখনই সেই বৈশারদী মায়া নিত্য? অথবা, সেই চিৎস্বরূপের তবে কি এই দুই ভাবেই নিত্যপ্রকাশ, তাঁহারই শক্তির দুই দিক্—একটা তমপ্রধান ও একটী বিশুদ্ধসত্ত্ব প্রধান?

এ মীমাংসা সাধক ব্যতীত কে করিয়া দিতে পারে?

"যদ্যোষোপরতাদেবী মায়া বৈশারদী মতি।
সম্পন্ন এবেতি বিদুর্মহিম্নি স্বে মহীয়তে॥" ভাঃ ১।৩।৩৫

"দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যযা।
মামেব যে প্রপদ্যং তে মায়া মেতাং তরতি তে॥" গী ৭।১৪॥

শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষাল।

কস্তূরী প্রকরণম্।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সিদ্ধাঞ্জনং জনিত যোগিজন প্রভাবং
ভাবং বদন্তি বিদুষাং নিবহা নবীনং।
সিদ্ধো ভবেন্মনসি সন্নিহিতে যদস্মিন্
পশ্যন্ জগন্তি মনুজো জগতামদৃশ্যঃ॥ ৩১॥

বিদুষাং (পণ্ডিতানাং) নিবহাঃ (সমূহাঃ) জনিত যোগিজন প্রভাবং (জনিতঃ উৎপন্নঃ যোগি জনানাং প্রভাবঃ মাহাত্মাং যেন সঃ তং) ভাবং নবীনং (অভিনবং) সিদ্ধাঞ্জনং (সিদ্ধ কজ্জলং) বদন্তি (কথয়ন্তি) যৎ (যস্মাৎহেতোঃ) অস্মিন্ ভাবে মনসি (চিত্তে) সন্নিহিতে (অবলম্বিতে সতি) সিদ্ধঃ (সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ) মনুজঃ (মনুষ্যঃ) জগন্তি (ভুবনানি) পশ্যন্ (অবলোকয়ন্) অপি জগতাং (ভুবনানাং) অদৃশ্যঃ (অনবলোকনীয়ঃ) ভবেৎ (স্যাৎ)। অঞ্জনন্তু অক্ষিভূষণং তথাপি অত্র শ্লোকে অন্যেষাং দৃষ্টি-বিঘাতক ত্বেনোক্তং অতএবাস্যাঞ্জনত্বং অন্যথা অঞ্জন-তুল্য-গুণত্বে নবীনপদ-মনর্থকং স্যাৎ। ৩১।

পণ্ডিতগণ যোগীব্যক্তির প্রভাব প্রকাশক ভাবকে নূতনতর সিদ্ধাঞ্জন বলিয়া থাকেন ; যেহেতু ঐ ভাব হৃদয়ে অবলম্বন করিলে মনুষ্য সিদ্ধিলাভ করিয়া জগৎ অবলোকন করিলেও নিজে জগতের অদৃশ্য হইয়া থাকেন।৩১।

অথ ক্রোধ প্রক্রমং—

স্কন্ধো যুদ্ধ মহীরুহস্য কুমতেঃ সৌধো নিবন্ধোঽংহসাং
যোধো দুর্ণয়ভূপতেঃ কৃত কৃপারোধোঽপ্রবোধো হৃদাং।
ব্যাধো ধর্ম্মমৃগে বধো ধৃতিধিয়াং গন্ধো বিপদ্‌বিরুধা
সন্ধো দুর্গতি পদ্ধতৌ সমুচিতঃ ক্রোধো বিহাতুং সতাং ॥ ৩২ ॥

সতাং (সজ্জনানাং) যুদ্ধ মহীরুহস্য (সমরবৃক্ষস্য) স্কন্ধঃ (শাখা সন্ধিস্থানং) যুদ্ধে ক্রোধস্য সঞ্চারিত্বাদিতি ভাবঃ। কুমতেঃ (কুবুদ্ধেঃ) সৌধঃ (প্রাসাদঃ) আবাসত্বাদিতি ভাবঃ অংহসাং (পাপানাং) নিবন্ধঃ (গ্রহঃ) দুর্ণয়ভূপতেঃ (দুর্ণয়ঃ দুর্ণীতিঃ, স এব ভূপতিঃ রাজা তস্য) যোধঃ (যোদ্ধা) দুর্ণয় সাহায্যকারিত্বাদিতি ভাবঃ। কৃত কৃপারোধঃ (কৃতঃ কৃপায়াঃ দয়ায়াঃ রোধ নিবারণং, যেন সঃ) হৃদাং (হৃদয়ানাং) অপ্রবোধঃ (অপ্রবোধকারণং) ধর্ম্মমৃগে (ধর্ম্ম এব মৃগঃ তস্মিন্) ব্যাধঃ (লুব্ধকঃ) ধৃতিধিয়াং (ধৈর্য্যবুদ্ধীনাং) বধঃ (নাশকরণং) বিপদ্‌বীরুধাং (বিপদঃ আপদ এব বীরুধঃ লতাঃ তাসাং) গন্ধঃ (আমোদঃ) দুর্গতি পদ্ধতৌ (দুর্গতির্বিপৎ সা এব পদ্ধতি মার্গস্তস্যাং) অন্ধঃ, ক্রোধঃ (কোপঃ) বিহাতুং (ত্যক্তুং) সমুচিতঃ (যুক্তঃ), এতাদৃগনিষ্টহেতুঃ ক্রোধ অবশ্যং ত্যক্তব্য ইত্যাশয়ঃ ॥৩২॥

যুদ্ধ বৃক্ষের স্কন্ধস্বরূপ, কুমতির সৌধস্বরূপ, পাপের পুস্তক স্বরূপ, দুর্ণয়রূপ রাজার যোদ্ধাস্বরূপ, ধর্ম্মরূপ মৃগের ব্যাধ স্বরূপ, ধৈর্য্যবুদ্ধির বিনাশক বিপদ্রূপ লতার গন্ধসদৃশ, দুর্গতি পথে অন্ধ সদৃশ, দয়ারোধকারী হৃদয়ের অজ্ঞানকারী ক্রোধ সদ্‌ব্যক্তি মাত্রেরই পরিত্যাগ করা উচিত। ৩২।

বায়ুর্যথা জলমুচাং সমিধাং যথাগ্নিঃ
সিংহো যথা করটীনাং তমসাং যথার্কঃ।
হস্তী যথা বলিকহাং পয়সাং যথোষ্ণ
শক্তস্তথা প্রশমনায় শমো রুষাণাম্ ॥ ৩৩ ॥

বায়ুঃ (পবনঃ) যথা জলমুচাং (মেঘানাং) অগ্নিঃ (বহ্নিঃ) যথা সমিধাং

(কাষ্ঠানাং) সিংহ (কেশরী) যথা করটীনাং (হস্তিনাং) অর্কঃ (সূর্য্যঃ) যথা তমসাং (অন্ধকারাণাং) হস্তী (করী) যথা অবনিরুহাং (বৃক্ষাণাং) উষ্ণঃ যথা পয়সাং (জলানাং) প্রশমণায় (শান্ত্যৈ) শক্তঃ (সমর্থঃ) ভবতীতি শেষঃ ; তথা (শমঃ শম গুণঃ) রুষাণাং (ক্রোধানাং) (রুষ শব্দাদপি-রুতে ততঃ ষষ্ঠ্যা বহুবচনম) প্রশমণায় শক্তো ভবতি ৷ ৩৩।

বায়ু মেঘের, অগ্নি কাষ্ঠের, সিংহ হস্তীর, সূর্য্য অন্ধকারের, হস্তী বৃক্ষ সমূহের এবং উষ্ণতা তেজ যেমন জলের প্রশম করিতে সমর্থ, সেইরূপ শমগুণ ক্রোধ দমন করিতে সমর্থ। ৩৩।

তপঃ পূবং পাথোমুচমিব মরুৎ সংহরতি যঃ
রুপাকেলিং মুস্তাঙ্কুরমিব বরাহঃ খনতি যঃ।
সুহৃদ্‌ভাবং নাশং হিমমিব পয়োজং নয়তি যঃ
স কোপঃ সাটোপঃ প্রবিশতি সতাং চেতসি কিমু॥ ৩৪॥

যঃ কোপঃ (ক্রোধঃ) মরুৎ (বায়ুঃ) পয়োমুচং (মেঘং) ইব তপঃ পূরং (তপঃ সমূহং) সংহরতি (অপনয়তি) তথা যঃ কোপঃ বরাহঃ (শূকরঃ) মুস্তাঙ্কুরং (মুস্তাপ্ররোহং) ইব রুপাকেলিং (দয়াকেলিং) খনতি (উৎপাট-য়তি) যঃ কোপঃ হিমং (শিশিরং) পয়োজং (পদ্মং) ইব সুহৃদ্‌ভাবং (সৌহার্দ্দাং) নাশং নয়তি (বিনাশয়তি) স (তাদৃশঃ) কোপঃ (রোষঃ) সাটোপঃ (আটোপেন সহ বর্ত্তমানঃ সন্) সতাং (সাধুজনানাং) চেতসি (মনসি) প্রবিশতি কিমু ? (প্রবিশতি কিং ?) ন প্রবিশত্যেব। সাধুচেতসি কোপস্য প্রবেশঃ অসম্ভব ইতি ভাবঃ। ৩৪।

বায়ু যেমন মেঘ সমূহকে সংহার করে, সেইরূপ যে তপঃ সমূহকে সংহার করে ; শূকর যেমন মুথা উৎপাটিত করে তদ্রূপ যে দয়াকে উৎপাটিত করে ; হিম যেমন পদ্মকে নষ্ট করে সেইরূপ যে সৌহৃদ্য নষ্ট করে, সেই কোপ সগর্ব্বে সাধুগণের চিত্তে প্রবেশ করিতে পারে কি ? (সাধুচিত্তে ক্রোধের প্রবেশ অসম্ভব। ৩৪।

তে ধন্যা অভিবন্দনীয় মিহ তৎপাদারবিন্দদ্বয়ং
তে পাত্রং সকল শ্রিয়াং জগতি তৎকীর্ত্তি র্নবীনর্দ্ধি চ।
তন্মাহাত্ম্যমসন্নিভং সুরনরাঃ সর্ব্বেঽপি তৎকিঙ্করা

যে কোপ-দ্বিপ-সিংহশাব-সদৃশং স্বান্তে শমংবিভ্রতি ॥৩৫॥

যে জনাইতি শেষঃ। কোপ দ্বিপ সিংহশাব সদৃশং (কোপঃ ক্রোধঃ দ্বিপঃ হস্তী ইব, তস্য সিংহ শাব সদৃশং কেশরিশিশু তুল্যং, ক্রোধ বিনাশক-মিত্যর্থঃ) শমং (শমগুণং) স্বান্তে (আত্মচেতসি) বিভ্রতি (ধারয়ন্তি) তে ধন্যাঃ; তৎপাদারবিন্দদ্বয়ং (তেষাং পাদপদ্মযুগলং) অভিবন্দনীয়ং (পূজ্যং) তে সকলশ্রিয়াং (সর্ব্বসম্পদাং) পাত্রং তৎকীর্ত্তিঃ (তেষাং যশঃ) ইহজগতি (ভুবনে) নরীনর্ত্তি (ভৃশং নৃত্যতি) তন্মাহাত্ম্যং (তেষাং মহিমা) অসন্নিভং (অসদৃশং) (নিরুপমমিত্যর্থঃ) সর্ব্বে (সমস্তাঃ) সুবনরাঃ (দেব মনুষ্যাঃ) তৎ কিঙ্করাঃ (তেষাং দাসাঃ) ভবন্তি ইতি শেষঃ। ৩৫।

যাঁহারা কোপরূপ হস্তীর বিনাশক সিংহ শিশু সদৃশ শমগুণকে চিত্তে ধারণ করেন, এ জগতে তাঁহারই ধন্য, তাঁহাদের পাদপদ্মদ্বয় পূজ্য; তাঁহারাই সর্ব্ব সম্পদের অধিকারী এবং তাঁহাদের যশঃ চিরকাল বিরাজিত থাকে; তাঁহাদের মাহাত্ম্য অনুপম; এবং মনুষ্য ও দেবতাগণও তাঁহাদের দাস। ৩৫।

বনবহ্নির্নবঃ কোঽপি কোপরূপঃ প্রকল্পিতঃ।

আন্তরং য স্তপোবিত্তং ভস্মসাৎ কুরুতে ক্ষণাৎ ॥ ৩৬ ॥

কোপরূপঃ (ক্রোধরূপঃ) কোঽপি নবঃ (নবীনঃ) বনবহ্নিঃ (দাবানলঃ) প্রকল্পিতঃ (অঙ্গীকৃতঃ) যঃ ক্রোধরূপোবহ্নিঃ আন্তরং (মানসং) তপোবিত্তং (তপোধনং) ক্ষণাৎ (ক্ষণকালেনৈব) ভস্মসাৎ কুরুতে (ভস্মসাৎ করোতি)। ৩৬।

কোপ নূতনতর দাবানলরূপে স্বীকৃত; যে হেতু ঐ কোপানল ক্ষণকাল মধ্যে মানসিক তপঃ সম্পদকে ভস্মীভূত করে। ৩৬।

অথ মানপ্রক্রমমারভ্যতে—

জাত্যৈশ্বর্য্যবলশ্রুতান্বয় তপোরূপোপলব্ধিশ্রিতং।

গর্ব্বং সর্ব্বগুণৈক পর্ব্বতপবিং মাত্মন্কুথাঃ সর্ব্বথা ॥

সঙ্গং গচ্ছতি যত্র যত্র যদসৌ তত্তদ্বিনা শাস্পদং।

প্রেত্য প্রাণভৃতো ভবন্ত্যভিমত প্রাপ্তি প্রহীণাঃ ক্ষণাৎ ॥ ৩৭ ॥

আত্মন্ (দেহিন্) জাত্যৈশ্বর্য্যবলশ্রুতান্বয় তপোরূপোপলব্ধিশ্রিতং (জাতিঃ ব্রাহ্মণত্বাদিঃ, ঐশ্বর্য্যং-সম্পৎ, বলং-সামর্থ্যং, শ্রুতং-বিদ্যা, অন্বয়ঃ কুলং, তপঃ

স্তপস্তা, রূপং-সৌন্দর্য্যং, তেষাং উপলব্ধি-লাভঃ তং শ্রিতঃ আশ্রিত তং) সর্ব্বথা (সর্ব্বপ্রকারেণ) সর্ব্বগুণৈক পর্ব্বতপবিং (সর্ব্বে গুণা এব পর্ব্বতাঃ তেষাং পরিঃ বজ্রং তং) গর্ব্বং (অহঙ্কারং) মা কৃথাঃ (মাকুরু) যৎ (যস্মাদ্ধেতোঃ) অসৌ (অয়ং গর্ব্বঃ) যত্র যত্র (যস্মিন্ যস্মিন্) সঙ্গং গচ্ছতি (ব্রজতি) তৎ তৎ বিনাশাস্পদং (বিনাশ কারণং) ভবতীতি শেষঃ প্রাণভৃতঃ (জীবাঃ) ক্ষণাৎ (ক্ষণকালেনৈব) প্রেত্য (প্রেতীভূয়) মৃত্যুং প্রাপ্য ইত্যর্থঃ অভিমত প্রাপ্তি প্রহীণাঃ (স্বাভিষ্ট প্রাপ্তি বিহীনাঃ) ভবন্তি। ৩৭।

হে জীব জাতি, ঐশ্বর্য্য, বল, বিদ্যা এবং রূপের লোভে মত্ত হইয়া সর্ব্বগুণরূপ পর্ব্বতের বজ্রস্বরূপ অহঙ্কারকে স্থান দিও না। যেহেতু অহঙ্কার যেখানে যেখানে স্থান পাইয়াছে, সেইখানেই বিনাশের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জীবগণ ক্ষণকাল মধ্যে কালের কবলগত হইয়া এই সমুদয় অভীষ্টলাভের ফলে বঞ্চিত হইয়া থাকে। মৃত্যুর পর অনিত্য জাতি কুল প্রভৃতি ক্ষণকাল মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায় অতএব ঐ সকল লইয়া গর্ব্ব করা অনুচিত। ৩৭।

ঔচিত্য চারু চরিতাম্বুজশীতপাদং সৎকর্ম্ম কৌশল,
কুচল কঠোরপাদং সংসেব্য সেবন বনক্রম সামযোনিং।
মানং বিমুঞ্চসুকৃতাম্বুধি কুম্ভ যোনিং ॥ ৩৮ ॥

ঔচিত্য চারুচরিতাম্বুজশীতপাদং (ঔচিত্যমেব চারু চরিতম—মনোজ্ঞ চরিত্রং তদেব অম্বুজং পদ্মং তস্য শীতপাদং চন্দ্রং) ঔচিত্য চারু চরিত্র বিনাশক মিত্যর্থঃ। সৎকর্ম্ম কৌশল কুচল কঠোর পাদং (সৎকর্ম্মকৌশলং সৎকার্য্যনৈপুনং এব কুচলং কমুদং তস্য কঠোর পাদং সূর্য্যং। সূর্য্যো যথা কমুদং নাশয়তি তদ্বৎ সৎকর্ম্ম কৌশল বিনাশক মিত্যর্থঃ।) সংসেব্য সেবন বনক্রম সামযোনিং (সংসেব্যঃ সম্যক্ সেবনীয়ঃ সেবন বনক্রমঃ সেবনারণ্য বৃক্ষঃ তস্য সামযোনিং হস্তিনং) সেবন বিনাশন মিত্যর্থঃ। সুকৃতাম্বুধি কুম্ভযোনিং (সুকৃতানাং পুণ্যানাং অম্বুধিঃ সমুদ্রঃ, তস্য কুম্ভযোনিং) অগস্ত্যং সুকৃত বিনাশক মিত্যর্থং। তথাভূতং মানং (অহঙ্কারং) বিমুঞ্চ (ত্যজ) ঔচিত্য সৎকর্ম্ম সেবন সুকৃত বিনাশকস্য মানস্য ত্যাগোহবশ্যং কর্ত্তব্য ইতি ভাবঃ। ৩৮।

ঔচিত্যরূপ চারুচরিত্র কমলের বিনাশক, চন্দ্র সদৃশ সৎকর্ম্ম নৈপুণ্যরূপ কুমুদের বিনাশক, সূর্য্য সদৃশ, সুখসেব্য সেবনরূপ বনের বৃক্ষ বিনাশক, হস্তী সদৃশ এবং পুণ্যসাগরের বিনাশক অগস্ত্য মুনি সদৃশ অহঙ্কারকে পরিত্যাগ কর। ৩৮।

বিপদাং সদ্ম গর্ব্বোঽয়মপূর্ব্বঃ পর্ব্বতঃ স্মৃতঃ।
প্রাপ্নুবন্ত্যূর্দ্ধমূর্দ্ধানো যমারূঢ়া অধোগতিং॥ ৩৯॥

বিপদাং (আপদাং) সদ্ম (স্থানং) অয়ং (এষ) গর্ব্বঃ (অহঙ্কারঃ) অপূর্ব্বঃ (অভিনবঃ) পর্ব্বতঃ (গিরিঃ) স্মৃত (কথিতঃ) যং (গর্ব্বপর্ব্বতং) আরূঢ়া (অধিরূঢ়া) ঊর্দ্ধ মূর্দ্ধানোঃ (উন্নত মস্তকাঃ) অধোগতিং (অধঃ-পতনং) প্রাপ্নুবন্তি (লভন্তে) অহঙ্কারিণোঽচিরাদেবাধঃপতন্তীতি ভাবঃ। ৩৯

আপদের আরাম স্থান অহঙ্কার অভিনব পর্ব্বত স্বরূপ, যাহাতে আরোহণ করিয়া উন্নতশির পুরুষেরাও অধোগতি লাভ করে। ৩৯।

দষ্টো যেন জনো জহাতি বিনয়প্রাণান প্রসিদ্ধিপ্রদাম্
যদ্দষ্টেন বিবেকনীতি নয়নে সংমীল্য সংস্থীয়তে।
যদ্দষ্টস্য চ কীল কীলিত মিব স্তব্ধং বপুর্জ্জায়তে দর্পং
সর্পমিবাতি জিহ্ম গহনং কস্তং স্পৃশেৎ কোবিদঃ॥ ৪০॥

যেন (দর্পেণ) দষ্টঃ (খণ্ডিতঃ) জনঃ (প্রাণী) প্রসিদ্ধি প্রদাম্ (খ্যাতি-দায়কাম্) বিনয় প্রাণান্ (বিনয় এব প্রাণাঃ জীবনানিতান্) জহাতি (ত্যজতি) তথা যদ্দষ্টেন (যেন দর্পেণ দষ্টঃ তেন কর্ত্রা জনেন) বিবেকনীতি নয়নে (বিবেকঃ সদসদ্ বিচারঃ নীতির্নয়ঃ ইতি দ্বে নয়নে চক্ষুষি) সংমিল্য (মীলয়িত্বা) সংস্থীয়তে (অবস্থীয়তে) তথা যদ্দষ্টস্য (যেন দষ্টস্য জনস্য ইতি শেষঃ) বপুঃ (শরীরং) কীল কীলিতং (অর্গলাবদ্ধং) ইব স্তব্ধং (নিশ্চলং) জায়তে (ভবতি) তং সর্পং (অহিং) ইব অতি জিহ্ম গহনং (অত্যন্ত ভয়প্রদং) দর্পং (অহঙ্কারং) কঃ কোবিদঃ (পণ্ডিতঃ) স্পৃশেৎ (স্পর্শকুর্য্যাৎ) ন কোঽপীতিভাবঃ। সর্পদষ্টোপি প্রাণপরিত্যাগাদিকং করোতি ইতি সাদৃশ্য মবলম্ব্যোক্তং কবিনা। ৪০।

যাহার দংশনে খ্যাতিপ্রদ বিনয়রূপ প্রাণ পরিত্যাগ করে, যাহার দংশনে বিবেক ও নীতিরূপ নয়নদ্বয় নিমীলিত হয়, যাহার দংশনে মানব শরীর কীলক

বিদ্ধ বস্তুর স্মায় স্তব্ধ হইয়া থাকে, সেই সর্প সদৃশ অতি ভয়ানক সর্পকে কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি স্পর্শ করে? ৪০।

অথ মায়াপ্রক্রমম :—

দম্ভং বকাইব বিধায় দুরাশয়া যে,
মীনানি বাখিল জনান্ প্রতি বঞ্চয়ন্তি,
তৈঃ সৌহৃদাদমল কীর্ত্তিলতা পয়োদা
দাত্মা প্রপঞ্চ চতুরোহ চতুরৈরবঞ্চি। ৪১

যে (জনা ইতি শেষঃ) দুরাশয়া (দুঃ দুষ্টা আশা তৃষ্ণাতয়া) হেতুনা দুষ্ট আশয়ো মনো যেষা মিতি কর্ত্তৃ বিশেষণং বা বিসর্গ লোপস্তু সুকল্পমিতি।) দম্ভং (কাপট্যং) বিধায় (অবলম্ব্য) বকাঃ (বলাকাঃ) মীনান্ (মৎস্যান্) ইব জনান্ প্রাণিনঃ প্রতিবঞ্চয়ন্তি (প্রতারয়ন্তি) তৈঃ অচতুরৈঃ (দুর্বুদ্ধিভিঃ জনৈরিতি শেষঃ) অমল কীর্ত্তিলতা পয়োদাৎ (অমলা নির্ম্মলা কীর্ত্তিঃ যশঃ এব লতাবল্লী তস্যা পয়োদঃ জলসেককারি মেঘঃ তস্মাৎ কীর্ত্তিবর্দ্ধকাদিতি ভাবঃ) সৌহৃদাৎ (সৌহার্দ্দাৎ) প্রবঞ্চ চতুরঃ (প্রবঞ্চেষু চতুরঃ কুশলঃ) আত্মা অবঞ্চি (বঞ্চিতঃ প্রতারিত ইত্যর্থঃ)। কপটাচার পুরুষেণ সহ কস্যাপি সৌহার্দ্দং ন ভবিষ্যতি ইতি ভাবঃ।৪১।

যাহারা দুরাশা হেতু কপটভাবলম্বন করিয়া (বকেরা যেরূপ মৎস্য গুলিকে প্রবঞ্চণা করে, সেইরূপ) জীব সমূহকে প্রবঞ্চনা করে, সেই অচতুর পুরুষেরা নির্ম্মল কীর্ত্তিলতার বর্দ্ধনকারী জলদ সদৃশ সোহার্দ্দ হইতে প্রপঞ্চ চতুর আত্মাকে বঞ্চিত করে। ৪১

মায়ামীমাং কুটিলশীল বিহার বিজ্ঞাং
মন্যামহে হৃদি ভুজঙ্গ বধূং নবিনাং।
দষ্টোহনয়া স্মিত সরোজ সহোদরাস্যো
মোহং নয়েদ্ যদি ভরাল্মধুরং ব্রুবানঃ।৪২।

ইমাং মায়াং হৃদি কুটীলশীল বিহার বিজ্ঞাং (কপটাচার বিহার পণ্ডিতাং) নবীনাং (অভিনবাং) ভুজঙ্গ বধূং (ভুজঙ্গীং) মন্যামহে (উৎপ্রেক্ষমহে) যৎ যতঃ অনয়া (মায়ারূপ ভুজঙ্গ্যা) দষ্টঃ (জন ইতি শেষঃ) স্মিত সরোজ সহোদরাস্য (ঈষদ্বাস্য রূপ কমল যুক্ত বদনঃ সন্) মধুরং (শ্রুতিসুখকরং যথা

কথা) ব্রুবানঃ (কথয়ন্) ইতরান্ (অজ্ঞান্ কাপট্য রহিতান্ ইত্যর্থঃ জনান্ ইতি শেষঃ) মোহং নয়তি (প্রাপয়তি) ভুজঙ্গী দষ্টো জন এব মোহং প্রাপ্নোতি মায়ারূপ ভুজঙ্গী দষ্টজন সম্পর্কাদন্যরে মূঢ়া ভবন্তীতি নবীনত্ব মিতি। ৫২

কপটাচার নিপুণা মায়াকে আমি অভিনবা ভুজঙ্গী বলিয়া মনে করি; যেহেতু ঐ ভুজঙ্গ দষ্ট মানব হাস্যমুখে মধুর কথা বলিতে বলিতে অপর সরল হৃদয় পুরুষোত্তম দিগকে মুগ্ধ করে। অন্য ভুজঙ্গ দষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হয়, মায়া ভুজঙ্গী দষ্ট ব্যক্তির তাৎকালীক মৃত্যু হয় না, কিন্তু সেই বিষে জর্জ্জরিত হইয়া, আত্মজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়ে এবং অন্যকেও মোহিত করে এই জন্য মায়া ভুজঙ্গীকে নূতন তরী বল হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীক্ষেত্রনাথ সেন।

মহাপ্রস্থান।

"There are certain bereavements which one would prefer to bear in silence, since words are too poor to do them justice."
—H. S. Olcott.

যখন পূজনীয়া মাদাম ব্লাভাস্কি জড়দেহ পরিত্যাগ করিয়া যান, তখন কর্ণেল অলকট্ উপরোক্ত কথাটী বলিয়াছিলেন। তাহার মহাপ্রস্থানে আমিও আজ তাহাই বলিতেছি। বাস্তবিক কর্ণেলের জড়দেহ ত্যাগে আমাদের হৃদয়ে যে আঘাত লাগিয়াছে, তাহা পক্ষাধিক কাল অনবরত চেষ্টা করিয়াও ভাষার অভাবে প্রকাশ করিতে পারিতেছি না।

আমাদের যে ভক্তি, ভালবাসা, স্নেহ, সব যেন এই দেহ পদবাচ্য খোসাখানা লইয়া। আজ যদি কোন উপায়ে জানিতে পারি যে, আমার প্রাণাপেক্ষা (?) প্রিয়তম মৃত ভ্রাতার সত্ত্বা এজীবনে নফর মুচির দেহে অধিষ্ঠিত, তখন তাহাকে কি ঠিক ততখানি ভালবাসিতে পারি? কখনই না। তবে কি করিয়া বলি, আমাদের ভালবাসা দৈহিক নহে?

বুঝিয়েছি পিতৃপ্রতিম পরলোকগত কর্ণেল দেহ কারাগার হইতে মুক্ত হইলেন, তত্রাচ যখন মনে হয় তিনি ইহজগতে নাই, তখনই যেন প্রাণে একটা ঘোর অবসাদ—বিষাদের ছায়াপাত হইতেছে। ইহাকে কর্ণেলের জড়দেহের প্রতি আশক্তি বই আর কি বলিব ? যখন মনে হয়, সেই ঋষিতুল্য সৌম্যমূর্ত্তি আর দেখিতে পাইব না,—যখন মনে হয় সেই জলদ্ গম্ভীর স্বর—সেই সস্নেহ সম্ভাষণ—সেই রসময় ভালবাসার উপহাস আর শুনিতে পাইব না, তখনই প্রাণ যেন কাঁদিয়া উঠে।

বাৎসরিক সম্মিলনের (Convention) সময় যখন আদিয়ারে যাইতাম, তখন তিনি যে আনন্দ প্রকাশ করিতেন, বোধ হয় বহুকাল প্রবাসী সন্তান গৃহে আসিলে পিতার তত আনন্দ হয় কিনা সন্দেহ। সম্মিলনের শেষে তাঁহাকে দেখিলে বিজয়ার ভগবতীর প্রতিমার ছল ছল চক্ষু আমার মনে পড়িত। যাঁহাদের ক্রোড়ে আজীবনে লালিত পালিত হইয়াছি, তাঁহাদের মৃত্যুতে এতটা অবসন্ন হই নাই, সুদূর মার্কিনবাসী বৃদ্ধের সহিত এই গোটা কুড়ি বৎসরের পরিচয়ে যেন একটা অকাট্য বন্ধন হইয়া গিয়াছিল।

কর্ম্মবীর কর্ণেল ১৮৩২ খৃঃ অব্দে মার্কিন দেশে অচেঞ্জ সহরে জন্ম গ্রহণ করেন। যৌবনে রাসায়নিক কৃষি বিদ্যাই তাঁহার আলোচ্য বিষয় ছিল। কৃষি বিদ্যায় এতদূর পারদর্শী হইয়াছিলেন যে তাঁহার ত্রয়োবিংশ বৎসর বয়ঃক্রম কালেই গ্রীসের এথেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিভাগে সর্ব্বোচ্চপদে তত্রস্থ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন। কিন্তু এ অযাচিত সম্মান প্রত্যাখ্যান করিয়া নিজ দেশেই একটী কৃষি বিদ্যালয় সংস্থাপনা করিয়া ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে কৃষি-বিদ্যানুশীলনার্থে প্রথমে ইউরোপ যাত্রা করেন।

পরে যখন মার্কিনে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয়, তখন তিনি সমর বিভাগে প্রবেশ করেন। কৃষক অলকট্ তখন যোদ্ধা অলকট্ হইয়া জেনারেল বারন্ সাইডের অধীনে যুদ্ধ করিতে থাকেন। এই সময় সমর বিভাগে নানা প্রকার জাল জুয়াচুরী চলিতে থাকে। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার প্রতিভা দর্শনে এই ব্যাপারানুসন্ধানে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। চারি বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় বলে নানা প্রকার কষ্ট ও নিন্দা সহ্য করিয়া অপরাধীর শাস্তি দেওয়ান। কর্ত্তৃপক্ষ যারপরনাই প্রীত হইয়া তাঁহাকে কর্ণেল উপাধিতে ভূষিত

করিয়া নগর বিভাগের প্রধান কমিশনর পদে উন্নীত করেন। এ সময় নৌযুদ্ধ (Navy) বিভাগেও এইরূপ গোলযোগ হওয়ায় তাহাও তিনি সুব্যবস্থিত করেন। প্রতিভার জয় সর্ব্বত্র।

কিছুদিন পরে কৃষক অলকটের যুদ্ধ বিগ্রহ ভাল না লাগায়, ব্যবহারাজীবির ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন। নিউ ইয়র্ক সহরে যখন তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি হয়, তখন মাদাম্‌মের সহিত পরিচয় এবং সেই পরিচয়ের ফলে ১৮৭৫ সালের ১৭ই নবেম্বর নিউইয়র্ক সহরে থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর প্রতিষ্ঠা। সেই অবধি ১৯০৬ সালের শেষ পর্য্যন্ত যে অদম্য উৎসাহের সহিত মানব জাতির কল্যাণ কামনায় দেহমন প্রাণ সমর্পণ তাহার পরিচয় এ অধমের দুর্ব্বল লেখনী বর্ণনায় অক্ষম। যখন মিশনরীগণ কুলুম্ব (Coloumb) দম্পতির সাহায্যে কুৎসা রটনা করিয়া ইহাদের উৎখাত করিতেছিল, তখন তাঁহাদিগের হিমাদ্রি সদৃশ ধৈর্য্য ও সহগুণ যে দেখিয়াছে, সেই অবাক হইয়াছে।

তাঁহার এক অক্ষয় কীর্ত্তি, সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। যে সিংহল একদিন বৌদ্ধ ধর্ম্মের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ বৌদ্ধ জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, খ্রীষ্টান পাদরীদিগের মোহে সেখানে গ্রামে গ্রামে মিশনরী স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল, দেশ খৃষ্টানে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, আর কিছুদিন সে অবস্থায় থাকিলে আজ সিংহলে আর বৌদ্ধ পাওয়া যাইত কিনা সন্দেহ। কিন্তু কর্ণেলের চেষ্টায় ও অনবরত পরিশ্রমে আজ সিংহল হইতে খৃষ্টান মিশনরী এক প্রকার বিতাড়িত হয়।

একজন পাদরী কর্তৃপক্ষদিগকে লিখিয়াছিলেন :—

"কর্ণেল অলকট থাকিতে সিংহলে আমাদিগের আর কোন প্রত্যাশা নাই। সুধু চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া কি হইবে, অনুমতি হয়ত আড্ডা তুলিয়া দেশে ফিরিয়া যাই।"

সিংহলে সোসাইটীর তত্ত্বাবধানে ২ শতের অধিক স্কুল কলেজ ও প্রায় ২৬০০০ ছাত্র। মিশনরীদিগের স্থান কোথায় ?

মাদ্রাজ অঞ্চলে খৃষ্টধর্ম্মের এত প্রবল প্রতাপ হইয়াছিল যে, থিয়সফি সময়ে না আসিলে, মাদ্রাজে হিন্দু খুঁজিয়া বাহির করিতে হইত না। চিন্তা

শক্তির প্রবল ক্ষমতার কথা স্বীকার করিলে, আজ যে আমাদের দেশে একটা সচ্চিন্তার স্রোত বহিতেছে, ইহার মূলেও এই থিয়সফি।

মাদ্রাজ অঞ্চলের পারিয়া জাতি চিরকাল উপেক্ষিত, কর্ণেলের চেষ্টায় তাহারাও আজকাল শিক্ষিত হইতেছে। কর্ণেল মাদ্রাজ, অদিয়ার তাহার বাড়ী বলিতেন। নিজের দেশ অপেক্ষা তিনি আদিয়ার বেশী ভাল বাসিতেন। তিনি যেন আজন্ম হিন্দুস্থান বাসী, আমাদেরও মনে হইত তিনি আমাদেরই একজন। তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার কথা পৃথিবীর সভা সমাজে সকলেই বিশেষ পরিজ্ঞাত।

১৯০৬ সালে আমেরিকা পরিভ্রমণে গিয়া ইউরোপে প্রত্যাবর্ত্তন কালে জাহাজে পড়িয়া গিয়া তাঁহার হৃদ্রোগ হয়। গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী বেলা ৭টার সময় হিমালয় বাসী জীবন্মুক্ত মহাত্মাগণ আসিয়া মহা সমারোহে প্রকৃত কর্ণেলকে জড়দেহ বিচ্যুত করিয়া স্বধামে লইয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে পূজনীয়া শ্রীমতী বেশান্ত "হিন্দু" পত্রিকায় যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

"This morning (17 Febry 1907) came from their far off ashramas in the snowy Himalayas, his (Col. Olcotts) own master wearing the Rajput form, with that other gentlest one in the form of Kashmiri Brahmana, and yet one other Egyptian form, who had him also in charge, and they with his dearest friend H. P. Blavatsky, came to fetch him to rest with them in their home far north. His own Gurudeva snapped the cord that bound the man to his cast off garment, and sleeping in his Masters arms, as it were, he passed from earth."

শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!!

শ্রীক্ষেত্রনাথ সেন।

আমি ও আমার দেহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চতুর্থ অধ্যায়।

মনোময় কোষ।

ভুবর্লোক। কামময় দেহ।

ভূর্লোকের পরে ভুবর্লোক। ভাষাটা বোধ হয় ঠিক হইল না, কারণ অনেকেই হয়ত এইরূপ বুঝিবেন যে ভুবর্লোক বুঝি ভূর্লোকের বাহিরে অবস্থিত। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি লোকগুলি কেহ কাহারও সম্পূর্ণ বাহিরে অবস্থিত নহে, পরস্পর পরস্পরের মধ্যে যথা সম্ভব অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। ভুবর্লোকও এই ভূর্লোকের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে, তবে ভুবর্লোক বৃহত্তর, সুতরাং ইহার কিয়দংশ ভূর্লোকের বাহিরেও অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আছে। মনে করুন একটি স্ফটিক্ গোলক জলে পরিপূর্ণ হইয়া আছে এবং তাহার মধ্যভাগে একটি স্পঞ্জের গোলক ভাসিতেছে। জল স্পঞ্জ গোলকের অভ্যন্তরে উহার শিরায় শিরায় পঞ্জরে পঞ্জরে প্রবিষ্ট হইয়া আছে, অথচ উহার বাহিরেও উহাকে চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া আছে। এ স্থলে স্পঞ্জ গোলকের সহিত জল গোলকের যেরূপ সম্বন্ধ, ভূর্লোকের সহিত ভুবর্লোকের অনেকটা সেইরূপ সম্পর্ক। স্থূল জগতের প্রত্যেক অণু যেইরূপ ইথার আবরণে আবৃত, ভূর্লোকের প্রত্যেক অণু সেইরূপ ভুবর্জগতের উপাদানের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আছে। রসগোল্লা যেরূপ রসে ডুবিয়া থাকে, ভূর্লোকও সেইরূপ ভুবর্লোকে ডুবিয়া আছে। যেখানে ভূর্লোক সেই খানেই ভুবর্লোক বিরাজমান। সুতরাং ভূর্লোক হইতে ভুবর্লোকে যাইতে হইলে ভূর্লোক ছাড়িয়া যাইবার প্রয়োজন নাই। কেবল উপযুক্ত যান আবশ্যক।

কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। মনে করুন একজন চক্ষুহীন, দৃষ্টিশক্তি একেবারেই নাই। কিন্তু তাহার কর্ণ আছে, শুনিতে পায়; ত্বক আছে, স্পর্শ করিতে পারে; রসনা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় আছে, সুতরাং আস্বাদ বা ঘ্রাণ লইবার কোন ব্যাঘাত হয় না। মোটের

উপর সে সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই অনুভব করিতে পারে, পারেনা কেবল দর্শন করিতে। শব্দ, স্পর্শ, রস, গন্ধ সমস্তই তাহার বোধগম্য, সমস্তই তাহার উপভোগ্য, কিন্তু রূপ বিষয়ে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। রূপ জগতের সহিত তাহার পরিচয় নাই, তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত সে অবগত নয়, অথচ যেখানে শব্দ জগৎ রস জগৎ, স্পর্শ জগৎ, গন্ধ জগৎ সেই খানেই রূপ জগৎ বিদ্যমান। সে রূপ সাগরে ডুবিয়া আছে, অথচ তাহার বিন্দুমাত্র পান তাহার ভাগ্যে ঘটে না শুদ্ধ একটি ইন্দ্রিয়ের অভাবে তাহার এই দুর্দ্দশা। যদি কোন উপায়ে সে এই ইন্দ্রিয়টি সংগ্রহ করিতে পারে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সে আপনাকে এক নূতন জগতে উপস্থিত দেখিতে পাইবে। ইহার জন্য তাহাকে স্থানত্যাগ করিয়া কোথাও যাইতে হইবে না। সেইরূপ ভুবর্লোকের সহিত পরিচয় করিতে হইলে আমাদের ইহলোক ছাড়িয়া যাইবার প্রয়োজন নাই, কেবল তদ্দর্শনক্ষম সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের বিকাশ করিতে পারিলেই যথেষ্ট হয়। যাঁহাদের এইরূপ সূক্ষ্মদৃষ্টির উন্মেষ হইয়াছে তাঁহারা ভূর্লোকে অবস্থিত থাকিয়া জাগ্রত অবস্থাতেই ভুবর্লোক দর্শন করিয়া থাকেন। এই ভূর্লোকে অসংখ্য ক্ষুদ্র জীবাণু সমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আমরা বাস করিতেছি, ঘাটে মাঠে জলে স্থলে সর্ব্বত্র তাহারা সর্ব্বদা বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত তাহাদিগকে আমরা দেখিতে পাই না। সেইরূপ সূক্ষ্ম জগতে বাস করিয়াও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের সহায়তা ব্যতিরেকে তাহার অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায় না। সৌভাগ্য ক্রমে এইরূপ সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় আমাদের সকলেরই আছে, তবে অধিকাংশ স্থলে তাহা অবিকশিত অবস্থায় বর্ত্তমান। যদি আমরা তাহার উপযুক্তরূপ ব্যবহার করিতে চাই, তাহা হইলে অগ্রে তাহাকে ফুটাইতে চেষ্টা করিতে হইবে। বলা বাহুল্য ইহার জন্য সাধনার প্রয়োজন।

সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের আধার সূক্ষ্ম দেহ। আর সূক্ষ্ম দেহই সূক্ষ্ম জগতে বিচরণের উপযুক্ত যান। যেমন জগৎ, দেহও তদনুরূপ হওয়া চাই। অশ্বযানে যেরূপ আকাশ পথে ভ্রমণ করা যায় না, স্থূল দেহে সেইরূপ ভুবর্লোকের ন্যায় সূক্ষ্ম লোকে বিচরণ করা যায় না। ভুবর্লোকে বিচরণ করিবার জন্য আমাদের স্বতন্ত্র দেহ আছে। বেদান্তে যাহাকে মনোময় কোষ বলে এই দেহ তাহারই অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মাংশ লইয়া গঠিত। এই দেহের স্বতন্ত্র নামকরণ করিতে

হইলে, বোধ হয় ইহাকে কামময় কোষ নামে অভিহিত করাই সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তি সঙ্গত, কারণ এই দেহই আমাদের সকল কামনার আধার।

যাঁহারা বলে মস্তিষ্ক ভিন্ন আমাদের মনের আর কোন সূক্ষ্মতর যন্ত্র নাই তাঁহারা এই মনোময় কোষের কথা শুনিলে হয়ত নানা আপত্তি করিয়া বসিবেন। দুর্ভাগ্যক্রমে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের স্থূল যন্ত্রের সাহায্যে এই কোষের অস্তিত্ব প্রমাণ করা আপাততঃ অসাধ্য। মনোময় কোষের স্থূলতম উপাদান সূক্ষ্মতম, ইথার অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর। যাহা দ্বারা এইরূপ পদার্থ প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়, এরূপ উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই এবং শীঘ্র যে হইবে এরূপ আশা করা যায় না। যে সূক্ষ্মদৃষ্টি বলে ইহা প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহা বিনা সাধনায় পাওয়া যায় না, এবং পাইলেও তাহা অপরকে ধার দেওয়া চলে না। সুতরাং যাঁহারা মনোময় কোষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইবেন, তাঁহাদের সন্দেহ দূর করা সহজ সাধ্য নহে। তবে তাঁহারা যুক্তি প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া থাকেন এবং চক্ষে না দেখিয়া থাকিলেও কেবল যুক্তির বলে ইথারের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন ইথার না থাকিলে ইহজগতের অনেক ব্যাপার বুঝিতে পারা যায় না; অতএব তাঁহারা ইথার আছে বলিয়া ধরিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। সুতরাং যদি এরূপ দেখান যায় যে মনোময় কোষের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে অনেক অবোধ্য ব্যাপার সহজ-বোধ্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে বোধ হয় ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে তাঁহাদের আপত্তি থাকিবে না। আমরা এক্ষণে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু সকলে স্মরণ রাখিবেন, যে সামগ্রী প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে তাহার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য অন্য যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা অনাবশ্যক। "বিশ্বাস না হয়, দেখিয়া আসুন" এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হয়। তবে ইহাকে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে যে সাধনা আবশ্যক, ইহাকে আকাশ কুসুমের ন্যায় কোন কাল্পনিক পদার্থ বলিয়া মনে ধারণা থাকিলে কয়জনের সে সাধনায় প্রবৃত্তি আসিতে পারে। এই জন্যই আমাদিগকে যুক্তির অবতারণা করিতে হইতেছে।

যে সকল যুক্তি বলে বৈজ্ঞানিকেরা ইথারের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন তাহার সকল গুলি এখানে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু তাহার

একটি যুক্তি এস্থলে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই যুক্তিটি আলোক-প্রবাহের বেগের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রতি সেকেণ্ডে আলোক দুই লক্ষ মাইল ছোটে। সূর্য্য পৃথিবী হইতে নয় কোটি মাইলেরও অধিক দূরে অবস্থিত, অথচ সাত মিনিটের মধ্যে সূর্য্য হইতে আলোক আসিয়া পৃথিবীতে পৌঁছায়। এই ভয়ঙ্কর বেগবান আলোক কি পদার্থ? প্রথমে বিশ্বাস ছিল ইহা স্থূল জড় কণা মাত্র; বহিস্থ পদার্থ হইতে অতি ক্ষুদ্র আলোক কণিকা সমূহ ছুটিয়া আসিয়া আমাদের চক্ষে আঘাত করে ও তাহাতেই আমাদের দর্শন অনুভূতি হয়। কিন্তু এত গুলি কণা এক সঙ্গে এত বেগে ভ্রমণ করিলে তাহাদের বেগভার (Momentum) এত অধিক হয় যে আমাদের চক্ষুর পক্ষে তাহা সহ্য করা অসম্ভব। সুতরাং বৈজ্ঞানিকেরা এই প্রচলিত মত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, এবং তৎপরিবর্ত্তে আলোককে কোন সর্ব্বব্যাপী সূক্ষ্ম পদার্থের স্পন্দনমাত্র বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। এই সর্ব্বব্যাপী সূক্ষ্ম পদার্থ কি? বায়ু প্রভৃতি এইরূপ ধরণের যে সকল পদার্থ আমাদের জানা আছে, তাহাদের তরঙ্গের বেগের সহিত আলোক তরঙ্গের বেগের তুলনাই হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহারা অনুমান করিলেন যে বায়ু হইতেও বহু গুণে সূক্ষ্মতর আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়ের অগোচর এক অপরূপ পদার্থ জগতে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে; আলোক প্রবাহ তাহাকেই অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এইরূপে ইথার আবিষ্কৃত হইল। মনোময় কোষ সম্বন্ধেও এইরূপ যুক্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। মনোরথকে সময় সময় এত দ্রুত ছুটিতে দেখা যায় যে ইথিয়াযানের গতিও তাহার নিকট অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে, স্থূল মস্তিষ্করূপ মন্দগতি বাহনের ত কথাই নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। যে সকল জর্ম্মণ লেখক স্বপ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে Steffens সাহেব অন্যতম। তিনি বলেন যে বাল্যকালে একদিন তিনি তাঁহার সহোদরের সহিত একত্র ঘুমাইতেছিলেন। এমন সময় তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে তিনি এক নির্জ্জন পথে উপস্থিত হইয়াছেন, আর সেখানে এক বন্য জন্তু তাঁহাকে তাড়া করিয়াছে। প্রাণ-ভয়ে তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন; জন্তুটাও তাঁহার পিছু পিছু ছুটিল। অবশেষে তিনি

সম্মুখে এক সিঁড়ি দেখিতে পাইয়া তাহার উপর উঠিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাকে অধিক দূর যাইতে হইল না। ভয়ে ও পরিশ্রমে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; সুতরাং সেই জন্তুটা আসিয়া শীঘ্রই তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং তাঁহার উরুদেশে ভীষণ দংশন করিল। অমনই তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি চমকিয়া উঠিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার ভাই তাঁহার উরুদেশে চিমটি কাটিয়াছে। Richers নামে আর একজন জর্ম্মান লেখক এইরূপ আর একটি ঘটনার বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, বন্দুকের শব্দে একজনের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। লোকটি জাগিয়া উঠিয়া বলিল যে সে এক অদ্ভুত গোছের স্বপ্ন দেখিতেছিল। তাহার বোধ হইতেছিল যেন সে কোন সৈনিক দলে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু নানা কারণে দল ছাড়িয়া সে একদিন পলাইল। তারপর সে কত স্থানে কত ভয়ানক বিপদে পড়িল, কত কষ্ট পাইল; এবং অবশেষে ধরা পড়িয়া সেনাপতির নিকট নীত হইলে সেখানে তাঁহার রীতিমত বিচার হইল এবং তাহাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিবার আদেশ দেওয়া হইল। অতঃপর যেমন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছোঁড়া হইল অমনই তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। পাঠকগণ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, এই দুইটি স্বপ্নের উৎপত্তি ও প্রকৃতি একই ধরণের। বাহির হইতে শব্দ বা আর কোন উত্তেজক কারণ আসিয়া নিদ্রিত ব্যক্তির স্নায়ু উদ্রিক্ত করিল, সে সংবাদ তাহার মস্তিষ্কে পৌঁছাইতে না পৌঁছাইতে সে সেই ব্যাপারটাকে চরম ঘটনা করিয়া একটা প্রকাণ্ড বিয়োগান্ত নাটকের সৃষ্টি করিয়া ফেলিল এবং স্বয়ং প্রধান নায়কের অংশ গ্রহণ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত অভিনয় করিল। এত কাণ্ড কারখানা হইয়া গেল; অথচ এক সেকেণ্ডের এক সামান্য ভগ্নাংশের অধিক সময় ব্যয়িত হইল না। বলা বাহুল্য চিন্তা তরঙ্গের এইরূপ প্রকৃত বেগের উদাহরণ বিরল নহে। যেরূপ স্বপ্নের কথা বলিলাম সেরূপ স্বপ্ন পাঠক বর্গ বা তাঁহাদের বন্ধুগণের মধ্যে বোধ হয় অনেকেই দেখিয়াছেন। সুতরাং আর উদাহরণের প্রয়োজন নাই। এক্ষণে কথা হইতেছে, স্থূল মস্তিষ্কের স্থূল অণু সমূহের স্পন্দনে এইরূপ দ্রুতগামী তরঙ্গের উৎপন্ন হওয়া সম্ভব কিনা? জর্ম্মণ পণ্ডিত Wunt সাহেব হিসাব করিয়া বলিতেছেন, একেবারে অসম্ভব। সত্যানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেই যে তাঁহার কথায়

সায় দিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং চিন্তার কোন সূক্ষ্মতর যানের সন্ধান করা আবশ্যক।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমন্মথমোহন বসু।

পঞ্চীকরণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

'জপ, হোম, এবং শত শত উপবাস দ্বারাও মুক্তি হইবে না; ব্রহ্মই আমি ইহা জানিয়া জীব মুক্ত হইবে। ঘোরতর মদ্যপানে মত্ত, অথবা প্রগাঢ় নিদ্রাক্রান্ত পুরুষ, যুবতী কর্তৃক আলিঙ্গিত হইলেও যেমন তাহার কিছুমাত্র চিত্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় না, তদ্রূপ ঘোর মোহমদোন্মত্ত এবং মায়া নিদ্রায় আক্রান্ত পুরুষ সাধনা দ্বারা অণুপ্রাণিত হইলেও তাহার আত্মজ্ঞান বা তত্ত্ববোধ জন্মে না। যে জপে, যে হোমে, যে ব্রত উপবাসে আত্মতত্ত্বের অভিজ্ঞান নাই আর শত শত বৎসর তাহার অনুষ্ঠান করিলেও তাহাতে কোন ফল হইবে না। অন্যথা জপ হোম উপবাসে মুক্তি হইবে না, ইহা যদি নিশ্চয়ই আছে, তবে আবার "মুক্তি হইবে না"—একথা বলা কেন? বাস্তবিক ত জপ হোম উপবাস, ইত্যাদি সমস্তই আত্মজ্ঞানের সাধন পরম্পরা। তাই শাস্ত্র বলিতেছেন—সেই মূল তত্ত্ব আত্মজ্ঞান অংশ ত্যাগ করিয়া কেবল সাধারণ কর্ম্মাংশের অনুষ্ঠান করিলে, শত বৎসরেও তাহার দ্বারা কখনও মুক্তি সাধিত হইবে না; আত্মজ্ঞানীর কর্ম্মানুষ্ঠান নাই, ইহা শাস্ত্রার্থ নহে। বরং আত্মজ্ঞানী ভিন্ন অন্য কেহ কর্ম্মের অধিকারীই হইতে পারে না, ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

আত্মা, সাক্ষী, (মায়া রচিত বিশ্বকার্য্যের কেবল দর্শন কর্ত্তা) বিভু, পূর্ণ সত্য অদ্বৈত পরাৎপর। (গৃহস্থিত আকাশের ন্যায়) দেহস্থিত হইয়াও আত্মা দেহস্থ নহে, অর্থাৎ দেহের অন্তর্গত হইলেও দেহগুণে নিত্য অলিপ্ত, এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ হইলেই জীব মুক্তি লাভ করে। বালকের ক্রীড়ার ন্যায় সমস্ত নামরূপাদির কল্পনা পরিহার পূর্ব্বক, যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াছেন, তিনি

মুক্ত, তাহাতে সংশয় নাই। বালক যেমন ক্রীড়া পুত্তলী মধ্যে পুত্র, কন্যা, বৈবাহিক ইত্যাদি সম্বন্ধ স্থাপন করে এবং ক্রীড়া ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই সেই সমস্ত নামরূপ অন্তর্হিত হয়, তদ্রূপ এই সংসাররূপ ক্রীড়াক্ষেত্রে মায়া পুত্তলী জীবগণের মধ্যে স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা, ইত্যাদি সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক যতই নামরূপের কল্পনা করনা কেন, নিশ্চয় জানিবে তোমায় এই ভবলীলার সঙ্গে সঙ্গেই সে সমস্ত নামরূপ ঘুচিয়া যাইবে। তাই এই বেলা, বেলা থাকিতে খেলা ভাঙ্গিয়া মায়াময় নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া মায়ার অতীত পরব্রহ্মে যিনি অন্তর্মন সমাধান করিয়াছেন ও পরমাত্মার অভিন্ন সম্বন্ধে যিনি মিশিয়াছেন, এই মায়িক দেহে অবস্থিত হইয়াও তিনি ব্রহ্মের ন্যায় নিত্য নির্ম্মুক্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় চতুষ্পদী।

জন্ম মরণ কেম টলশে ভাই,
সাধুনো সমাগম করায়ে জাই।
জন্ম মরণ কেম টলশে মহাবে,
হুঁ কোণ ছুঁ এবো বিচার করেতে বারে ॥২॥

অনেক জন্মে, নিষ্কাম ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে, এরূপ বৈদিক শুভকর্ম্ম সমুদায়ের ফলে, প্রসন্ন হইয়াছেন এইরূপ ঈশ্বর, তাঁহার অনুগ্রহতে, শান্তি দান্তি, শ্রদ্ধা, আদি সাধনসম্পন্ন হইয়াছে, এরূপ জিজ্ঞাসুর এই জন্ম মরণের মহৎ দুঃখ কিরূপে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে; কোন উপায়ে নিবৃত্ত হইবে? যদি এই প্রকার জিজ্ঞাসুর "জিজ্ঞাসা" (শুভ ইচ্ছা) উৎপন্ন হয়, তবে ঐ মুমুক্ষুর অনতিবিলম্বে সাধুর নিকট যাইয়া তাঁহার নিরন্তর সহবাস করা উচিত।

শিষ্য। সাধু শব্দের অর্থ কি? কৌপীন তুম্বী (কমণ্ডলু) আদি ধারণ করিয়া, কেবল বেশমাত্র অবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহকারী যাহারা জগতে ভ্রমণ (বিচরণ) করিয়া থাকে, তাহাদিগকে কি সাধু বলে? এই কি সাধুর লক্ষণ? না, অন্য কোন লক্ষণ আছে? যে লক্ষণ জানিলে সাধুর স্বরূপ চিনিয়া তাঁহার সহিত সমাগম করিলে জন্ম মরণ ক্লেশ নিবৃত্ত হয়। কৃপা করিয়া সাধুর এই লক্ষণ গুলি আমাকে বলুন।

গুরু। "সাধু" অর্থে যে স্বধর্ম্মই ত্যাগ করে না, যাহাতে সমদৃষ্টি,

বৈরাগ্য, শান্তি, দান্তি, ধৈর্য্য, দয়া,অদম্ভ, অমান, অক্রোধ, ক্ষমা, অবৈর, শুচি, এই সকল শুভগুণ থাকে, এবং যে শ্রোত্রিয় অর্থাৎ বেদ ও ইহার অর্থ জ্ঞাতা, আর ব্রহ্মনিষ্ঠ, অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে যাহার নিষ্ঠা আছে, এরূপ সাধু চিন্‌বো কেমন ক'রে? উত্তর,—যার মন প্রাণ অন্তরাত্মা ঈশ্বরে গত হইয়াছে, তিনিই সাধু। যিনি কামিনী ও কাঞ্চন ত্যাগী, তিনিই সাধু। যিনি সাধু, তিনি স্ত্রীলোককে ঐহিক চক্ষে দেখেন না—সর্ব্বদাহ অন্তরে থাকেন তিনি যদি স্ত্রীলোকের কাছে আসেন, ত্যাকে মাতৃবৎ দেখেন ও পূজা করেন। সাধু সর্ব্বদা ঈশ্বর চিন্তা করেন। ঈশ্বরীয় কথা বই কথা কন না, আর সর্ব্বভূতে ঈশ্বর আছেন জানিয়া সেবা করেন। মোটামুটি এইগুলি সাধুর লক্ষণ। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অতীব প্রিয়, অর্থাৎ প্রকৃষ্ট সাধন সিদ্ধ, তাঁহার চারটী লক্ষণ হয়। যথা, (১) বালকবৎ, (২) পিশাচবৎ (৩) জড়বৎ এবং (৪) উন্মাদবৎ। তিনি ত্রিগুণাতীত হয়েন। তাঁর কোন গুণেরই আঁট নাই।

সাধুর সামান্য লক্ষণঃ—স্বকার্য্যং সংসারসাগরতরণলক্ষণং ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানেন সাধয়িত্বা পরেষাং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপাণি কার্য্যাণি সাধয়ন্তি তে সাধব উচ্যতে। তাৎপর্য্য এইঃ—ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞান কর্ত্তৃক সংসাররূপ সাগর হইতে তরণ (উদ্ধার) রূপ স্বীয় কার্য্য সিদ্ধ করিয়া, তার পর পুরুষের (অন্যের) ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ কার্য্যকে যে সিদ্ধ করে, তাহাকে সাধু কহে। ইহাই সাধু শব্দের সামান্য লক্ষণ। আর বিশেষ লক্ষণ ঃ—বিচারমালা গ্রন্থের ২য় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

কৃপালবোনভিদ্রোহাঃ পরোক্ষেপসহিষ্ণবঃ।
শান্তাদান্তাঃ কামহীনা মৃদুলা উপকারকাঃ॥

দোহা—অতি কৃপালু, নহিঁ দ্রোহচিত্ত, সহনশীলতা সার।
শম দম আদি অকাম মতি, মৃদুল সর্ব্ব উপকার॥২॥

সাধু অতি কৃপালু, দ্রোহচিত্ত রাহিত্য, (নিন্দা) সহনপটু, শ্রেষ্ঠত্যাগী, অর্থাৎ পরস্ত্রীকে মাতৃভাবে দর্শনকারী, শম (অন্তরেন্দ্রিয় নিগ্রহশীল), দম (বহিরেন্দ্রিয় নিগ্রহশীল) নিষ্কামবুদ্ধি, মিষ্টভাষী ও পর উপকারী হয়েন।২। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ শর্ম্মা।

বিজ্ঞান প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

থিওসফিক্যাল সোসাইটীর স্থাপয়িতা শ্রদ্ধাস্পদ অলকট সাহেব স্থূল জগৎ ত্যাগ করিয়া বিশ্রাম লাভ করিতেছেন। সমস্ত জীবনে যে মহাব্রতে ব্রতী ছিলেন এক্ষণে পুনরায় আগামী জীবনে সেই ব্রত সাধিত করিবার জন্য উচ্চতর শক্তি লাভ করিয়া, তিনি পুনরায় ফিরিয়া আসিবেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে কতকগুলি অসাধারণ ঘটনার সংঘটিত হয়। এই সোসাইটীর পশ্চাতে যে ঋষিকুল আছেন তাঁহাদিগকে লইয়া বাদানুবাদ চলিতেছে। মাননীয়, আনি বেশান্ত বলেন যে পূজ্যপাদ ঋষিরাই মৃত্যু কালে অলকট সাহেবের নিকট প্রকাশিত হন এবং তাঁহাকে সভাপতি হইতে নির্ব্বাচন করেন। অপর পক্ষে শ্রদ্ধাস্পদ ভারতীয় সভার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন যে ঐরূপ বাহ্য মায়াবিক ঘটনাবলীর উপর নির্ভর না করিয়া সভার সভ্যগণ স্থির বুদ্ধিতে সভাপতি নির্ব্বাচন করিলেই মঙ্গল।

এ বিষয়ে আমরা কিছুই বলিতাম না। কিন্তু সংবাদ পত্রে যেরূপভাবে এই বিষয় আন্দোলিত হইতেছে তাহাতে কিছু না বলিয়া থাকা যায় না।

যাহা ব্যক্ত, যাহা চৈতন্যের প্রতিদ্বন্দী, যাহা রূপজ তাহাতে আত্মার পূর্ণ সত্তা থাকিতে পারে না। আমরা যখন পরমাত্মাকে হৃদয় ক্ষেত্রে প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করিতেছি, তখন আমাদের "আমির" বাহিরে সত্য অন্বেষণ করিতে যাওয়া কি কর্ত্তব্য। মানব বস্তু অর্থে বিচ্ছিন্ন ভাব বুঝেন। স্থূলদর্শীর নিকট গুরু ও মহাপুরুষ স্থূল ও আমিত্বের প্রতিদ্বন্দীসত্তা পদার্থ হইয়া পড়েন। কিন্তু গুরু কি স্থূল শরীর? তদ্রূপ অনেকে সাংসারিক অমঙ্গল নাশ কর্ত্তা ব্যক্তিকে গুরু বলিয়া ভাবেন। কেহ বা বুদ্ধি ও মনের অন্ধকার ও অপটুতা দূরকারী শক্তিকে গুরু বলেন। এ গুরুও বাহিরের ক্রীড়ন মাত্র। যতক্ষণ আমরা অহঙ্কারে মগ্ন ততক্ষণ গুরুও বাহিরের ব্যক্তি—অহঙ্কারের অভিব্যক্তি। অতএব উপেন্দ্র বাবুর কথাটী কি নিগূঢ় সত্য নহে! আজ আমরা যদি স্থূল ছায়াবাজীর খেলার কোষ্টি পাথর হইয়া মহাপুরুষ ও তাহাদের ভাব গ্রহণ করি এবং ঐ ভাবের উপর নির্ভর করিয়া আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করি তাহা হইলে আমরা মায়ার সীমা অতিক্রম করিবার এই সুযোগ ত্যাগ করিয়া স্থূলের ও ভেদ ভাবের মোহে নিমজ্জিত হইব। এই প্রকার অদ্ভুত ঘটনার প্রামাণ্য কেবল ব্যক্তিগত। সুতরাং ব্যক্তিগত ভাব আর বাড়াইয়া লাভ কি?